মুসলিম সঙ্গীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা -চট্টগ্রাম

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

সাবেক মহাপরিচালক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সাবেক সচিব- ধর্ম বিষয়ক এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান- আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
সাবেক সভাপতি- বাংলাদেশ তমদ্দুন মজলিস
সভাপতি- বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

Esld- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ :

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য ঃ ৩৫০/-

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Muslim Sangit Charchar Sonali Itihas, (Golden History of Muslim Culture of Music) Written by A.Z.M.Shamsul Alam, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.350/- US$: 10/- **ISBN. 984-70241-0039-9**

www.amarboi.org

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

উৎসর্গ

আমার একমাত্র পুত্র জাবেদ আলম
একমাত্র কন্যা ফিরোজা আলমকে
এবং
তাদের চার পুত্র কন্যাদের
দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য কামনায়-

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

প্রারম্ভিক কথা

আল-কুরআনুল কারীম এর সাহিত্যগুণ বা বৈশিষ্ট্য কি? এটা কি ধরণের গ্রন্থ ? এটা কি গদ্যে রচিত অথবা পদ্যে ? আল-কুরআন গদ্য এবং পদ্য মিশ্র ছন্দে রচিত। কুরআন তিলাওয়াতে প্রচ্ছন্ন আছে। সূর, স্বর, তাল, মাত্রা, কম্পন, সুরেলা ধ্বনি, ইত্যাদি এবং কুদরতি শক্তি আছে। আয়াতে মাত্রা, ছন্দের মিল থাকার কারণে আল-কুরআন মুখস্থ করা সহজ হয়। অবশ্যই, আসল কারণ হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরত। তিনি সর্ব শক্তিমান।

হাদীসের মধ্যেও কিছুটা ছন্দ আছে। অতীতে বহু হাদীস গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিফজ করা হতো। এখনো হয়। আল্-কুরআন হিফজ করা সম্ভব ও সহজতর হয়- আয়াতের অলৌকিক শক্তির কারণে।

কবিতা এবং গানের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে, মিলও আছে। কবিতা এবং গানের ছন্দ এক স্তর বা রূপের নয়। সংগীতযন্ত্র যোগে গীত সংগীতের ছন্দ সাধারণ কবিতা বা গানের ছন্দ হতে ভিন্নরূপ এবং উন্নততর।

ইসলামী বিষয়-সমৃদ্ধ গজল, কাওয়ালী এবং যন্ত্রবিহীন সংগীত ইসলামী তত্ত্ব সমৃদ্ধ না হলেও ইসলাম বিরোধী হয় না। ইসলামী ভাবধারা সম্মত সংগীত মুসলিম পরিবেশে সহনীয়। সুরের মাতলামী, অঙ্গ ভঙ্গীতে বাদরামী এবং কুরুচিশীলতা সর্বাবস্থায় বর্জনীয় ইসলামী সংগীত। সাধারণ জনগণ এবং সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র সমাজে মার্জিত কণ্ঠ সংগীত চর্চা মুসলিম সোনালী যুগে প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশে বহু দেশ বিখ্যাত ওয়ায়েজীন আছেন- যাদের ওয়াজ, ঘন্টার পর ঘন্টা এবং সারা রাত ধরে যখন অনুষ্ঠিত হয়- তা কবিতা, কাব্য আবৃত্তির স্তর অতিক্রম করে যন্ত্রবিহীন সংগীতের স্তরে পৌঁছে যায়।

আধুনিক গান শুনিয়ে শ্রোতাদের সারা রাত বসিয়ে রাখা কঠিন। কিন্তু সুমধুর কণ্ঠে ওয়াজ শুনিয়ে ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন শ্রোতাদের সারা রাত মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখা সহজ। মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত নীতি কথাও শুনতে ক্লান্তি আসেনা।

www.amarboi.org

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হন দেশের সেরা বক্তা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সংগঠনে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বক্তাদের বক্তৃতা কি শ্রোতাদেরকে সারা রাতব্যাপী শোনানো যাবে ? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তাদের ভক্তগণ কত ঘন্টা একাধারে শ্রবণ করতে চাইবেন ?

বহু ঘন্টা ব্যাপী দ্বীনী ওয়াজ চলে। দ্বীনী ওয়াজ শোনা হয় শুধু সুন্দর ওয়াজের জন্যে নয়। বরং, ধর্মীয় বিষয় বস্তুর জন্যে এবং শ্রোতাদের ধর্মীয় চেতনার আবেদনে।

সংগীত কি ইসলাম সম্মত অথবা ইসলাম বিরোধী ? এ প্রশ্নের সর্বজন সম্মত অথবা সর্বজন গৃহীত জবাব দেয়া এবং পাওয়া কঠিন। মুসলিম সোনালী যুগে সংগীতজ্ঞ হওয়ার কারণে অথবা সংগীত চর্চার অপরাধে কাওকে শাস্তি দেয়া হয়েছে এমন দৃষ্ঠান্ত বিরল ও ব্যক্তিগত।

তবে, সংগীত চর্চার প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং পৃষ্ঠপোষকতা– উভয় প্রবণতার প্রতিফলন মুসলিমদের সোনালী যুগে হয়েছিল। সংগীত সমর্থক এবং সংগীত বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক হতাশা, বিরক্তি এবং উষ্মা থাকলে এ বিষয় নিয়ে পারস্পরিক কোনো দাঙ্গা হয়নি।

ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার রা. ছিলেন সবচেয়ে কড়া এবং আপোষহীন। স্বীয় পুত্র আবু শামাকে মদ্য পান করার অপরাধে খলিফা হযরত উমার রা. বিচারক হিসেবে চাবুক মারার শাস্তি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, চাবুক মারার দায়িত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা অপরাধী খলিফা পুত্রের প্রতি করুণাপ্রবণ হতে পারেন। তাই এ শাস্তি খলিফা নিজের হাতেই কার্যকর করেন।

পুত্রকে শাস্তি দানে ২য় খলিফা হযরত উমার (রা.) দুর্বল হয়ে যাবেন মনে করে খলিফা এত জোরে স্বীয় পুত্র আবূ শামাকে চাবুকাঘাত করেন যে, চাবুকের শাস্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই তার পুত্র আবু শামা মৃত্যুবরণ করেন। চাবুকের অবশিষ্ট সংখ্যক আঘাত খলিফা উমার (রা.) তাঁর পুত্র আবু শামার কবরের ওপর প্রয়োগ করে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

হযরত উমার রা. এর অপর পুত্র আসিম সংগীত চর্চা করতেন। খলিফা তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তার সংগীত চর্চায় বাধা দেননি (ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম)। সংগীতের মধ্যে আরব নুসব সংগীত ছিল উগ্র প্রকৃতির এবং সে কালের অতি আধুনিক প্রকৃতির সংগীত। বন্ধুসহ আসিমকে ঐ সংগীত গাইতে

www.amarboi.org

শুনে খলিফা উমার রা. তাকে কষাঘাত করতে চাবুক হাতে আসেননি। বরং "গর্দভ" বলে গালী দেন (আব্‌দ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরীদ)। হযরত উমার রা. শুধু খলিফাই ছিলেন না, হযরত আবু বাকরের রা. পরই খলিফা উমার (রা.) হলেন ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম জীবন দর্শনের দ্বিতীয় আলোকবর্তিকা এবং অণুকরণীয় মডেল।

"ইসলামে সংগীত চর্চা" সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পুস্তক দেখা যায় না। এ বিষয় লেখা কদাচিত পত্র পত্রিকায় দেখা গেছে।আজকাল সংস্কৃতি চর্চার নামে সংগীত, নৃত্য, নাটক, ইত্যাদি যেভাবে পরিবেশন করা হয়, তা প্রতিরোধ করা দ্বীনদারদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করা হলে তা বর্তমান এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে।

www.amarboi.org

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

প্রকাশকের কথা

প্রকাশকের কথায় প্রকাশকের একটি দায়িত্ব হলো পুস্তকের বিষয় বস্তুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং পুস্তক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা। পুস্তকের পরিচিতি, বিষয় বস্তু, প্রসঙ্গ, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি পুস্তকের সূচী দেখে ধারনা করা যায়। প্রবন্ধের অধ্যায় সমূহে বিষয় বস্তুর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সম্প্রসারণ এবং পুস্তকটির প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যায়। যার সাধনায় পুস্তকটি রচিত হয়ে পাঠকের হাতে আসল তার সম্বন্ধে পাঠকের ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। পুস্তকের লেখাই লেখকের পরিচয়। একটি পুস্তকে লেখকের সাধনার থাকে কিছুটা পরিচয় ও পরিচিতি।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকটি একটি গবেষণা লব্ধ এবং তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এতে সংগীতের ওপর রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী হতে ব্যাপক তথ্য সংকেত এবং পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে লেখক এ.জেড.এম. শামসুল আলম নিজের বক্তব্য দিয়েছেন। তদুপরি মুসলিম ইতিহাসে সঙ্গীত চর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে সংগীত সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা হতে তথ্য সংকলনই বেশী করেছেন। এ পুস্তকে প্রদত্ত তথ্য সূচীর সংখ্যা (৪৭১টি) এত বেশি যে মুসলিম সঙ্গীত চর্চার ওপর এমন ব্যাপক এবং মৌলিক আলোচনা বাংলা ভাষায় ইতোপূর্বে আমাদের জানা মতে হয়নি।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" গ্রন্থটি যুগ যুগ ভিত্তিক সংগীত ও সংগীতজ্ঞ সম্পর্কীয় একটি ঐতিহাসিক গবেষণা পুস্তক। বাংলা ভাষায় মুসলিমদের সংগীতের ইতিহাস, কালে ভদ্রে, এখানে সেখানে, আংশিক, ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা হয়েছে। সঙ্গীত চর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনায় যে অপূর্ণতা বিরাজ করছে তা পূরণে এ পুস্তক লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" শীর্ষক গ্রন্থটি কোনো তাত্ত্বিক গ্রন্থ নয়। গান ও সংগীত কতটুকু ইসলাম সম্মত এবং কোন স্তর হতে ইসলাম সম্মত নয় এর বিশ্লেষণ এ পুস্তকে করা হয়নি। ফতোয়া সংক্রান্ত পুস্তক এটি নয়। এটি নিছক ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ।

www.amarboi.org

"আল কুরআনের আলোক সঙ্গীত চর্চা", "হাদীসের আলোকে সংগীত চর্চা" হযরত আয়েশা (রা:) এর সম্মুখে সংগীত চর্চা", "খিলাফতের যুগের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ", "খিলাফতের যুগে সংগীত প্রকরণ", "ইমামদের দৃষ্টিতে সংগীত চর্চা", "ইসলামে বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার", "উমাইয়া যুগে সংগীত চর্চা", "আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চা" শীর্ষক বিষয়াদির তথ্য ভিত্তিক বর্ণনা, এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে পুস্তকটির শিরোনাম "ইসলামের দৃষ্টিতে সংগীত চর্চা" ও হতে পারত। তবে এ পুস্তকে দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য লেখকের বিশ্লেষণে অধিকতর গুরুত্ব এবং স্থান পেয়েছে।

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে বাঙ্গালী মুসলিমগণ ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য দেশ হতে অধিকতর রক্ষণশীল। টুপি দাড়িওয়ালা লোক বাংলাদেশে যত দেখা যায় ইরান, পাকিস্তান ও বহু আরব দেশসমূহে তত নয়।

ইসলামী যুগের শুরু হতে মুসলিম সমাজে সংগীত চর্চার বাস্তব ক্ষেত্র এবং চিত্র কিরূপ ছিল তারই ঐতিহাসিক রূপরেখা লেখক এ পুস্তকে উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামী বিষয় সমৃদ্ধ গজল, কাওয়ালী এবং যন্ত্রবিহীন সংগীত ইসলামী না হলেও ইসলাম বিরোধী মনে করা হয় না। ইসলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ সংগীত মুসলিম পরিবেশে সহনীয়। বাংলার সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সম্ভ্রান্ত সমাজে মার্জিত সংগীত চর্চা প্রচলিত ছিল। বইটিতে সংগীত চর্চায় ইতিহাসের ভাব ধারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের রচনায় দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান সাধনার নির্দেশ পালনের প্রতিফলন কম দেখা যায়। "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকটির লেখক কিছুটা ব্যতিক্রম। কোনো বক্তব্যই তার নিজস্ব, একক এবং উপমাহীন- এরূপ অনুভূতি লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয় না। তিনি যা লেখেন অনুরূপ তথ্য, জ্ঞান, ও অনুভূতি যে তার পূর্বে অনেকের ছিল এ চেতনার অকপট প্রতিধ্বনী লেখক শামসুল আলম এর "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

লেখকের লেখা "ইসলাম ও সংগীত চর্চা" শীর্ষক ৬২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ১৯৬৭ সালে সুনামগঞ্জ আর্ট কাউন্সিলের সচিব আব্দুল হাই এর উদ্যোগে মুশ্রেদী প্রেস, সুনামগঞ্জ হতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া সংগীত সম্পর্কে লেখকের বহু সংখ্যক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকিতে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মাদীয়া ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং অত্র গ্রন্থের

www.amarboi.org

লেখকের লেখা "বাঙ্গালী সংস্কৃতি", পৃ: ১৫৮, ২০০২ খ্র:, "মুসলিম সংস্কৃতি" পৃ: ২০৮, ২০০২ খ্র: ও "পাশ্চাত্য সংস্কৃতি", পৃ: ১৫৮, ২০০২ খ্রী:, ইত্যাদি পুস্তকে সংগীত চর্চা সম্পর্কে আলোচনা কম বেশী স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থকার ব্যক্তিগত জীবনে সহজ সরল জীবন যাপনকারী এবং বাংলাদেশের কৃচ্ছ্র সাধকদের অন্যতম। তাঁর সহজ সরল জীবন যাপনের প্রতিফলন ঘটে তার রচনায়ও। অতি জটিল তত্ত্ব অতি সহজ সরল ভাবে যারা প্রকাশ করেন, তিনি তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন।

লেখকের রচিত কোনো পুস্তকেই জ্ঞান চর্চার কচকচানি নেই। তিনি যা সত্য বলে অনুধাবন করেন- তা অতি সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করেন। তার ফলে লেখার মর্মবাণী পাঠক হৃদয়ে স্থান পেতে ভারবহ হয় না। এ কারণে তার রচিত এবং প্রকাশিত পুস্তকের পাঠক সংখ্যা অতীব ব্যাপক।

ইসলামী বিষয়ে লেখকের হাজার হাজার প্রবন্ধ এবং শতাধিক পুস্তক ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক সমাদৃত হযেছে। আশা করি লেখকের অন্যান্য রচনার ন্যায় এ গ্রন্থটিও যুগোপযোগী এবং পাঠক সমাদৃত হবে। গ্রন্থের সর্বশেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় তাঁর রচিত পুস্তকের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

লেখক ছিলেন একজন সরকারী কর্মকর্তা। সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং নিবেদিত প্রাণ। তৎকালীন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সি.এস.পি) এর চাকুরীতে যোগদানের পর সাধারণত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষকদেরও জ্ঞানচর্চার সমাধি ঘটে।

সরকারী চাকুরীতে চাকচিক্য এবং চমক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হতে অনেক বেশী। তাই, যারা সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে যোগ দিয়েছেন, তারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত থাকলে তাদের লেখক হিসাবে অবদান যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, তা হতে পারেনি।

অনেকের মতে এ পুস্তকের লেখক ছিলেন অসাধারণ কঠোর পরিশ্রমী সরকারী কর্মকর্তা। তবুও তিনি জ্ঞান চর্চায় অবহেলা করেন নি। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে যত পুস্তক পুস্তিকা এবং গ্রন্থারাজী আছে বাংলাদেশে লেখকদের ব্যক্তিগত পাঠাগারে তা বিরল।

গ্রন্থকার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে একজন জ্ঞান সাধক নন। তিনি ইসলামী চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদেরকে পুস্তক রচনায় যেভাবে উৎসাহিত করে থাকেন, তা তুলনাহীন। তার ইসলামিক ফাউন্ডেশনে মহা-পরিচালক (দু'বার) ও ধর্ম

www.amarboi.org

সচিব থাকা কালে বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীক যে ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, তাতে তার একক অবদান হয়ত ছিল সবচেয়ে বেশী।

লেখক ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান চর্চা যতটুকু করেন, তা হতে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদেরকে দিয়ে গ্রন্থ রচনার কাজ করিয়ে নেন অনেক বেশী। তবে তিনি নিজেও যে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমী-এর বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" গ্রন্থটি।

বাংলাদেশে ইসলামী প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে বিরাট বিল্পব সংগঠিত হচ্ছে তার অন্যতম নীরব রূপকার হলেন এ গ্রন্থের লেখক। আমরা তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

এ ব্যতিক্রম ধর্মী পুস্তকটি প্রকাশনার সুযোগ পেয়ে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ আনন্দিত এবং গর্বিত।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" বইটি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে পৌঁছলে মুসলিম সমাজে সংগীত চর্চার বাস্তব চিত্র এবং বহু ঐতিহাসিক তথ্য উম্মোচিত হবে -ইনশা-আল্লাহ।

আমাদের দেশে মুসলিম সমস্যা ও সংস্কৃতি ওপর যুগোপযোগী রচনায় যারা মূল্যবান অবদান রাখছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলে এ গ্রন্থের রচয়িতা।

তাবলীগের ওপর বাংলা ও ইংরেজীতে লেখকের একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। The Message of Tableeg and Da`wah শীর্ষক সর্ববৃহৎ পুস্তকটি Islamic Foundation, Bangladesh কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫৮+৩২। প্রকাশনা সাল ১৯৯৩। এ হেন ব্যক্তির কলমে সংগীত চর্চার কি হাল হয়েছে, তা দেখার জন্যে সংগীতামোদীদের ঔৎসূক্য থাকতে পারে!

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" বইটি জাতির হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা পরম করুণাময় আল্লাহু তায়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক ইনচার্জ ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

লেখকের কৈফিয়ত

প্রকৃতি, পেশা বা নেশাগত ভাবে আমি এ.জেড.এম. শামসুল আলম সংগীতজ্ঞ নই। সংগীতের মজবুত সমজদারও নই। বরং, সংগীতের ইতিহাস রচনায় আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি। আমি আমার একমাত্র পুত্র জাভেদ আলম এবং একমাত্র কন্যা ফিরোজা আলমের জন্যে তবলা, হারমোনিয়াম ক্রয় করে দিয়েছিলাম। গানের মাষ্টারও রেখে ছিলাম। কিন্তু আমার ধর্মপ্রাণা স্ত্রী মরহুমা বদরুন নাহারের নিরুৎসাহ এবং বিরোধীতার কারণে আমার, পুত্র ও কন্যা- এ দু'জনের কারো গান বাজনা শিক্ষা লাভ হয়নি। এ দিক দিয়ে আমি আমার মরহুমা স্ত্রীর প্রতি কতৃজ্ঞ এবং পুত্র কন্যার প্রতি সন্তুষ্ট। পেশাগত গান বাজনা একটি নেশা। পরিনতি হতাশা এবং দারিদ্র উত্তরনের ভাগ্য কয়জনের হয়। নজরুলের অগ্নীবীনায় জ্বলেপুরে মরে অনেকেই।

আমার পিতৃ- মাতৃকূলে এখনো সংগীত নিষিদ্ধ। কিন্তু তাবলীগ সমাদৃত। মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস লেখার আমার এ দু:সাহসটি বাংলা ভাষার "হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া জিজ্ঞাসে কত জল?" প্রবাদের মত। পাশ্চাত্যের বহু প্রাচীন পর্যটক এবং গবেষক উপমহাদেশের কোনো ভাষা না জেনেও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন পরিমন্ডলের ইতিহাস লেখে গেছেন। "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" লেখায় আমার এ দু:সাহসটি তাঁদের পূন্য স্মৃতির ব্যর্থ অনুকরণ বলা যায়।

মুসলিমদের সোনালী যুগে সংগীত সাধনার মাণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেয়া এ পুস্তকটির একটি লক্ষ্য। আশা করি এ পুস্তক পাঠে মুসলিম চেতনা সমৃদ্ধ আধুনিক মুসলিমদের এ দিগন্তে হীনমণ্যতা বোধ কিছুটা হলেও লোপ পাবে। তারা গর্বের সঙ্গে তাদের সোনালী অতীতের দিকে তাকাতে পারবেন।

হীনমন্যতালোপ : পাশ্চাত্য শিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তাধারার অনুসারী মুসলিমদের কেও কেও হীনমন্যতায় ভোগেন এ কারণে যে– ইসলাম ধর্ম হিসাবে উত্তম। কিন্তু, তা সেকেলে, প্রাচীন এবং একটু গোড়া জীবনাদর্শ। ধারনাটি অতিরঞ্জিত এবং ভ্রান্ত। তাঁদের কারো কারো ধারণা–শিল্পকলা, সংগীত, নৃত্য, নাটক, ইত্যাদির প্রতি মুসলিমগণ অতীতে ছিল শত্রুভাবাপন্ন এবং বর্তমানেও উদাসীন।

www.amarboi.org

মুসলিম ইতিহাসের উমাইয়া এবং আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চা সম্বন্ধে এ পুস্তকের পৃষ্ঠা সমূহ পাঠ করলে বর্তমান কালের সংগীতামোদীগণ হতবাক হয়ত হতে পারেন।

ইসলাম মূলত একটি আখিরাতমুখী ধর্মীয় জীবন বিধান। পশুপাখী এবং বিবিধ জীবজন্তুর কোন আখিরাত, জান্নাত বা জাহান্নাম নেই। মানুষের আছে। এ বিষয়ে মুসলিমগণ অন্য যে কোন জাতি গোষ্ঠি অপেক্ষা অধিকতর সচেতন।

উমাইয়া যুগে কারবালার ঘটনাটি ছিল গভীর শোকাবহ এবং দু:খজনক ব্যতিক্রম। এ ঘটনা উমাইয়াদের সকল অবদান ম্লান করে দেয়। তারা সমগ্র মুসলিম উম্মার ঘৃণা এবং ধিক্কারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়।

মুসলিম ইতিহাসের সুদীর্ঘ আব্বাসিয়া যুগে এক বংশের ৩৭জন খলিফার শাসনামলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচার মোটামুটি কায়েম ছিল। যারা জীবনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম এবং ধর্ম প্রচারে নিয়জিত ছিলেন, তারা ওয়ালী আল্লাহদেরকে অনুসরণ করে দুনিয়া বিমুখ এবং আখিরাতমুখী জীবন যাপন করতেন।

গৌরববোধ : মুসলিম সমাজের একটি বিরাট অংশ ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও এর সঙ্গে সঙ্গে ফিল আখিরাতে হাসানাতাও অর্জনেই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এরূপ মুসলিমদের মধ্যেও সংগীত ও ললিতকলা কেমন ছিল-এর কিছু ইঙ্গিত এবং ঈশারা দেওয়া হয়েছে "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" পুস্তকটিতে।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" পুস্তকটি পাঠে আধুনিক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলিমদের হীনমন্যতা কিছুটা অবশ্যই দূর হবে। তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের পদলেহন পরিত্যাগ করে আত্মসম্মান বোধে উজ্জিবিত হওয়া সহজতর হতে পারে।

যারা জন্ম সূত্রে মুসলিম হওয়ায় নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন, তাদের অনেকের জন্যে "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" গ্রন্থটি একটি অবশ্য পাঠ্য পুস্তকরূপে বিবেচিত হতে পারে।

মুসলিমদের মধ্যে যারা নিজেদের সন্তানদেরকে সংগীত চর্চায় উৎসাহিত করেও হীনমন্যতায় ভোগেন, তারা মধ্যযুগের মুসলিমদের যুগপথ ধর্ম চর্চা এবং সংগীত চর্চার সাফল্য জেনে উৎফুল্ল বোধ করতে পারেন।

www.amarboi.org

পৃষ্ঠপোষকতা : মুসলিম ইতিহাসের শুরু থেকে উমাইয়্যা, আব্বাসিয়া এবং মুঘল যুগে এবং পরবর্তীকালে মুসলিমদের মধ্যে সংগীত চর্চা কী পর্যায়ে ছিল ঐ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া ছিল এ পুস্তকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আব্বাসিয়া আমলে সংগীত চর্চা ধর্ম নিরপেক্ষ ও নির্দোষ আনন্দ এবং বিনোদন চর্চা হিসাবে গণ্য হতো। সংগীতের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা এমন মানে করা হতো যে সুন্দর জীবিকার জন্যে সংগীতজ্ঞদেরকে বিত্তশালীদের করুণা মুগ্ধ সঙ্গী করা যেত না।

ধর্মীয় সংগীত : ধার্মিক ব্যক্তিগণ রাব্বুল আলামীনের হামদ বা প্রশংসা এবং নাবী রাসূলদের নাত, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন গীত রচনা করতেন। ইসলামী সংগীতের মাধ্যমে তাঁরা ধর্মীয় চেতনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতেন। আজকালও বহু ইসলামী চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তি হামদ, নাত, গজল, ইত্যাদি ইসলামী সংগীত চর্চা করছেন।

সংগীতানুষ্ঠানে সতর্কতা : আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকারীদের অনেকে গান, বাজনার সঙ্গে নাচা নাচী, ঢলাঢলি করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন। তাদেরকে দেখে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ মনে করেন যে সংগীত চর্চা নৈতিকতাহীনদের কর্ম এবং কামনা লিপসার একটি বিশেষ দিক। অতীতে ধারণা এমন ছিল না।

মুসলিমদের সোনালী অতীত যুগে সংগীতানুষ্ঠানে বেত হাতে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্তব্যরত থাকতেন। তাদের কর্তব্য ছিল বেত বা ছড়ি ব্যবহার করে সংগীতের আসরে অংশগ্রহণকারী দর্শকদের অতিরিক্ত উচ্ছাস এবং অসংযত ভাব প্রবণতা সংহত এবং সংযত করা।

রচনার উদ্দেশ্য : মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে চায়। অবহিত হতে চায়। জানার নেশা মানুষের প্রকৃতি। "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" গ্রন্থটি সংগীতচর্চার স্বপক্ষে ক্যানভাসের কোন গ্রন্থ নয়।

সংগীত চর্চা সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে কি লেখা আছে, তারও কিছুটা এ পুস্তকের প্রথমাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত মুসলিমদের সোনালী যুগে তাদের মধ্যে সংগীত চর্চা কি মানে এবং কত নিবেদিত প্রাণে এবং ব্যাপকহারে প্রচলিত ছিল-তা বর্ণনা করা হয়েছে এ পুস্তকে।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস শীর্ষক" পুস্তকটি এ উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি যে এ পুস্তক পাঠে কেও সংগীত চর্চায় উৎসাহী হবেন। রাজা, বাদশাহ, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাহিনী নিয়ে রচিত পুস্তক

www.amarboi.org

লেখা এবং পাঠের উদ্দেশ্য এ নয় যে পাঠক ঐ ধরনের পুস্তক পাঠ করে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান হতে চেষ্টা করবেন। তা না হলে এ ধরনের পুস্তক রচনা করার এবং পাঠ করার উদ্দেশ্য কি!

জ্ঞানচর্চা : সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞান সাধনা একমাত্র মানব জাতির পিতা আদমের আওলাদের প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আদমের আওলাদ যা জানে না, তা জানতে চায়। ঘটনার বিবর্তন অবহিত হতে চায়।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কপি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থ ব্যয় করে মানুষ এগুলো ক্রয় করছে। অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অবহিত হওয়া। কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, অবহিত হওয়া মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি।

সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ঐ সমস্ত আলেম অধিকতর করতে চান, যারা কুরআন কারীমের শব্দাবলীর অর্থ জানেন অথবা অধিকাংশ আয়াতের অর্থ বুঝেন।

তাবলীগে তিন চিল্লা দেয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত হওয়ার কারণে খাটি দ্বীনদার মুসলিম হতে আমি ব্যর্থ। ইসলাম চর্চা কালে ভুল ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধি ভিত্তিক একাজ সেকাজ কিছুটা করি। গান বাজনা এবং সংগীত চর্চা ব্যক্তিগত ভাবে আমি করি না।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকটি মুসলিম ইতিহাসে সংগীত চর্চার একটি প্রবন্ধ সংকলন বলা যায়। আমি আশা করব যারা আমার চেয়ে শত গুণ বেশী দক্ষ এবং যোগ্য, তারা এ দিগন্তে তাঁদের আরো মূল্যবান অবদান রাখবেন।

ইউরোপীয়ানগণ ভারতের বিভিন্ন কালের ইতিহাস রচনা করে গেছেন। কিন্তু আরব, ইরানী ও আফগানীদের ন্যায় ভারতে থেকে যাননি। ইসলামের বিভিন্ন দিগন্তে আমার কিছু কিছু ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আছে। "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" তন্মধ্যে একটি। আমার অন্যান্য বহু পুস্তক পাঠকদের নিকট সমাদৃত হওয়ায় আমি তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

"মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" পুস্তকটির সমালোচনার মাধ্যমে সুধী পাঠকদের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আর এক দফা আমি আবদ্ধ হব, ইনশাআল্লাহ। এ কাজে জ্ঞান সম্পন্ন সুধীজন এবং বাস্তব সংগীতজ্ঞগণ এগিয়ে এসেও আমার ব্যর্থতার বলিষ্ঠ প্রমাণ রাখবেন- এ আশা বিনিত চিত্তে পোষণ করছি।

www.amarboi.org

ব্যাপক সূচিপত্র (Index/Contents)

Index অথবা ব্যাপক সূচী বিন্যাস

ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিন্যাস হয় কালক্রম বা সময় ভিত্তিক। ইতিহাসের ঘটনা বিন্যাস হয় ইতিহাসের নায়ক, রাষ্ট্র প্রধান অথবা রাজা বাদশাদের শাসনামলের রাষ্ট্রীয় ঘটনা ক্রমে। "মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকেও তাই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু সংগীতের বিষয়বস্তুগুলো খলিফাদের বা জাতীয় নেত্রবৃন্দের খেলাফতের মেয়াদানুসারে বিভক্ত করা একটু কঠিন। সংগীত সংক্রান্ত সমস্যা হলো একই বিষয়ক ঘটনা, সংগীত রচনা বা সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব বিভিন্ন খলিফাদের যুগে ঘটেছে।

এ সমস্যাটির সমাধান পাঠকদের পাঠ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও অনুধাবনের সুবিধার জন্যে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সমূহের বিষয়বস্তুর সাব-হেডিং সংক্রান্ত একটি "ব্যাপক সূচি" এ পুস্তকের প্রাসঙ্গিক স্থানে এবং সূচিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সূচি দেখে পাঠক তাঁর কাঙ্খিত বিষয়গুলো কোথায় আছে তা অপেক্ষাকৃত সহজে এবং অতি দ্রুত বের করতে পারেন।

বিদেশী ভাষায় রচিত তাত্ত্বিক Index বা Appendix প্রকৃতির তথ্য-সংযুক্তি থাকে পুস্তকের শেষে। বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের শেষে Index বা সংযুক্তি অবলোকন, পাঠে বা ব্যবহারে লেখক এবং পাঠকগণ অভ্যস্ত নন। এ পুস্তকে পাঠকের সুবিধার জন্যে Index জাতীয় ব্যাপক তথ্যসূচি বিন্যাস পুস্তকের শুরুতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় পাঠকদের খেদমতে এমন ব্যাপক সূচিপত্র পেশ করা হয়েছে এম কথা আমার জানা নেই।

প্রবন্ধ শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের প্যারা ভিত্তিক অথবা কয়েক প্যারা ভিত্তিক উপ-শিরোনাম (Sub-heading) রাখা হয়েছে। এর ফলে ব্যাপক সূচি দেখে মূল প্রবন্ধের কোন্ পৃষ্ঠায় কি আছে ঐ ধারণা করা যায়।

যে তথ্য পাঠকের প্রয়োজন, শুরু থেকে প্রবন্ধ পাঠ না করেও সরাসরি প্রাসঙ্গিক তথ্য, নির্দেশনা ও ধারনা পাওয়া যায়- Index type ব্যাপক সূচিপত্র হতে।

www.amarboi.org

অতি ব্যাপক সূচিপত্র দেখে পাঠকের যে তথ্য প্রয়োজন, ঐ প্যারায় পাঠক সরাসরি চলে যেতে পারেন। পাঠকের তাৎক্ষণিক যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করে প্রয়োজন বোধে অন্য প্যারায় বা ভিন্ন সূচিতে অগ্রসর হতে পারেন।

ঘোড়া দৌড়ান, সাইকেল চালনা এবং গাড়ী ড্রাইভ করা অনভ্যস্তদের জন্য কঠিন। কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেলে কেও ঐ জাতীয় যানবাহন পরিহার করবেন না। এ পুস্তকের "ব্যাপক তথ্যসূচি"(Index) পাঠ বা ব্যবহারে অনভ্যস্তদের জন্যে প্রথম প্রথম বিরক্তিকর বা সময়ের অপচয় মনে হতে পারে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে ব্যাপক সূচির সুবিধা শুধু ব্যবহার নয়, উপভোগের মত সহজ এবং আনন্দদায়ক হতে পারে, ইন-শা-আল্লাহ।

কোনো নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুটাই থাকতে পারে। এ জন্যে পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিনীত লেখক

www.amarboi.org

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

ব্যাপক -সূচীপত্র

প্রারম্ভিক কথা 8
প্রকাশকের কথা ৭
লেখকের কৈফিয়ত ১১
ব্যাপক সূচী ১৫

প্রথম অংশ

সংগীত ও সংগীতজ্ঞ ৩৭
কবিতা ও গান ৩৭
আবেগ, অনুভূতি ও সংগীত ৩৭
পেশাগত সংগীতচর্চা ৩৯
রাজদরবারে পেশাগত সংগীত ৩৯
সুর মাধুর্য ৩৯
যন্ত্র সংগীত ৪০
ঢোল ৪০
সংগীতের উদ্দেশ ৪০
গানের উপকারিতা ও অপকারিতা ৪১
সমকালীন গীতিকার ৪১
সমকালীন সংগীতজ্ঞ ৪২
কালজয়ী সংগীতজ্ঞ ৪২
উচ্চাঙ্গের সংগীত ৪৩
শোক সংগীত ৪৩
প্রেম ও সংগীত ৪৩
মরমী সংগীত ৪৩

আল্-কুরআনের আলোকে সংগীত-চর্চা ৪৪
অপ্রয়োজনীয় গল্প গুজব (লাহওয়াল হাদীস) ৪৪
উদ্দেশ্যভেদে সংগীত বৈধ বা অবৈধ ৪৫
অসৎ উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতও হারাম ৪৫
লাহ্ওয়াল হাদীসমূলক (অসার বাক্য) আয়াতটির পটভূমিকা ৪৬
'লাহ্ওয়া' শব্দের অর্থ ৪৭
সংগীত বিরোধী হিসেবে উত্থাপিত আল্-কুরআনের দ্বিতীয় আয়াত ৪৮
সংগীত অবৈধতার তৃতীয় আয়াত ৪৯
হাদীসের আলোকে সংগীত চর্চা ৫০
হযরত আবূ উসামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ৫০
নবী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ৫১

www.amarboi.org

গানের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-এর মত বিশ্লেষণ ৫১
হযরত আয়েশা (রাঃ) ও সংগীত চর্চা ৫৩

চার খলিফার যুগে সংগীত-চর্চা ৫৫
১ম খলিফা আবূ বাকর (রাঃ) ৫৫
২য় খলিফা উমার (রাঃ) ৫৬
৩য় খলিফা উসমান (রাঃ) ৫৭
হযরত উসমান (রাঃ)-এর গান পরিত্যাগ ৫৮
৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) ৫৯

খিলাফতের যুগের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৫৯
তুয়াইস ৫৯
মারওয়ান বিন হাকাম ৬০
আজ্জা আল-মাইলা ৬০
নাসিখ ইরানী ৬১
আহমদ আল-নাসিবী ৬১
সাইব কাসির ৬১

খিলাফতের যুগে সংগীত প্রকরণ ৬১

ইমামদের দৃষ্টিতে সংগীত-চর্চা ৬৪
ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ৬৪
ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী ৬৫
ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) ৬৮
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) ৬৮
ইমাম মালিক বিন আনাস (রাঃ) ৬৯
গ্রীক প্রভাব ৭০

ইসলাম ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ৭১

সংগীত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ৭১
ঐতিহাসিক এবং ফিকাহ্বিদদের সমর্থন ৭১
মাযামির, আওতার প্রভৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৭২
বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার কারণ ৭৩
মহানবী (সাঃ)-এর সম্মুখে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ৭৪
হাজীদের সংগীত-চর্চা ৭৫
হৃদয়ে সুরের মূর্ছনায় অপূর্ব প্রভাব ৭৫
আল্লাহ্-প্রেম জাগরণে যন্ত্রসংগীত ৭৬

সংগীত নিষিদ্ধতার প্রেক্ষাপট ৭৭
ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সংগীত ৭৭

www.amarboi.org

সংগীত ও রিয়া ৭৮
সার্বজনীন নিষিদ্ধতা ৭৮
পুস্তকের প্রথম অংশের তথ্যসূত্র ২৫টি ৮১

দ্বিতীয় অংশ
উমাইয়্যা যুগ

উমাইয়্যা ও হাশেমী বংশের সম্পর্ক ৮২
আবদ্ মানাফ পরিবার ৮২
হাশেমী পরিবার ৮৩
আব্‌দ মানাফ উমাইয়্যা ও হাশেমী সম্পর্ক ৮৪

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) ৮৪
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ফুফাত বোনের পুত্র হযরত উসমান (রাঃ) ৮৪
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দু'কন্যার জামাতা হযরত উসমান (রাঃ ৮৪
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কণিষ্ঠ জামাতা ৮৫
উমাইয়্যা বংশে খেলাফত ৮৬

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ৮৬

প্রথম উমাইয়্যা খলিফা আমীর মুয়াবিয়া (রা.) (৬৬১ খ্রী- ৬৮০ খ্রী) ৮৬
রাজধানী স্থানান্তর ৮৭
কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রতি উদাসীনতা ৮৮
কাব্য সংগীত ৮৮

প্রথম ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) (৬৮০-৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) ৮৯

সংগীতজ্ঞ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আয়শা ৮৯
মাতৃভক্তি ৮৯
সংগীত শ্রবণকারীদের প্রতি মমত্ববোধ ৮৯
মূল্যায়ন ৯০
প্রশিক্ষণ ৯০
করুণ মৃত্যু ৯০

কুরাইশ বংশ লতিকা ৯১

খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) ৯১
দুষ্টমতি ইয়াজিদ ৯১
কারবালায় নবী পরিবারের শহীদান ৯২
আকিল পরিবারের ৬ জনের শাহাদাত ৯২
জাফর পরিবারে শাহাদাত ৯২

www.amarboi.org

হযরত আলীর ৫ পুত্রের পরিবারের শাহাদাত ৯২
হযরত হাসানের ৫ পুত্রের শাহাদাত ৯২
কারবালায় কুরবানীর তাৎপর্য. ৯৩
শাহাদাতের আদর্শ ৯৩
উমাইয়্যা যুগের মানস ৯৪
কথক মানুষ ৯৪

উমাইয়্যা যুগে সংগীতচর্চা ৯৪
আল্-কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ ৯৫
সুন্দর ওয়াজ ৯৫
হালাল–হারামের বন্ধনে শিথিলতা ৯৬
উমাইয়্যাদের সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা ৯৬
সংগীত চর্চার তত্ত্ব গ্রন্থ ৯৬

উমাইয়্যা যুগে আরব সংগীত ৯৭
চারণ কবি ৯৮
সূফীদের মরমী সংগীত চর্চা ৯৮
বাউল সংগীত ৯৯
ইমাম জাফর সাদীক (মৃঃ ৭৬৫ খ্রীঃ ৯৯
দাসদের সংগীত চর্চা ৯৯
সরকারী কর্মকর্তাদের সংগীত চর্চা ১০০
অভিজাত আরবদের সংগীত চর্চা ১০০
ফার্শিয়ানদের সংগীত চর্চা ১০০
সংগীতজ্ঞদের আর্থিক অবস্থা ১০১
মক্কা মদীনায় সংগীতচর্চা ১০২
আবদুল্লাহ ইবন জাফর এর সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা ১০৩
ক্ষীণ পর্দার আড়াল থেকে সংগীত ১০৩
আরব সঙ্গীতের ইতিহাস ১০৩
আরব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ১০৪

আরব সংগীত যন্ত্র ১০৫
সংগীত যন্ত্র ১০৫

সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় উমাইয়্যা খলিফাবৃন্দ

৩য় খলিফা দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩-৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৭

৪র্থ খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকাম (৬৮৪-৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৮

৫ম খলিফা আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৯
মক্কার সংগীতজ্ঞ ইবন মিসজাহ ১১১

www.amarboi.org

৬ষ্ঠ খলিফা প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ) ১১৩
সংগীতজ্ঞ আবু ইয়াহইয়া উবায়দুল্লাহ ইবনে সুরাইজ ১১৪
সংগীতজ্ঞ আবু ইয়াজিদ আবদ আল মালিক আল গারীদ ১১৬
পৃষ্ঠপোষকতা ১১৬

৭ম খলিফা খলিফা সুলাইমান (৭১৫-৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ) ১১৭
সংগীতজ্ঞ আবুল ফাত্তাহ মুসলিম ইবন মুহরিজ ১১৮

৮ম খলিফা দ্বিতীয় উমার (রাঃ) ইবন আবদুল আজীজ (৭১৭-৭২০ খ্রীষ্টাব্দ) ১২০

৯ম খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০ খৃঃ-৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১২১
সংগীতজ্ঞ আল বাইদাক আনসারী ১২২
সংগীতজ্ঞ মাবাদ ইবনে ওয়াহহাব ১২২
পিতৃ পরিচয় ১২৩
মূল্যায়ন ১২৩
প্রশিক্ষণ ১২৩
উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ১২৩
মৃত্যু ১২৪

১০ম খলিফা হিশাম (৭২৪-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) ১২৫
সংগীতজ্ঞ ইবনে মুশাব আল তায়েবী আল হিজাজী ১২৫
সংগীতজ্ঞ ইবন তানবুরা ১২৫
সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিব ১১২৫
শ্রমের পুরস্কার ১২৬
গুণীজনের শিষ্যত্ব ১২৬
রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ও লোপ ১২৬
সংগীত সাহিত্যিক ১২৮
সংগীতজ্ঞ আমর ইবনে উসমান ১২৮

১১তম খলিফা রঙিলা দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১২৯
সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়াহ কায়ীল ১৩০
সংগীতজ্ঞ উমার আল ওয়াদি ১৩০
সংগীতজ্ঞ আবু কামিল আল ঘুজাইল ১৩০
সংগীতজ্ঞ আবুল আলা আশাব ইবন যুবায়ের ১৩০
সংগীতজ্ঞ আতাররাদ আবূ হারুন ১৩০
১২তম খলিফা তৃতীয় ইয়াজীদ (৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১৩১
সংগীতজ্ঞ আল বুরদান ১৩২
সংগীতজ্ঞ সাঈদ ইবন মাসুদ ১৩২

১৩তম খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ১৩৩
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাত আল কাতিব ১৩৩

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ দাহমান আব্দুর রহমান ইবন আমর ১৩৩
সংগীতজ্ঞ মালিক আল তাঈ ১৩৩
অভিভাবকত্ব ১৩৩
প্রশিক্ষণ ১৩৪
মৃত্যু ১৩৪
মূল্যায়ন ১৩৪

উমাইয়্যা যুগের চারজন মহিলা সংগীতজ্ঞ ১৩৫
সংখ্যা হিসেবে চার এর অগ্রাধিকার ১৩৫
মহিলা সংগীতজ্ঞ জামিলা ১৩৫
মহিলা সংগীত কেন্দ্র ১৩৬
শিল্পীদের বিশ্রাম কেন্দ্র ১৩৬
পবিত্র হজ্জ প্রতিপালন ১৩৭
সংগীতজ্ঞ জামিলার হজ্জকালীন সংগীতানুষ্ঠান ১৩৭
প্রথম দু'দিনের অনুষ্ঠান ১৩৭
তৃতীয় দিনের সংগীতানুষ্ঠান ১৩৮
মহিলা সংগীতজ্ঞবৃন্দ ১৩৮
সাল্লামা আল জারকা ১৩৮
সাল্লামা আল কায়স ১৩৯
সংগীতজ্ঞা হাব্বাবা ১৩৯
হাব্বাবা উমাইয়্যা যুগে সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র ৯৪টি ১৭৪

তৃতীয় অংশ

আব্বাসিয় যুগ

আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চা ১৪৪
উলামা, ফুকাহা এবং সংগীত ১৪৫
গৃহ ভৃত্যা ও দাসী (কায়না) সংগীত বালিকা ১৪৬
মালটার গৃহ সেবিকাদের অবদান ১৪৭

আব্বাসিয়া যুগে সংগীত সাধনা ১৪৮
বায়তুল হিকমা ১৪৯
ইখওয়ানুস সাফা ১৪৯
আব্বাসিয়া প্রদেশসমূহে সংগীতচর্চা ১৫০
যুগ পথ কবিতা ও সংগীত ১৫১
আন্দালুসিয়া (স্পেন) ১৫১
আব্বাসিয়া যুগে মুসলিম স্পেনে সংগীত চর্চা ১৫১

আব্বাসিয়াদের উত্থান যুগ ১৫৩
১ম আব্বাসিয়া খলিফা আবদুল্লাহ আব্বাস আস সাফফা (৭৫০-৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১৫৩

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ আল খলিল ইবনে আহমাদ ১৫৩
সংগীতজ্ঞ ইসমাইল ইবনে হারবিদ ১৫৪

২য় আব্বাসিয়া খলিফা আব্দুল্লাহ,আল মানসুর আবু জাফর (৭৫৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) ১৫৪
সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদী ১৫৪
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে হামজা আবূ জাফর ১৫৭

৩য় আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল-মাহদী, আবু আবদুল্লাহ (৭৭৩ -৭৮৫ খ্রী.) ১৫৮
সংগীতজ্ঞ আবদুল্লাহ সিয়্যাত ১৫৯
সংগীতজ্ঞ ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহ ১৫৯
সংগীতজ্ঞ ইবনে জামী ১৬০

৪র্থ আব্বাসিয়া খিলফা মুসা আল হাদী, আবু মুহাম্মাদ (৭৮৫-৮৬ খ্রী.) ১৬১

সংগীত পরিবেশনার হল ঘর ১৬৩

সংগীতজ্ঞ আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে জামী ১৬৩
সংগীতের ডায়াস ১৬৪

৫ম খলিফা হারুন আর রাশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রী.) ১৬৫

সংগীতজ্ঞ হিশাম-১ (৭৮৮-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) ১৬৬
সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি ১৬৬
সংগীতজ্ঞ সুলাইম ইবনে সাল্লাম আবু আবদুল্লাহ ১৬৮
সংগীতজ্ঞ ইয়াজীদ হাওরা আবু খালিদ ১৬৮
সংগীতজ্ঞ আল যুবায়ের ইবনে দাওমান ১৬৯
সংগীতজ্ঞ ভারসাওমা আল জামির ১৬৯
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে রাফ ১৭০
সংগীতজ্ঞ আবু সাদাকা ১৭০
সংগীতজ্ঞ খলিফা হারুনের দরবারী সংগীতজ্ঞ ১৭০
সংগীতজ্ঞ মানসুর জালজাল আল দারীব ১৭১

৬ষ্ঠ খলিফা মুহাম্মদ আল আমিন (৮০৯-১৩ খ্রী.) ১৭২
সংগীতজ্ঞ আবূ আলী ইয়াহ্‌ইয়া আল মাক্কী ১৭২
সংগীতজ্ঞ আবুল মাহান্না মুখারিক ইবন ইয়াহইয়া ১৭৪
সংগীতজ্ঞ আল্লাইয়াহ আল আসর ১৭৫
সংগীতজ্ঞ আল হাকাম-১ (৭৯৬-৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) ১৭৬
সংগীতজ্ঞ আব্বাস ইবনে নাসাই ১৭৬
সংগীতজ্ঞ আল মানসুর ১৭৬
সংগীতজ্ঞ আলুন এবং জারকুন আল আমীন ১৭৬

৭ম খলিফা আবদুল্লাহ আল মামুনুর রশিদ (৮০৯-৮৩৩ খ্রী.) ১৭৭

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ রাজপুত্র ইব্রাহিম ইবনে আল মাহদী আবু ইসহাক	১৭৮
সংগীতজ্ঞ কাজী মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছ ইবনে বুশক হুন্নার আবু জাফর	১৭৯
সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলি (৭৫৬-৮৫০ খ্রী.)	১৮০
সংগীতজ্ঞ বানু মুসা (মুসা বংশীয় তিনজন)	১৮৩
সংগীতজ্ঞ তাহির পরিবার	১৮৩
সংগীতজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবন তাহির (মৃত্যু ৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ)	১৮৩
৮ম খলিফা মুহাম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৪২ খ্রী.)	১৮৪
সংগীতজ্ঞ আবূ জাফর আহমাদ আল মাক্কী (মৃত্যু ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)	১৮৪
সংগীতজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আবীল আলা	১৮৫
সংগীতজ্ঞ হাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল মাওসুলি	১৮৫
সংগীতজ্ঞ আহমাদ ইবন সাদাকী	১৮৫
সংগীতজ্ঞ আবু আইয়ূব সোলাইমান আল মাদানি	১৮৫
সংগীতজ্ঞ আল কিনদি (জন্ম ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ)	১৮৬
৯ম খলিফা হারুন আল ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রী.)	১৮৭
সংগীতজ্ঞ জুনাম	১৮৭
সংগীতজ্ঞ আবুল হাসান ইবন তারখান	১৮৭
জিরিয়াব আবুল হাসান আলী ইবনে নাফী	১৮৮
আন্দালুসিয়ান সুলতান আবদুর রহমান - ২ (৮২২-৫২)	১৯০
জিরিয়াব পরিবার	১৯০
আব্বাসিয়াদের অবক্ষয় যুগ	১৯৩
১০ম আব্বাসিয়া খলিফা জাফর আল মুতাওয়াক্কিল, আবুল ফজল (৮৪৭-৬১ খ্রী.)	১৯৩
সংগীতজ্ঞ হুনাইন ইবন ইসহাক আল ইবাদী আবু জায়েদ (৮০৯-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)	১৯৪
সংগীতজ্ঞ আবু আলী আল হাসান তাম্বুরী	১৯৪
সংগীতজ্ঞ আবুল ওবাইছ ইবন হামদুন	১৯৫
সংগীতজ্ঞ আল হাসান ইবন আল মুসা আল নাসিবী	১৯৫
স্বল্প খ্যাত কয়েকজন সংগীতজ্ঞ	১৯৫
১১তম আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল মুনতাসির বিল্লাহ, আবু জাফর (৮৬১-৬২ খ্রী.)	১৯৬
সংগীতজ্ঞ বুনান ইবন আমর ইবন হারিছ	১৯৬
কর্দোভায়	১৯৬
সেভিল	১৯৭
সংগীতজ্ঞ আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবী মানসুর (মৃত্যু ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)	১৯৭
১২তম আব্বাসিয়া আহমাদ আল মুসতাঈন বিল্লাহ, আবুল আব্বাস (৮৬২- ৬৬ খ্রী.)	১৯৮
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া	১৯৮

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ কুস্তা ইবনে লুকা আল বালবাকী (মৃত্যু ৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ১৯৮
হামদুন ইবন ইসমাইল ১৯৯

১৩তম আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ মুতাজ্জ বিল্লাহ,
আবু আবদুল্লাহ (৮৬৬-৮৬৯ খ্রী.) ১৯৯
সংগীতজ্ঞ ইবন আল কাউসার ১৯৯

১৪তম ন্যায়নিষ্ঠ আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল মুহতাদী বিল্লাহ,
আবু ইসহাক (৮৬৯-৭০ খ্রী.) ২০০

সংগীতজ্ঞ মানসুর ইবন তালহা ইবন তাহির ২০১
সংগীতজ্ঞ সাবীত আল কুররা (৮৩৬-৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) ২০১
সংগীতজ্ঞ আমর ইবন মুহাম্মাদ (মৃত্যু ৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) ২০২

১৫তম খলিফা আহমাদ আল মুতামিদ আলা বিল্লাহ, আবুল আব্বাস (৮৭০-৯২ খ্রী.) ২০৩
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবন ইয়াহইয়া আল মাক্কী ২০৩
সংগীতজ্ঞ ইবনে খুরদাবীহ (মৃত্যু ৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) ২০৩
সংগীতজ্ঞ আবুল কাশিম আব্বাস ইবন ফিরনাস (মৃত্যু ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ২০৪
সংগীতজ্ঞ আবু হাসিসা ২০৫
সংগীতজ্ঞ আমর আল মাইদানী ২০৫
মিশরে তুলনিদ শাসন ২০৫

১৬তম খলিফা আহমাদ আল মুতাদ্দিদ বিল্লাহ আবুল আব্বাস (৮৯২-৯০২ খ্রী.) ২০৬
সংগীতজ্ঞ ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন তাহির ২০৬
সংগীতজ্ঞ আহমাদ ইবন আবদাল্লাহ ইবন আবুল আলা ২০৬
সংগীত শাস্ত্রবিদ ইয়াহইয়া ইবন আলী ইবন ইয়াহইয়া (৮৫৬-৯১২) ২০৭

সংগীতজ্ঞ ইবন আবদ রাব্বিহি ৮৬০-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ ২০৭
সংগীতজ্ঞ আহমাদ আল সারাখসী মৃত্যু ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ২০৮
সংগীতজ্ঞ আবুল ফারাজ আলী আল ইস্পাহানী ৮৯৭-৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ

১৭তম আব্বাসিয়া খলিফা আলী আল মুকতাফি বিল্লাহ,
আবু মুহাম্মাদ (৯০২-৯০৭ খ্রী.) ২০৯
সংগীতজ্ঞ দুনিয়া (৮২৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) ২১১
সংগীতজ্ঞ ইবন আল দুব্বী আবু তায়্যিব (মৃত্যু ৯২০ খ্রীষ্টাব্দ)
সংগীতজ্ঞ শাসাস্ত্রবিদ ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (মৃত্যু ৯১২) ২১২

১৮তম আব্বাসিয়া জাফর আল মুকতাদীর বিল্লাহ,
আবুল ফজল (৯০৭-৯৩২ খ্রী) ২১৩
সংগীতজ্ঞ জাহজা আল বার্মাকি ২১৩
সংগীতজ্ঞ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আল জাকারিয়া আল রাজী (মৃত্যু ৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ) ২১৪

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ আল মাসুদী ২১৪

১৯তম খলিফা মুতাসিম কাহির বিল্লাহ (৮৩৩-৮৩২) খ্রীঃ ২১৬
আবদুর রহমান -৩ (৯১২-৫১ খ্রীষ্টাব্দ) ২১৭

২০তম মুহাম্মাদ আল রাজী বিল্লাহ আবুল আব্বাস (৯৩৪-৪০ খ্রী.) ২১৭
সংগীতজ্ঞ কুরাইশ আল জাররাহী ২১৮
সংগীতজ্ঞ সাইদ ইবনে ইউসুফ (৮৯২-৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) ২১৮

২১তম আব্বাসিয়া খলিফা ইব্রাহিম আল মুত্তাকি বিল্লাহ,
আবু ইসহাক (৯৪০-৪৪ খ্রী.) ২১৮
সংগীতজ্ঞ আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ২১৯
সংগীতজ্ঞ হারুন ইবন আলী ইবন হারুন ২২০

২২তম আব্বাসিয়া আবদুল্লাহ আল মুসতাকফি বিল্লাহ, আবুল কাশিম (৯৪৪-৪৬ খ্রী.) ২২০
আলী ইবন হারুন ইবন আলী (৮৯০-৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) ২২০

আব্বাসিয়াদের পতনের যুগ ২২২
২৩তম আব্বাসিয়া খলিফা ফজল আর মুতিঈ বিল্লাহ,
আবুল কাশিম (৯৪৬-৭৪ খ্রী.) ২২২
সংগীতজ্ঞ বুওয়াইহিডস ২২২
মিশরের ইখশিদীদ বংশ ২২৩
মিশরে ফাতিমিহ খেলাফত ২২৩
মিশরে ফাতিমীয় খলিফা আল মুইজ (৯৫২-৬৫খ্রীষ্টাব্দ) ২২৩
আল হাকাম-২ (৯৬১-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) ২২৪
ইখওয়ান আল সাফা (পবিত্র ভ্রাত্রি সংঘ) ২২৪
২৪তম খলিফা আবদুল কারীম আত-তাঈ বিল্লাহ (৯৭৪-৯১ খ্রী.) ২২৫
বিজ্ঞানী আবু আবদাল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল খাওয়ারিজম ২২৫
সংগীতজ্ঞ আবুল ওয়াফা আল-বুজজানি (খ্রীস্টাব্দ ঃ ৯৪০-৯৮) ২২৬
ইজ্জা আল দাওলা (৯৬৭-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) ২২৬
খলিফা আল আজিজ (৯৭৫-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) ২২৬
হিশাম-২ (৯৭৬-১০০৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২২৭

২৫তম খলিফা আহমাদ আল কাদীর বিল্লাহ আবুল আব্বাস (৯৯১-১০৩১ খ্রী.) ২২৭
ফিহরিস্ত রচয়িতা ওয়াররাক আল বাগদাদী (মৃ. ৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) ২২৭
ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) ২২৮
হামাদান ২২৯

সংগীতজ্ঞ ইবনে আল হাইথাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২৩০
সংগীতজ্ঞ আল মাগরিবি (৯৮১-১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ২৩১
সংগীতজ্ঞ ইবন ইউনুছ (মৃত্যু ১০০৯খ্রীষ্টাব্দ) ২৩২

www.amarboi.org

মাসলাম আল মাদ্রিদি	২৩২
এশিয়া খন্ডের খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞবৃন্দ	**২৩৩**
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সিরাজী (মৃত্যু ১০০০)	২৩৩
সংগীতজ্ঞ কামাল আল জামাল	২৩৩
খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত মুসলিম স্পেন	২৩৩
খলিফা আল হাকিম, আন্দালুসিয়া (৯৯৬-১০২১)	২৩৪
খলিফা আল জাহির (১০২০ -৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)	২৩৪
কর্দোভা রাজ্য	২৩৫
সেভিল রাজ্য	২৩৫
সারাগোষা রাজ্য	২৩৫
মালাগা রাজ্য	২৩৫
খলিফা হিশাম-৩/ (১০২৭-৩১ খ্রীষ্টাব্দ)	২৩৬
২৬তম খলিফা আল কাইম বি আমরুল্লাহ আবদুল্লাহ, আবু জাফর (১০৩১-৭৫ খ্রী.)	**২৩৬**
সংগীতজ্ঞ আবুল হাকাম উমর আল কারমানী (মৃত্যু ১০৬৬)	২৩৬
সংগীতজ্ঞ আল হুসাইন ইবন জাইলা	২৩৬
মিশরীয় খলিফা আল মুস্তানছির(১০৩৬-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)	২৩৬
২৭তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুকতাদি বি আমরুল্লাহ, আবুল কাশেম আবদুল্লাহ (১০৭৫-৯৪ খ্রী.)	**২৩৭**
সংগীতজ্ঞ ইবন নাকীয়া	২৩৭
সংগীতজ্ঞ আবদুল ওয়াহাব আল হুসাইন ইবন জাফর আল হাজীব	২৩৮
সংগীতজ্ঞ আবুল হাসান ইবনে হাসান ইবনে ইবনে আল হাসীব	২৩৯
সংগীতজ্ঞ ইয়াহ ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ আল বাহ্জাবী	২৩৯
সংগীতজ্ঞ আবুল হুসাইন ইবনে আল হামারা	২৩৯
সংগীতজ্ঞ আল মামুন টলেডো	২৩৯
সংগীতজ্ঞ আবুল হুসেন ইবনে আবি জাফর আল ওয়াকসী	২৩৯
কর্দোভা	২৪০
সংগীতজ্ঞ ইসহাক ইবনে শিমান	২৪০
সংগীতজ্ঞ আবুল ফজল হাসদাই	২৪০
২৮তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুসতাজহীর বিল্লাহ, আবুল আহমাদ (১০৯৪- ১১১৮ খ্রী.)	**২৪১**
আবূ হামীদ আল গাজ্জালী (রাঃ)	২৪১
সেলজুকি শাসন	২৪২
মালিক শাহ সেলজুকি	২৪৩
মুস্তানসির	২৪৪
২৯তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুসতারশিদ বিল্লাহ, আল ফজল আবু মানসুর (১১১৮-৩৪ খ্রী.)	**২৪৪**
খলিফা আল আমির (১১০১-১১৩১ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৪

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ আবুল সালাত উমাইয়্যা (১০৬৮-১১৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৪
সংগীতজ্ঞ ইবন বাজ্জাহ (মৃত্যু, ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৪
ইরাকী সেলজুকি সুলতান মাহমুদ	২৪৫
৩০তম আব্বাসিয়া খলিফা মানসুর আবু রাশিদ বিল্লাহ	
আবু জাফর (১১৩৪-৩৫ খ্রি.)	২৪৫
আন্দালুসিয়ায় মুরাহবিদ (বারবার) শাসন	২৪৬
মুয়াহবিদ	২৪৬
খলিফা আল হাফিজ (১১৩১-৪৯)	২৪৬
আবুল হাকাম বাহিলী	২৪৭
৩১তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুকতাফি লি আমরুল্লাহ	
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (১১৩৫-৬০ খ্রী.)	২৪৭
সেভিল	২৪৭
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবন হাদ্দাদ	২৪৮
সংগীতজ্ঞ কামাল আল দ্বীন ইবনে মানাহ (জন্ম, ১১৫৬)	২৪৮
ইয়াহইয়া ইবন আল খুদুজ আল মুরসি	২৪৮
খলিফা আল জাফির (১১৪৯-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৮
৩২তম খলিফা ইউসুফ আল মুসতানজিদ বিল্লাহ,	
আবুল মুজাফফার (১১৬০-১১৭০ খ্রী.)	২৪৮
খলিফা আল ফায়েজ (১১৫৪-৬০ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৯
খলিফা আল আদিদ (১১৬০-৭১ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৯
সংগীতজ্ঞ ইবন রুশদ (১১২৬-৯৮ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৯
সালাহউদ্দিন আইয়ূবী (১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)	২৪৯
সংগীতজ্ঞ আবুল মাজিদ মুহম্মাদ ইবনে আবুল হাকাম (মৃত্যু, ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দ)	২৫০
৩৩তম খলিফা আল মুসতাইজ বি আমরুল্লাহ,	
আবু মুহাম্মাদ হাসান (১১৭০-১১৮০খ্রী.)	২৫০
ইবনে নাক্কাস আল বাগদাদী (মৃত্যু, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)	২৫০
মিশরে আইয়ুবী রাজবংশ (১১৭১-১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ)	২৫১
৩৪. খলিফা আল নাসির লী দীন আল্লাহ,	
আবুল আব্বাস আহমাদ (১১৮০-১২২৫ খ্রী.)	২৫২
আবু নাসর আসাদ (মৃত্যু, ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দ)	২৫২
সেভিল	২৫২
সংগীতজ্ঞ আবু জাকারিয়া ইয়াহ ইয়া আল বায়াসী	২৫৩
৩৫. খলিফা আজ-জাহির বি আমর উল্লাহ,	
আবু নাসির মুহাম্মাদ (১২২৫-২৬ খ্রী.)	২৫৩

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ ইবন আবী উসাইবিয়া	২৫৩
সংগীতজ্ঞ ইবন আল কিফতি	২৫৪
আলাম আল দীন কায়সার (১১৭৮-১২৫১ খ্রী.)	২৫৪
৩৬. খলিফা আল মুসতানসির বি আমর উল্লাহ	
আবু জাফর মানসুর (১২২৬-৪২ খ্রী.)	২৫৫
সংগীতজ্ঞ আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-রাকুতী	২৫৫
সংগীতজ্ঞ ইবন শাবীন (মৃত্যু, ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দ	২৫৫
সংগীতজ্ঞ জিরাব আল দাওলা	২৫৫
৩৭. খলিফা আল মুস্তাসিম বি আমরুল্লাহ	
আবু আহমাদ আবদুল্লাহ (১২৪২-৫৮ খ্রী.)	২৫৬
সংগীতজ্ঞ আবু জাফর নাসির আল দীন আল তুসী (১২০১- ৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)	২৫৭
সংগীতজ্ঞ শাফী আল দীন আবদাল মুমিন	২৫৮
সংগীতজ্ঞ আলী ইবনে মুসা আল মাগরীবি	২৬১
গ্রানাডার নাসরিদ বংশ	২৬২
আব্বাসিয়া যুগে মহিলা সংগীত শিল্পী (৭৫০-১২৫৮খ্রী.)	২৬২
সংগীতজ্ঞ বাস বাস	২৬২
আল মুনাজ্জিম এর সংগীত পরিবার	২৬৩
সুলতান আবদুর রহমান-১ (৭৫৬-৮৮)	২৬৩
সংগীতজ্ঞা আফজা	২৬৪
খলিফা হারুনুর রাশীদের যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৭৮৬-৮০৯ খ্রী.)	২৬৪
সংগীতজ্ঞ দাত আল খাল (সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠার্থী)	২৬৪
সংগীতজ্ঞা ইনান	২৬৫
সংগীতজ্ঞা দানানীর (সম্পদ)	২৬৫
সংগীতজ্ঞা আতিকা বিনতা সুহদা	২৬৬
সংগীতজ্ঞা আল আমিন বাদল	২৬৬
খলিফা মামুন আর রাশীদের যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮১৩-৮৩৩ খ্রীঃ)	২৬৭
সংগীতজ্ঞ উরাইব (মৃত্যু ৮৪১)	২৬৭
সংগীতজ্ঞ উবাইদা তামবুরিয়া	২৬৮
সংগীতজ্ঞ মুনিসা	২৬৯
খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ -এর যুগের মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮৩৩-৪২ খ্রীঃ)	২৬৯
সংগীতজ্ঞ ফাজাল	২৬৯
সংগীতজ্ঞ সারিইয়া এবং ইব্রাহীম ইবন মাহদী	২৬৯
খলিফা মুতাসিমের যুগে সংগীতজ্ঞা	২৭০
সংগীতজ্ঞ মুতাইম হাসিমিয়া	২৭০
খলিফা ওয়াসিক এবং কালাম আল সালিহিইয়া	২৭১

www.amarboi.org

আব্দাল্লু মিয়ার আবদুর রহমান-২ এর যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮২২-৮৫২খ্রী.) ২৭১
সংগীতজ্ঞ কালাম ২৭১
সংগীতজ্ঞ মুসাবিহ ২৭১
সংগীতজ্ঞ মুতা ২৭১
সংগীতজ্ঞ তারাব ২৭১

খলিফা ওয়াসিক-মুতাওয়াক্কিল ২৭২
ফরিদা ২৭২
বুনান ২৭২

খলিফা আল-মুতাজ্জিবিল্লাহ এর যুগ (৮৬৬-৬৯ খ্রীঃ) ২৭২
জিরিয়াব ২৭২
বাজীয়া ২৭২
খলিফা মুতামিদ বিল্লাহ এর যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮৭০-৯২ খ্রীঃ) ২৭২
সংগীতজ্ঞ কামার ২৭২
সংগীতজ্ঞ সাজী ২৭৩
সংগীতজ্ঞ সালিফা ২৭৩
সংগীতজ্ঞ উনস আল কুলুব ২৭৩
সংগীতজ্ঞ বিশারা আল জামির ২৭৩
সংগীতজ্ঞ নুজহা আল ওহাবীয়া ২৭৩
সংগীতজ্ঞ উম্মে আবিল জাইস ২৭৩
সংগীতজ্ঞ ওয়ার্দা ২৭৩
সংগীতজ্ঞ আল কাছীর ওয়াল্লাহদা বিনত আল মুসতাকফি ২৭৪
সংগীতজ্ঞ হিন্দ (১১৫২ খ্রীষ্টাব্দ) ২৭৪

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮৪৭-৮৬১ খ্রীঃ) ২৭৪
সংগীতজ্ঞ মাহবুবা ২৭৪
আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র ৩১২টি ২৭৭

চতুর্থ অংশ

উপ-মহাদেশীয় যুগ

সুলতানি আমল ২৮৬
মুসলিম ভারতে সংগীত চর্চা ২৮৬
উস্তাদ আমীর খসরু ২৮৮
সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু এর বংশ পরিচয় ২৮৯
নিজামুদ্দীন (রা.) এর শিষ্য ২৮৯
সংগীতজ্ঞ সেতু বন্ধন আমীর খসরু ২৮৯
আমীর খসরু ও তানসেন ২৯০

www.amarboi.org

কাওয়ালী ২৯০
খেয়াল ২৯০
তারানা ২৯১
তাল ২৯২
নতুন রাগ-রাগিনী আবিস্কার ২৯২
সংগীতযন্ত্র ২৯২
আমীর খসরু ও নায়ক গোপাল ২৯২

জৌন পুরের সার্কী বংশের সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা ২৯৪
ইব্রাহীম শাহ সার্কী ২৯৪
মাহমুদ শাহ সার্কী ২৯৪

সুলতান হুসাইন শাহ্ সার্কী জৌনপুরী ২৯৫
দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় জামাতা ২৯৫
সাম্রাজ্য বিস্তার ২৯৬
নতুন রাগ প্রবর্তন ২৯৬
হুসাইন রাগিনী ২৯৬
হুসাইনী কানরা ২৯৭
শাহ হুসাইন ফকির ২৯৭
হটকারী অভিযান ২৯৭
সুলতান বাহলুল লোদী ২৯৭
সুলতান সিকান্দার লোদী ২৯৮
বাংলার সুলতানের বদান্যতা ২৯৮

সুলতান সিকান্দার লোদী ২৯৯
সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা ২৯৯
উজির মিয়া ভূঁইয়া ৩০০
লাহজাত সিকান্দর শাহী ৩০০

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও নায়ক বাই ৩০১

সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর ৩০১
আকবরের তানসেন মূল্যায়ন ৩০২
কুট কর্ণ দরবারী ৩০২

বাদশাহ্ আকবরের সংগীতজ্ঞ পৃষ্ঠ পোষকতা ৩০৩
মিয়া মিরজা তানসেন ৩০৪
জন্ম ৩০৪
জাতিচ্যুতি ৩০৪
বৃন্দাবন ৩০৫
দাক্ষিণাত্যে ৩০৫

www.amarboi.org

বান্দর ঘরে ৩০৫
মিয়া মিরজা তানসেন ৩০৬
মৃত্যু ৩০৬
মূল্যায়ন ৩০৭

সংগীতজ্ঞ সুলতান বজ বাহাদুর **৩০৭**
সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ ৩০৮
বজ খানী সংগীত ৩০৮
খেয়াল সংগীতজ্ঞ ৩০৮
নৃত্য শিল্পী বজ বাহাদুর ৩০৮
রাধাকৃষ্ণ নৃত্য ৩০৯
মুঘল আক্রমণ ৩১০

বন্দী রূপমতি **৩১১**
আদম খানের বদ উদ্দেশ্য ৩১১
রাণী রূপমতির করুন মৃত্যু ৩১২
রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা ৩১২
বজখানী সংগীতজ্ঞ ৩১৩

সম্রাট নুর উদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর **৩১৪**
সংগীতজ্ঞ বিলাস খান ৩১৪
সংগীতজ্ঞ হাফিজ নাদ আলী ৩১৪

সংগীতজ্ঞ মির্জা জুল কারনাইন **৩১৫**
ইয়াকুব পুত্রদ্বয় ৩১৫
বাদশাহী নির্দেশে ইসলাম কবুল ৩১৫
লবণ কারখানার অধিনায়ক ৩১৬
সংগীত চর্চা ৩১৭

সম্রাট খুররম শাহজাহান **৩১৮**
"রাগ দর্পণ" ৩১৮
সংগীতজ্ঞ লাল খান গুণ সমুদ্র ৩১৯
সংগীতজ্ঞ মরমী সংগীতজ্ঞ বাহাউদ্দীন ৩১৯
সংগীতজ্ঞ মিয়া লালু ও শের মুহাম্মাদ ৩১৯
কাওয়ালী সংগীত ৩১৯
সংগীতজ্ঞ মহা কবি রায় ৩১৯
গুণ সেন ৩১৯
বিদেশী পর্যটক ও সংগীতজ্ঞ ৩১৯
সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ বাক ও মীর ঈমাদ ৩২০
যুবরাজ সুজা ৩২০

www.amarboi.org

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ৩২১
ধর্মীয় চেতনা ৩২১
সম্রাট বাহাদুর শাহ ৩২২
সংগীতজ্ঞ নিয়ামত খান ৩২৩
মুহাম্মদ শাহ 'রঙিলা' ৩২৩
সংগীতজ্ঞ লালা বাঙ্গালী ৩২৩
সংগীতজ্ঞ সংগীতজ্ঞ বাদশাহ ৩২৪
সংগীতজ্ঞ শায়খ মইনুদ্দীন ৩২৪
সংগীতজ্ঞ ফিরোজ খাঁন ৩২৪

সূফী দরবেশের সংগীত-চর্চা ৩২৪
সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু ৩২৪
সংগীতজ্ঞ পীর শেখ বোধান ৩২৪
সংগীতজ্ঞ শেখ মুহাম্মাদ গাউস ৩২৫

মুসলিম প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ ৩২৫
কাশ্মীরে সংগীত চর্চা ৩২৬
কাশ্মীর সুলতান জয়নুল আবেদীন কাশ্মীরী (১৪১৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) ৩২৬
সুলতান জয়নুল আবেদীন এর সমসাময়িক ৩২৬

গোয়ালিয়র রাজ মানসিংহ তানোয়ার (১৪৮৬-১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) ৩২৬
তেলাং (তেলিংগানা) রাজ্যে সংগীত চর্চা ৩২৭

সঙ্গীতে শু'রাটের অবদান ৩২৮
ছয়টি প্রধান রাগ ৩২৮
৮০,০০০ রাগ রাগীণি ৩২৮
সুলতান মাহমুদ শাহ-৩. ৩২৯

মুঘল পরবর্তী ভারতে সংগীত চর্চা ৩২৯
সংগীত চর্চা বিকেন্দ্রীকরণ ৩২৯
মারাঠা অঞ্চলে সংগীত চর্চা ৩৩০
অযোদ্ধা ও লাখনৌ ৩৩০
রাগ রাগিণীর শ্রেণী বিন্যাস ৩৩০
হালকা সংগীত ৩৩০
ঠুমরী ও টপ্পা ৩৩১
সংগীতজ্ঞ মিয়া সুরী ৩৩১
বৃটিশ রাজত্বে অবক্ষয় ৩৩১

আধুনিক যুগ ৩৩৩
ধ্রুপদ সংগীত ৩৩৩

www.amarboi.org

ধ্রুপদ সংগীত চর্চ ৩৩৩
সংগীত তারকা মন্ডলী ৩৩৩
সংগীত যন্ত্র বাদক ৩৩৩
সংগীতজ্ঞ বায়েজীদ খান ৩৩৩
বৈশিষ্ট্য ৩৩৪
ধর্ম ও সংগীত ৩৩৪

খেয়াল সংগীত ৩৩৫
খেয়াল ও ধ্রুপদ ৩৩৫
সংগীতজ্ঞ রাজা রাম শাহ্ ৩৩৫
মুঘলদের খেয়াল চর্চা ৩৩৫
উপভোগ্যতা ৩৩৬
ধ্রুপদ বনাম খেয়াল ৩৩৬

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা ৩৩৬
নওয়াব ওয়াজেদ আলী খাঁন ঃ ৩৩৭
বিদায়ী সংগীত ৩৩৭
নাজ সংগীত গ্রন্থ ৩৩৭

উস্তাদ আলাউদ্দীন খান ৩৩৮
মাইহার দরাবার ৩৩৮
ব্যক্তিত্ব ৩৩৮
বংশ পরিচয় ৩৩৮
শিশুকালে গৃহ ত্যাগ ৩৩৯
যাত্রা পার্টিতে ৩৩৯
সংগীত বাদক দলে ৩৩৯
কলকাতা গমন ৩৩৯
প্রথম রাত ৩৩৯
ভিক্ষা প্রশিক্ষণ ৩৩৯
বিতাড়ন ৩৪০
ব্রাহ্মণ সংগীতজ্ঞ ননী গোপাল ৩৪০
নাম পরিবর্তন ৩৪০
তবলা ও তানপুরা প্রশিক্ষণ ৩৪০
বিবাহের রাতে পলায়ন ৩৪০
পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু ৩৪০
বেহালা ও বাঁশি ক্রয় ৩৪০
কনসার্ট পার্টিতে ৩৪১
তবলা বাদক মিনার্ভা থিয়েটার ৩৪১
ত্রিপুরার মহারাজার বাদক দলে ৩৪১

www.amarboi.org

মুক্তাগাছায় মহারাজ বাড়িতে ৩৪১
উস্তাদ আহমাদ আলীর খাদেম ৩৪১
খাদেম ও বাবুর্চি ৩৪১
রামপুরে ৩৪২
এক টাকার আফিম ৩৪২
মাইহার নবাবের গাড়ী চাপা পড়ার চেষ্টা ৩৪২
দুর্ঘটনা হতে রক্ষা ৩৪২
সরোদ বাদক ওয়াজীর আলীর শিষ্যত্ব ৩৪২
মাসিক এক টাকা বেতন ৩৪২
স্ত্রীর আত্মহত্যা ৩৪২
মাইহার মহারাজার দরবারে চাকুরী ৩৪৩
ইউরোপ ভ্রমণ ৩৪৩
মাইহার বাদক দল গঠন ৩৪৩
উপমহাদেশের সর্বোত্তম সরোদ বাদক ৩৪৩
জীবন ব্যাপী সাধনা ৩৪৩

সুরের সাগরে অবগাহন ৩৪৪
গানের সুর ৩৪৪
সুরের প্রভাবের গভীরতা ৩৪৪
সংগীতের তান ৩৪৪
সুরেলা ধ্বনী ৩৪৪
সংগীতের উপকারীতা ৩৪৫
সার্বজনীনতা ৩৪৫
যন্ত্র সংগীত ৩৪৫
ইঙ্গিতবহ সংগীত ৩৪৫
দ্বীনী সংগীত ৩৪৬
সংগীতজ্ঞদের জীবন যাত্রার মান ৩৪৬
সংগীত ও হৃদয় ৩৪৭
উপমহাদেশীয় সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র ৩৩টি ৩৪৮
Bibliography ৩৪৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৩৫৩
লেখকের কয়েকটি পুস্তক ৩৫৪

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম অংশ

সংগীত ও সংগীতজ্ঞ

সকল মানুষ কবি নয়, শিল্পী নয়, সৎ নয়, ভদ্রলোকও নয়। কিন্তু, সকল মানুষই কম বেশী গায়ক। ছোট বড় কণ্ঠ শিল্পী। অন্য কেও সম্মুখে না থাকলে সংগীতে অনভিজ্ঞরাও গান গায়। আদম সন্তান অবসর পেলেই একা একা গুন গুন করে। গুন গুন করে গান গাইতে প্রেমিকের মন চায়। পাগল একা একা কথা বলে। প্রেমিক একা একা গান গায়।

শ্রোতারা থামিয়ে না দিলে গায়ক হওয়ার সুযোগ কেওই হারাতে চায় না। একা থাকলে তো নয়ই। সফল না হলেও একটু আধটুকু চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি? একক সংগীতজ্ঞদের সংগীত চর্চার একটি উত্তম স্থান হলো স্নানাগার। তবে তা পাবলিক স্নানাগার নয়। গর্দভ রাগিণী হলে রক্ষা নেই।

গানের একটু আধটুকু অভ্যাস অবিবাহিতদের পক্ষে কনে দেখার মতই লোভনীয়। সংগীত একটি কুমারী বালিকার ন্যায়। কুমারীর দিকে পুরুষমন তাকাতে চায়। বুড়োরাও তাকাতে চান। কারণ, নিজের জন্য আর প্রয়োজন না হলেও তাঁদের পৌত্রদের জন্য উপযুক্ত কনে প্রয়োজন। তাই মেয়েটি ভাল করে দেখে নিতে হবে। সংগীত শ্রবণে সকলেই কম বেশি উৎকর্ণ।

সংগীতের বিষয় বস্তু কি? সংগীতের বিষয় বস্তু অনেক কিছু। এর মধ্যে রয়েছে ঋতু বৈচিত্র্য জীবনের হাসি, আনন্দ, কান্না, দুঃখ, বেদনা, সাফল্য, ব্যর্থতা, দুর্দশা, হতাশা, আশা, আকাংখা, শীত, বসন্ত, গ্রীস্ম, বর্ষা, জয়-পরাজয়, যৌবনের উদ্দামতা, বার্ধক্যের ক্লান্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য– আরো কত কি !

কবিতা ও গান : কবিতা হলো শব্দের মালা। গীত হলো শব্দের কবিতা। সকল কবিতা মঞ্জুষা গীতি কাব্য নয়। অনেক কবিতা কাব্যময়। সংগীতের মাধ্যমে কবিতার শব্দমালা রঙধনুর সৌন্দর্য্য ধারণ করে। প্রাজ্ঞজনের বিজ্ঞ বাক্য সংগীতের মাধ্যমে শ্রোতার মর্মমূলে প্রবেশ করে।

শাব্দিক ছন্দ ও ঝঙ্কারের কারণে গল্প অপেক্ষা কবিতা মুখস্থ করা সহজতর। সত্যন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমৃতাক্ষর মার্ধূয্যের কবি মাইকেল মধুসুদনের কবিতা

www.amarboi.org

মুখস্থ করা গভীরতর ভাব সমৃদ্ধ কবিতা অপেক্ষা সহজতর। জাতীয় মানসের শাব্দিক চিত্র জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

একজন সংগীতজ্ঞের সংগীতের প্রভাব বিভিন্ন শ্রোতার কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। সকল গানের সুর, লয়, তান ও তাল এক রূপ নয়। সুর মধুর হলে ভাষা হার মানে। প্রকৃতির মধুর স্বর ও সুরের ভাষা সার্বজনীন ও চিরন্তন।

আবেগ, অনুভূতি ও সংগীত : সংগীতের জন্ম জ্ঞানে নয়, আবেগ অনুভূতিতে। গানের মাধ্যমে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ পায়। হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশিত হয় গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে। শুধু গানের মাধ্যমে নয়।

জীবন বাস্তব। গান, গীতিকা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস বাস্তব নয়। বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। অনুভূতির ছন্দময় প্রকাশই সংগীত। নদীর কলকল ধ্বনিতে ভাষা নেই। আছে ছন্দ ও গীত।

গান হৃদয়ের তারে সুর বাজায়। হৃদয়কে নরম করে। সংগীত অনুভূতিকে নাড়া দেয়। সংগীত হৃদয়ে সাড়া জাগায়। হৃদয়কে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে।

জীবনের দুঃখ বেদনা সংগীতের মাধ্যমে হ্রাস পায়। গান মন উদার করে। উতলা করে। অনুভূতিঘন গভীর স্বর শুধু বাতাসেই ভাসে না। অতি দূর হতে শ্রুত গীত কর্ণে বাজে। গানের ভাষা হতে পারে সহজ সরল। মর্মার্থ হয় কখনো অতি গভীর। কখনো কখনো সুদূঢ় প্রসারী।

নৈতিক উপদেশ অপেক্ষা সংগীত হৃদয়ে গভীরতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনুভূতিকে অনেক বেশী নাড়া দেয়। এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করে যা কখনো মরে না। সংগীত মানব মনকে অভিভূত করে। হৃদয় জানে না – কেন তা করে।

যারা সংগীত রচনা করেন– তাদের মন হয় নরম। সাধারনতঃ তারা কঠোর ও হৃদয়হীন হতে পারেন না। কঠোর হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের হৃদয়ে ছন্দময় সুর ও মধুর স্বরের আবেদন সাধারণত হয় না।

অসুস্থতার সময়ে কথা শুনতে অনেক রোগীর বিরক্তি লাগে। তাই রোগীর ঘরে কথা হয় কম। রোগী দর্শনার্থীরাও চুপচাপ বসে থাকেন। সংগীতজ্ঞ রোগী দেখতে গেলে এবং বিনা যন্ত্রে গান গাইতে চাইলে রোগীর হয়তো বিরক্তি

www.amarboi.org

লাগবে না। ক্লাসিক্যাল সংগীতের ধ্বনি অজ্ঞ জনের নিকট যুবকের কান্নার ন্যায় বিরক্তিকর অনুভূতি হতে পারে।

পেশাগত সংগীতচর্চা : গান এবং কবিতাকে শুধুমাত্র পেশাগত জীবনের খাদ্যে পরিণত করলে জীবন হয় ব্যর্থ। কবিতা ও গান হলো খাদ্যের মধ্যে চাট্‌নি বা আচারের মত। খাদ্য বাদ দিয়ে মধু ও চাটনী খেলে স্বাস্থ্য থাকে না। জীবনের কর্ম সাধনা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র গানবাজনা নিয়ে পাগল হলে জীবন হয় মৃত দেহের মত। তা সংরক্ষন করা হলে পুঁতিগন্ধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

মদ্য পান করে মাতাল বুঁদ হয়ে থাকে। সংগীত শ্রবণে কেও কেও মাতালের মত বুঁদ হয় না। বরং, বেহাল হয়ে উঠে।

যে কোনো কর্মকে জীবন সাধনা এবং পেশাগত ভাবে গ্রহণ না করলে জীবন সাধনায় পূর্ণ সাফল্য আসেনা। কিন্তু পেশা ও সাধনায় অনেক ক্ষেত্রেই সমন্বয় হয়না। সাধনা অপেক্ষা জীবিকা, জীবন যাত্রার মান এবং পেশাগত স্বীকৃতি ও সাফল্যই বড় হয়ে দেখা দেয়।

প্রাচীন কালে গায়ক ও সংগীতজ্ঞগন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন অন্যান্য পেশাজীবী থেকে অনেক বেশী। রাজা বাদশাহগণ কবিতা ও গল্প শুনে কবি ও সাহিত্যিককে যত উপহার সামগ্রী দিতেন, গায়ক ও সংগীতজ্ঞদেরকে উপহার দিতেন অনেক অনেক বেশী।

রাজদরবারে পেশাগত সংগীত : রাজদরবারে পুরস্কার বা সম্মানের আশায় যে প্রশংসা সংগীত বা স্তবগীত গাওয়া হয়, তাতে মিথ্যার উপাদান ও মধুরতা থাকে অনেক বেশী। রাজা বাদশাহের দরবারে সংগীত চর্চা খুব কমই মহৎ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। নেক উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বর যতটুকু মধুর করা যায়, তা থেকে বদ উদ্দেশ্যে অনেক বেশী মধুর করা হয়।

পেশাগত সংগীত চর্চাকারীদের কারো কারো জীবন দ্বীনি দৃষ্টিকোন থেকে ব্যর্থ বলা হতো। রক্ষনশীল মহলে মনে করা হতো যে, রাজকীয় সংগীত চর্চা এবং সংগীত পৃষ্ঠপোষকতায় মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার পথ থেকে শয়তানের পথে ধাবিত করে।

সুর মাধুর্য : গানের মাধুর্য এবং সুরের আবেদন ফুলের বাগানে, নদীর কুলে, বনের গভীরে, মদের দোকানে, মায়ের কবরের পাশে এবং রাজার প্রাসাদে একরূপ হতে পারে না। কথা ও বক্তৃতা অপেক্ষা কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্রের সুর অনেক বেশী আকর্ষণ করে মানব মন ।

www.amarboi.org

সংগীতের ছন্দ তাল ও লয়ে যা প্রকাশিত হয়, তা অপ্রিয় খুব কমই হয়ে থাকে। যদি না তা ব্যঙ্গ সংগীত হয়। গানের কথা ও কলী হয় সরল ও সাধারন। গায়কের কণ্ঠে সুরের গভীরতায় গানের মর্ম স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে শ্রোতার মর্মমূলে প্রবেশ করে।

যন্ত্র সংগীত : যন্ত্র সংগীত অনেকের নিকটই অতি প্রিয়। যন্ত্র সংগীতের সুরে বন্য পশুর গতিও শথ হয়ে যায়। যন্ত্র সংগীত শুধু যে পাখী আকর্ষণ করে, তা নয়– মাকড়ষা, ইদুঁর থেকে উট ও হাতিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে।

নীরব, নিথর, গভীর রাতে প্রেমিকের গানের সুর বাতাসে ভাসে। বহু দূরে প্রেমিকার কর্ণে ঐ সুর পৌছে যায়। সংগীত যন্ত্রের মধ্যে বাঁশীর সুর অত্যন্ত সহজ। গভীর রাতে এ সুর শুধু যে প্রেমিকাকে ঘর থেকে বের করে আনে, তা নয়। বিষাক্ত সর্প গর্ত থেকে বের করে এনে সুরে সুরে সাপুড়ে নাঁচাতে পারে ।

ঢোল : ঢোলের ভাষা ঝড়ের মতো। এটা শুধু আকর্ষণ এবং মুগ্ধই করে না, বরং নাঁচায়। ঢোলের শব্দ শুনলে নৃত্য শিল্পীদের হৃদয়ই শুধু নাঁচে না, দেহ নড়া শুরু হয়। সংগীত চর্চা বেশী হলে তা শুধু কণ্ঠে সীমাবদ্ধ থাকে না। যন্ত্র সংগীতে রূপ নিয়ে নৃত্যে পর্যবসিত হয়। নৃত্য একটি দর্শনীয় এবং শব্দহীন সংগীত। যন্ত্র সংগীত বিহীন নৃত্যও আকর্ষণীয়।

মধ্যযুগেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে ড্রাম বা ঢোল এবং দফ ব্যবহার হতো। অতীতকালে সৈনিকদের মরণপণ সম্মুখ সমরে যুদ্ধ সংগীতের ব্যবহার ছিল। শুধু যে ঢোল, তবলা, দফ বাজানো হত তা নয়, উত্তেজনাকর কণ্ঠ সংগীতের আবেদন মুখোমুখি যুদ্ধে খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। মরনপন যুদ্ধের মধ্যে বাজনা বাজানো হত। দফ জাতীয় ঢোলের নিম্ন দিক খোলা থাকে।

সংগীতের উদ্দেশ্য : গান ভাল কি মন্দ, তা কিছুটা নির্ভর করে গীতিকার ও গায়কের উদ্দেশ্যের ওপর। যৌনানন্দ ও মাদকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংগীত গীত হলে এক প্রকার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। যদি গানের উদ্দেশ্য হয় মনুষ্যত্বের বিকাশ, সে ক্ষেত্রে ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

গায়কের উদ্দেশ্য হতে পারে শ্রোতার চিত্তবিনোদন, জীবনধারা পরিবর্তন অথবা শ্রোতার জীবনকে পরিবেশের সংগে মানিয়ে নেয়া। উত্তম মানের গান শ্রোতাকে আনন্দ দেয় ও অনুপ্রাণিত করে। শ্রোতার জীবনের গতিধারা পরিবর্তন করে দিতে পারে, যদি গানটি সে মানের হয়। গানের বীজ উত্তম হলে শ্রোতার

www.amarboi.org

মনের উর্বরা জমিতে ফসল ফলাবে। গোলাপের চারা লাগালে গোলাপ গাছে গোলাপ ফুলই ফুটবে।

গানের উপকারিতা ও অপকারিতা : ঐতিহাসিক ইতিহাস-চর্চা করেন ইতিহাস সম্বন্ধে নিজস্ব অবগতি এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহন এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যে। ইতিহাস রেকর্ড করে অতীতের ক্রিয়াকলাপ, সফলতা, ব্যর্থতা ও ভুলভ্রান্তি। ইতিহাস জানার প্রতিক্রিয়া এবং উপকারীতা কি হবে, তা নির্ভর করে পাঠকের ওপর। গানের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে গায়ক ও শ্রোতার ওপর।

সংগীত রক্তকে করতে পারে উষ্ণ ও উত্তেজিত। জীবনকে করতে পারে উচ্ছৃঙ্খল। অন্য দিকে মহৎ সংগীত চরিত্রকে দিতে পারে মাধুর্য ও পবিত্রতা। গানের প্রতি আকর্ষণ কাওকে প্রদান করে সাফল্য, মহত্ব এবং সৌন্দর্য্য। অন্য কারো জীবন পর্যবসিত হয় বিফলতা ও ব্যর্থতায়।

স্বর্ণকার সোনা দিয়ে অলঙ্কার গড়েন। এই অলঙ্কারের জনপ্রিয়তা নারী মহলে সর্বত্র। গানের ভুবনে সংগীতজ্ঞ স্বর্ণকারসম। স্বীয় গানের সুর নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। উন্নততর করা যায়। যেমন, স্বর্নকার সোনার গয়নার ডিজাইন পরিবর্তন করেন।

যদি কেও জীবনে মহান, স্মরণীয় ও বরনীয় হতে চান, তাঁদেরকে হতে হবে শিশুর ন্যায় শিক্ষার্থী–তাঁদের নিকট, যারা জ্ঞানে, গুনে ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধতর। সহজ সরল অর্থহীন বাক্যও সংগীতের ছন্দ, সুর ও স্বরের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করে।

ঐতিহাসিক এবং লেখকগণ রেকর্ড করে যান যা বাস্তবে ঘটে এবং যা তারা দেখেন। কিন্তু কবি, শিল্পী ও গায়কগণ তাদের কবিতা, কাব্য এবং সংগীতের মাধ্যমে অমানুষকে করতে পারেন মানুষ। পশুত্বে নিপতীতকে উন্নীত করতে পারেন অমরত্বে।

সমকালীন গীতিকার : কবি ও গীতিকার সুন্দর কথার মালা গেথে কবিতা ও সংগীত রচনা করেন। পুষ্পের পাপড়ি অপেক্ষা গানের কলি অধিকতর মনোরম হতে পারে। উভয়টাই শ্রোতার কর্ণে মধু অপেক্ষা মধুরতর হতে পারে। হৃদয়ের ভাষা, গান, তাল, তান, সুর, লয় ও ছন্দের মাধ্যমে কণ্ঠ সংগীতে রূপান্তরিত হয়। গীতিকার ও গায়ক হলেন স্বীয় হৃদয়ের বংশী বাদক। সংগীতের স্বর উচ্চকিত এবং আলোকিত হয় গায়কের কণ্ঠে। গায়ক অপেক্ষা গানের শ্রোতা ও সমঝদার বেশী।

www.amarboi.org

সমকালীন সংগীতজ্ঞ : সমকালীন সংগীতজ্ঞ বসন্তের কোকিলের ন্যায় প্রিয়। কোকিল গান গায়। যে গায়িকাদের কণ্ঠ মধুর তাদেরকে বলা হয় কোকিল কণ্ঠী। গায়কগণ বন্ধুমহলে অতি প্রিয়। তাদের ভক্ত মন্ডলীর পরিধি বিস্তৃত। সংগীতে আছে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য। বাগানে ফুলের দৃশ্য ও সুগন্ধ আধুনিক ও সমকালীন সংগীতের ন্যায়। অতীতের রেকর্ড করা সংগীত দোকানে রক্ষিত অতি সুন্দর আতরের শিশির মোহনীয় গন্ধের সঙ্গে তুলনীয়।

সংগীতের মাধুর্য, সুর লহরী পরিবেশ ভেদে ভিন্নরূপ হয়। ফুলের গন্ধ এবং আতরের গন্ধের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, তেমনি বিভিন্ন কণ্ঠে একই গীতের সুর ও স্বরের আবেদন শ্রোতার হৃদয়ে হয় ভিন্ন রূপ।

গায়কের অবদান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নয়, বরং সমকালীন শ্রোতাদের জন্য। গায়ক হতে পারে যুগের সংস্কারক। যে কাজ বহু ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে হয় না, ঐ কাজ হতে পারে গানের সুরের প্রতিক্রিয়ায়।

কালজয়ী সংগীতজ্ঞ : ইতিহাস যে সমস্ত সংগীতজ্ঞদের নাম বুকে ধারন করে ধন্য হয়, তাদের মত সংগীত সাধক খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য। আরো অনেক কষ্টসাধ্য হলো জীবনব্যাপী সাধনায় উন্নীত এবং হারিয়ে যাওয়া সুর পুনরুদ্ধার করা।

প্রাচীন কালের কালজ্বয়ী সংগীতজ্ঞগণ যে সুর লহরী তুলেছিলেন, তা ধরে রাখার মত কোন যন্ত্র সে যুগে আবিষ্কার হয় নি। ঐ যুগের উন্নত মানের সংগীতের বর্ণনা জানা যায় সংগীতের ইতিহাস পাঠ করে। এর তৃপ্তি বিদেশীর পক্ষে বাংলাদেশী রসগোলা অথবা রাজভোগ একবারও আস্বাদন না করে বর্ণনা শুনে উপলব্ধির মত।

সমকালীন পরিচিত গায়কগন গাছে নাঁচানাচী করা পাখীর মত। তারা শ্রোতাকে আনন্দ দেন। তাদের গানে শ্রোতাদেরই চিত্তবিনোদন হয়। অপ্রিয় কথা মনে থাকে দীর্ঘকাল। আর মনে থাকে দীর্ঘকাল গানের কলি।

ছোট পাখিগুলোর নাঁচানাচী দেখা যায় তাদের গানও শোনা যায়। হাজার বছর পরেও যে সংগীতজ্ঞ ও গায়কদের পর্যালোচনা হয়, তারা আকাশে উড়ন্ত শ্যেন পাখির মত। বাজপাখী আকাশে এত উপরে উড়ে যে ভূমি থেকে তাদের দেখা যায় না।

কালজয়ী সংগীতজ্ঞগন তাজমহলের ন্যায় অমর কীর্তির রাজমিস্ত্রীর মত। তাজমহলের সৌদে ব্যবহৃত শ্বেত পাথরগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে থাকে মানবকুলে নয়নাভিরাম।

www.amarboi.org

উচ্চাঙ্গের সংগীত : ক্লাসিক্যাল সংগীতের আবেদন থাকে সমঝদারের নিকট। ক্লাসিক্যাল সংগীত উপভোগ করতে হলে গানের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। উচ্চ স্তরের সংগীত প্রেমিক হতে হবে। ক্লাসিক্যাল সংগীত অনেকটাই বিদেশী ভাষার মত। বিদেশী ভাষা না জানলে বিদেশী ভাষার কথা উপলব্দি হবে না এবং মাধুর্যও অনুভব করা যাবে না।

উচ্চাঙ্গের সংগীতের নিয়মাবলী ও বিধিবিধান অতি জটিল। ব্যাকরণের বিধিবিধানে সফল সংগীত সকল হৃদয়ে প্রবেশ করে না। তবুও মর্ম হৃদয়াঙ্গম করতে উচ্চাঙ্গের সংগীতের ব্যাকরণ জানতে হবে।

শোক সংগীত : পরম শোক দুঃখ জনিত কান্না কবি কণ্ঠে স্বভাবসিদ্ধ কাব্যে রূপান্তরিত হয়। শোক কান্নার মধ্যেও ছন্দ এসে যায়। গুণীজনের হৃদয়ের কান্না ও অশ্রুজল সংগীতের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

গানের মাধ্যমে মানব হৃদয়ের সুখ দুঃখ বেদনার ব্যঞ্জনা ঘটে। দুঃখ বেদনার ভার সম্পূর্ণ বিদূরিত না করলেও গান কিছুটা হ্রাস করে। শোক সংগীত শ্রোতাকে অশ্রুজলে সিক্ত করে। সংগীত লাঘব করে দুঃখ বেদনা।

প্রেম ও সংগীত : সংগীত প্রেমের দীক্ষা দেয়। প্রেম রসে মন সিক্ত হলে সংগীতের স্বাদ হৃদয় মনে বেশী অনুভূত হয়ে থাকে। হৃদয় যখন গানের ভাষায় প্রিয়জনকে ডাকে, প্রেমিক প্রেমিকার মন পাখা মেলে উড়ে আসে। হৃদয় যখন প্রেমে আপ্লুত হয়, প্রেমিক ও প্রেমিকার কণ্ঠস্বরে সংগীতের সুর বাজে।

সকল গানে হৃদয় গলে না। শুনার মতো মন ও কর্ণ না থাকলে গানের বাঁশী বাদল দিনে বাজেনা। প্রেমিকের সংগীতের তীর প্রেমিকার হৃদয়কে বিদ্ধ করে এবং নয়নকে অশ্রুসজল করে তোলে।

মরমী সংগীত : মরমী সংগীত কারো কারো দৃষ্টিতে পবিত্র ও পুণ্যময়। গানের মাধ্যমে মহাত্যাগ ও কুরবানী বেঁচে থাকে। উত্তম মানের নীতিবোধ সমৃদ্ধ সংগীত জটিল মানব প্রকৃতিতে আনতে পারে সম্প্রীতি, ভারসাম্যতা, উন্নতি এবং প্রগতি। বাস্তবায়িত করতে পারে মানব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু মহৎ এবং উদার। উচ্চমানের নীতিবোধ সম্পন্ন গীতিচর্চা করা হলে সাধিত হবে চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।

www.amarboi.org

আল্‌-কুরআনের আলোকে সংগীত-চর্চা

মুসলিম জনমনে এ ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল যে, অনৈতিক গান-বাজনা সম্পূর্ণ হারাম। কেও কেও বলেন সকল প্রকার সংগীত চর্চাই হারাম। কেননা, সংগীত চর্চা শয়তানের কাজ। বলা হয় যে, গানের সুর শয়তানের সুরের অনুকরণে করা হয়েছে। মুয়াজ্জিন যেমন আযান দিয়ে মুসাল্লিদের আল্লাহ্‌র পথে ডাকেন, শয়তান তেমনি গানের সুরের মাধ্যমে মানুষকে নিজের পথে নিয়ে যায়।

মুসলিম ফিকাহ্‌ এবং আইনশাস্ত্রের এক মূলনীতি এই যে, যা অবৈধ করা হয়নি বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি তা বৈধ। আল্‌-কুরআন এবং হাদীস দ্বারা যা অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি ঐ সবই আমরা বৈধ ধরে নিতে পারি। কি কি কাজ অবৈধ তা নির্ধারণ করার জন্যে আল্‌-কুরআন এবং হাদীসের আশ্রয় নিতে হয়।

আল্‌-কুরআনে সংগীতের অবৈধতাসূচক সুস্পষ্ট কোনো আয়াত নেই। তবুও কয়েকটি আয়াতকে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় যে, ওগুলোতে সংগীতের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। এ নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে হাদীস এবং ফকিহ্‌দের মতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়।

মদ, সুদ এবং জুয়া যেভাবে আল্‌-কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে গিনা, নাগমা, সামারূপ গান বা সংগীত সম্বন্ধে সেরূপ নিষেধাজ্ঞা আল্‌-কুরআনে নেই।

অপ্রয়োজনীয় গল্প গুজব (লাহওয়াল হাদীস) : আল্‌-কুরআনে সূরা লুকমানের একটি আয়াত সংগীত-চর্চার অবৈধতার সমর্থনে পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, "মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য অজ্ঞানতাবশত 'লাহওয়াল হাদীস' (অর্থাৎ কথার মধ্য থেকে অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় গল্প-গুজব বা বাক্য) ক্রয় করে এবং আল্লাহ্‌র পথকে হাসি-তামাশারূপে গ্রহণ করে। অপমানজক আযাব তাদের জন্যই আছে। আমার আয়াতসমূহ যখন তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তারা অহঙ্কার ভরে ফিরে চলে যায় যেন তারা শোনেনি এবং তারা বধির" (আল্‌-কুরআন ঃ সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৬)[১]।

www.amarboi.org

মুসলিম আইনবেত্তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রাঃ)- এবং নাখয়ি (রাঃ) 'লাহওয়াল হাদীস'- এর অর্থের মধ্যে অনর্থক বাক্যের সঙ্গে সংগীতকেও অন্তভূক্ত করেছেন। 'লাহওয়াল হাদীস'-এর মধ্যে সংগীতও পড়ে কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যদিও আমরা ধরে নিই 'লাহওয়াল হাদীস' অর্থাৎ অনর্থক বা অসার বাক্যের অর্থ শুধুমাত্র সংগীতই, তাহলেও উক্ত আয়াত থেকে সর্ব প্রকার সংগীত হারাম– এ সিদ্ধান্তে মনে হয় আসা যায় না।

উদ্দেশ্যভেদে সংগীত বৈধ বা অবৈধ : ওপরের আয়াতটি সূক্ষ্মভাবে দেখলে আমরা লক্ষ্য করি 'লাহওয়াল হাদীস' বা অপ্রয়োজনীয় গল্প গুজব ক্রয় করার নিন্দা করা হয়েছে– যখন আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। দিনের ক্লান্তি শেষে অফিস ফেরত পিতা অথবা পিতামহ যদি সন্তানের বা আওলাদের গান শুনে আনন্দ পেতে চান, তা হলে কাওকে পথভ্রষ্ট করা হয় না।

অপ্রীতিকর সাহচর্য থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে স্ত্রী যদি সংগীত-চর্চা করে থাকেন, তা আল্লাহ্‌র পথ থেকে স্বামীকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে নয়। নির্দোষ আনন্দের জন্যে যৌন আবেদনহীন সংগীত-চর্চা ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট করে না।

দেশপ্রেমমূলক জাতীয় গান শ্রোতাদেরকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। এ জাতীয় গান অসৎ উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় না। পথভ্রষ্ট করার শর্ত পূরণ না হলে সংগীত হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত– এ আয়াত হতে বোধ হয় করা যায় না।

অসৎ উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতও হারাম : মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে যা কিছু করা হোক না কেন, তা হারাম। তা সংগীত হোক, বক্তৃতা হোক বা খোশগল্পই হোক। পথভ্রষ্টকারী সংগীত হারাম। কাব্য, কবিতা, গদ্য, গল্প, ইতিহাস-চর্চা যা কিছুই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে করা হয়, সবই হারাম।

পথভ্রষ্ট করার উপযোগী সংগীত, সংগীত বলে হারাম নয়, তা হারাম হয়। হারাম উদ্দেশ্যের পোষক হওয়ার কারণে। 'লাহওয়াল হাদীস'- অর্থ হয় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এর অর্থ সংগীত ধরে নিলেও এ আয়াত থেকে বোধ হয় না যে, সংগীত মাত্রই হারাম।

আল্-কুরআনের মধ্যেও কাব্যিক ছন্দ এবং সুর আছে। সুর এবং ছন্দ না থাকলে কোন গ্রন্থ মুখস্থ করা কঠিন। আল্-কুরআনের ছন্দ এমন যে অনারব শিশুগণও না বুঝে আল্-কুরআনের আয়াত মুখস্থ করতে পারেন।

www.amarboi.org

নিয়ন্ত্রিত মধুর ধ্বনিকে সুর বলা হয়। নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি ছান্দিক মিল বা বাহার থাকার কারণে কুরআন মুখস্থ করা যত সহজ, হাদীস মুখস্থ করা তত সহজ নয়। বাহার ফার্শি শব্দ। এর অর্থ- সুর।

ইমাম আবূ হামীদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ধর্মের বিনিময়ে 'লাহওয়াল হাদীস' বা অনর্থক বাক্য ক্রয় করা হলে তা বান্দাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে অন্য দিকে নিয়ে যায়। তজ্জন্যই তা হারাম এবং নিন্দনীয়। এতে কোনো মতভেদ নেই।"

ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এক মুনাফিক (আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই) নামাযে ইমামতি করতো। সে সালাতে যে সূরা আবাসা (৮০ নম্বর সূরা)[২] ভিন্ন অন্য সূরা পড়তো না। এ সূরায় অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতুমকে অবহেলা করার জন্যে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মুনাফিকের উদ্দেশ্য ছিল– বার বার এ সূরাহ পাঠ করে লোকের মনে রাসূল (সাঃ) এর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। হযরত উমার (রাঃ) ঐ মুনাফিকের আচরণে এতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাকে বারন করেন।

আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) লিখেছেন যে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সংগীত কেন, আল্-কুরআন তিলাওয়াত করাও হারাম। প্রেমিকার মন জয় করার উদ্দেশ্যে কেও কেও মমুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করত।

কুরাইশ সর্দারদের সঙ্গেঁ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কালে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূলল্লাহ্ (সাঃ)-কে দ্বীন শিক্ষার জন্যে বার বার অনুরোধ করেন। তখন আয়াত নাযিল হলে "সে (রাসূল) ভ্রূকুঞ্চিত করল (আবাসা) এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছিল (আল্-কুরআন, সূরাহ্ আবাসা ৮০ : ১,২)[৪]। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ প্রিয় সাহাবীকে তার মদীনার বাইরে সফর কালে দুবার মদীনার সাময়িক শাসক (আমীর) বা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন।

লাহ্ওয়াল হাদীসমূলক (অসার বাক্য) আয়াতটির পটভূমিকা : আল্-কুরআন তিলাওয়াত, আলোচনা প্রভৃতিতে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তাঁরা অবসর সময় পেলেই কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতেন। তাতে তাঁদের ঈমান এবং মনোবল বৃদ্ধি পেতো।

মুনাফিক এবং কাফিররা কুরআন অধ্যয়ন থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো। তারা নানা মুখরোচক খোশগল্প তৈরী এবং বর্ণনা করে

www.amarboi.org

মুসলিমদেরকে কুরআন অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো। পদ্যে এবং গদ্যে বাক্য বিন্যাসে তারা ঐতিহাসিক ঘটনার কল্পিত বর্ণনা দিতো।

মুসলিমগণ কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করলে কাফিররা উপেক্ষা প্রদর্শন করতো এবং রসাত্মক বাক্যালাপ দ্বারা লোকজনকে ধর্মপথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো। এ কাজে কবিদের ভূমিকা ছিলো প্রধান। কাফির কবিদের মধ্যে এক কর্মে কাব ইবনে আশরাফ, কাব ইবনে লুহাই এবং ইবনে হারিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের বাক্যালাপে মুগ্ধ কোনো কোনো মুসলিম কুরআন পাঠ থেকে বিমুখ হতো। তাদেরকে লক্ষ্য করেই উপরে উল্লেখিত 'লাহওয়াল হাদীস' ঘটিত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

'লাহ্ওয়া' শব্দের অর্থ : আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস 'লাহ্ওয়াল হাদীসের' অর্থ করেছেন, "গান এবং তার অনুরূপ বিষয়সমূহ"। 'লাহ্ওয়া' শব্দের অর্থ ব্যাপক। এর অর্থ খেলা, তামাশা, অসার কথা, অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ, অনর্থক কাজ, ইত্যাদি যা মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে সরিয়ে অথবা বিরত রাখে।

গল্প উপন্যাস সত্যভিত্তিক কাহিনী নয়। মীর মোশারফ হোসেন এর বিষাদ সিন্ধুও অতিরঞ্জন এবং কল্পিত কাহিনী সংযোগের জন্যে লাহওয়াল হাদীস এর পর্যায়ে পড়ে। অথচ নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিতে এ গ্রন্থটি অনুপম।

সংগীতের জন্য আরবী ভাষায় পৃথক শব্দ আছে। ওপরের আয়াতে যদি সংগীতের নিষেধাজ্ঞাই উদ্দেশ্য হতো, তবে গানের অর্থবোধক আরবী শব্দ যেমন 'গেনা' বা 'সামা', 'নাগমা', প্রভৃতিই ব্যবহার হতো। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বা ইবনে মাসউদ (রাঃ) 'লাহও' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অবশ্যই এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। তবে এ ব্যাপারে ইখতেলাফও আছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ লিখেছেন, "আল্-কুরআনের তফসির সম্বন্ধে শত শত কথা আলিম মন্ডলী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্যথায় কয়েকটা সূরাকে আল্-কুরআনের অঙ্গ হইতে বাদ দিয়া ফেলিতে হয়। তফসিরের কিতাবগুলোতে স্বয়ং হযরতের নামকরণে এরূপ শত শত রেওয়ায়েত মুনাফিকগণ কর্তৃক সন্নিবেশিত হইয়া আছে যাহা হযরতের হাদীস কখনই নহে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তফসির বলিয়া যে পুস্তকখানা আমাদের সমাজে পরিচিত, তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিলেই আমরা অনেক রহস্য অবগত হইতে পারিব। ইহার একটি প্রমাণ এই যে, ইবনে আব্বাস এরূপ

www.amarboi.org

কথা বলেন নাই। তিনি স্বয়ং সংগীত শ্রবণ করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে" (কিতাবুল আগানী)[৬]।

সংগীত বিরোধী হিসেবে উত্থাপিত আল্-কুরআনের দ্বিতীয় আয়াত : সংগীত বিরোধীগণ নিম্নের আয়াত দুটিও সংগীতের অবৈধতার সমর্থনে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কি এ কথায় আশ্চর্য হও ? হাসি ঠাট্টা করছ ! ক্রন্দন করছ না এবং তোমরা তো "সামেদুন" বা উদাসীন ? (আল্-কুরআন, সূরাহ্ নাজম, ৫৩ঃ৬০, ৬১)[৭] এ আয়াতের শেষ শব্দটি "সামেদুন"। এটি আরবী ভাষার শব্দ হলে এর অর্থ হয় উদাসীন, গাফেল, অবিবেচক, বেহুদা কাজে লিপ্ত ব্যক্তি, ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 'সামেদুন' শব্দ আরবী নয়। তাঁর মতে 'সমদ' হুমাইরী ভাষার শব্দ এবং এর অর্থ গান। 'সমদ' অর্থ গান হলে 'সামেদুন'-এর অর্থ হয় যারা গানে লিপ্ত আছে এমন ব্যক্তিবর্গ। এ আয়াতে বুঝা যায় যে, হাসা এবং গান গাওয়া জাতীয় উদাসীনতায় বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

যদি এ আয়াত দ্বারা আমরা এটা প্রমাণ করতে চাই যে, গান গাওয়া হারাম তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মেনে নিতে হবে যে, হাসা এবং উদাসীনতাও হারাম। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত কি অমূলক হবে না ?

'সমদ' বা 'সামেদুন' শব্দ আরবী ভাষার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা হুমাইরী ভাষার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এ সম্পর্কে বিতর্ক আছে। সাধারণত ভিন্ন ভাষার শব্দ আল্-কুরআনে ব্যবহৃত হতে পারে যদি আরবী ভাষায় সেরূপ অর্থজ্ঞাপক শব্দ না থাকে। কিন্তু আরবী ভাষায় গান ও সংগীত অর্থে গিনা, নাগমা, সামা, ইত্যাদি শব্দাবলী বেশ প্রচলিত আছে।

ঐ অবস্থায় কেন আমরা এ বিশেষ শব্দটি মাত্র হুমাইরী ভাষার শব্দ ধরে নিয়ে সংগীতের অবৈধতার দলীলস্বরূপ পেশ করব -তা বুঝা কষ্টকর। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংগীতের অবৈধতা প্রমাণের জন্য এ শব্দটি হুমাইরী ভাষার শব্দ বলে ব্যাখ্যা করা অপ্রয়োজনীয়।

'সামেদুন' শব্দ হুমাইরী ভাষাগত। এ সম্বন্ধে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) ব্যাখ্যা সম্পর্কে মৌলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন, "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরূপ কথা বলেন নাই– বলিলেও তা গ্রাহ্য হইতে পারে না। নাফে ইবনুল আজরকের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হুযায়ফার

www.amarboi.org

কবিতা উদ্ধৃত করিয়া উহার আরবী ভাষার শব্দ হওয়া দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছেন (দুর্‌রে মনসুর)। এ অবস্থায় তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে, উহা বিদেশী ভাষার শব্দ। তাহার পর কুরআনে বিদেশী শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া অধিকাংশ ইমাম এবং আলিম স্বীকার করেন না।"(এৎকান)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'সমদ' শব্দের অর্থ সংগীত বলেছেন। এ কথার মূলসূত্র ইকরামার বর্ণনা। ইকরামার মিথ্যা বর্ণনা দেওয়ার অভ্যাস আছে বলে দুর্নাম আছে (মিজানুল এতেদাল)। তিনি অবিশ্বাস্য বর্ণনাকারী। তিনি প্রায়ই ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা করতেন।

এতে ইবনে আব্বাস এর পুত্র আলী (রাঃ) একদিন এতো বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে বেঁধে আটকিয়ে রাখেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এ 'খবিস' (ইকরামা) আমার পিতার নামে মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে থাকে।"

সংগীত অবৈধতার তৃতীয় আয়াত : আল্-কুরআনের অপর একটি আয়াত সংগীত অবৈধতার স্বপক্ষে পেশ করা হয়। আল্লাহ্ শয়তানকে বলেছিলেন, "যাকেই পারো তোমার 'সাউত' বা স্বর দ্বারা পথভ্রষ্ট কর। সংগীত বিরোধীগণ 'সাউত' শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে 'সাউতকে' সংগীত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে শয়তানের স্বর অতি মিষ্ট। সুমধুর স্বর বা সংগীত দ্বারা শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তাই সিদ্ধান্ত হল সংগীত হারাম।

এটা অনুধাবন করা কষ্টকর যে, সংগীতের প্রতিশব্দ গিনা, নাগমা, সামা ইত্যাদি আরবী ভাষায় থাকা সত্ত্বেও কেন তা ব্যবহৃত না হয়ে এক স্থানে 'লাহও' অপর জায়গায় 'সমদ' এবং অন্যত্র 'সাউত' ব্যবহৃত হলো। আরবীতে 'সাউত'-এর প্রচলিত অর্থ স্বর।

আল্-কুরআনের অন্যত্র 'সাউত' শব্দ স্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– যেমন মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের 'সাউত' বা স্বরকে নবীর সাউতের ওপর করো না (আল-কুরআন, সুরা- হুজরা নং- ৪৯, আয়াত নং- ২)[৮]। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর 'সাউত' বা স্বর গর্দভের 'সাউত' বা স্বর (সূরা লুকমান)। হযরত আব্বাসও সাউতকে সংগীত অর্থে ব্যবহার করেন নি।

www.amarboi.org

হাদীসের আলোকে সংগীত চর্চা

সাহাবী হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "ইবলিসই প্রথম শোক গীতি গেয়েছিলো এবং গানও ইবলিসই সর্বপ্রথম গায়।" এ হাদীসে দেখা যায় যে, শোকগীতি এবং গান গাওয়া দুটোই শয়তানের নিন্দনীয় কাজ।

ইমাম আবূ হামীদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) তার রচিত সুবিখ্যাত ইয়াহ্-উল-উলুমুদ্দীন গ্রন্থে লিখেছেন-'এ হাদীসটিতে শোকগীতি এবং সাধারণ গানকে একত্র করা হয়েছে— যদিও শয়তানের শোকগীতিই শুধু বর্জনীয়। কিন্তু দাউদ (আঃ) এর গুনাহগারদের গুনাহ মাফ চাওয়ার যে শোকগীতি— তা শয়তানের শোকগীতি জাতীয় নয় এবং গর্হিতও নয়।'

"তদ্রূপ হৃদয়ে আনন্দ, দুঃখ এবং আশাকে জাগ্রত করার জন্যে যে সংগীত- তা শয়তানের সংগীতের ন্যায় বর্জনীয় নয়। কারণ হৃদয়ে হর্ষ-বিষাদ, আশা আকাঙ্খা, আনন্দ জাগ্রত করা হালাল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে দুটি বালিকার গান, বিজয় অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সম্বর্ধনাগীতি— নিষিদ্ধ সংগীতের বহির্ভূত নয়।"

হযরত আবূ উসামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস : অপর এক হাদীসে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি উচ্চস্বরে গান গাইলে আল্লাহ্ তার জন্য দুটি শয়তান পাঠিয়ে দেন। তারা গায়কের কাঁধে আসন গ্রহণ ক'রে তার বুকের ওপর পদাঘাত করতে থাকে, যতক্ষণ না সে গান থেকে বিরত হয়।"

ঐ হাদীসটি সম্পর্কে আবূ হামীদ আল-গাজ্জালী বলেন, "এ হাদীস কামোদ্দীপক সংগীত সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ঐ সংগীত শয়তানের ইচ্ছায় হৃদয়ে কামভাব সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রেম এবং কাম বাসনা উত্তেজিত করে।

কিন্তু, যে সংগীত আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা জন্মায়, সন্তান লাভ এবং প্রবাসীর প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষে গীত হয়, তা শয়তানের ইচ্ছার পরিপন্থী। ঐ সংগীত হালাল হওয়ার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সম্মুখে দুটি বালিকার গান এবং হাবশীদের গান যা সহীহ্ আল্-বুখারী এবং সহীহ্ আল মুসলিম এ উল্লেখিত হয়েছে।"(ইমাম গাজ্জালী, ইহ্ ইয়াহ্ উল-উলুমুদ্দিন)[৯]।

www.amarboi.org

নবী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস : হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গায়িকা ক্রীতদাসীর ক্রয়-বিক্রয়, মূল্য গ্রহণ এবং শিক্ষাদান হারাম করেছেন।" এ হাদীসটি কুরআনের আয়াতের পরিপূরক হিসেবে উপস্থিত করা হয়। গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় এবং শিক্ষাদান হারাম হলে সংগীত-চর্চা হারাম ধরা হয়।

ইমাম আবূ ঈছা তিরমিজী রা. এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আলী ইবনে যায়েদকে যয়ীফ বা দুর্বল মনে করেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরারও আলী ইবনে যায়েদ সম্পর্কে একই অভিমত। তিনি লিখেছেন, "এ হাদীসের রাবী আলী ইবনে যায়েদ, তাঁর উস্তাদ এবং তাঁর শাগরিদ সকলেই যয়ীফ বা দুর্বল।

এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হলেও এটি সংগীতের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে না। এ হাদীসটিতে গায়িকা ক্রীতদাসী বা "কায়না"- এর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, "কায়নার অর্থ ঐ ক্রীতদাসী যে মদের আসরে পুরুষকে গান শোনায়। নারীর যে গানের ফলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে, তা হারাম হবে। বিপদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য না থাকলেও তা বর্জনীয়।

মনিবের সামনে ক্রীতদাসীর গান ঐ হাদীস থেকে হারাম হওয়া বুঝা যায় না। অধিকন্তু, মনিব ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির সম্মুখেও ক্রীতদাসটীর গান গাওয়া হালাল, যদি তা কাওকে কুপথে চালনা না করে। এর প্রমাণ ঐ হাদীস যা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে গায়িকা দাসীর সম্বন্ধে এসেছে (আল গাজ্জালী: এহইয়াউল উলুমুদ্দীণ)[১০]।

গানের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-এর মত বিশ্লেষণ : হযরত নাফি (রাঃ) বলেছেন, "আমি একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। হঠাৎ তিনি মেষ পালকের বাঁশির সুর শুনে কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করালেন এবং ভিন্ন পথ ধরে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে নাফি, তুমি কি এখনও ঐ সুর শুনতে পাও ?" আমি বললাম, "শুনতে পাই না।" তিনি তখন কর্ণ থেকে অঙ্গুলী সরালেন এবং বললেন, "আমি রাসূল (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।"

www.amarboi.org

এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকে বলেন যে, এতে গান এবং বাঁশীর সুর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ বোঝা যায়। এ সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালী বিস্তারিত টীকা লিখেছেন। তিনি বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-এর বাঁশীর শব্দে কর্ণে আঙ্গুল দেওয়াতে গান হারাম হয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হযরত নাফি (রাঃ) কে কর্ণে আঙ্গুল দিতে বলেননি অথবা গান শুনতে নিষেধ করেন নি। তখন হয়ত গান শোনার মতো মানসিক পরিবেশ তাঁর ছিলো না। তিনি তাঁর কর্ণকে গানের সুর থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি হৃদয়কে এমন শব্দ থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন যা অপ্রয়োজনীয় চিন্তাকে জাগ্রত করে, সৎ চিন্তা এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রতিবন্ধক হয়।

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে কর্ণে আঙ্গুল দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-কে তা করতে বলেন নি। এতে সিদ্ধান্ত করা হয়ত সঙ্গত নয় যে, সংগীত হারাম। বরং, এতে এ-ও বোঝা যায় যে, যদি সঙ্গীতে হৃদয়ে অসৎ প্রভাবের সম্ভাবনা থাকে– তবে গান ত্যাগ করা কেন, অন্যান্য জিনিস ত্যাগ করাও উত্তম।

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবি জাহাবের উপঢৌকন দেওয়া নকশা খচিত পরিচ্ছদ পরিধান করে নামায পড়ছিলেন। নামাযের পরেই তিনি ঐ বস্ত্র খুলে ফেললেন, কারণ বস্ত্রের চাকচিক্য তাঁর মনকে নামায থেকে অন্যমনষ্ক করে ফেলেছিলো।

এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, নক্শা করা বস্ত্র ব্যবহার হারাম। মেষ পালকের বাঁশী শোনার সময় হয়ত তিনি আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, বাঁশীর সুর তাঁকে অন্যমনষ্ক করেছিলো যেমন নক্শা করা বস্ত্র তা করেছিলো।

আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সংগীত-চর্চা ইসলামে হারাম নয়– যদিও বিশেষ বিশেষ সংগীত হারাম করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে সংগীতের অবৈধতার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাই আলোচনা করা হয়েছে। সংগীতের বৈধতার স্বপক্ষে আরো বলিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়- আল্-কুরআনের আয়াতে, হাদীসে এবং ফকিহ্দের মতামতে।

www.amarboi.org

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও সংগীত চর্চা

হযরত আয়েশা (রাঃ) সংগীতের অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপস্থিতিতেই সংগীত-চর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হাদীস গ্রন্থগুলোতে। মিনার এক উৎসবের দিন হযরত আবূ বাকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে এসে দেখেন দুটি গায়িকা বালিকা দফ বা তাম্বুরা সঙ্গত করে গান গাইছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। তাঁর নিজের শরীরও পোশাকে আবৃত ছিল।

নবীগৃহে গান-বাজনা দেখে আবূ বাকর (রাঃ) কন্যা আয়েশাকে তিরস্কার আরম্ভ করলেন। মহানবী (সাঃ) মুখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, আবূ বাকর! ওদেরকে বিরক্ত করো না– আজ ওদের উৎসবের দিন" (বুখারী, মুসলিম)[১১]।

আর এক দিনের ঘটনা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সাঃ) গৃহে ফিরে দেখেন দুটি গায়িকা বালিকা বুয়াত দিবসের গান গাইছে। মহানবী (সাঃ) শুয়ে পড়লেন এবং অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর আমার পিতা আবূ বাক্‌র (রাঃ) ঘরে ঢুকলেন এবং বিরক্ত হয়ে আমায় তিরস্কার করে বললেন, "এ কি করে চলতে পারে ? আল্লাহ্‌র নবীর সম্মুখে শয়তানের বাঁশীর ঝঙ্কার!" আল্লাহ্‌র নবী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন "আবূ বাক্‌র! তাদেরকে তাদের কাজ করতে দাও" (মুসলিম ও বুখারী)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) একটি মেয়েকে লালন পালন করতেন। অতঃপর তাকে এক আনসারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) মেয়েটিকে তার স্বামীর গৃহে রেখে এলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মেয়েটিকে তার স্বামীর গৃহে রেখে এসেছো ?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধালেন, "তুমি কি এমন কাওকে তাদের বাড়ি পাঠিয়েছ যে গান গাইতে পারে ?" হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন "না"। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তুমি তো জানো আনসাররা অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়" (ইক্‌দ আল ফরিদ)[১২]। এ ঘটনাটির একটু ভিন্ন ধরণের বর্ণনা আছে হাদিসের কিতাব বুখারী, ইবনে হব্বান এবং ইবনে মাজাতে।

www.amarboi.org

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে অপর একদিনের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "আমার ঘরে একটি মেয়ে গান গাইতেছিল। তখন উমার ইবন খাত্তাব আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উমার (রাঃ)-এর পদধ্বনি শোনামাত্র মেয়েটি পালিয়ে গেলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃদু হাস্য করলেন। তাঁর হাস্যাবস্থায় উমার (রা.) নবীগৃহে প্রবশে করলেন।

হযরত উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কেন হাসছেন?" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "একটি মেয়ে এখানে গান গাইছিলো। কিন্তু তোমার পদধ্বনি শোনামাত্রই সে ভয়ে পালিয়ে গেলো।" উমার (রা.) বললেন, "আল্লাহ্র নবী যা শুনেছেন , তা না শোনা পর্যন্ত আমি এ গৃহ ত্যাগ করছি না।" অতঃপর মহানবী (সাঃ) মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে গান গাইতে বললেন। আর তিনি তা শুনতে লাগলেন (কাশফ-আল-মাহজুব)[১৩]।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত উমার (রাঃ) একদিন মহানবীর কক্ষেই সংগীত শ্রবণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেও সংগীতের সমঝদার ছিলেন। কান্দ নামক এক গায়ক হযরত আয়েশার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল।

কান্দ ছিল সা'দ বিন-আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর গোলাম। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। একদিন হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তার দাস কান্দকে মৃদু প্রহার করেন। তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এত ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সা'দ (রাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করেন। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) গায়ক কান্দের নিকট ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত হযরত আয়েশা সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস এর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন (ইক্দ-আল-ফরিদ)[১৪]।

মুসলিম সমাজে সংগীত-চর্চার প্রতি উদাসীনতা এবং পরবর্তীকালে বিরোধিতার একটি কারণ সংগীতের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উৎসাহের অভাব এবং হযরত আবূ বাক্র (রাঃ)-এর গভীর বিতৃষ্ণা। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে যখন গান হতো, তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খুব উৎসাহও প্রকাশ করতেন না, বাধাও দিতেন না। তিনি যে গান ঘৃণা করতেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আল্-কুরআনে সুমিষ্ট সুরের প্রশংসা আছে। আল্লাহ্র ধ্যান এবং জাতির কল্যাণে যিনি প্রতি মুহূর্ত বিভোর থাকতেন, তাঁর পক্ষে গানের সমঝদার হওয়ার মতো সময় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং খলীফাদের যুগে ছিলো না। সংগীতের প্রতি তাঁদের উদাসীনতা পরবর্তী যুগে আলিমদের সংগীত বিরোধিতার পটভূমি হিসাবে কাজ করে।

www.amarboi.org

চার খলিফার যুগে সংগীত-চর্চা

ইসলামী জীবন বিধানের প্রাথমিক যুগে এবং তৎপূর্বে প্রত্যক্ষভাবে সংগীত-চর্চা ছিলো বাইজী বা নিম্নশ্রেণীর নারীদের পেশা। সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ গান গাইতেন না। তাঁরা গান উপভোগ করতেন। তাঁরা ছিলেন গানের সমঝদার। পেশাদার দাসীরা গান গাওয়ার জন্য নিযুক্ত হতো। গায়িকারা গান গেয়ে প্রভুদের মনোরঞ্জন করতো।

পারিবারিক গায়িকা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের সৌখিন আসবাবপত্রের মত অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিলো। তখনকার গায়িকাদের না ছিল কোন ইজ্জত। আর না ছিলো কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা। গায়িকাদের বলা হতো 'কাইনা'।

'কাইনা' নামের একটা ইতিহাস আছে। আদি মানব হযরত আদম আ. এর সন্তান 'কাইন' তার ভ্রাতা আবেলকে হত্যা করেছিলো। মানব ইতিহাসে এটাই ছিলো সর্বপ্রথম নরহত্যা।

ঐতিহাসিক মাসুদী লিখেছেন যে, আরবদের ধারণা ছিলো কাইনের ছেলে 'জুবাইল' প্রথম সংগীত রচনা করেন। ঐ সংগীত ছিলো মৃত্যু সম্পর্কীয় শোকগাথা। কাইনের কন্যারা বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করে। তারা গানের ভক্ত ছিলো। সেই থেকেই গায়িকাদের বলা হয় 'কায়না বা কাইনা'।

কাইন সন্তানদের প্রতি মানব জাতির পিতা আদমের বংশধরদের মনোভাব শুভেচ্ছামূলক ছিলো না। তাদের আচার-আচরণ এবং রীতিনীতি কখনই বনি আদম নেক নজরে দেখেনি। কাইন কন্যাদের সংগীত-চর্চাকেও তারা প্রশংসনীয় মনে করেন নি বরং পরবর্তীকালে গায়িকাদের কাইন বা বাইজী নাম দিয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সর্ব নিম্ন স্তরে স্থান দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেছেন, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর আরবদের পেশা ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্যবীর্যমূলক কাজ, শাসনকার্য পরিচালনা, ইত্যাদি। বিশেষ সামাজিক মূল্যবোধের জন্য সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেনীর লোকদের সংগীত শিক্ষার আগ্রহ ছিলো না। তাঁরা মনে করতেন সংগীত-চর্চা মাওলাদের বা দাসদের পেশা। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের বলা হতো মাওয়ালী (মাওলার বহুবচন)।

১ম খলিফা আবূ বাকর (রাঃ) : হযরত আবূ বাকর (রাঃ) সংগীত-চর্চা পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে সংগীত-চর্চা অতি অপাঙতেয় পেশা ছিল। তিনি মনে করতেন যে- মদিরার নেশায় মানুষ যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তেমনি গানের আবেশেও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।। সংগীতের সমঝদার হয়ে পড়ে

www.amarboi.org

আরামপ্রিয় এবং বিলাসী। গান-বাজনাকে ধরা হতো মালাহী বা নিষিদ্ধ আনন্দের মধ্যে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে গায়িকারা সরাইখানা বা প্রকাশ্য স্থানে গান বাজনা করে পথিক এবং সমঝদারদের আনন্দ-বর্ধন করতো। গান-বাজনার সাথে সাথে নানা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোও অবর্তমান ছিলো না।

গায়িকাদের অপর নাম ছিলো মুসান্নিয়া। যারা সান্‌জ নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতো তাদেরকে বলা হতো সান্নাজা এবং যে সব গায়িকা জামর বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতো তাদেরকে বলা হতো জাম্মারা। যদিও মুসান্নিয়া, সান্নাজা, জাম্মারা– এ শব্দগুলোতে আপত্তিকর কিছু নেই, তবুও সম্ভ্রান্ত ঘরের গায়িকাকে মুসান্নিয়া বা সন্নাজা বলে পরিচয় দিলে তারা অপমান বোধ করতো। কারণ মুসান্নিয়াগণ কেবলমাত্র গান গেয়ে বাজনা বাজিয়েই আনন্দ দিত না, তারা দেহ দান করতেও কুণ্ঠিত হত না।

হযরত আবূ বাকর (রাঃ)-এর আমলে সরাইখানা ইত্যাদিতে পথিকদের আনন্দ বর্ধনের জন্য গান-বজনার রীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তবে বিত্তবান সম্ভ্রান্ত লোকদের পারিবারিক গায়িকা (কাইনা বা কিয়ান) রাখা নিষিদ্ধ হয়েছিলো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

২য় খলিফা উমার (রাঃ) : সংগীত-চর্চা সম্বন্ধে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাঃ)-এর মনোভাব হযরত আবূ বাকরের ন্যায় কঠোর ছিলো না। ইসলামের অনুশাসনগুলোর প্রতিপালনে হযরত উমার (রাঃ) অতি মাত্রায় সজাগ ছিলেন। এই ন্যায়নিষ্ঠ শাসক উমার (রাঃ) ধর্মপথভ্রষ্টদের কঠোর শাস্তি দিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

মদ্যপানের অপরাধের জন্য খলিফা উমার (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবূ শামাকে কষাঘাতের শাস্তি দেন এবং নিজেই সেই শাস্তি কার্যকরী করেন। নির্দিষ্টসংখ্যক কষাঘাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর পুত্র মৃত্যুবরণ করেন। খলীফা অবশিষ্ট সংখ্যক চাবুকাঘাত মৃত পুত্রের কবরের ওপর দিয়ে কর্তব্য সমাধা করেন।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংগীত-চর্চাকে মদ্যপান এবং নৈতিক ভ্রষ্টতার সমতুল্য বর্ণনা করেছেন। ওটাই যদি মহানবী (সাঃ) এর অভিমত হতো, তবে হযরত উমার (রাঃ) নিশ্চয়ই অবহিত থাকতেন এবং এ বিষয়েও তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

ইবনে হিশামের বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর পুত্র আসীম সংগীতের বড় ভক্ত ছিলেন, অথচ হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে তা হতে নিবৃত্ত করেন নি (ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা- ৭৮২)[১৫]।

www.amarboi.org

একদিন আসীম (রাঃ) অপর এক ব্যক্তিসহ নুসব জাতীয় গান গাইতেছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) তা শুনতে পেয়ে আসীমকে গর্দভ বলে মন্তব্য করেন (ইক্দ আল-ফরিদ)।

'নুসব' শব্দের অর্থ পাথর। নুসব পাথরের ওপর লাত দেবীর উদ্দেশ্যে মানত করা হতো। অনেকের মতে নুসব সংগীতের উৎস ছিল লাত দেবীর উদ্দেশ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠান। পরে তা কাফেলা সংগীতের রূপ পরিগ্রহ করে।

ওপরে বর্ণিত ঘটনাটি হতে দেখা যায় যে, হযরত উমার (রাঃ) আসীমের নুসব সংগীত-চর্চা পছন্দ করেন নি। কিন্তু তা যদি ইসলাম-বিগর্হিত হতো– তবে তিনি পুত্রকে শুধু গর্দভ বলেই ক্ষান্ত হতেন না। স্বীয় আবূ শামার ন্যায় কঠোর শাস্তি দিতেন যদি সংগীত-চর্চা মদ্যপানের ন্যায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো।

ইবনে দুরাইদ্ (ইশতিকাত) ইবনে হাজরের বর্ণনায় দেখা যায়– হযরত উমার (রাঃ) কবিতা রচনা করতেন, যদিও তিনি অতি উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন না। অনেক স্থানে কবিতা এবং গানের মধ্যে প্রাচীর অতি ক্ষীন। বেসুরো কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি হযরত উমার (রাঃ) মোটেই পছন্দ করতেন না।

একদিন হযরত উমার (রাঃ) কয়েকজন দাসী গায়িকাকে ডুফুক (Tambourine) নামক যন্ত্র সহযোগে গান গাইতে শোনেন। তারা গাইছিল "জীবন শুধু ভোগের জন্য।" হযরত উমার (রাঃ) তাদেরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং ক্ষুদ্র লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিলেন (ইবন আল ফকিহ্)।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, হযরত উমার (রাঃ) কি গানটির জন্য অথবা গানের ভাবের জন্য শাস্তি প্রদান করেছিলেন ? অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত উমার (রাঃ) একদিন ডুফুক বা তাম্বুরার যন্ত্রের সুর শুনতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– এটা কি উপলক্ষে বাজানো হচ্ছে ? তাঁকে বলা হলো যে, এটা খত্নার (ত্বকচ্ছেদ) আনন্দোৎসব। এটা শোনার পর তিনি আর কিছু বলেন নি।

হযরত উমার (রাঃ)-এর আমলে আল-নুমান ছিলেন মায়মন প্রদেশের শাসনকর্তা। তিনি সংগীত-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হযরত উমার (রাঃ)-এর পক্ষে এটা জানা অস্বাভাবিক ছিলো না। (ইবনে সা'দ ঃ তাবাকাত আল-কবির)।

৩য় খলিফা উসমান (রাঃ) : হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন বা উন্নয়ন সাধিত হয়। হযরত উমার (রাঃ) মক্কা ও মদীনাবাসীদের অন্যত্র বসাবাস করার অনুমতি দিতেন না। হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মহানবীর সাহাবাদের মদীনাতেই

www.amarboi.org

থাকতে হতো। সাহাবীদের ইচ্ছামত জমি ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়নি।

হযরত উসমান (রাঃ) পূর্ববর্তী খলীফার বিধি-নিষেধ তুলে দেন। তাতে বিত্তশালীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার লাভ করেন। তাঁরা ইচ্ছামত গনিমত হিসাবে প্রাপ্য অর্থ সম্পদ দিয়ে জমিজমা ক্রয়ের সুযোগ নিতেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর এ ব্যবস্থায় ভূস্বামীর সৃষ্টি হলো। অর্থশালীরা বিভিন্ন অঞ্চলে জমি ক্রয় করে জমিদার হয়ে বসেন। ফলে সামাজিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আসে।

বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে প্রচুর বিত্ত-সম্পদ মদীনায় আসতে শুরু করে। অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরাম-আয়েশ এবং বিলাসের দিকে বিত্তশালীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। পারিবারিক গায়িকা রাখা অনেকের নিকট সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। গান-বাজনা সংগীত-চর্চা সামাজিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে।

পূর্ববর্তী যুগে সংগীত-চর্চার প্রতি যেটুকু বিধি-নিষেধ ছিল, নয়া সামাজিক পরিস্থিতিতে তা শিথিল হয়ে পড়ে। যদিও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং প্রতিবাদ করেন। কিন্তু নয়া সামাজিক গতিধারা রোধ করতে তারা পারেন নি।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর গান পরিত্যাগ : হযরত উসমান (রাঃ) বলেছেন, "যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে মিথ্যা কথা বলিনি, গান গাইনি এবং পুরুষাঙ্গ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করিনি" (লিসানুল আরব)। এ হাদীসের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হামিদ গাজ্জালী (রাঃ) বলেন, মিথ্যা কথা বলা অবশ্যই হারাম স্বীকার করি। কিন্তু পুরুষাঙ্গ ডান হাত দ্বারা ধরা হারাম এ কোথা থেকে পাওয়া গেলো ? হযরত উসমান (রাঃ) যে পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা এবং গান গাওয়া হারাম মনে করেই করেছিলেন এটা কিভাবে নির্ধারণ করা যায়?"

তিনি হয়ত ব্যক্তিগত রুচির জন্য পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা ত্যাগ করেছিলেন, তা হারাম বলে নয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর গান ত্যাগ করা বা পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরা থেকে এগুলো হারাম, তাও সিদ্ধান্ত করা যায় না। আমরা এগুলোকে প্রশংসনীয় আমল নয় বলে ধরে নিতে পারি।

৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) : হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন অতি উচ্চস্তরের কবি। সংগীত-চর্চার প্রতি তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের চেয়ে অধিকতর

www.amarboi.org

উদার ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে কবিগণ সংগীতের ন্যায় ললিতকলার প্রতি সহানুভূতিশীল। হযরত আলী (রাঃ) এ সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ছিলেন না।

প্রাথমিক যুগে সমাজের প্রভাবশালী অনেকেই সংগীত-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), আয়েশা বিনতে সা'দ, তালহা (রাঃ)-এর কন্যা আয়েশা, হযরত আলী পুত্র হুসাইন শহীদ (রাঃ)-এর কন্যা সুকাইনী এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ) সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের অনেকের বাসস্থানে সাপ্তাহিক সংগীতের আসর বসতো। আল-মাসুদী লিখেছেন যে, তখনকার প্রতিপত্তিশালী সামাজিক নেতাদের বাড়ীতে একাধিক গায়িকা থাকতো। তাঁরা পেশাদার সংগীতজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

খিলাফতের যুগের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগণ

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কয়েকজন প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়। 'কিতাবুল আগানীতে (গানের কিতাব) বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের সম্বন্ধে চমকপ্রদ আলোচনা আছে। লোকসংগীত, কবিতা, প্রভৃতির মাধ্যমে সংগীতজ্ঞদেরকে স্মরণীয় করার প্রচেষ্টা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর পূর্বে সংগীত-চর্চা তৎকালীন গায়িকা এবং দাসী নারীদের পেশা ছিল। সেকালে পুরুষেরা সঙ্গীত-চর্চাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেনি। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের আমলেই মদীনার পেশাদারী পুরুষ সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়। আর সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার 'তুয়াইস' লালিত-পালিত হয়েছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর পরিবারেই।

তুয়াইস : সংগীতজ্ঞ তুয়াইসকে লালন-পালন করেন হযরত উসমান (রাঃ) এর মাতা আরওয়া। তুয়াইস -এর জন্ম হয় মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের বছর। তুয়াইস-এর পুরো নাম আবু আবদ আল-মুনীম ইসা ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-দাইব তুয়াইস। তিনি ছিলেন মদীনার বনু মাখযুম গোত্রের সন্তান।

সংগীত চর্চার প্রতি যে চিরাচরিত বিধি-নিষেধ ইসলাম-পূর্ব যুগ হতে চলে আসছিল– তার প্রভাব তখনও দূর হয়নি। পুরুষ সংগীতজ্ঞদেরকে বলা হতো 'মুখান্নাস'। এরা হাত রাঙাতো এবং নারীদের চালচলন এবং আচার অনুকরণ করতো। নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা তাদের প্রতি ছিলেন বিরূপ। কারণ, পুরুষদের নারীবেশ অনুকরণ নিষিদ্ধ ছিলো।

www.amarboi.org

মারওয়ান বিন হাকাম : খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সংগীত-চর্চা পছন্দ করতেন না। নারীসুলভ মুখান্নাসদের তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন।

আমীর মারওয়ান ঘোষণা করেন যে, যারা মুখান্নাসদের তাঁর হস্তে অর্পণ করতে পারবে, তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

আল-নাগাদি নামক একজন মুখান্নাসকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় (ইক্‌দ-আল-ফরিদ)[১৬]। এ কারণে তুয়াইস ভয় পেয়ে সিরিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

তুয়াইস এর সংগীত প্রকরণে পারসিক প্রভাব ছিল প্রবল। বস্তুত তাঁর সংগীত সাধনা আরম্ভ হয় পারসিকদের নিকট। তখনকার দিনে যুদ্ধবন্দীদের বিভিন্ন সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হতো। পারসিক যুদ্ধ-বন্দীদের ভেতরে কয়েকজন গায়ক ছিল। তারা মধুর কণ্ঠে গান গাইত। তুয়াইসের ওপর এর প্রভাব পড়ে এবং তিনি তাদের কাছে থেকে সংগীত শিক্ষা করেন।

তুয়াইস যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন, তার মধ্যে দফ (এক জাতীয় তাম্বুরা) ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হাযাজ' নামীয় সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিলো। তুয়াইসের কয়েকজন শিষ্য পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

আজ্জা আল-মাইলা : আজ্জা আল-মাইলা নামক আর একজন মহিলা সংগীত শিল্পী হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রিয় কবি হাসান বিন সাবেত তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সাহাবী হাসান বিন সাবেত (রাঃ) আজ্জা আল-মাইলা এর সংগীতের আসরে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। সুরকার তুয়াইসকেও দেখা যেত ঐ আসরে।

আজ্জা আল-মাইলার জলসায় বহু লোকের সমবেত হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল তাঁর দৈহিক রূপ লাবণ্য। সংগীতের আসরে পূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা হতো। যেহেতু বহু লোক জমায়েত হতো, সেজন্য শালীনতা রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এবং ব্যবস্থা ছিলো। বেত হাতে নিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ বসে থাকতেন। শালীনতা বিরোধী কোনো অঙ্গভঙ্গী অথবা মন্তব্য করা হলে– সঙ্গে সঙ্গেই সে সব লোককে বেত্রাঘাত করে মজলিস থেকে বের করে দেওয়া হতো (আবুল ফারাজ উস্পাহানী, কিতাবুল আঘানী)[১৭]।

তুয়াইসের মতে আজ্জা ছিল সংগীতজ্ঞদের মধ্যে রাণীতুল্য। আজ্জা সংগীত শিক্ষা করেন রাইফা, নাসিথ, সাইব কাসির, প্রমুখ সংগীতজ্ঞের নিকট। তিনি যে

www.amarboi.org

সমস্ত বাদ্যযন্ত্র করতেন তার মধ্যে প্রধান ছিল মিজাফা (পিয়ানোর মত আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট বাদ্যযন্ত্র) মিজমার (এক প্রকার বাঁশি)। এর মধ্যস্থলে চামড়া লাগানো থাকতো। পরবর্তীকালে তিনি উদ (এটাও এক প্রকার বাঁশী– কাঠের নির্মিত) বাজানোতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

নাসিথ ইরানী : নাসিথ ইরানী নামক আর একজন সংগীতজ্ঞ বেশ সুনাম অর্জন করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ)-এর দাস ছিলেন। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। নাসিথ পারসিক যুদ্ধবন্দী ছিলেন। তিনি পারসিক সংগীত গেয়ে মদীনার লোকদের মাতিয়ে তোলেন। পরে তিনি সাইব কাসিরের নিকট আরবীয় সংগীত শিক্ষা করেন। তাঁর প্রভাবে পারস্য সংগীত মদীনায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আহমদ আল-নাসিবী : আহমদ আল-নাসিবী একজন বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা ছিলেন। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর আমলে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। কবি আস-হামদান-রচিত সঙ্গীতে তিনি সুর দিতেন। আস-হামদানের রচিত গান গেয়ে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাম্বুরা ব্যবহারে নাসিবী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নুসব, কারওয়াঁ সংগীত তার খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কুফার শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ উল্লেখযোগ্য।

সাইব কাসির : সাইব কাসির সমকালীন সংগীতজ্ঞের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁর পুরা নাম আবূ জাফর সাইব ইবনে কাসির। তিনি পারস্য হতে আগত যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে আযাদ করে দেওয়া হয়। তিনি মদীনায় সংগীত শিক্ষা করেন।

প্রথমত সাইব কাসির গায়িকাদের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। প্রতি সপ্তাহে গানের মজলিস বসতো। সেই সংগীত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে তিনি সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে তিনি খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেন। বলা হয়–তিনিই প্রথম সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ) সাইব কাসিরের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। খলীফা মুয়াবিয়া (রাঃ) সংগীতচর্চা পছন্দ করতেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ) সাইব কাসিরকে নিয়ে হযরত মুয়াবিয়ার (প্রথম) দরবারে যান এবং তাঁকে কবি বলে পরিচয় দেন। সাইব কাসির গান গেয়ে দরবার তন্ময় করে তোলেন।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাঃ) খলীফাকে বলেন যে, এটা গান নয়, সুরযুক্ত পদ্য। খলীফা মুয়াবীয়া সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উপহার প্রদান করেন।

সাইব কাসির অতি উচ্চ স্তরের শিল্পী ছিলেন। তিনি 'থাকিল আওয়াল' নামক ছন্দের প্রবর্তন করেন। সংগীতকে তিনি অতি উন্নত ললীতকলার স্তরে উন্নীত করেন। তাঁর পূর্বে এরূপ নিখুঁত ছন্দোময় সংগীত অপরকেও চর্চা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

সমকালীন অপরাপর বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের মধ্যে হুনাইন আল হিরি, ইবনে সুরাইজ, কান্দ, ফিন্দ, আল দালাল, নাকিদ, বুদাই, আস-সালিহ্, জামিলা, মাবাদ, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

খিলাফতের যুগে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সংগীত জনপ্রিয় ছিলো। তখনকার দিনে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য ঃ উদ, মিজহার (সেতার জাতীয় যন্ত্র), তানবুর (Pandore), জাঙ্ক (Harp), মিজাফা (Psaltery), মিজাফ (Barbiton), কাসাবা (Vertical instrument), বুক (Horn clarion), মিজমার (Reed), দফ (Tambourine) ইত্যাদি।

খিলাফতের যুগে সংগীত প্রকরণ

প্রাথমিক যুগের সংগীত শিল্প হিসাবে খুব উন্নত মানের ছিল না। যেহেতু সংগীত মাওয়ালী বা নিম্নশ্রেনীর মাওলাদের (দাসদের) পেশা ছিল, তাই সম্ভ্রান্ত লোকগণ এ দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের উন্নত নগরীগুলো মুসলিম খিলাফতের অধীনে আসার পর সংগীতের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন হয়।

প্রাথমিক যুগে মুসলিমগণ রাজ্য বিস্তার এবং ইসলামের প্রসারের কাজেই মগ্ন ছিলেন। পারস্য এবং রোমক সাম্রাজ্যের বিপুল অংশ বিজিত হওয়ার পর স্থানীয় কৃষ্টি এবং সভ্যতার প্রভাব আরবদের ওপর পড়ে। পারসিকদের সংগীত সাধনা আরবদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাতে ক্রমশ সংগীত শিল্পের উন্নতি হতে থাকে।

গিনা-সংগীত : গানের আরবী প্রতিশব্দ 'গিনা', সামা ইত্যাদি। গায়ক এবং গায়িকাকে বলা হয় মুগান এবং মুগান্নি। 'তারাব' শব্দের অর্থও গান বা সংগীত।

www.amarboi.org

সে হিসেবে গায়ককে বলা হয় মুতরিব। লাহ্ও বলতে গান বোঝায়। গানের জন্য 'সাউত' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। তবে এটা সাধারণত কণ্ঠসংগীত বলে পরিগণিত হয়। 'নাগমা' শব্দটিও গানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুরের (Melody) আরবী প্রতিশব্দ 'লাহন'। উচ্চাঙ্গের সংগীতের জন্য লাহনের কতগুলো মান আছে। ওগুলোকে বলা হয় আসবা (বহুবচনে আসাবি)।

হাদা সংগীত : পৌত্তলিকতার যুগে হাদা বা কারওয়াঁর সংগীতর বহুল প্রচলন ছিল। একে রাকবানীও (আরোহী সংগীত) বলা হতো। উট চালনাকালে হাদা সংগীত গাওয়া হতো। গানের সুরে উটের চলার গতি বেড়ে যেত। শুধু মানুষ নয়, মনে হয় আরব উটও গানের সমঝদার ছিল। পরবর্তী সময় হাদা সংগীতের উন্নত প্রকরণে নুসব সংগীতের প্রবর্তন হয়। নুসব সংগীত সাময়িক উত্তেজনার কাজ করত। গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উটগুলো অধিকতর দ্রুত চলতে আরম্ভ করত।

নুসব সংগীত : আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে আঞ্জামা এবং বারা ইবনে মালিক মহানবী (সাঃ) এর সফরকালে হাদা সংগীত পরিবেশন করতেন। হাদা হতে নুসব সংগীতের আর একটি পার্থক্য এলহান মাউজুনা (measured melodies). হাদা সংগীতের সুরের মধ্যে পরিমিতি সংযমের অভাব থাকতো। কিন্তু নুসব তদ্রূপ ছিল না।

খিলাফতে রাশেদীনের শেষ দিকে সংগীতের যান্ত্রিক কলা-কৌশলের উন্নতি এবং পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত গানের মধ্যে ঈক (rhythm) ছিল না। কবিতার মধ্যে যে ছন্দ (metre) থাকে, গানের মধ্যেও তা-ই ছিল।

তুরাইস : আবুল ফারাজ ইসফাহানী রচিত 'কিতাবুল আগানী' অনুসারে দেখা যায় সুরকার তুরাইসই সর্বপ্রথম গানের মধ্যে ঐক্য বা তাল এবং লয়-এর প্রবর্তন করেন। এ সময় যে উন্নত তাল, লয় সংযোগে গীত গানের প্রচলন হয় তাকে বলা হতো 'গিনা' আল-মুকতান (artistic song). এর প্রবর্তক ছিলেন সুরকার তুয়াইস।

আরবদেশে তখন গানের তিনটি প্রধান আউজ্জহ (Style) বা প্রকরণ ছিল– **নুসব, হাযাজ, সিনাদ**। সিনাদ ছিলো উচ্চাঙ্গের সংগীত। হাযাজ অনেকটা লঘুতর আবেদনমূলক সংগীত। সিনাদ এবং হাযাজ জাতীয় সঙ্গীতেই ঈকার (rhythm) প্রয়োগ হয়।

www.amarboi.org

গিনা আল মুত্তাকী : এ সময় আরও কয়েকটি সুরের প্রবর্তন হয়। তার মধ্যে কোন সুরটি কে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। গিনা আল-মুত্তাকি এক প্রকার সুরপ্রধান গান (rhythmic song). ধরা হয় যে, আজ্জা আল-মাইলা এটা আবিষ্কার করেন।

থাকিল আউয়াল : সাইব কাসির যে সুর (rhythm) সৃষ্টি করেন তার নাম 'থাকিল আউয়াল।' শিল্প-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে এটি ছিল অতুলনীয়। এই বিশিষ্ট সুরটি ওটার প্রবর্তকের সুর প্রকরণ সম্বন্ধে অগাধ পান্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

তুরাইস আর একটি সুর সৃষ্টি করেন। তার নাম গিনা আল-রাফিক (graceful music). এটা যদিও গিনা আল মুতকান বা খাকিল আউয়ালের ন্যায় শিল্পসঙ্গত (artistic) নয়, তবু সাধারণত শ্রোতাদের নিকট এর আবেদন ছিলো অত্যধিক।

খিলাফতের আমলে বা তৎপরবর্তী যুগে সংগীত-চর্চার ইতিহাসের জন্য মাল-মসলার অভাব নেই। সে যুগে সংগীতজ্ঞগণ শুধুমাত্র ব্যবহারিক দিকেই উৎসাহী ছিলেন না, তাঁরা সংগীতকলা এবং সংগীত-বিজ্ঞানের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

ইমামদের দৃষ্টিতে সংগীত-চর্চা

সুন্নী মাযহাবের চারজন ইমাম সংগীতের বৈধতা সম্বন্ধে একমত ছিলেন না। বিশেষত ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) সঙ্গীতের প্রতি বিরূপ ছিলেন। অন্যদিকে অপর দু'জন ইমাম– আবূ হানীফা (রাঃ) এবং ইমাম মালিক বিন আনাস (রাঃ) খানিকটা ভিন্ন মত পোষণ করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) : চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)-এর সংগীত সম্বন্ধে মতামত অধিকতর ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) সংগীত সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। "আদাবুল কাজারে" তিনি লিখেছেন, "সংগীত চর্চা মাকরূহ্, কারণ তা বাতিলের অনুরূপ। যা বাতিল তা অকেজো এবং অপ্রয়োজনীয়। যে সংগীত-চর্চায় ডুবে আছে– সে অজ্ঞ এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।"

কাজী তাইয়েব লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তার দাসী বালিকার গান শ্রবণ করার জন্যে লোক জমায়েত করে– সে মূর্খ।

www.amarboi.org

তার সাক্ষ্য গ্রহনীয় নয়। বেত বা দন্ড দিয়ে আঘাত করে রাগ-রাগিণী উৎপাদন করা মাকরূহ। জিন্দিকগণ লোকজনকে আল্লাহ্র পথ সরিয়ে নেওয়ার জন্যে তা করতো। তিনি মনে করতেন যে, সুরুচি সম্পন্ন ধার্মিক লোকদের জন্য সংগীত অপাঙতেয়।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) উট চালকদের হাদা বা কারাজ সংগীত বৈধ মনে করতেন। তা ছাড়া বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করে যে সমস্ত গান গাওয়া হয়– ওগুলো নিষিদ্ধ মনে করতেন। কতকগুলো বাদ্যযন্ত্র যেমন উদ, সান্জ, নায়াল, ইরাকী বারবাত, রাবাব ইত্যাদি শাফেয়ী (রাঃ) শরাহ অনুসারে নিষিদ্ধ এবং এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র কেও ভেঙ্গে ফেললে তিনি আইনত দন্ডনীয় হবেন না। কারণ এগুলোর সম্পদ হিসেবে কোনো মূল্য নেই (আল নামায়ি, পৃষ্ঠা- ২০০)।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)-এর অভিমত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে মহাজ্ঞানী ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) অন্যতম। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) অবশ্য কোথাও সংগীতকে হারাম ঘোষণা করেন নি। তবুও তাঁর বলার ভঙ্গীতে মনে হয় তিনি সংগীত মোটেই পছন্দ করতেন না। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেছেন যে, সংগীত বাতিলের অনুরূপ। সুতরাং তা মাকরূহ।

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী : ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) বলেন যে, যা বাতিল বা অপ্রয়োজনীয়– তা স্বভাবতই নিষিদ্ধ হতে পারে না। তিনি আবিসিনিয়ানদের নাঁচ এবং গানের উপমা দিয়ে বলেন যে, এগুলো ছিল বাতিল। কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) নিজে তা উপভোগ করেছিলেন এবং এগুলো মাকরূহ বলে ঘোষণা করেন নি।

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) লিখেছেন, "যা অপ্রয়োজনীয় এবং যা থেকে কোনো কল্যাণই সাধিত হয় না, এবং কারো জন্যে ক্ষতিকর নয়- এরূপ এবং অনুরূপ কিছুর জন্যে আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তিকেই কোনো শাস্তি দেবেন না। যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি যদি দিনের মধ্যে একশ বার মাথা স্পর্শ করার অভ্যাস করে নেয়, তবে তা হবে অপ্রয়োজনীয় বা বাতিল কাজ। কিন্তু, তাই বলে তা হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না।"

আল্লাহু তা'য়ালা বলেন যে "তিনি কথার মধ্যে অর্থহীন কসম করার জন্যে কাওকে শাস্তি দেবেন না। যদি কেও আল্লাহ্র নামে কসম করে যে, সে একটি নির্দিষ্ট কাজ করবে, কিন্তু তাতে দৃঢ় থাকতে পারে না– তার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না, যদি সে কাজ না করা শরীয়ত বিরোধী না হয় এবং তা না করলে কারো ক্ষতি না হয়। "

www.amarboi.org

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) যুক্তি দেখিয়ে বলেন "যদি কেও আল্লাহ্‌র নামে বাতিল বা অপ্রয়োজনীয় কসম করে, তা পালন না করলেও শাস্তি না পায়, তবে কেন কোনো ব্যক্তি গান, বাজনা, নাঁচ এবং কবিতা-চর্চা করলে শাস্তি পাবে, যদি এ সমস্ত কাজ বাতিল বা বাতিলের অনুরূপ হয় ?"

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী আরো লিখেছেন, "ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) লিখেছেন যে, গান বাতিল বা মূল্যহীনের অনুরূপ। এখানে বাতিল হলো হারামের নিকটবর্তী এ অর্থে হয়ত ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা সংগীত-চর্চাকে হারাম মনে করতে পারতাম যদি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে বলতেন যে, সংগীত-চর্চা বাতিল অথবা হারাম। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বাতিল না বলে বলেছেন বাতিলের অনুরূপ।

বাতিল অর্থ যা থেকে কোনো উপকার আসে না। যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট বলে, "আমি আমাকে তোমার কাছে বিক্রয় করলাম" এবং স্ত্রী বলে, "আমি তোমাকে ক্রয় করলাম" এই সমস্ত কথা বাতিল বা অর্থহীন। এগুলোর উদ্দেশ্য কৌতুক এবং আনন্দ। এ ধরণের কথা হারাম নয়।

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী লিখেছেন, "ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) মনে করেন সংগীত-চর্চা মাকরূহ। তিনি তো অনেক কিছুকে মাকরূহ বলেছেন, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে করেছেন বা উপভোগ করেছেন। তিনি বলেছেন সব রকমের খেলাধুলা মাকরূহ। কারণ, তাঁর ধারণা খেলা-ধুলা ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী এবং রুচিসম্পন্ন লোকদের জন্য নয়। এ ধরণের কথা তাঁর নিজস্ব রুচি এবং অভিমত ব্যক্ত করে।

আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে আবিসিনিয়াদের খেলা এবং নাঁচ দেখেছেন। তবুও ইমাম শাফেয়ীর ধারণা খেলাধুলা মাকরূহ এবং ধার্মিক ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য নয়।" ইমাম আবূ আল-গাজ্জালী (রাঃ) আরও লিখেছেন, "যখন ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) লিখেছেন সংগীত-চর্চা মাকরূহ– তখন তিনি হয়ত প্রকৃতপক্ষে মাকরূহ তানজিহি-ই ধরেছেন যা হালালের নিকটবর্তী, কিন্তু মাকরূহ তাহ্‌রিমা নয়"।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)-এর অভিমত ছিল যে সংগীতজ্ঞের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই তা মেনে নিতে পারেন নি। ইসলামের আইন শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন ফকিহগণ নিজস্ব বুদ্ধি এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং ধারণার ওপর ভিত্তি করে। আইন শাস্ত্রের সব কথাই আল্-কুরআন বা হাদীসভিত্তিক নয়।

www.amarboi.org

আল্-কুরআন, হাদীস এবং ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই অবশ্য আইনশাস্ত্র রচিত হয়েছে। যেখানে কুরআন এবং হাদীসে কিছু পাওয়া যায়নি, সেখানে ফকিহদের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে।

ইসলামী সাক্ষ্য আইন অতি মাত্রায় বিশেষত্বপূর্ণ। ফকিহগণ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সুক্ষাতিসূক্ষ্ম সাক্ষ্য আইনের ব্যবস্থা করেছেন। কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হতো না– যদি বিচারক সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারতেন যে, সাক্ষ্য দানকারী অতি উচ্চ নৈতিক মানের। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কার্যের ফলে সাক্ষ্যদানের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়, তবে তা হতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে কাজটি অবশ্যই অনৈসলামিক হবে।

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি বাজারে কিছু কিনে– সেখানে তা খায়, তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। তৎকালে আরবগণ বাড়ীর বাইরে কিছু খাওয়া পছন্দ করতেন না। শরীফ বা ভদ্রলোকগণ বাজারে বা দোকানে কোনো কিছু খাওয়া শরাফতির বরখেলাপ মনে করতেন। আজকাল আমরা দেখি হোটেল রেস্তোরাঁতে ভদ্রলোকেরা প্রায়ই আহার-বিহার করেন।

আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী বলেন, যদিও বাজারে কিছু খেলে ঐ ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীর মতে সাক্ষ্য দানের অনুপযুক্ত হয়, তা সত্ত্বেও বাজারে খাওয়া দাওয়া করা অবশ্যই হালাল। অবশ্য সুরুচি সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা তা করেন না।

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী মনে করেন, সংগীতজ্ঞের সাক্ষ্য গ্রহণের অযোগ্য হওয়ার তেমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সংগীত-চর্চাকারীর প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায় না। তার সাক্ষ্য মূল্যহীন হতে পারে না। পেশাগত গায়ককে কৃষ্টিহীন মনে করা বা তাদের ওপর মূর্খতা বা অর্বাচীনতার দোষ চাপিয়ে দেওয়া ভুল, যা ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) করেছেন।

উপরের আলোচনা হতে মনে হয় যদিও ইমাম শাফেয়ী সংগীত-চর্চা পছন্দ করেন নি, তিনি তা নিষিদ্ধও ঘোষণা করেন নি। মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন যে, অনেক কিতাবে উল্লেখ আছে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) নিজেই সংগীত উপভোগ করেছিলেন (আজাকির আলী কারী, আবদুল গনী নাবলাসী, ইত্যাদি)[২২]।

ইমাম ইউনুস বিন আবুল আলা (রাঃ) ইমাম শাফেয়ীকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন মদীনাবাসীদের জন্য সংগীত হালাল কিনা। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)

www.amarboi.org

বলেছিলেন, আমি হেজাজের কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি সম্বন্ধে অবহিত নই, যিনি সংগীত মাকরূহ মনে করেছেন (ইয়াহ্ ইয়া আল-উলুমুদ্দিন)[১৮]।

ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) : কাজী আবূ তাইয়েব তিববী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) সংগীত সম্বন্ধে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা থেকে মনে হয় তিনি সংগীত পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিপরীত ধারণাও পাওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) মনে করতেন সংগীতযন্ত্র নষ্ট করলে বা চুরি করলে তা অপরাধ হবে না। কারণ, এগুলো মূল্যহীন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) তা মনে করতেন না।

বর্ণিত আছে যে, প্রতি রাতে ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) এক প্রতিবেশীর গান শুনতেন (তাজকেরাতুল হামদাভিয়া)। সংগীতজ্ঞ ইমাম আহমদ ইবনে আবদে রাব্বিহী লিখেছেন– আবূ হানীফা (রাঃ) একবার তাঁর প্রতিবেশী সংগীতজ্ঞ আমরকে জামিনে নিয়ে আসেন, যেহেতু তিনি গায়ক আমরের সুমধুর স্বর শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন (ইবন রাব্বিহী, ইক্দ-আল ফরিদ ঃ ৩, ১৮১)[১৯]।

আল্লামা আবদুল গনি নাবলাশী হানাফীও ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন। এক রাতে ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) তাঁর প্রতিবেশী গায়ক আমরের কণ্ঠস্বর শুনতে পান নি। তিনি প্রতিবেশীর খোঁজে বের হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, কুফা নগরীর আমির আইনী গায়ক আমরকে বন্দী করেছেন।

আবূ হানীফা (রাঃ) আমীর আইনীর কাছে গেলেন এবং প্রতিবেশীর মুক্তির জন্য অনুরোধ করলেন। আমীর আইনী সংগীতজ্ঞ আমরকে মুক্তি দিতে রাজী হলেন এবং মুক্তির আদেশ দিলেন। কিন্তু দেখা গেল– আমর নামে একাধিক কয়েদী আছে। আমীর হতবুদ্ধি হয়ে স্থির করলেন যে, খ্যাতনামা ফাকীহ আবূ হানীফা (রাঃ) এর সম্মানার্থে তিনি আমর নামীয় সকল কয়েদীকেই মুক্তি দেবেন।

আল্লামা আলী কারী হানাফী 'সামা' নামীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ হানীফা (রাঃ) সংগীত শ্রবণ করতেন। ইমাম ইউসুফ সংগীত উপভোগ করতেন খলীফা হারুন-অর-রশিদের দরবারে। তাঁকে সংগীতের বৈধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জওয়াব দেন যে, যদি সংগীত অবৈধ হতো, তবে ইমাম আজম প্রতি রাতে সংগীত শ্রবণ করে সময় নষ্ট করতেন না।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) : বলা হয় যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) সংগীত পছন্দ করতেন না। তার বিরোধী ধারণাও পাওয়া যায়। তাঁর পুত্র সংগীতের ভক্ত ছিলেন। এক দিন আকস্মাৎ তাঁর পুত্রের জলসায় তিনি এসে

www.amarboi.org

উপস্থিত হলেন। বিস্মিত পুত্র বললেন যে, পূর্বে তিনি (ইমাম সাহেব) তো সংগীত পছন্দ করতেন না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) তখন জওয়াব দিলেন যে, শুধুমাত্র ঐ জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ যা হৃদয়ে অসৎ ভাব সৃষ্টি করে।

মাওলানা আকরাম খাঁ আবদুল গনী নাবলিসীর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) যে গানে বিভোর হয়ে যেতেন তার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে। এমন কি তিনি সংগীত শ্রবণকালে শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গীও করতেন (আকরাম খা ঃ সমস্যা ও সমাধান)[২০]।

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাঃ) : বলা হয় যে, ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রাঃ) সংগীত পছন্দ করতেন না এবং সংগীত-চর্চা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেছেন, "যদি কেও কোনো দাসী বালিকা খরিদ করে এবং যদি দেখে যে, সে গায়িকা, তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

মাওলানা আকরাম খাঁ আবদুল গণী নবলিসী এর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম মালিক নিজে গান গাইতেন এবং অপরের গাওয়া গান উপভোগ করতেন। রাগ-রাগিণীর মধ্যে কোনো ভুল থাকলে তা শুদ্ধ করে দিতেন। যখন তাকে সংগীত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন ইমাম মালিক (রাঃ) জওয়াব দেন, "অশিক্ষিত, মূর্খ এবং হৃদয়হীন ব্যতীত অপর কেও সংগীতকে নিষিদ্ধ মনে করতে পারে না"।

সুন্নীদের থেকে শিয়াগণ সংগীত সম্পর্কে অধিকতর সহনশীল এবং মুক্তমনা। মুতাজিলা সম্প্রদায় ছিল শিয়া ও সুন্নীদের থেকে অধিকতর উদার। তারা ছিল সুন্নীদের মধ্যে যুক্তিবাদী সম্প্রদায়। আব্বাসীয়দের সোনালী যুগে মুতাজিলা চিন্তাধারার সমর্থনে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরব সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। আব্বাসীয়দের আমলে সমাজ এবং সরকার সংগীতের প্রতি অধিকতর সহনশীল হয়ে উঠে।

আব্বাসীয় শাসন থেকে উমাইয়্যাদের শাসনের প্রতি আলেম, উলামা ও ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন নেতৃশ্রেণী ছিলেন নানা কারণে অধিকতর বিক্ষুদ্ধ। ঐ সময়ে আলেম, উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ উমাইয়্যা শাসকদের থেকে দূরে থাকতে চাইতেন এবং উমাইয়্যাগণও রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়ে আলিমদের সাথে আলোচনা পরিহার করতেন। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে আলিমও ইসলামী চিন্তাবিদদের সঙ্গে সম্পর্ক শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্টতর হয়।

www.amarboi.org

আলিমগণ রাজদরবারে ও সরকারী চাকুরীতে স্থান পেয়ে আব্বাসীয়দের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। "ইব্রাহিম ইবন সা'দ আল জুহুরী" ছিলেন খলিফা হারুন-অর-রশীদের আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম।

খলিফা হারুন-অর-রশীদ একদিন ইব্রাহীম ইবন সা'দ আল জুহুরীকে বলেন, আমি শুনেছি মালিক ইবন আনাস (রাঃ) সংগীত চর্চাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করতেন। প্রতিক্রিয়ায় ইব্রাহীম ইবন সা'দ খলিফা হারন-অর-রশীদকে বলেন–"হারাম-হালাল, পাপ এবং পূণ্য নির্ধারণের কি অধিকার মালিক ইবন আনাস-এর আছে। আমি যদি স্বকর্ণে শ্রবণ করতাম যে, মালিক ইবন আনাস সংগীতকে পাপ মনে করেন– এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আমি যথাযথ করে দিতাম (আবদুল্লাহ্ ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮০)[২১]। এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় ইবরাহীম ইবন সা'দ আল জুহুরী উদ্ধত প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইবরাহীম সা'দ আল জুহুরীর প্রতিক্রিয়া শুনে খলিফা হারুন-অর-রশীদ পুলকিত অনুভব করেন। তবুও সাধারণ ভাবে আলিম সম্প্রদায় সংগীতের প্রতি সে যুগেও তেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন না। ব্যক্তিগত ভাবে ইব্রাহীম ইবন সা'দ-এর ন্যায় তোষামোদী আলেমদের কেও কেও বিশেষ বিশেষ সংগীতের সমর্থক থাকতে পারেন। হযরত মালিক বিন আনাস (রা.) এবং দরবারী আলিম ইব্রাহীম ইবন সা'দ আল-জহুরীদের কোনো তুলনা করাও বেয়াদবি।

গ্রীক প্রভাব : আব্বাসিয়া যুগে আরব সংগীতের ওপর গ্রীক বাইজানটিয়াম এবং পারস্য প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। খলিফা মামুনুর রশীদ খলিফা হওয়ার পূর্বে পারস্যে খুরাসনের গভর্ণর ছিলেন। তার সময়ে পারস্য সংস্কৃতি আরব সংস্কৃতিতে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। মামুনুর রাশীদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং জান্নাতী মহিলা জুবায়দা পুত্র এবং অযোগ্য খলিফা আল-আমিন ছিলেন আরবীয় ধারা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন (Jurji-Zaidan, পৃষ্ঠা- ১৮৫-৮৬)[২২]।

www.amarboi.org

ইসলাম ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

সংগীত-চর্চাকে হারাম ঘোষণা করে আল্-কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি। সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) এর যুগে আরব দেশে সংগীত-চর্চা প্রচলিত ছিল। আল্-কুরআন সমকালীন সামাজিক আচার, প্রথা, অনুষ্ঠান, প্রভৃতির অনেক কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিলুপ্ত জাতিসমূহের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে আল্-কুরআনে।

সালাতের (নামাজের) গুরুত্ব ঘোষণা করা হয়েছে সত্তুরের বেশী বার। কিন্তু সংগীত চর্চার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন অংশেই প্রকাশ্য কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। পরবর্তীকালের তফসীরকার এবং ইসলামী ফকীহগণ আল্-কুরআনের কোন আয়াত পরোক্ষভাবে সংগীত চর্চা বিরোধী বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সংগীত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা : ইসলাম এবং সংগীত-চর্চার পারস্পরিক সঙ্গতিপূর্ণতা সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। কারো কারো মতে সংগীত হারাম। কেও কেও মনে করেন গজল হালাল এবং অন্যান্য প্রকার সংগীত হারাম। কেও কেও মনে করেন বাদ্যযন্ত্রের সাথে সম্পর্কহীন সকল প্রকার ধর্মীয় সংগীত হালাল এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত সকল প্রকার সংগীত হারাম।

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রা. প্রমুখ সূফী সাধকগণের গজল, কাওয়ালী সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা এগুলুর অবৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তবুও সাধারণভাবে মুসলিম ধর্মজ্ঞগণ সংগীতকে অবৈধ বলে ধরে নিয়েছেন, বিশেষত তাঁরা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকে হারাম মনে করার মত ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্-কুরাআনে ঃ "আল্লাহ্‌র ঘরের নিকট তাহাদের যে উপাসনা তাহা তো উলুধ্বনি করা ও করতালি দেওয়া বৈ আর কিছুই ছিল না। অতএব যে ধর্মদ্রোহ তোমরা করিয়া আসিতেছিলে তাহার প্রতিফলে শাস্তি ভোগ কর।"

বায়তুল্লাহ্‌র নিকট করতালি দেওয়া এবং অন্যত্র করতালি দেওয়া একরূপ নয়। তদুপরি বায়তুল্লাহ্‌র নিকট উপাসনাকালে করতালি দেওয়ার অবৈধতা থেকে সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত অনেকে করেছেন। এতে ইখতিলাফ আছে।

ঐতিহাসিক এবং ফিকাহ্‌বিদদের সমর্থন : সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ (সাঃ) ও ন্যায়দর্শী (রাশেদীন) খলীফাদের যুগে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের উল্লেখ

www.amarboi.org

কিতাবে উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকের লেখা।

পরবর্তীকালে রচিত কিতাবুল আগানী এবং মাসুদী, ইবনে খালদুন, তাবারী, ওয়াকিদি প্রমুখের বর্ণনা এবং সিদ্ধান্ত সংগীত যন্ত্রের বৈধতার সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ না করতে পারি, তবে ইবনে হাজর (রাঃ), ইবনে খাল্লিকান (রাঃ), জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রাঃ), ইমাম আবূ হামিদ আল গাজ্জালী (রাঃ) প্রমুখের বর্ণনা এবং মতামত আমাদের সংগীতযন্ত্রের বৈধতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

তাঁদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এবং হাদীস গ্রন্থে সংগীত যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ পাওয়া যায়। আমাদের এ প্রবন্ধের ভিত্তি বিশেষভাবে ইমাম গাজ্জালীর অমর গ্রন্থ 'এহ্ইয়া-উল-উলুমুদ্দীন'। এ গ্রন্থের এক অধ্যায়ে তিনি সংগীত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন।

মাযামির, আওতার প্রভৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ : কতগুলো সংগীতযন্ত্রের ব্যবহার স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে কুবা, মাযামির এবং আওতার, ইত্যাদি। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাঁর আলোচনার সারাংশ বর্ণনা করছি।

মদ্যপান হারাম হওয়ার পর যে সমস্ত পাত্র মদ্যপানে ব্যবহৃত হত সেগুলোও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মোজাফফাত, হানতান, নকীব প্রভৃতি পাত্রে মদ্য পরিবেশন করা হতো। এই পাত্রগুলি নিজস্ব এবং পৃথকভাবে হারাম নয় এবং ঐ সবের হারাম হওয়ার কারণও নেই। কিন্তু ঐগুলোকে হারাম ধরা হয়েছে। কারণ, এগুলো মদ্যপানের স্মৃতি মনে জাগায় এবং তাতে মদ্যপানের ইচ্ছা জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে শুধুমাত্র গর্হিত কাজই হারাম করা হয়নি, তার পূর্বাবস্থাও হারাম করা হয়। কোন নারীর সাথে নির্জন স্থানে অবস্থান করলেই আল্লাহ্ পাপ লিখে রাখবেন না। কিন্তু, ন্যায়নীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়নে একে হারাম করা হয়েছে। কারণ, এতে পাপ পথে চলার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। উরুর দিকে তাকানো হারাম করা হয়েছে, কারণ তা যৌন অঙ্গের সঙ্গেঁ সংযুক্ত এবং যৌনাকাঙ্খা মনে জাগতে পারে।

কোন দ্রব্য নিজস্ব গুণে হালাল হতে পারে। কিন্তু পারিপার্শিক অবস্থার জন্যও হারাম হতে পারে। বিশেষ ধরণের জুব্বা পরিধান করা কোন কোন স্থানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, তা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুর্নীতি পরায়ণ লোকগণ

www.amarboi.org

পরিধান করে। কিন্তু মাও-ওরাও নামক স্থানে ঐরূপ জুব্বাকে আদর্শ পোষাক মনে করা হয়। কারণ সেখানকার বুযুর্গ লোক জন তা পরিধান করেন।

বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার কারণ : মাজামির, আওতার, কুবা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, এ সকল বাদ্যযন্ত্র সুরাপানে উৎসাহ যোগায়। মদ্যপানের মজলিসে এগুলো বাজিয়ে মদ্যপায়ীদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের স্বর শুনলে মদ্যপানের স্মৃতি মনে উদিত হয়। মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পর যে সমস্ত বস্তু মদ্যপানের সঙ্গে বিজড়িত ছিলো– সব কিছুর ব্যবহারই হারাম হয়ে যায়।

মদ্যপানের স্মৃতি বিলুপ্ত করার জন্যই হানতান, নকীব, মুজাফফাত প্রভৃতি মদ্যপাত্র এবং মাজামির, আওতার, কুবা প্রভৃতি সংগীত যন্ত্রের ব্যবহার হারাম হয়ে যায়। তৃতীয়ত, মুসলিমদের মধ্যে মদ্যপান রহিত হলেও অমুসলিমদের মধ্যে মদ্যপানের রীতি থেকে যায় এবং তারা তাদের সুরার মজলিসে এ সমস্ত মদ্যপাত্র এবং সংগীতযন্ত্র ব্যবহার করতো।

অমুসলিমদের রীতি অনুসরণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেক সময় সুন্নাত পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে, যদি দেখা যায় ঐ প্রথা পথভ্রষ্টদের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত। কুবা এক প্রকার ঢোল, এর মধ্যস্থল সূক্ষ্ম এবং দুই দিক বিস্তৃত। মুখান্নাস (স্ত্রী-বেশী পুরুষ গায়কগণ) কুবা বাজাতো। যেহেতু পুরুষদের স্ত্রী বেশ ধারণ ইসলামে নিষিদ্ধ, তাই মুখান্নাসদের ব্যবহৃত ঢোল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু একটু ভিন্ন আকারে নির্মিত হাজীদের ব্যবহৃত ঢোল বা জিহাদের ঢোল, সাহিন, কাদিব, গিরবাল, ইত্যাদি বৈধ রাখা হয়েছে।

বিশেষ বিশেষ সংগীত যন্ত্র হারাম হওয়ার কারণ এগুলোর সুন্দর সুমধুর সুর নয়। সুর ছন্দযুক্ত বা ছন্দবিহীন হলেই হারাম বা হালাল হয় না। হারাম হওয়ার অন্য কারণ আছে। মেষ পালকের বাঁশী, কাদিব, শাহিন, বাদ্যকারদের বাঁশী, তবলা, দফ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হারাম নয়। কারণ মদ্যপানের সঙ্গে এগুলোর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। অথচ আওতারের স্বর সুমধুর হওয়া সত্ত্বেও মদ্যপানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলেই সাত রাগিণীর বাঁশী, মেজমার, এক রাগের বেহালা প্রভৃতি হারাম করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হামিদ আল্-গাজ্জালীর উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে– সকল প্রকার সংগীতযন্ত্র হারাম করা হয়নি। বিশেষ বিশেষ সংগীতযন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো– ইসলাম বিরোধী নিষিদ্ধ ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে সংগীতযন্ত্রের সংযোগ।

www.amarboi.org

মহানবী (সাঃ)-এর সম্মুখে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার : মহানবী (সা.)এর যুগে কতকগুলো সংগীতযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। তাঁর সম্মুখে যখন ওগুলো বাজান হয় তখন তিনি নিষেধ করেন নি বরং উপভোগ করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে ঐ সমস্ত সংগীতযন্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন নি বরং তারিফ করে বলেছিলেন যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর বাদ্যযন্ত্রাদি তাকে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে হযরত দাউদ (আঃ) একজন উচ্চমানের সুরকার ছিলেন।

রেদওয়ান অভিযানে রাসূল করীম (সা.) বিপুল সাফল্য লাভ করেন। তাঁর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই বিজয়ের খবরে মদীনার পূর মহিলাগণ দফ নামক সংগীতযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। নারী ও পুরষগণ তাঁর আগমনে গান গেয়ে দফ বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনিও তাতে আনন্দিত হয়েছিলেন (আল-গাজ্জালী, ইহইয়া উল-উলুমুদ্দিন)[২৩]। বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে দফ নামক সংগীতযন্ত্র, যা রাসূল (সাঃ)-এর সম্মুখে এবং তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো, তার উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার রাসূল করীম (সাঃ) পছন্দ করতেন। ঈদ, আকিকা, বিবাহ ভোজ, প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যুগে সংগীত যন্ত্রের ব্যবহার হতো। বিবাহের সময় উৎকৃষ্ট ধরণের কোন কোন সংগীত যন্ত্রের ব্যবহার করা সম্ভব না হলে তিনি বলেছেন যে, "গিরবাল (অতি নিম্নস্তরের এক সস্তা বাদ্যযন্ত্র) বা খঞ্জনী বাজিয়ে হলেও বিবাহ ঘোষণা কর।" (আল-গাজ্জালী)। হযরত আলী (রাঃ) এবং বিবি ফাতিমার বিয়েতে সংগীতজ্ঞ আমর ইবনে উমাইয়্যা জারিমি বাজিয়েছিলেন 'দায়রা' নামীয় গোল তাম্বুরা।

খালেদ তাবেরী বর্ণনা করেছেন ঃ এক আশুরার দিন মদীনার জারিয়া বা গায়িকা নারীগণ সংগীত যন্ত্র সহকারে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেছিল। আমরা এ সম্বন্ধে রাবি বিনতে মুয়াযকে এর বৈধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "একদিন রাসূল (সাঃ) এসে আমার বিছানায় বসলেন। তাঁর আগমনের পর দাসী গায়িকারা দফ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়েছিল" (মুসলিম, বুখারী, ইবনে মাজা)।

ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন যে যখন নাবী করীম (সাঃ) রাবি বিনতে মুয়াযের গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা তাঁর প্রশংসাসূচক গান আরম্ভ করলেন।

www.amarboi.org

তাঁদেরকে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "এই গান ত্যাগ কর। যা আগে গেয়েছিলে তা-ই গাও।"

সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) একবার কোন এক বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার পর এক নারী তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমি নিয়ত করেছি, আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলে আমি গান গেয়ে এবং দফ বাজিয়ে আপনাকে আনন্দ দেব।" হযরত বললেন, "ভালো কথা, নিয়ত পুরা কর।" তখন স্ত্রীলোকটি গান গাইতে শুরু করলেন (আবূ দাউদ এবং তিরমিজী)[২৪]।

হাজীদের সংগীত-চর্চা : ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) তাঁর পুস্তকে কখন কখন কণ্ঠসঙ্গীতে যন্ত্রের ব্যবহার প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি হাজীদের সংগীত-চর্চার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "হাজীগণ তবলা, বাঁশী, প্রভৃতি সহযোগে গান গেয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে থাকেন। এগুলো হালাল। কেননা তাতে কাবা, মক্কা, হাতিম, জমজম এবং অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। তার প্রভাব হৃদয়ের ওপর পড়লে বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারত করার আকাঙ্খা মনে উদয় হয় এবং হৃদয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

কাবাগৃহ এবং অন্যান্য নিদর্শনের বর্ণনা বা বক্তৃতার মাধ্যমে সুর বিন্যাস এবং অলঙ্কার সহযোগে বর্ণনা যেমন জায়েয, তদ্রূপ কবিতা আবৃতি করাও জায়েয। ছন্দ এবং সুরের সহযোগ হৃদয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুললিত সুর এবং ছন্দযুক্ত গানের সহযোগে তা আরো গভীর হয়।

তদুপরি, সুললিত স্বর এবং ছন্দযুক্ত গানের সঙ্গে বাঁশী এবং তবলা সঙ্গত হলে হৃদয়ের ওপর এর প্রভাব আরো অধিকতর হয়। সুললিত স্বর, ছন্দযুক্ত গান, তবলা, বাঁশী এগুলোর প্রত্যেকটিই জায়েয যে পর্যন্ত মাজামির এবং আওতারের ব্যবহার না হয়। কারণ মাযামির এবং আওতার সুরা পানের প্রতীক।"

হৃদয়ে সুরের মূর্ছনায় অপূর্ব প্রভাব : "বাদ্যযন্ত্রের সুর হৃদয়ে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং হৃদয়ে তন্ময়তা সৃষ্টি হয়। এতে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা প্রবল হয়। তাই সূফীগণ আল্লাহ্-প্রেম বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য সংগীত যন্ত্রের আশ্রয় নিতেন।" ইমাম গাজ্জালী (র.) হৃদয়ে ওজদ বা তন্ময়তা সৃষ্টিতে ছন্দ এবং বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মানুষের মনে মাঝে মাঝে এক অজানা আশ্চর্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যা ভাষায়

www.amarboi.org

প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ছন্দ এবং গানের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। ছন্দযুক্ত কবিতা (গান) এবং ছন্দহীন কবিতার (সাধারণ পদ্য) ভেতর পার্থক্য নেই।"

"মনের অজানা অবস্থা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সংগীতযন্ত্র মনের ওপর যে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এটা শুধু অনুভূতি দ্বারাই বুঝা যায়। আওতার বা বাঁশীর সুর বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের স্বর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং অজানা আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ প্রেমিক, মানব প্রেমিক এবং সাধারণ লোক– সকলের হৃদয়েই এ অনুভূতির সৃষ্টি হয়।" ইমাম গাজজালী।

এ অনুভূতি হৃদয়ের মলিনতা, সংকীর্ণতা দূর করে এবং হৃদয়কে প্রশস্ত করে, উদার করে। গান যে কোমলতার সৃষ্টি করে তাতে আল্লাহ্ প্রেম, মানবতার প্রেম জাতীয় আদর্শ প্রেমের বীজ হৃদয়ে সহজেই বপন করা যায়।

আল্লাহ্-প্রেম জাগরণে যন্ত্রসংগীত : ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন ঃ "কুরআন তিলাওয়াতে হৃদয়ে আল্লাহ্ প্রেম বর্ধিত হয় এবং সূফীদের অন্তরে তন্ময় ভাবের সৃষ্টি করে।" তবে ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ)-এর মতে প্রেমের তন্ময়তা সৃষ্টিতে কুরআনের আয়াতের থেকে সংগীতের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর হয়। এর সাতটি কারণ তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে পঞ্চম কারণ সংগীতের সঙ্গে সংগীতযন্ত্রের সঙ্গত। কারণ যন্ত্রের সুমধুর সুর বোধগম্য না হলেও হৃদয়ে অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় সংগীতযন্ত্রের ব্যবহার করা যায় না। ইমাম গাজ্জালীর নিজের কথায় ছন্দযুক্ত স্বর এবং সংগীতযন্ত্রের সুমধুর সুরের সংযোগ হৃদয়ে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন রাগ-রাগিনী সঙ্গত, দফ বাজান, বাঁশীর সুর, প্রভৃতির প্রভাব হৃদয়ে অত্যন্ত গভীর।

আল্লাহ্র প্রতি প্রেম গভীর হলে সহজেই আল্লাহ্ প্রেমের তন্ময়তা সৃষ্টি করে। কিন্তু, তা দুর্বল হলে হৃদয়ে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে না। সে জন্য সংগীত যন্ত্রের সুর এবং বাঁশীর সুরের প্রয়োজন।

সংগীতযন্ত্র কেন হারাম হতে পারে না, ঈমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) তা বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা তাঁর গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি তিন পারায় বিভক্ত করে দিয়ে এ লেখা শেষ করছি। "ছন্দযুক্ত সুমধুর স্বর উচ্চারণ স্থান বিশেষে কয়েক প্রকার। প্রথমত, জড়বস্তু থেকে বহির্গত আওয়াজ যথা মাযামির, আওতারের আওয়াজ, ঢোল, তবলার আওয়াজ, বিভিন্ন তারযুক্ত যন্ত্রের ওপর আঘাতের স্বর, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, প্রাণীর কণ্ঠনির্গত এবং অন্যান্য নিম্ন প্রাণীর কণ্ঠ নির্গত স্বর– যথা কোকিল, বুলবুল ও অন্যান্য পাখীর

www.amarboi.org

সুললিত স্বর। কোকিল, বুলবুলের স্বর, ছন্দযুক্ত, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর। প্রাণীর স্বরের মূল প্রাণীর কণ্ঠদেশ। সৃষ্টির প্রয়োজন মনে রেখেই সুমধুর স্বর সৃষ্টি করা হয়েছে।"

"আল্লাহ্ সৃষ্টির জন্য যা মনোনীত করেছেন– তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা অপ্রয়োজনীয় এবং অনুসরণীয়। এর বিশদ ব্যাখ্যা দীর্ঘ। কোন স্বর সুমধুর এবং ছন্দযুক্ত হলেই হারাম হয়ে যাবে– এর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। কোকিলের স্বর এবং অন্যান্য পাখীর সুমধুর স্বর কেও হারাম মনে করেন না। কণ্ঠস্বরের অনুকরণে এবং কণ্ঠস্বরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যান্ত্রিক সুর আবিষ্কার করা হয়েছে।"

"কোকিলের সুর শোনা যেমন হারাম নয়, তেমনি মানুষের ইচ্ছা মুতাবিক কণ্ঠ নিঃসৃত সুর শ্রবণ করা হারাম নয়। প্রাণহীন যন্ত্রের সুর এবং প্রাণীর স্বর পৃথক নয়। মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুর, বিভিন্ন তারযন্ত্রের ওপর আঘাত বা ঘর্ষণ জনিত আওয়াজ, দফ, তবলা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ হারাম নয়।"

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (রাঃ) কোনো সংগীত যন্ত্রের যথার্থতা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা অন্য কোনো আলিম উলামা লিখলে তারা শুধু কাফির ফতোয়াই পেতেন না। অধিকন্তু তাদের কতল করা ওয়াজিব হয়ে যেতো!

সংগীত নিষিদ্ধতার প্রেক্ষাপট

হযরত ফুযাইল (রাঃ) বিন আয়ায বলেছেন, "সংগীত ব্যভিচারের অস্ত্র।" অপর এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, "সংগীত পাপীদের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে।" ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বলেছেন, "সংগীত ত্যাগ করবে। কারণ, সংগীত লজ্জা হ্রাস করে। কামভাব উদ্রেক করে। মনুষ্যত্ব খর্ব করে। তা সুরার প্রতিনিধি এবং নেশা উৎপাদনকারী।" আবূ হামিদ আল্-গাজ্জালী (রা.) বলেন, "বড়ো পাপী এবং কামভাবাপন্ন যুবকদের সম্পর্কে এগুলো বলা হয়েছে।"

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সংগীত : কয়েকজন লোক একদা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় গান গাইতে গাইতে কাবা তওয়াফ করছিল। তাঁদের মধ্যে একজন নারী গান গাইতেছিলো। তা দেখে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, "সতর্ক হও। আল্লাহ্ তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন নি।" তিনি একথা দু'বার বললেন।

ইমাম আবূ হামিদ গাজ্জালী (রাঃ) বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-এর এ কথায় সর্বাবস্থায় সংগীত হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত করা যায় না।"

www.amarboi.org

"ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় নারীর গীত শ্রবণ করা অসঙ্গত। ঐ সংগীত আধ্যাত্মিক তন্ময়তা সৃষ্টির জন্যে করা হয়নি এবং আল্লাহ্‌র ঘর জিয়ারতের জন্যেও উৎসাহব্যঞ্জক ছিলো না।" যেহেতু ঐ সংগীত নিছক আনন্দের জন্য গাওয়া হয়েছিলো, তাই তিনি তা নিষেধ করেছিলেন। ইহ্‌রাম অবস্থায় সংগীত নিন্দনীয় ছিলো।

সংগীত ও রিয়া : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন, "গান হৃদয়ে মুনফিকী জন্মায় যেমন বৃষ্টি তৃণলতা জন্মায়।" 'মুনাফিকী' শব্দটি এখানে 'রিয়া' বা অহঙ্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গানে পারদর্শিতার জন্যে গায়কের মনে অহঙ্কার উদয় হয়।

ইমাম আবূ হামিদ গাজ্জালী (রাঃ) বলেন, "গান মুনাফিকীর জন্ম দেয়। এর অর্থ এই যে, গায়ক তার সুমিষ্ট স্বর অপরকে শোনায় এবং অপরের সম্মুখে নিজেকে গর্ব ভরে প্রকাশ করে। গায়ক যে বিনয় প্রকাশ করে তা গায়কের স্বীয় গানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে। এটা বিনয়বশত নয়। এবং মুনাফিকী। কিন্তু এতে গান হারাম হয়ে যায় না।"

"যদি কেও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে, সজ্জিত, সুন্দর ঘোড়ায় আরোহণ করে, উৎকৃষ্ট গরু-ছাগলের মালিক হয়, প্রচুর ধন-সম্পত্তি, উত্তম খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সুখ সম্পদ এবং গৌরবের জিনিস উপভোগ করে, তাতে তার মনে মুনাফিকী বা অহঙ্কার জন্মাতে পারে। কিন্তু মুনাফিকী বা রিয়া জন্মায় বলে ঐ সমস্ত জিনিস কি হারাম হয়ে যায় ? হালাল জিনিসও হৃদয়ে কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং পাপের কারণ হতে পারে।"

"দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাঃ) একদিন এক উৎকৃষ্ট দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করেছিলেন। অশ্বটির নৈপুণ্য এবং দ্রুতগতি দেখে তাঁর মনে অহঙ্কারের ভাব জন্মেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং আস্তে চলতে লাগলেন। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ঘোড়াটির লেজ এর সুন্দর কেশগুচ্ছ কেটে দিলেন যাতে এর সৌন্দর্য কমে যায়–এটা আশ্বারোহনের ন্যায় হালাল জিনিসের মধ্যে মুনাফিকীর তথা রিয়ার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত।"

সার্বজনীন নিষিদ্ধতা : যুক্তি দেওয়া হয় কোন কোন গান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তাই মানুষকে সত্য পথে অনড় রাখার জন্যে সংগীতমাত্রই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন। মনে হয় এ যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। পথভ্রষ্টগণ শুধু সংগীত দ্বারাই লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে না, পথভ্রষ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা হয়।

www.amarboi.org

বাক্যালাপের মাধ্যমেই মানুষ বেশী পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। তাই বলে সকল কথাবার্তা, প্রবন্ধ, নাটক, বক্তৃতা, ইত্যাদি সব কিছুই হারাম হয়ে যাবে–এ জাতীয় যুক্তি কতটুকু বলিষ্ট– তা ভেবে দেখতে হবে। বিশেষ বিশেষ গান হারাম বলে সংগীত মাত্রই হারাম বলা কি সঙ্গত ?

সংগীত যদি নিষিদ্ধ না-ই হলো তবে সংগীতের অবৈধতার ধারণা মুসলিম সমাজে, বিশেষত আলিমদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল হলো কি করে? এ প্রশ্নও নিতান্ত স্বাভাবিক। ইসলামের বহু ধারণা আমরা আরব, পৌত্তলিক, খৃষ্টান এবং ইয়াহুদদের থেকে অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোনো বিষয়ে আল্-কুরআনের আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত আরব এবং ইয়াহুদদের রীতিনীতি অবলম্বন করতেন।

অজ্ঞতার যুগে আরবদের ধারণা ছিলো সংগীত-চর্চা সুকণ্ঠি নর্তকী এবং ভ্রষ্টা নারীদের পেশা। সম্ভ্রান্ত পরিবারে অপরাপর বিলাস দ্রব্যের সঙ্গে দাসী গায়িকা থাকতো। পারিবারিক দাসী গায়িকা শরাফতের নিদর্শন-স্বরূপ রাখা হতো। রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে আধুনিক সমাজে যে চিত্ত বিনোদন হয়, তা সম্ভব হতো তখনকার দিনে দাসী গায়িকার মাধ্যমে। তারা তাদের কণ্ঠস্বর এবং শারীরিক সান্নিধ্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি দিয়ে প্রভুদের মনোরঞ্জন করতো। পুরুষদের মধ্যে যাঁরা গান গাইত তাঁরাও নারীবেশ পরিধান করতো। নারীবেশী পুরুষ গায়কগণকে বলা হতো "মুখান্নাস"।

ইয়াহুদগণও সংগীত-চর্চা বেশী পছন্দ করত না। তাদের এবং ঈসায়ী ধর্মগ্রন্থে সংগীত-চর্চার নিন্দাও পাওয়া যায়। মুসলিমদের মধ্যে সংগীতের প্রতি অমনোযোগিতা আরব এবং ইয়াহুদী মনোভাবের সম্প্রসারণ স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছিলো।

আলিম সমাজের মধ্যে সংগীত বিরোধিতার প্রধান কারণ উমাইয়্যা, আব্বাসীয় ও পরবর্তী রাজদরবারে সংগীত-চর্চার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ। সুলতানদের দরবার নাচ, গান, মদ, মেয়ে মানুষ প্রভৃতির আসর হয়ে উঠে। নানাবিধ অনাচার শুধু প্রাসাদেই সীমাবদ্ধ রইলো না, তা সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্টি হয় সংগীত-চর্চার প্রতি আলিমদের বিরূপ মনোভাব। এ মনোভাব নিতান্ত স্বতঃস্ফুর্তভাবেই এবং সঙ্গত কারনেই হয়েছিলো। যখনই কোন বিষয়ে সীমালঙ্ঘন এবং অত্যধিক বাড়াবাড়ি দেখা দেয়, তখনই এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

www.amarboi.org

সংগীত সর্বস্ব শাসকগণ এবং সমাজ নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন আলিম সমাজ। ওয়ায-মাহফিল, আলোচনা, গ্রন্থাদি প্রভৃতির মাধ্যমে সংগীত প্রবণতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সম্ভবপর যুক্তি দাঁড় করানো হয়। সংগীত-বিরোধী মনোভাব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ইমাম আবূ হামিদ গাজ্জালী (রাঃ)-কে সংগীত সম্বন্ধে ইসলামের যথার্থ নীতি বিশ্লেষণের জন্য লেখনী ধরতে হয়।

সংগীত নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়া দেওয়া মধ্যযুগে প্রয়োজন ছিলো। যুগের বিশেষ পরিবেশ কখনো কখনো হালাল জিনিসকেও হারাম ঘোষণা করা যেতে পারে। এ নীতির প্রয়োগ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মধ্যেই পাই। সংশ্লিষ্ট আল্-কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

কিন্তু,মাযাফফাত, হানতান, নকিব প্রভৃতি মদ্যপাত্রগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়নি। দেখা গেল এগুলোর ব্যবহার মুসলিমদের মনে মদ্যপানের ইচ্ছা জাগ্রত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন ঘোষণা করলেন যে হানতান, নকিব প্রভৃতি মদ্যপাত্র ব্যবহারও হারাম।

মদ্যপান সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ার পর এবং পূর্বতন নেশা সম্পূর্ণ কেটে যায়। অতঃপর মহানবী সা. ঘোষণা করলেন যে, হানতান, নকিব প্রভৃতি পাত্র এখন ব্যবহার করা যেতে পারে। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিজী)[২৫]।

মধ্যযুগের নৈতিক অরাজকতা এবং কাম সংগীত-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈধ সংগীত-চর্চাকে অবৈধ ফতোয়া দেওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদ্যপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার অনুরূপ। যুগের দাবীতে কোনো কোনো সময় বৈধ বস্তুকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ইসলাম-বিরোধী নয়।

www.amarboi.org

সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র

১. আল্-কুরআন ঃ সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৬
২. সূরা আবাসা ঃ ৮০ নম্বর সূরা
৩. ইমাম আবূ হামিদ গাজজালীঃ ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন
৪. আল্-কুরআন, সূরাহ্ আবাসা ৮০ ঃ ১,২
৫. সূরাহ্ লুকমান ৩১ ঃ ৬
৬. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী কিতাবুল আগানী
৭. আল্-কুরআন, সূরাহ্ নাজম, ৫৩ ঃ ৬০, ৬১
৮. আল-কুরআন, সূরাহ্ নং- ৪৯ হুজরা, আয়াত নং-২
৯. ইমাম গাজ্জালী, এহ্ইয়াহ্ উল-উলুমুদ্দিন
১০. আল গাজ্জালী: এহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন
১১. সাহিহ্ বুখারী, সাহিহ্ মুসলিম
১২. আবদুল্লাহ ইবন রাব্বিহী ইক্দ আল ফরিদ
১৩. কাশফ-আল-মাহজুব
১৪. ইক্দ-আল-ফরিদ
১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা- ৭৮২
১৬. ইবন রাব্বিহী, ইক্দ-আল-ফরিদ
১৭. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আঘানী
১৮. ইয়াহ্ ইয়া আল-উলুমুদ্দিন ইমাম গাজ্জালী
১৯. আবদুল্লাহ্ ইবন রাব্বিহী, ইক্দ-আল ফরিদ ঃ ৩য় খন্ড, ১৮১
২০. মাওলানা আকরাম খা ঃ সমস্যা ও সমাধান
২১. আবদুল্লাহ্ ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮০
২২. Jurji-Zaidan, পৃষ্ঠা- ১৮৫-৮৬
২৩. ইমাম আল-গাজ্জালী, ইহইয়া উল-উলুমুদ্দিন
২৪. আবূ দাউদ এবং তিরমিজী
২৫. মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিজী

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অংশ
উমাইয়্যা যুগ
উমাইয়্যা ও হাশেমী বংশের সম্পর্ক

প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি লগ্ন থেকেই আরব ছিল মরুভূমি। ইরাক ভিন্ন আরবে কোন নদ-নদী ছিলনা বললেই চলে। মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হয় কম। মরুভূমির মাঝে মাঝে পাহাড় ও উচ্চভূমির পাদদেশে কোথাও কোথাও মরুদ্যান দেখা যায়। আরব মরু উদ্যানে মূলত খেজুর গাছই ছিল বেশী।

আরব দেশে নগর সভ্যতা গড়ে উঠার অবকাশ ছিল কম। প্রথম মানুষের আর্বিভাব হয়েছিল আরব মরুর কোন এক অংশে। মহান স্রষ্টার ইবাদতের জন্য প্রথম মসজিদ বা উপাসনাগার কাবা তৈরী হয়েছিল মক্কায়, যা সুদূর অতীতে "বাক্কা" নামে অভিহিত হত।

পবিত্র কাবার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধর **ফিহির** পরিবারের ওপর। ফিহির এর অপর নাম ছিল **কুরাইশ**। পবিত্র উপাসনাগৃহ কাবার সেবায়েত বা রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বের কারণে কুরাইশ এবং তার বংশধরগণ আরবের বিরাট অঞ্চলে ছিলেন সামাজিক মর্যাদার অধিকারী।

আবদ্ মানাফ পরিবার : ইসলাম প্রচার হওয়ার পর ফিহির **(কুরাইশ)** বংশের আবদ্ মনাফের পরিবারই মক্কা তথা সমগ্র আরব এবং মুসলিম বিশ্বের শাসন প্রশাসনের পুরোভাগে ছিল ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হালাকু খাঁ এর হস্তে আব্বাসিয়াদের পতন পর্যন্ত।

আবদ্ মনাফের ছিল হাশিম এবং আবদ্ শামস্ নামে দু'পুত্র। হাশিম এবং আবদ্ শামসের পর মক্কার নেতৃত্ব আসে হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর পিতৃব্য আবদ্ শামসের পুত্র উমাইয়্যার হাতে।

আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ অভিহিত হতে লাগলেন তার পিতা হাশিমের নামানুসারে "হাশেমী" খেতাবে এবং উমাইয়্যার বংশধরগণ ইতিহাসে পরিচিত হলেন "উমাইয়্যা" খেতাবে– উমাইয়্যার পিতা আবদ শামস এর নামে নয়।

হাশিম ছিলেন উমাইয়্যার পিতৃব্য। নবী বংশ হাশেমী, উমাইয়্যা, আব্বাসিয়া ও মূল শিয়াদের বংশগত সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

www.amarboi.org

হাশেমী পরিবার : উমাইয়্যা বংশীয়গণ ঐতিহ্যগত ভাবে হাশেমীদের অপেক্ষা অধিকতর দুনিয়াদার বা দুনিয়ামুখী ছিলেন। আব্দুল মোত্তালিবের দশ পুত্রের মধ্যে একমাত্র হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং সাইয়্যেদুস শুহাদা হযরত হামজা (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছিলেন। হামেশীগণ ইসলাম প্রচারে তেমন বাধার সৃষ্টি করেনি। ব্যতিক্রম একমাত্র আবূ লাহাব। কিন্তু এই আবূ লাহাবও ইসলাম প্রচারের পূর্বে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদকে প্রানাধিক পুত্র অপেক্ষা কম ভালবাসতেন না।

শিশু মুহাম্মাদের জন্মের খবর আবূ লাহাবের নিকট পৌছিয়েছিল তার দাসী ছুয়াইবা। মৃত ভ্রাতা আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান জন্মের খবরে আবুল উজ্জা আবু লাহাব এত আনন্দিত হয়েছিল যে তার আট আঙ্গুলের ৮টি অঙ্গুরীয়ের মধ্যে সবচেয়ে দামী আংটিটি দাসী ছুয়াইবা এর দিকে ছুড়ে মারে। আংটি হাতে তুলে নিয়ে অভিভূত দাসী ছুয়াইবা ভাবছিল নব জাতকের জন্য এত বড় আংটি দিয়ে কি হবে?

দাসী ছুয়াইবা ভাবতেই পারেনি এত দামী আংটিটি আবূ লাহাব দাসীকে বখশিস দিবে। আবূ লাহাব ভাবল দাসী ছুয়াইবা বোধ হয় আংটি পেয়ে তত বেশী খুশী হয়নি। আনন্দের অতিশয্যে আবূ লাহাব তাকে খুশি করার জন্য ঘোষণা করলো– এই দামী আংটি পেয়েও তুই খুশি হচ্ছিস না । আজ তোর থেকে আমি অনেক বেশী খুশী। যা আমি তোকে খুশি করব। আজ থেকে তুই মুক্ত, আযাদ।

এদ্বারা বুঝা যায় আব্দুল্লাহ্‌র নবজাত শিশু পুত্র মুহাম্মাদ তার পিতৃ পরিবারে কত প্রিয় ছিলেন। শুধু শিশু মুহাম্মাদ নয়, কুরাইশ যুবক মুহাম্মাদের কন্যাগন ছিল তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অতি প্রিয়ভাজনা ও স্নেহশীলা। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর তিন পুত্র কাসিম, আবদুল্লাহ্‌, এবং ইব্রাহীম শিশুকালেই ইন্তেকাল করেন। শিশু আবদুল্লাহ তাহির এবং তাইয়েব উপনামেও খ্যাত হতেন।

বিবাহের বয়স হওয়ার পূর্বে যুবক মুহাম্মাদের কন্যাগনের বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। অন্যদের থেকে আপন জনের দাবী ছিল অগ্রগণ্য। হযরত মুহাম্মাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়নাবকে পুত্র বধু করে নিয়ে যান তার খালা "হালা"। খাদিজা (রাঃ) এর ভগ্নি "হালা" তার পুত্র আবুল আস ইবনে রাবিয়ার জন্যে পুত্র বধু হিসেবে নিয়ে যান হযরত যায়নাবকে।

www.amarboi.org

আবদুল মোত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে আবুল উজ্জা আবু লাহাব ছিল অত্যন্ত আগ্রাসী প্রকৃতির। কিশোরী যায়নাবকে পুত্র বধূ হিসেবে না পাওয়ার দুঃখ সে হজম করেছিল আরো কিছু বেশী পেয়ে। সে হযরত মুহাম্মাদের বালিকা কন্যা রোকেয়া এবং শিশু কন্যা উম্মে কুলসুমকে একই সঙ্গে পুত্র বধু করে তার পুত্রদ্বয় উতবা ও উতাইবার জন্য। এরূপ ছিল হযরত মুহাম্মাদের জন্য তার নিকৃষ্টতম পিতৃব্য আবু লাহাবের স্নেহ, ভালবাসা ও মমত্ববোধ।

আব্‌দ মানাফ উমাইয়্যা ও হাশেমী সম্পর্ক : উমাইয়্যা খলিফাদের পূর্ব পুরুষ "উমাইয়্যা" ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পিতামহ শাইবা আব্দুল মুত্তালিবের সহোদর চাচাতো ভাই। আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম এবং উমাইয়্যার পিতা আব্‌দ শামস্ ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। তাদের পিতার নাম হলো আব্‌দ্ মানাফ। আব্‌দ মানাফ এর পিতা ছিলেন কুশাই।

উমাইয়্যার পৌত্র আবু সুফিয়ান (ইবন হারব) এর কন্যা উম্মে হাবিবাকে (রাঃ) বিবাহ করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। তৃতীয় খলিফা এবং রাসূলুল্লাহর দুই কন্যার স্বামী হযরত উসমান (ইবনে আফফান) ছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদের যমজ ফুফু উম্মে হাকিমের দৌহিত্র। হযরত উসমানের মাতার নাম আরওয়া।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ফুফাত বোনের পুত্র হযরত উসমান (রাঃ) : তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) উমাইয়্যার অধস্তন চতুর্থ বংশধর হলেও তার সঙ্গে নবী পরিবারের সম্পর্ক ছিল নিবীড়তর। খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর মাতা আরওয়া ছিলেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ফুফু উম্মে হাকিমের কন্যা। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পিতা আবদুল্লাহর যমজ বোন ছিলেন উম্মে হাকীম। তারই কন্যা আরওয়া বিনত কুরাইজ এর পুত্র হলেন খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) ইবনে আফ্‌ফান।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দু'কন্যার জামাতা হযরত উসমান (রাঃ) : শুধুমাত্র খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর মাতা আরওয়া এবং উসমানের মাতামহী উম্মে হাকিম নবী পরিবারের সাথে সংযুক্ত ছিলেন– তা নয়। খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) বিবাহ করেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়্যাকে

www.amarboi.org

এবং তার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে।

মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) এর পর থেকেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা নবী ও রাসুল প্রেরন করতেন মানব জাতির হেদায়েত এবং সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আবির্ভাব হয় আবদুল মুত্তালিবের বংশে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে শেষ নবীর আর্ভিভাব হলেও আব্বাসিয়াদের পূর্বে আবদুল মুত্তালিবের পিতৃব্য পুত্র উমাইয়্যার বংশধরগণই ৯০ বছর পর্যন্ত খলিফার পদ অলংকৃত করে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কনিষ্ঠা জামাতা

হযরত উসমানের (রাঃ) পর খেলাফত ফিরে আসে আবদুল মুত্তালিব পরিবারে। খলিফা হন হযরত আবুল আস এর ভ্রাতা হাশিমের পৌত্র এবং তদীয় পুত্র আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)। তার পরে খেলাফত বা শাসন ক্ষমতা চলে যায় পুনরায় উমাইয়্যার পরিবারে।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর খলিফা হন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইবন হারব ছিলেন উমাইয়্যার দ্বিতীয় পুত্র হারব্ এর পৌত্র। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর পর খলিফা হন ইয়াজিদ এবং ইয়াজিদের পর তার পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া।

দ্বিতীয় মুয়াবিয়া এর খেলাফত ছিল অতি স্বল্প কালীন এবং তার পিতা ইয়াজিদ ও কারবালার শোকাবহ ঘটনার পরিণতিতে জঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ। দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার পর খেলাফত দখল করে উমাইয়্যার পুত্র আবুল আস এর পৌত্র মারওয়ান ইবনে হাকাম।

উমাইয়্যার পুত্র আবুল আসের দুই পৌত্রই খলিফা মনোনীত হন। প্রথমতঃ খলিফা হন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবুল আস (রাঃ)। পরে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আবুল আস।

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর মুসলিমগণ হযরত আলীকে (রাঃ) খলিফা নির্বাচন করেন। হযরত আলী পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত সকল গভর্ণরের পদচ্যুতি ঘোষণা করেন। কিন্তু হযরত উসমানের বংশীয় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তা মেনে না নিয়ে প্রথমে হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের বিচার দাবী করেন খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট।

www.amarboi.org

এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) এর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়ে আবু সুফিয়ানের পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শ্যালক হযরত মুয়াবিয়া খলিফা হযরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। হযরত মুয়াবিয়ার বৈমাত্রেয় ভগ্নি উম্মে হাবীবা (রাঃ) বিনত আবু সুফিয়ান ছিলেন রাসুল্লাহ (সাঃ) এর স্ত্রী এবং উম্মুল মুমেনীন।

উমাইয়্যা বংশে খেলাফত : উমাইয়্যার পুত্রদ্বয় আবুল আস এবং হারব্ এর বংশেই খেলাফত আবর্তিত হতে থাকে বহু কাল। উমাইয়্যার প্রপৌত্র হযরত উসমান (রাঃ) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমারের (রাঃ) পর খলিফা নির্বাচিত হলেন– উমাইয়্যার প্রথম পুত্র আবুল আস এর পৌত্র হযরত উসমান (রাঃ) ইবনে আফ্ফান ইবনে আবুল আস।

প্রথম উমাইয়্যা খলিফা মুয়াবিয়া

খারিজীদের ষড়যন্ত্রের কারণে এবং প্রতিফলে তাদের নির্ধারিত ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলজেম ১৭ই রমজান ৪০ হিজরীতে কুফার মসজিদে ফজরের নামাজের ইমামতি কালে হযরত আলী (রা.)-কে আক্রমণ করে শহীদ করে দেয় (৬৬১ খ্রীঃ)। তারপর হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সফিয়ান নিজেকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উমাইয়্যাগণ বিভিন্ন দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আত্মীয় ছিলেন। তারা মুসলিম হয়েও তাদের শাসনামলে এমন সব কাজকর্ম করেন যার জন্য তারা সমকালীন বহু শাসকদের তুলনায় যোগ্যতর হলেও নন্দিত নন বরং সার্বজনীন ভাবে নিন্দিত।

১ম উমাইয়া খলিফা আমীর মুয়াবিয়া (রা.)

(৬৬১ খ্রী- ৬৮০ খ্রী)

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ইবনে আবু সুফিয়ান এর খেলাফত শুরু হয় ৬৬১ সালে এবং শেষ হয় ৬৮০ সালে। যদিও হযরত মুয়াবিয়া দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাঃ) ইবনে খাত্তাবের সময় থেকে ২০ বছর পর্যন্ত সিরিয়ার আমীর ছিলেন, তার খেলাফত ধরা হয় ৬৬১ সালে হযরত আলী (রাঃ) ইবন আবূ তালিব এর শাহাদাতের বর্ষ থেকে।

উমাইয়্যাদের মধ্যে মুয়াবিয়া (রাঃ) ইবন আবু সুফিয়ান ছিলেন প্রিয় নবী রাসূল (সাঃ) এর স্নেহধন্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহচর্য পাওয়ার কারনে তার

www.amarboi.org

স্থান সাহাবীর স্তরে। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন আল্লাহর রাসুলের প্রিয়ভাজন এবং ওয়াহি লেখক।

সাহাবী হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) অপত্য স্নেহরূপ দুর্বলতা হৃদয়ের চোখে দেখা গেলেও তার প্রতি রাসূল (সাঃ) এর স্নেহ ভালবাসার স্মৃতি স্মরণ হলে সকল বিরূপ অনুভূতি স্তব্দ হয়ে যায়। অগ্নির দিকে হাত বাড়ালে তাপের অনুভূতি টের পাওয়ার পর হাত পেছন দিকে টেনে নিয়ে আনতে হয়। হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) প্রতি কোনো অপ্রিয় ধারনা হৃদয়ে অনুভূত হলেও মুখে বলা যায় না।

মায়ের দুর্বলতা দৃষ্টি পথে পতিত হলেও চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়। কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়। হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) প্রতি বিশ্ব মুসলিমের প্রতিক্রিয়া অনেকটা তেমনই।

উমাইয়্যাগণ ইসলামী খেলাফতের রাজধানী মদীনায় রাখেনি। সমগ্র আরবের মধ্যে মদীনা ছিল সবচেয়ে আখিরাতমুখী নগরী। প্রকান্ড আরব ভূমির মধ্যে একমাত্র মদীনার মানুষই রাসূল সা. এর চরম বিপর্যয়ের সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে আহ্বান করেছিলেন।

রাজধানী স্থানান্তর : দুনিয়ামুখী হামাদউমাইয়াদের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা প্রীতিপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর ছিলনা। তদুপরি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার ইবনে খাত্তাবই (রাঃ) উমাইয়া বংশের সেরা রত্ন সাহাবী মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ানকে নিযুক্ত করেছিলেন সিরিয়ার আমীর। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ইবনে আবু সুফিয়ান ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাস্তববাদী ও বিচক্ষণ। তার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

মুসলিম খেলাফতের রাজধানী মক্কা এবং মদীনা হতে অন্য কোথাও স্থানান্ত র করতে হলে দামেস্ক মন্দ জায়গা নয়। খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তার বংশীয় খেলাফতের ভিত্তি দামেস্কে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলেন। তার উত্তরসুরীগণ সাম্রাজ্যের রাজধানী অন্যত্র সরাবার প্রয়োজনবোধ করেননি। বরং, তারা মুসলিম খেলাফতকে রাজত্ব ও সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল।

দামেস্কের ওপরে রোমান সাম্রাজ্যের এবং পারস্যের রাজা বাদশাদের অশুভ প্রভাব ও ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। এর প্রভাব এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ অতিক্রম করে স্পেন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। দামেস্কে খেলাফত হতে

www.amarboi.org

পুতপবিত্র স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হত না। বরং, তথায় প্রবাহিত হত রাজত্বের ধমকা হাওয়া এবং বাদশাহী তান্ডব নৃত্য।

কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রতি উদাসীনতা : খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের পৃষ্ঠপোষক। কবিরাও তার সুদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হননি। (আল মাসুদী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)[৩০]। আমীরের দরবারে কবিদের কবিতা আবৃতি খলিফা মুয়াবিয়া (রাঃ) মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করতেন।

বয়স্কদের গান বা কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কোন রূপ আকর্ষণ বা সুদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়নি। বালক বালিকাদের গান তিনি শুনেছেন। কখনো ধমক দিয়ে তিনি বন্ধ করে দেননি, যেমন করতেন অন্যান্য বহু সাহাবী।

হযরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক বলা যাবে না। তবে তিনি কবিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়ার স্ত্রী এবং ইয়াজিদের মাতা 'মায়সুন' অত্যন্ত উচু স্তরের মহিলা কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন মরু সন্তান। আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হযরত মুয়াবিয়ার অন্তপুরে স্থান পেয়েও উষর মরুর আকর্ষণ তিনি ভুলতে পারেননি।

কাব্য সংগীত : সংগীত প্রিয় আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) ইবনে আবূ তালিব তৎকালীন সংগীতজ্ঞ সাঈদ কাসিরকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সম্মুখে এনে পরিচয় করে দিয়েছিলেন কবি হিসেবে। কারণ সংগীতজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিলে খলিফা মুয়াবিয়া (রাঃ) হয়ত তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না– এরূপ ভীতি আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) এর ছিল (ইকদ আল ফরিদ, পৃষ্ঠা-৩১৮)[৩১]।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের প্রস্তাবে এবং খলিফা মুয়াবিয়ার অনুমোদনে "সাঈদ কাসীর" খলিফার মজলিসে হৃদয় স্পর্শী কবিতা আবৃত করেছিলেন। যদিও এর মধ্যে কোন সংগীত যন্ত্র ছিল না। বস্তুত আবৃতিকৃত কবিতাগুলো ছিল বর্তমান কালের গজলের ন্যায় গীত-সংগীত।

হযরত মুয়াবিয়ার জীবনের শেষ প্রান্তেও একবার মদীনায় তার সঙ্গে সংগীতজ্ঞ সাঈদ কাসীর-এর সাক্ষাত হয়। সাঈদ কাসীর তখনো কবিতার ছদ্মবেশে সংগীত আবৃতি করে খলিফা মুয়াবিয়াকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং উপঢৌকনও পেয়েছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর আমলে আরব ভূখন্ডে পারস্যের দাস-দাসীদের

www.amarboi.org

আমদানী শুরু হয়। এই দাস-দাসীদের অনেকেই ছিল ইমারত নির্মাণের শ্রমজীবি। মদীনায় মসজিদ সংস্কার অত্যন্ত ব্যাপক হারে শুরু হয়। তাদের মাধ্যমে মক্কায় বিদেশী সংগীত ধারা ব্যাপকতা লাভ করে।

উমাইয়্যা যুগের শেষ দিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন মহাসাধক হাসান আল বসরী রা. (মৃত ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ)। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে হযরত হাসান আল বসরী বলেছেন যে, চারটি কারনে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে দায়ী করেন। প্রথমটি হলো পুত্র ইয়াজিদকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) খলিফা পদের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত ঃ অনেকের মতে ইয়াজিদ মাঝে মাঝে মদ্যপান করত। তৃতীয়তঃ তাম্বুরা (Pandore) বাজাত এবং চতুর্থতঃ Silk পরিধান করত। (তাবারি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬)[৩২]।

সংগীতজ্ঞ আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন আয়শা

মাতৃভক্তি : উমাইয়া যুগের সংগীতজ্ঞ আবু জাফর মুহাম্মাদ তার মাতা আয়শার পুত্র হিসেবে তিনি ইবন আয়শা নামেই খ্যাত। তাঁর পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত। ইবনে জাফর এর মাতা আয়শা ছিলেন আল কাসীর ইবন আল সালাত আল কিন্দি পরিবারে কেশ বিন্যাসকারী খাদীমা হিসেবে কর্মরতা। এহেন সেবিকা আয়শার পুত্র আবূ জাফর মুহাম্মাদ সংগীতজ্ঞ হিসেবে আরব ইতিহাসে উচ্চ স্থান পেয়ে গেছেন।

আবূ জাফর এর ন্যায় প্রতিভাবান পুত্র প্রতিপালন এবং প্রতিভা বিকাশে মা আয়শার অবদান এতো বেশী ছিলো যে, তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আবু জাফর মুহাম্মাদ তার মাতা আয়শার পুত্র হিসেবেই নিজের পরিচয় দিতেন এবং সেই পরিচয়ই ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। যেমন ইবন উমাইয়্যা যুগের অন্যতম প্রধান সংগীতজ্ঞ আবু ইয়াহইয়া খ্যাত হন দাস পিতা সুরাইজ পুত্র হিসেবে ইবন সুরাইজ নামে।

সংগীত শ্রবণকারীদের প্রতি মমত্ববোধ : সংগীত পরিবেশনের পূর্বে আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবন আয়শা সংগীতের মর্মার্থ ও ভাষা সম্পর্কে শ্রোতাদের সম্মুখে বক্তব্য বা ভূমিকা উপস্থাপন করতেন। এ সংগীতটি তার রচনা না হয়ে অন্য কারও রচিত সংগীত হলে তাও উল্লেখ করতেন।

সংগীতে সুর, স্বর, ধারা, তাল, লয়, ইত্যাদি কি ধরনের তাও শ্রোতাদেরকে

www.amarboi.org

বুঝিয়ে দিতেন। এর ফলে সংগীতের মর্মার্থ অনুধাবন এবং মাধুর্য উপলব্ধি করা শ্রোতাদের পক্ষে সহজ হতো। (কিতাবুল আঘানী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২,৭৯; [৩৫] ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭)[৩৬]।

সংগীতজ্ঞ আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন আয়শার সংগীত সাধনা সম্বন্ধে ইবনে আল কালবি বলেছেন যে, ইবন আয়শা ছিলেন "মানবকুলের মধ্যে সংগীতজ্ঞ হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ"। এরূপ প্রশংসা তার মেধা ও উৎকর্ষের পরিচায়ক। ঐ সময় ইবন আয়শার সংগীত সম্পর্কে বিবিধ কিংবদন্তি এবং উপকথার সৃষ্টি হয়। কাওকে প্রশংসা করতে বলা হতো– তিনি ইবন আয়শার মতো ।

মূল্যায়ন : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আয়শার সংগীত মেধার পরিচয় পাওয়া যায় তার বাল্যকাল থেকেই। খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) আমলের সংগীতজ্ঞের তালিকায় কিশোর আবু জাফর ইবন আয়শার নাম স্থান পেয়েছে। (কিতাবুল আঘানী, অষ্টাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৭)[৩৭]।

দ্বিতীয় ইয়াজিদ(৭২০-৭২৪ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪৩-৭৪৪ খ্রীঃ) আমলে ইবন আয়শা ছিলেন রাজ দরবারের সংগীতজ্ঞ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় ইয়াজিদ তার (ইবন আয়শা) সংগীত শ্রবণে এত বেশি আত্মহারা হয়ে যান যে, স্বীয় আচরণে খলিফার দরবারের সম্ভ্রমহানী হয়। (আল মাসুদী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৯-১০)[৩৮]।

প্রশিক্ষণ : আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন আয়শার শিক্ষক ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ মাবাদ এবং জামিলা। ইবন আয়েশার কণ্ঠ ছিলো অত্যন্ত মধুর। তার এই কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হতেন, বহু সংগীতামোদী। এমনকি মাবাদ এবং জামিলার মতো শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞগণও। তারা পরম আগ্রহে ইবন আয়শাকে (আয়শা পুত্র) তাদের সেবক এবং শিষ্য হিসেবে বরণ করে নেন।

করুণ মৃত্যু : খলিফা ওয়ালিদের ভ্রাতা আল ঘামর ছিলেন সংগীতজ্ঞ আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন আয়শার বন্ধু। তারা দুজনেই এক সংগে মদ খেতেন। এক দিন ঐ অবস্থায় প্রাসাদের দোতালার বেলকনিতে তাদের মধ্যে ঝগড়া এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এর পরিণতিতে ইবন আয়শা দোতালার বেলকনি থেকে নিচে পড়ে যান এবং মৃত্যু বরণ করেন (৭৪৩ খ্রীঃ)। (কিতাবুল আঘানী, পঞ্চম খন্ড , পৃষ্ঠা- ১৭, ৫৪)[৩৯]।

www.amarboi.org

কুরাইশ বংশ লতিকা

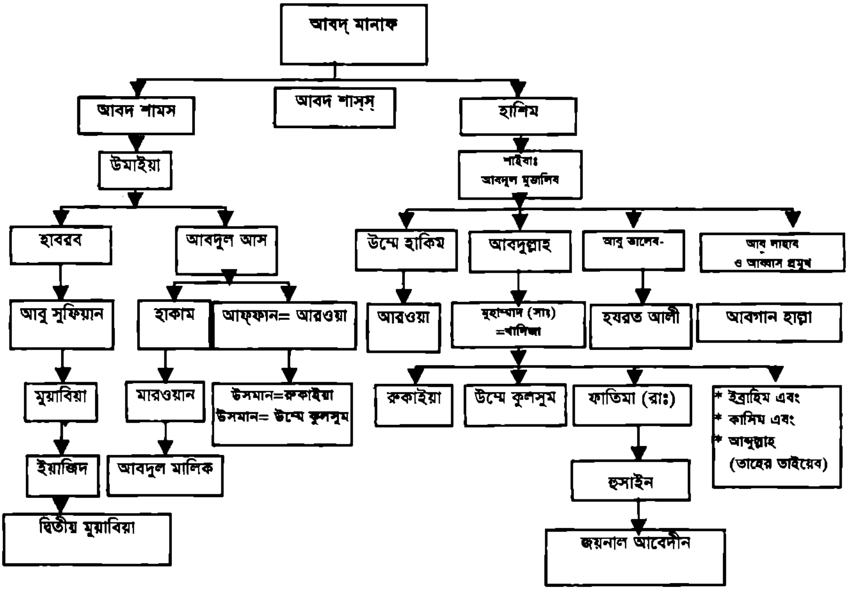

দুষ্টমতি হতভাগ্য প্রথম ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ)
(৬৮০-৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)

হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) এর পুত্র দুষ্টমতি ইয়াজিদের খেলাফত ছিল স্বল্পস্থায়ী (৬৮০-৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)। কারো কারো মতে কারবালার করুন এবং মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার অকাল মৃত্যু ঘটে। কবি মাতা মাইসুনের পুত্র ইয়াজিদের প্রকৃতিতে মাতৃপ্রভাব থাকা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইয়াজিদ নিজেও ছিল এক উন্নত মানের কবি।

সঙ্গীতের প্রতি ছিল ইয়াজিদের তীব্র মোহ। তিনি তার রাজকীয় মজলিসে সঙ্গীতের সঙ্গে সংগীত যন্ত্রেরও সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। গায়কগণ তার দরবারে মালাহি এবং তারাব জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত। (আল মাসুদী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা ১৫৬;[৩৩] কিতাবুল আগানি, পৃষ্ঠা-৭০)[৩৪]। ইয়াজিদের দরবারে খোলামেলা সংগীত চর্চায় ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ছিলেন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত।

www.amarboi.org

সবচেয়ে নিন্দিত হলো ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়া। তার সময়ে সংঘটিত হয় কারবালার শোকাবহ মর্মান্তিক ও কলঙ্কজনক ঘটনা। কারবালার যুদ্ধে নবী পরিবারের বহু মহান ব্যক্তিত্ব শাহাদাত বরণ করেন।

কারবালায় নবী পরিবারের শহীদান : হযরত হুসাইনের (রাঃ) পুরুষ সংগীদের প্রায় প্রত্যেকেই কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। অনেকেরই নাম সংরক্ষিত হয়নি। কারবালার যুদ্ধে একটি বড় অবদান ছিল হযরত আলীর (রাঃ) ভ্রাতা আকিল পরিবারের।

আকিল পরিবারের ৬ জনের শাহাদাত : হযরত আকিল এর শাহাদাত প্রাপ্ত পুত্রদের মধ্যে ছিল (২) আবদুল্লাহ ইবনে আকিল, (৩) আবদুর রহমান ইবনে আকিল, এবং (৪) জাফর ইবনে আকিল।

হযরত আকিল (রাঃ) এর পৌত্রদের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন (৫) মোহাম্মদ ইবনে আবি ছায়িদ ইবনে আকিল এবং (৬) আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে আকিল।

জাফর পরিবারের শাহাদাত : হযরত আলীর ভ্রাতা জাফরের পরিবারের মধ্যে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন (৭) মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন জাফর এবং (৮) আউন ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর ।

হযরত আলীর ৫ পুত্রের পরিবারের শাহাদাত : স্ত্রী উম্মুল বানীনের গর্ভজাত খলিফা হযরত আলী (রাঃ) পুত্রদের মধ্যে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন তার পাঁচ পুত্র। তারা হলেন (৮) আব্বাস ইবন আলী (রাঃ) (৯) আবদুল্লাহ ইবন আলী (রাঃ) (১০) উসমান ইবনে আলী (রাঃ) (১১) মোহাম্মদ ইবন আলী (রাঃ) এবং অপর গর্ভজাত (১২) আবূবকর ইবনে আলী (রাঃ)।

হযরত হাসানের ৫ পুত্রের শাহাদাত : হযরত হুসাইনের (রাঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসানের (রাঃ) পুত্রদের মধ্যে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন (১৩) আবু বাকর ইবনে হাসান (রাঃ) (১৪) আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রাঃ) (১৫) কাসেম ইবন হাসান (রাঃ) (১৬) আলী ইবনে হাসান (রাঃ) (১৭) উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান (রাঃ)।

হযরত হুসাইনের পুত্র (রাঃ) পুত্রদের মধ্যে (১৮) আলী আকবার ইবনে হুসাইন (রাঃ)। এরা সবাই ছিলেন হযরত হুসাইনের (রাঃ) অতি আপনজন। তাদের সকলের শাহাদাত তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

আহলে বায়েতের যুবক, কিশোর , ও বৃদ্ধের সাথে নিজের রক্ত দিয়ে হযরত হুসাইন (রাঃ) মহাসত্যের অনির্বাণ শিক্ষা প্রজ্জলিত রেখে গেছেন। তাঁদের রক্তে স্নাত হয়ে ইসলাম-রবি পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে। মাওলানা মোহাম্মাদ আলীর

www.amarboi.org

ভাষায়, "কতলে হুসাইন, আসলে মরগেয়ে হায় ইয়াজিদ, ইসলাম জিন্দা হোতা, হায় হর কারবালা কি বাদ"।

কারবালায় কুরবানীর তাৎপর্য : কারবালার প্রান্তরে আত্মত্যাগ রাষ্ট্র হতে ধর্ম পৃথকীকরণ, রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন এবং জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা জায়েয অথবা না জায়েয এ মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের জন্যেই হয়েছিল।

কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসাইনের (রাঃ) পুত্র আলী আকবার রা পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমরা কি সত্যপথে কায়েম নই? ইমাম হুসাইন (রাঃ) বলেছিলেন- নিশ্চয়ই আমরা সত্যপথে আছি। জওয়াব শুনে আলী আকবার চিৎকার করে বলেছিলেন তাহলে মৃত্যুতে ভয় কিসের !

কারবালা প্রান্তরে সর্বশেষ শহীদ ছিলেন হযরত হুসাইন (রাঃ) নিজে। আদর্শের প্রতি কত গভীর প্রত্যয় এবং একিন থাকলে নিজ হাতে শুধু সংগী নয়, একই শোণিত যাদের শিরায় প্রবাহিত তাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর যে কোলে ঠেলে দেওয়া যায়, তা বিস্ময়কর।

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা বিশ্ব মুসলিম মানস এবং চেতনাকে যতটুকু নাড়া দিয়েছে ইতিহাসের অন্য কোন ঘটনাই ততটুকু করেনি। রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথকীকরণ এবং খিলাফতকে রাজতন্ত্রে বা স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরণের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের ঐ ক্রান্তিলগ্নে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এক রুগ্ন বালক জয়নাল আবেদীন ভিন্ন আহলে বায়েতের যুবক, বৃদ্ধ, এবং শিশুকে এক একটি করে সত্য ও ন্যায়ের পথে কুরবানী হন।

শাহাদাতের আদর্শ : হযরত আবদুল্লাহ আল হুসাইন (রাঃ) জানতেন যে, এ অসম যুদ্ধে তাঁরা শাহাদাত বরণ করবেন। যাঁরা শত নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গ ছাড়তে রাজী হননি, তাঁদের শহীদী দরজা পার করে দেওয়ার পূর্বে তিনি শাহাদাত বরণ করেন নি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে নিজের এক পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন, আর হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) স্বেচ্ছায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের নির্বাচিত খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে কিভাবে নিজ প্রাণপ্রতিম সন্তানকে সাজিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে হয়, তার নজীর রেখে গেছেন।

তিনি জানতেন- ইয়াজিদের বিরুদ্ধে এ সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করবে তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ্ ও আলী আকবার, ভ্রাতুস্পুত্র কাসিম ইবনে হাসান।

www.amarboi.org

কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে জন্ম নেবে শত শত আলী আকবার, কাসিম, যাঁরা ইসলামী সম্মেলনে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদী ও নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে আসবে। আত্মদান করবে, শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা পান করবে। ক্ষমতার মসনদে প্রতিষ্ঠা নয়, ত্যাগ ও সংগ্রামই হবে তাঁদের সাফল্য এবং কামিয়াবী। শাহাদাতই হবে তাদের পুরস্কার।

উমাইয়্যা যুগের মানদন্ড : উমাইয়্যা খলিফাদের আমলে কাউকে সংগীতজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা ও মূল্যায়নের একটি মানদন্ড ছিল। যে দরাজ গলায় উন্নত মানের সংগীত পরিবেশন করতে পারতেন–তাঁকেই উলেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ বিবেচনা করা হত না।

তিনি অতি নিম্মমানের মামুলী সংগীতজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন, তবে, স্মরণীয় সংগীতজ্ঞ সাধারণত তারাই হতেন, যারা ছিলেন স্বভাব কবি এবং গীতিকার। তারা শুধু মাত্র কবিতা আবৃতি বা গায়কই ছিলেন না। বরং, তারা ছিলেন গান, কবিতা ও সংগীত রচয়িতা। সংগীতের মৌলিক রচয়িতা না হলে কোন ব্যক্তি গায়ক হলেও স্মরণীয় হওয়ার মত ব্যক্তি বলেই গন্য হতেন না।

উমাইয়্যা যুগের অন্যতম জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন মালিক আল তাঈ। যেহেতু তিনি অন্যের রচিত সংগীত পরিবেশন করতেন, তাই তিনি অনেকের দৃষ্টিতেই সংগীতজ্ঞ বলে গন্য হতেন না।

যদিও মালিক আল তাঈ সংগীতজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হতেন না, তবুও ছিলেন তিনি শুধু সংগীত রচয়িতা নন, সংগীত সাহিত্যিকও। তার রচিত বহু সংগীত সংকলিত হয়েছে। (আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানীর কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮-৭৫) [১]।

কথক মানুষ : সকল মানুষ প্রকৃতিগতভাবে শ্রবণ অপেক্ষা কথোপকথনে বেশী আগ্রহী হয়ে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ কথা বলে যায়। বিশেষ করে অসুস্থ, রোগী, বৃদ্ধ, পাগল, শিশু, কোনো কোনো নারী– কথা শুনা অপেক্ষা কথা বেশী বলতে চান।

উমাইয়্যা যুগে সংগীতচর্চা

আলাহ সুবহানাহু তায়ালা মানব জাতির মধ্যে মধুরতম কণ্ঠস্বর দিয়েছিলেন হযরত দাউদকে (আঃ)। তিনি যখন পবিত্র গ্রন্থ যাবুর শরীফ তিলাওয়াত করতেন – শুধু মানুষ নয়, আকাশের পাখী ও সমুদ্রের মৎস্য পর্যন্ত তাঁর

www.amarboi.org

আসমানী কিতাব শ্রবনের জন্যে আকর্ষিত হতো। শুধু আকাশের পাখী এবং সমুদ্রের মৎস্য নয়, মরুভূমির উট, বনভূমির হস্তি, ঘরের পিপীলিকা ও মাকড়সা, গর্তের ইঁদুর ও বিষাক্ত সর্প পর্যন্ত তাঁর মধুর ছন্দ ও সুর লহরী দ্বারা প্রভাবিত হতো।

আল্-কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ : আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালা হয়ত ধ্বনী, ছন্দ, কাব্য, সুর, ইত্যাদি পছন্দ করেন। এর একটি প্রমান হলো আল কুরআনের ভাষা। কুরআন কোনো কাব্য গ্রন্থ নয়। কিন্তু এতে কাব্যিক ছন্দ আছে। কুরআন মুখস্থ করা সহজ হয় মধুর ধ্বনী ও ছন্দ মার্ধুয্যের জন্যে।

আল কুরআনে ছন্দ ও ধ্বনি মার্ধুয্য এতো গভীর যে তিলওয়াত করে মনে তৃপ্তি আসে। আল কুরআনের ভাষা যারা বুঝেন না, তাদের হৃদয়েও কুরআন হিফজ বা তিলাওয়াত প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন লোকদের নিকট কুরআন তেলওয়াতের চেয়ে মধুরতর আর কিছু হতে পারে না। কুরআন তিলাওয়াত এতো মধুর এবং অনেকের নিকট এত সহজ যে, সমগ্র কুরআন শুধু চক্ষুস্মান নয়, অন্ধজনেও হিফজ করতে পারেন। দুনিয়ায় এমন দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই– যা লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্থ না বুঝেও নিয়মিত মুখস্থ করে থাকেন।

সুন্দর ওয়াজ : আল্লাহু তায়ালা হযরত মুসা (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুন্দর ওয়াজ (মাওয়েজাতুল হাসানা) এর মাধ্যমে ফেরাউনকে আলাহু তায়ালার পথে আহ্বান করতে। আমাদের ওয়ালী কামেল পীর বুজুর্গগণ সারারাত ধরে ওয়াজ করলে বসে বসে শুনতে ইচ্ছা হয়। তাঁদের ওয়াজের ধারা হলো ছন্দময় গদ্য। কারো কারো ওয়াজ শ্রবণের জন্যে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হন। উদ্দেশ্য নেক এবং মহৎ থাকলে আল্লাহু তায়ালা প্রদত্ত মধুর কণ্ঠস্বর চর্চার মাধ্যমে উন্নততর করে সন্তোষজনক উদ্দেশ্য এবং কর্মে তা ব্যবহার করা যায়।

রাসূলুল্লাহর যুগে সংগীত চর্চা করার মত মন মানসিকতা মুসলিমদের ছিল না বললে বোধ হয় বেশী বলা হবে না। খুলাফায়ে রাশেদিন এর আমলে কোনো কিছু করার পূর্বে মুসলিমদের মনে প্রশ্ন জাগতো– এটা ইসলাম সঙ্গত কিনা। যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ হতো, তখনই তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখতেন– এটা কি কুফর অথবা শিরক অথবা বেদাত। যার অনুমোদন তাওহীদ এবং রেসালাতে পাওয়া যেতোনা– তা নিষিদ্ধ মনে করা হতো।

www.amarboi.org

হারাম-হারামের বন্ধনে শিথিলতা : উমাইয়্যাদের আমলে হারাম হালালের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হওয়া শুরু করে। মূল আরব ভূখন্ডে কখনো বিরাট রাজশক্তি বা সেনাবাহিনী ছিলো না। যেমন ছিলো- ইয়ামেন, পারস্য, সিরিয়া ও মিশরে। রোমান, ইরানীয়ান ও মিশরীদের ন্যায় আরবগন তাদের এলাকার বাইরে কোনো সাম্রাজ্য স্থাপন ইতোপূর্বে করতে পারেনি।

ইসলামী প্রেরণা ও চেতনায় সমৃদ্ধ মুসলিমগণ শুধু আরবেই সরকার প্রতিষ্ঠা করেননি, তারা পৃথিবীর সেরা সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ পদানত করেন। এর ফলে উমাইয়্যাদের মধ্যে অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ন্যায় অহংকার, অহমিকা এবং ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্যের সৃষ্টি হয়।

উমাইয়্যা খলিফাদের মধ্যে উমার ইবন আবদুল আজিজের খিলাফতের জিন্দেগীতে তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় রাসুল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবীদের প্রতিফলন। যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন না, তবুও তিনি ছিলেন বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ের আপনজন।

উমাইয়্যাদের সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা : মদিনার খেলাফতে সংগীতজ্ঞদের কোন স্থান ছিলনা। উমাইয়্যা খেলাফতের যুগে দামেস্কে সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। শুধু যে ইরানের সংগীতজ্ঞগণ তখন দামেস্কে ভীড় জমান, তা নয়। আরব কবিগনও সংগীত চর্চা শুরু করেন। স্বাধীন আরবদের মধ্যেও সংগীতজ্ঞের আর্বিভাব হয়। এজন্য তাদের সংগীত পেশাগত পরিচিতি ও চেতনার প্রবনতা সৃষ্টি হয়।

তদানিন্তন আরবগণ বহু দেবদেবীর পুজা করলেও তাদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর একত্ববাদের ধারণা হারিয়ে যায় নি। উমাইয়্যাদেরকে মুসলিমদের মৌলিক চেতনার অবক্ষয়ের জন্য যে যে কারণে দায়ী করা হয়, তার মধ্যে তাদের সংগীত এর পৃষ্ঠপোষকতা একটি।

উমাইয়্যা যুগে খলিফাদের দরবারে সংগীতজ্ঞদের ছিল মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। শুধু নরসংগীত নয়, নারীসংগীতজ্ঞগনও মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি তিনজন উমাইয়্যা খলিফা। তারা হলেন ২য় উমর ইবনে হযরত আবদুল আজিজ, মুয়াবিয়া (রা.) এবং আবদুল মালিক। শুধু কণ্ঠ সংগীত নয়, যন্ত্র সংগীতজ্ঞগণও উমাইয়্যা দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সংগীত চর্চার তত্ত্ব গ্রন্থ : আরব সঙ্গীতের ইতিহাসের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য

www.amarboi.org

গ্রন্থগুলো হলো- আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী রচিত (মৃত্যু ৯৬৭ খ্রীঃ) "কিতাব আল আগানী"। এই বিরাট পুস্তকটি ২০ খণ্ডে রচিত। অপর একটি গ্রন্থ হলো- ইবন আল রাব্বিহী রচিত "ইকদ আল ফারিদ।" তিনি ছিলেন আন্দলুসিয়ার কর্ডোভা রাজ্যের সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের (৯১২-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) সভাকবি। অপর দুটি গ্রন্থ হলো ইবন আল কালবি (মৃত্যু ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত "কিতাব আল নাগাম" (Melody সংক্রান্ত পুস্তক) এবং "কিতাব আল কিয়ান" (সংগীত বালিকাদের ইতিহাস)।

সংগীত ও সংগীত যন্ত্র সংক্রান্ত্র বহু তথ্য উমাইয়্যা আমলের সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিব এর রচনায় স্থান পেয়েছে। ইউনুস আল কাতিব উমাইয়্যা খলিফা হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) এর সমসাময়িক ছিলেন।

উমাইয়্যা যুগের অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বহু প্রজ্ঞা ও শিল্পজনচিত ঘটনা তৎকালীন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাজার বছর পর সংগীত ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনায় হাজার গুণ বেশী সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে হচ্ছে না।

উমাইয়্যা যুগে সংগীতচর্চা সম্বন্ধে আলোচনাকালে উমাইয়্যা ও হাশেমীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ করে আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্ত াফা (সাঃ) এর সঙ্গে উমাইয়্যা ও আব্বাসিয়াদের সম্পর্ক অবহিত হওয়া প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

উমাইয়্যা যুগে আরব সংগীত

উমাইয়্যা যুগে সংগীত চর্চা পৃষ্ঠপোষকতারও রাজনৈতিক কারণ ছিল। সে যুগে সভাকবিগণ কবিতা রচনা করতেন। নিরক্ষরগণও কবি গান গাইতেন। কথা অপেক্ষা ছন্দবদ্ধ কবিতা ছিল সুখশ্রুতিমধুকর। সাধারণভাবে ছন্দবদ্ধ কবিতায় সুর আরোপ করা হলে এর আবেদন ও প্রভাব শ্রোতা হৃদয়ে গভীরতর হয় (কিতাবুল আঘানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৪)[২]।

উমাইয়্যা দরবারের কবিগণ উমাইয়্যা শাসনের প্রশংসা করে কবিতা ও কাব্য রচনা করতেন। গায়ক ও সংগীতজ্ঞগণ এ কবিতা সঙ্গীতে রূপ দিতেন। সঙ্গীতের সঙ্গে সংগীত যন্ত্রের যোগ হলে শ্রোতার আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। রজনীর

www.amarboi.org

নীরবতায় যন্ত্রবিহীন সঙ্গীতের আহ্বান হৃদয়ে গভীরতর হয়। দিবাকালে শ্রোতা আকর্ষণ করতে হলে সংগীতযন্ত্র যথাযথ হয়।

সংগীতজ্ঞগণ উমাইয়্যা দরবার থেকে সরকারী অর্থায়নে এক শহর থেকে অপর শহরে এবং জনপদে ছড়িয়ে পড়তেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত এবং গৃহীত উন্নতমানের সংগীত মুখস্থ করে নিতেন উটের কাফেলার যাত্রীগণ। (Kitabul Aghani, 2nd volume, page-153)[৩]।

সংগীতজ্ঞ ও গায়কদের মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে রাজকীয় সুশাসন ও মাহাত্বের প্রচার হত। বর্তমানে সরকারের উত্তম কাজের প্রচার যেরূপ টিভি, রেডিও এবং সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়, তৎকালে তা হত সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের মাধ্যমে।

চারণ কবি : ইসলাম পূর্ব যুগে আরব সমাজে চারণ কবিদের বৈশিস্ট্যপূর্ণ মর্যাদা ছিল। মেলা উপলক্ষে কবিতা প্রতিযোগিতা হতো। কবিতায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো। কবিদেরকে কেন্দ্র করে মেলা জমত।

ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর পূন্যাত্মা খলিফাদের যুগে মেলায় কবিতা চর্চার উৎসাহে ভাটা পড়ে। সাহাবীদের মধ্যে কবিতা শোনার আগ্রহ অপেক্ষা হাদীস শোনার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। শুধু কবি নয়, অকবিরাও যতটুকু সম্ভব হাদীস মুখস্থ করত এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ হলে আল কুরআনের আয়াত ও হাদীস শুনাত।

সূফীদের মরমী সংগীত চর্চা : হাসান আল বাসরী ছিলেন একজন ইরাকী সূফী সাধক (মৃঃ ৭২৮ খ্রীঃ)। তিনি বলেছেন আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে গিনা বা সংগীত সহায়ক। এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার অনুভূতি দৃঢ় হয়, যদি ঐ সঙ্গীতের ভাবধারা তৌহিদ ভিত্তিক হয় (ইবন আবদ রাব্বিহী : ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯)[৪]। সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি বৃদ্ধির পদ্ধতি অতীতে গ্রহণ করা হতো। এই পদ্ধতি উন্নয়নে সূফীগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

জালাল উদ্দিন রুমীর মসনবী শরীফ গদ্য গ্রন্থ নয়। বরং ছন্দ বদ্ধ পদ্য কাব্য। গদ্য মুখস্থ করা খুব কঠিন। খুব কম লোকই ইতিহাস বা গল্প গ্রন্থ মুখস্থ করতে পারেন। কিন্তু মাইকেল মুধুসুদনের অমৃতাক্ষর ছন্দের মেঘনাথ বদ কাব্য মুখস্থ করনে অনেকেরই দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়।

ছন্দবদ্ধ কবিতার বাক্য মুখস্থ করে বার বার আবৃত্তি করলে হৃদয়ের ওপরে তাছির বা আছর পড়ে। তাছির শব্দটির অর্থ প্রভাব।

www.amarboi.org

ইসলামে মুর্তি পূজা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কুফর, শিরক নিষিদ্ধ হলেও নব পোশাকে এর আবির্ভাব হয়। বিদ'আত দূর করা আরো কঠিন। জ্বীন, সংখ্যা, যাদু, ইত্যাদিতে বিশ্বাস বহু মুসলিমের এখনো আছে। জ্বীনের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু জীনের কাহিনীগুলো কতটা সত্য, তাতে অনেকেরই সন্দেহ আছে।

বাউল সংগীত : ইউরোপে মধ্য যুগে সংগীতজ্ঞগণ ছিলেন ভবঘুরে বা বাউল শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত। সফলকাম ভবঘুরে সংগীতজ্ঞগণ যেখানে যেতেন, তাদের গানে ও কণ্ঠস্বরে শ্রোতা আর্কষিত হতো।

অভিজাত এবং বিত্তশালীদের গৃহে ভবঘুরে সংগীতজ্ঞগন অতিথি হিসেবে আপ্যায়িত হতেন। সম্মানী হিসেবে অর্থ সাহায্য তারা পেতেন। এর ফলে সংগীতজ্ঞগণ ইউরোপ এবং এশিয়ায় একটি পেশাগত শ্রেণী হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

ইমাম জাফর সাদীক (মৃঃ ৭৬৫ খ্রীঃ) : ইমাম জাফর সাদীক সংখ্যার সাহায্যে সংখ্যাগত দ্বীনি আমল করার তত্ত্ব শিখাতেন। কোনো একটি শব্দ বা শব্দ সমষ্টির উচ্চারণ একই সংখ্যাগত রিপিটেশন করা হলে তা ছন্দ এবং সুর রূপে নেয়। সঙ্গীতের সঙ্গে অংকের সংখ্যাগত মিল আছে।

কারো কারো মতে কবিতা এবং ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক গজল, গানও আইন সঙ্গত সংগীত। কিন্তু, যাদু টোনা বেআইনী হলেও তা মুসলিম সমাজে চলছে। 'ইবনআবদ রাব্বিহি রচিত "ইকদ আল ফরিদ" গ্রন্থে একটি অধ্যায় আছে যাতে সংগীত শুনতে শুনতে বা গান গাইতে গাইতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বেহুশ হয়ে যেতেন, এমন কি কেও কেও মরেও যেতেন– তাদের বর্ণনা আছে। (ইকদ আল ফরীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৯)[৫]।

দাসদের সংগীত চর্চা : মুসলিম সমাজে দাস ও প্রভুর পার্থক্য ছিল অতি ক্ষীণ। কিন্তু সামাজিক মর্যাদায় দাসগণ কিছুটা পেছনে ছিল। হযরত বিলাল (রাঃ) ইবনে রাবিয়াকে "কালো নারীর সন্তান" বলায় হযরত উমারকে (রাঃ) তিরস্কার সুচক "জাহেল" শব্দটি নবী (সাঃ) কণ্ঠ হতে শুনতে হয়েছিল। তার মধ্যে "জাহেলিয়াতের" উপাদান তখনও আছে– এরূপ কথা রাসূলুল্লাহর মুখে শুনে হযরত উমারের (রাঃ) ন্যায় একজন শিক্ষিত আরবের সারা জীবনের জন্য শিক্ষা হয়ে যায়।

যে বেলালকে (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ) কালো নারীর সন্তান বলেছিলেন তাকেই হযরত উমার (রাঃ) বাকী জীবন "সাইয়্যেদেনা বিলাল" সম্বোধন করেছিলেন। এমনকি তাকে আমীর নিয়োগের পরও। সাহাবীদের মধ্যে মুক্ত

www.amarboi.org

আরব এবং কৃষ্ণকায় দাসদের মধ্যে কোন মর্যাদাগত পার্থক্য ছিল না। দাস প্রথা তখনও বিলোপ হয়নি। তাই মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য দাসগণ সংগীতকে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি হিসাবে ধরে নিত।

এ কারণে হয়ত বহুকাল পূর্ব থেকেই দাসদের মধ্যে সংগীত চর্চা ছিল এবং সংগীত শুনিয়ে তারা প্রভুদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন। উমাইয়্যা যুগে স্বাধীন আরবগণও সংগীতকে তাদের অন্যতম পেশা হিসাবে অবলম্বন করতেন। মুক্ত আরব সংগীতজ্ঞগণ "মাওয়ালী" নামে অবিহিত হতেন।

সরকারী কর্মকর্তাদের সংগীত চর্চা : উমাইয়্যা যুগে সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত ব্যক্তিদেরকেও সংগীতচর্চাকে তাদের অন্যতম পরিচতি হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। "ইউনুস আল কাতিব" ছিলেন মদিনার পৌর প্রশাসনের একজন সম্মানিত কর্মকর্তা। পৌর প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে ইউনুস আল খাতীব ইতিহাসে স্থান পান নি। তবে তার নাম সংগীত চর্চা প্রসঙ্গে উচ্চকিত হয় এবং সে পরিচয়ে তিনি ইতিহাসে নিজের পরিচয় করে নিয়েছেন।

"বুরদান" ছিলেন মদিনার অন্যতম প্রধান কবি। মদিনা নগর প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। ইতিহাসে তিনি স্থান পেয়েছেন উমাইয়্যা যুগের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ হিসেবে। (আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী: Kitabul Aghagi, 7th Volume, page-১৬৮)[৬].

অভিজাত আরবদের সংগীত চর্চা : ইসলাম প্রচারের পর গান বাজনা দাস শ্রেণীর পেশা হয়ে দাড়িয়েছিল। অভিজাত আরবগণ যে গান, বাজনা, নৃত্য, সংগীতে আগ্রহী ছিলেন না, তা নয়। আরব কবি এবং আভিজাতরাও সংগীত চর্চা করতেন। এ অভিজাত ও সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান আরব সংগীতজ্ঞ ছিলেন "মালিক"।

ফার্শিয়ানদের সংগীত চর্চা : আরবগন ছাড়াও উমাইয়্যা যুগে ফার্শিয়ান সংগীতজ্ঞগণ আরবে চলে আসেন–বিশেষ করে সিরিয়ায়। পার্শি সংগীতজ্ঞদের কদর ও মর্যাদা ছিল পারস্য রাজ দরবারে। মুসলিমগণ কর্তৃক পারস্য দখলের পর পারস্য রাজদরবার উঠে যায়। সংগীতজ্ঞগণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাহীন এতিমে পরিণত হন।

ইরানে স্বাধীন নাগরিক ও অভিজাত শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তি সংগীতে উৎসাহিত হলে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিত্ত বিনোদনে বা পেশাগত ভাবে সংগীত

www.amarboi.org

চর্চা গ্রহণ করতে পারতেন। এতে কারো কিছু বলার থাকত না। কিন্তু ইসলামে সংগীত নিরুৎসাহিত এবং নিষিদ্ধ থাকায় সংগীতজ্ঞদেরকে অবমাননার চোখে দেখা হত।

পারস্য এবং বাইজানটিয়াম প্রভাবে আরবীয় সংগীত ধারার ওপর বিভিন্নরূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তা সত্বেও উমাইয়্যা আমলে সংগীত চর্চায় আরবীয় মূল ধারা প্রভাবশালী ছিল। উমাইয়্যাদের সঙ্গীতের ধারা উমাইয়্যা খেলাফতের পতনের পরে আনদালুসিয়ায় (স্পেন) প্রবর্তিত হয়। আব্বাসিয়া আমলে সংগীত চর্চার নতুন আরবীয় ধারা সৃষ্টি হয়।

সংগীতজ্ঞদের আর্থিক অবস্থা : সফল ও সার্থক সংগীতজ্ঞদের জীবনযাত্রার মান ছিল উন্নত। তাদের আবেদন ছিল রাজদরবারে, অভিজাতদের প্রাসাদে, ধনী বুর্জুয়াদের গৃহে এবং বহুবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে। এজন্য তারা সম্মান, প্রশংসা, অভ্যর্থনা, উপহার ও উপঢৌকন ও আর্থিক সম্মানী পেতেন। আরব দেশের একটি প্রবাদ ছিল "রজতমুদ্রা ছাড়া সংগীত হলো আতর ছাড়া মৃতদেহের অনুরূপ" (Burck Hards ; Arab Proverb, Page- 464)[৭].

উমাইয়্যা যুগে অভিজাত ও বিত্ত শ্রেণীর সম্পদ আশাতীত বৃদ্ধি পায়। কারো কারো বিলাস ভবনও সংগীত ভবন হিসেবে পরিচিত হয়। কেও কেও তাদের অবসর সময় সংগীত ভবনে কাটাতেন।

সংগীতজ্ঞগণ এ সমস্ত ভবনে গায়িকা বালিকাদের সংগীত প্রশিক্ষণ দিতেন। গৃহে সংগীত পটিয়সী দাসী বা খাদিমা না থাকলে তা অনেক অঞ্চলে অভিজাত গৃহ হিসেবে বিবেচিত হতো না।

হজ্জের সময় মদিনায় মহিলা সংগীতজ্ঞ জামিলা যে সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, সেখানে সংগীত পরিবেশনকারী নারী এবং শ্রোতাদের মধ্যে পাতলা পর্দা ছিল। (কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড,পৃষ্ঠা-১৫৭)[৮]।

আয়েশা বিনতে তালহার বাসভবনে মহিলা সংগীতজ্ঞ "আজ্জা আল মাইলা" কুরাইশ অভিজাত মহিলাদের সম্মানার্থে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা ছিল। (কিতাবুল আঘানী, ১০ম খন্ড,পৃষ্ঠা -৫৫)[৯]।

এক অনুষ্ঠানে দেখা যায় সংগীতজ্ঞ "ইবনে সুরাইজ" এবং মহিলা সংগীতজ্ঞ "আজ্জা আল মাইলা" এক সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। সংগীতানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সুকাইনা বিনতে আল-হুসাইনের (রাঃ)

www.amarboi.org

বাসভবনে। ঐ অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা বা ব্যবধান ছিল না। (কিতাবুল আঘানী, ১৫তম খন্ড,পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২)[১০]।

অভিজাত শ্রেণীর বাসভবনে উম্মুক্ত অবস্থায় সংগীত বালিকাদের সংগীতানুষ্ঠানে সামাজিক বিধিনিষেধ তেমন করাকড়ি ভাবে আরোপ করা হতো না। খোলাখুলি অনুষ্ঠান নির্ভয়ে অনুষ্ঠিত হত। এতে অতিথিদেরকেও সংগীত পরিবেশনের জন্য আহবান করা হত। (ইবন আবদ রাব্বিহিঃ ইকদ আল ফরিদ তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮)[১১]।

মক্কা মদীনায় সংগীতচর্চা : সিরিয়ায় উমাইয়্যা রাজশক্তি দৃঢ় হওয়াকালে মক্কার পরিবেশ হয়েছিল অত্যধিক রক্ষনশীল এবং গোড়া ধর্মীয় প্রবণতার আবাসস্থল। অন্যদিকে মদিনাবাসীদের দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল অপেক্ষাকৃত উদার। তা ছাড়া, এক পর্যায়ে রাজধানী মদিনা থাকার কারনে হয়ত মদিনায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের আর্বিভাব হয়েছিল উমাইয়্যা আমলে। তবে মক্কা পেছনে পড়ে থাকে নি। মক্কায় সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল ছিলেন “ইবন মিসজাহ”।

মদিনায় সংগীতের চর্চা ও প্রসার বেশী হওয়ার কারণ কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। মদিনা ছিল মুসলিম খেলাফতের রাজধানী। পারস্যের রাজদরবার বিলোপের পর তথাকার সংগীতজ্ঞগন পৃষ্ঠপোষকতায় আশায় প্রথমে আসে মদিনায়। মদীনায় তারা অন্য পেশা অবলম্বন করলেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সীমিত আকারে ধর্মনিরপেক্ষ সংগীত চর্চা ছিল। ফলে সংগীতের নতুনধারা মদিনায় শুরু হয়।

উমাইয়্যা আমলে শুধু সংগীতের উপস্থাপনা ও বাস্তব চর্চাই উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা নয়। সংগীতের তাত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন কলা কৌশল উন্নত হয়েছিল। ঐতিহাসিক “আল মাসুদী” লিখেছেন যে, প্রথম ইয়াজিদের আমলে (৬৮০-৬৮৩) ব্যাপক ভাবে মক্কা মদিনায় সংগীত চর্চার প্রসার ঘটে। (আল মাসুদী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭)[১২] একই অভিমত অন্যরাও প্রকাশ করেছেন। (জুরহি জাইদান, পৃষ্ঠা-১৩৯)[১৩]।

কারো কারো ধারনা মদিনায় সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা মক্কা অপেক্ষা কম হত। কিন্তু অনেকের মতে মক্কা অপেক্ষা মদিনার পরিবেশ ছিল অধিকতর ধর্ম নিরপেক্ষ। (ইবন আল কিবরিয়া; ইবনে খাল্লিকান: বাইয়োগ্রাফিক্যাল

www.amarboi.org

ডিকশনারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯)।

আবদুল্লাহ ইবন জাফর এর সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা : সে যুগের বিখ্যাত মহিলা সংগীতজ্ঞ জামিলা একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন "আবুদল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) ইবনে আবু তালিব এর সম্মানার্থে। এ অনুষ্ঠানে সংগীতজ্ঞা জামিলার বাসভবনে যে সমস্ত সংগীত বালিকাগণ সংগীত প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল তারা সুন্দর পোষাকে বিকশিত হয়ে সংগীত পরিবেশন করেন এবং এতে শ্রোতা ও শিল্পীদের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। (কিতাবুল আঘানী ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬)[১৪]।

ক্ষীণ পর্দার আড়াল থেকে সংগীত : সংগীত পরিবেশনের বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। খলিফারা বিবেচিত হতেন ধর্মীয় প্রধান হিসেবে। আমীর হিসেবে তারা মসজিদে ইমামতিও করতেন। এজন্য নারী সংগীতজ্ঞগণ খলিফাদের মুখামুখী হয়ে সংগীত পরিবেশন করতেন না। সংগীত পরিবেশিকা থাকতেন অতি পাতলা পর্দার আড়ালে। (আল-মাসুদী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮)[১৫]।

তবে দরবারে অমাত্যদের সংখ্যা সীমিত হলে নারী সংগীতজ্ঞরা খলিফাদের মুখোমুখি হয়ে সংগীত পরিবেশন করতেন। যদি রাজ পরিবারের মহিলারা দরবারে উপস্থিত থাকতেন, তখন অবশ্যই সংগীত পরিবেশন কালে পরিবেশিকাগণ পর্দার আড়ালে থাকতেন। ব্যতিক্রমও ঘটত। (কিতাবুল আঘানী ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৯)[১৬]।

কখনো কখনো উমাইয়্যা খলিফা এবং সংগীতজ্ঞগণ সংগীত পরিবেশনের সময় মুখোমুখি থাকতেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, খলিফা এবং সংগীতজ্ঞ একই আসনে উপবিষ্ঠ ছিলেন। (কিতাবুল আঘানী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭)[১৭] নারী সংগীত বালিকাগণ অধিকাংশ সময়ই পাতলা পর্দার আড়ালে থেকে সংগীত পরিবেশন করতেন।

আরব সঙ্গীতের ইতিহাস : আরব সঙ্গীতের ইতিহাস প্রথম সংকলন শুরু করেন উমাইয়্যা আমলের সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিব। তার সংগ্রহের মধ্যে আছে সংগীতজ্ঞদের জীবন তথ্য এবং তৎকালীন আরব সঙ্গীতের বর্ণনা।

আরব সংগীত উন্নয়নে যারা অমূল্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে মুহরিজ এবং তার ওস্তাদ মিসজাহ। (কিতাবুল আঘানী, পৃষ্ঠা-৭০)[১৮]।

www.amarboi.org

ইবন আল কালবি (মৃত্যু ৮১৯ খ্রীঃ) রচিত "কিতাব আল নাগাম" (সঙ্গীতের গবেষনা সংক্রান্ত পুস্তক) এবং "কিতাব আল কিয়ান" অত্যন্ত মূল্যবান উৎসমূলক রচনা। কিতাব আল কিয়ান হলো- সংগীত বালিকাদের ইতিহাস।

আরব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ : হিজাজের বাইরের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উমাইয়্যা যুগের উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ ছিলেন- (১) নাশিত আল ফারিসী, (২) আবূ কামীল আল বুজাইল দামেস্কি, (২) ইবন তানবুরা ইয়ামেনী এবং (৪) হুনাইন আল হিরী। বংশগতভাবে ইরাকী, দামেস্কী, ইয়ামেনী হলেও তারাও মূলত ছিলেন জন্মগতভাবে আরব।

হিজাজ অঞ্চলে উমাইয়্যাদের সময়ে সংগীত চর্চা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইরানের নওমুসলিমদের মধ্যে সংগীত চর্চা নিষিদ্ধতার অনুভূতিটাই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামপূর্ব আরবে মৃদু সংগীত চর্চার যে ঐতিহ্য ছিলো- সিরিয়া ও ফারসীয়ান প্রভাবও তাতে যুক্ত হতে থাকে। প্রাথমিকভাবে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সংগীত চর্চা পুনরায় শুরু হয়। এর পর ইরানী ও রোমান সংগীত ধারা ও ছন্দের প্রবর্তন আরবে দেখা দেয়।

"নাশিত আল ফারিসী" নামে একজন পারসিয়ান সংগীতজ্ঞের উল্লেখ কোথাও কোথাও আছে। উমাইয়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের মধ্যে তেমন কোনো বিখ্যাত ইরানী, সিরিয়ান, এমন কি ইরাকী সংগীতজ্ঞ দেখা যায় না।

হিজরতের পরে ১০০ বছরের মধ্যে কোনো সিরিয়ান অনারব সংগীতজ্ঞের গভীর প্রভাব দেখা যায় না। আরব না হলেও প্রায় সকলেই ছিলেন আরবী ভাষাভাষী। উমাইয়্যা যুগের ইরানীয়ান বংশোদ্ভুদ সংগীতজ্ঞ যারা ছিলেন, তাদের জন্ম এবং শিক্ষা হয়েছিলো আরবেই।

www.amarboi.org

আরব সংগীত যন্ত্র

সংগীত যন্ত্র : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রাঃ) মক্কায় কাবা ঘর সংস্কারের জন্য ৬৮৪ খ্রীঃ পারস্য দেশ থেকে রাজমিস্ত্রি এবং নির্মাণ কাজের শ্রমিক আনয়ন করেন। তাদের সাথে পারস্য দেশীয় উদ বা বীনা বাদ্যযন্ত্র ছিলো। মক্কার সংগীতজ্ঞ ইবনে সুরাইজ তাদের বীণা ধার করে নিয়ে তা বাজান এবং সুরে সুরে আরবী সংগীত রচনা করেন। (কিতাবুল আগানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৮)[১৯]। আরব সংগীত কলা ছিল সহজ, সরল, বোধগম্য, জটিলতাহীন।

পারস্য সংগীতে সংগীতযন্ত্রের ছিল অধিকতর গুরুত্ব। পারস্য প্রভাবে আরবে যন্ত্র সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। পারস্য এবং সিরীয়া হতে উন্নত মানের সংগীত যন্ত্র আমদানী শুরু হতে থাকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও আরবী সংগীতের যে রিদম এবং মেলোডি ছিল, উমাইয়্যা আমলে এগুলো আরো উন্নত ও স্পষ্টতর করা হয়।

উমাইয়্যা যুগে সংগীতের ইকাত বা রিদমিক মোডের ছয়টি উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলো ১. থাকিল আউয়াল (প্রথম সানী) ২. থাকিস সানি (দ্বিতীয় সানী) ৩. খাফিফ তাকিন ৪. হাজ্জাজ ৫. রমন ৬. তানবুরি। এই ছয়টির মধ্যে দুইটির প্রবর্তন হয় উমাইয়্যা যুগে এবং একটি (রমন) প্রবর্তন করেন ইবন মুহরিজ। (কিতাবুল আঘানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫২)[২০]।

'ইবনে মুহরিজ' সংগীত চর্চায় এত খ্যাতিমান ছিলেন যে,"তাকে সংগীত জগতের শ্রেষ্ঠতম আখ্যা দেয়া হয়েছে"। কোন কোন সমালোচক তাকে হার্প বা বাদ্যযন্ত্র বাদক (Harpist) এবং সান্নাজ নামক সংগীত যন্ত্রবাদকও বলেছেন। (Nicholson: Literary History Of The Arabs: Page ১২৩)[২১]।

আরবী ভাষায় সংগীতসূচক শব্দকে মাতনা বা মতন এবং মাতলাত নাম দেয়া হয়েছে। বীণার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তারের সুরে পারসী প্রভাবও অত্যধিক। (Henry George Farmer: History of Arabian Music. Facts for the Arabian Musical Influence, Appendix, 24)[২২].

আরবী, তবলা, Drum (ঢাল), এবং দফ যন্ত্রের তলভাগ হতো চারকোনা। বাদ্যযন্ত্রের সহায়ক যন্ত্র হিসেবে হৃদম গণনার জন্য তাম্বুরা ব্যবহার হতো। (কিতাবুল আঘানী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬২)[২৩]।

ইরাকে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র ছিলো–তাম্বুরা (Pandore), উদ বা বীণা ইত্যাদি। এগুলো তৈরীতে যে তারের ব্যবহার হতো–এ তারগুলোতে ব্যবহৃত

www.amarboi.org

হতো– জীর এবং বাম। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮১)[২৪]।

উমাইয়্যা আমলে হেজাজ এবং সিরীয়াতে তাম্বুর (Pandore) বহুল ভাবে প্রচলিত হতে শুরু করে।

মিজমার কাঠের তৈরি। মিজমারে যে Melody সৃষ্টি হয় -- তা হলো সুর প্রধান ও মোটা। এই সুরকে সুর ও গভীরতর কার্যে সহায়তার জন্য ব্যবহার হয় উদ (বীণা) যন্ত্র। (কিতাবুল আঘানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২১)[২৫]। কাদিফ ব্যবহার হতো হৃদম গভীরতর করার কাজে। (কিতাবুল আঘানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৯)[২৬]।

যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার হয় বড় ঢোল (Drum) এবং Cattle Drum। কাদিফ (wand) জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার হয় হৃদম গভীরতর করার কাজে। (কিতাবুল আঘানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯)[২৭]।

উমাইয়্যা কালে আরবি উদ (Ud), ফারসী (বীণা)-এর ব্যবহার চালু হয়েছিলো। (কিতাবুল আগানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮)[২৮]।

'বীণা' ফিঙ্গার বোর্ড সংক্রান্ত উদ (বীনা) চর্চা হতো। আরবী বীণা বা উদ উমাইয়্যা আমলে পারসী বীণার রূপ ধারণ করে। বীনার মধ্যে প্রথম এবং চতুর্থ তারের নাম জির এবং বাম। এ শব্দ দু'টি পারস্য ভাষা হতে উদ্ভূত। আরবীতে ব্যবহৃত দাসতান শব্দটি পারস্য ভাষাগত।

আব্বাসিয়া আমলে সংগীতজ্ঞ 'জালজাল' আবিষ্কার করেন 'উদ আল শাব্বুত' অর্থাৎ আরবী বীনা। ফারসীয়ান উদ বা বীণা "বারবাত" নামেও অভিহিত হতো।

অজ্ঞতার যুগের আরব সংগীত যন্ত্র উদ বা বীনা, তানম্বুর (Pandore), মিজাফ (Barbiton), মিজমার (Reed-Pipe), ইত্যাদি উমাইয়্যা যুগে ব্যাপক ব্যবহার হয়। এ যন্ত্রগুলো পারস্যেও প্রচলিত ছিলো। তবে পারস্যের সংগীত যন্ত্র ছিলো উন্নততম মানের।

ঐতিহাসিক আল কিনদি লিখেছেন যে আরব সংগীত তত্ত্ব "আসটুকুশিয়্যা" থেকে গ্রীক সংগীত তত্ত্ব সম্পূর্ন পৃথক। বাইজানটাইন প্রভাবের ফলে পিতাগরিয়ান সংগীতের মাপ বা স্কেল আরবীতে এসেছে।

মাজরা আল জিনসির বা পুরুষ সংগীত কলা এবং মাজরা আলকুজতা বা নারী সংগীত কলা বা বিধির পার্থক্য আরবী সংগীতে ছিল না।

এগুলো এসেছে সালভিয়ান বা পিতাগরিয়ান সংগীত তত্ত্ব থেকে। কারো কারো মতে সংগীতে এ সমস্ত কলা কৌশলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাচীন সেমেটিক সংগীত দর্শন তত্ত্বেও ছিল।

www.amarboi.org

উমাইয়্যা আমলে পারস্য ও বাইজানটাইন প্রভাব আরব সংগীতে পড়েছিল। কিন্তু, আধুনিক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতে পারসিয়ান এবং বাইজানটাইন সংগিত কলা কৌশল আরব সংগীত কলা কৌশলকে প্রভাবিত করলেও তাতে মূল আরবী ধারা (P N Land: Remarks on the Earliest Development of Arabic Music, page-156) পরিবর্তিন হয়নি বরং আরবী সংগীতে মৌলিকত্ব সংরক্ষিত হয়েছে।[২৯].

তৃতীয় উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩-৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)

ইয়াজিদ ইবনে মোয়াবিয়ার পর খলিফা মনোনীত হন ইয়াজিদের পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩–৬৮৪) এবং মারওয়ান ইবন হাকাম (৬৮৪-৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তারা অতি অল্প সময় খলিফার মসনদে ছিলেন। ফলে সে যুগের রাজনৈতিক সমাজ, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ওপর তারা কোন প্রভাবই ফেলতে পারেন নি।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবন আফফান (রাঃ) এর আমলে মারওয়ান ইবনে হাকাম খলিফাকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করত। হযরত মুয়াবিয়ার আমলেও সে ছিল খলিফার সুভাকাঙখী, বুদ্ধিদাতা ও আত্মীয়। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তার থেকে বুদ্ধি নিলেও তিনি নির্ভর করতেন নিজের বুদ্ধির ওপর। যে কাজ হযরত মুয়াবিয়া করতে চাইতেন না, তা করতে হলে মারওয়ানের সঙ্গে আলোচনা করেই করতেন। লোকজন এই জন্য দায়ী করত মারওয়ানকে।

উমাইয়া এর পৌত্র এবং কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান (ইবন হারব) এর পুত্র হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তার আপন চাচাতো ভাই মারওয়ানকে (ইবনে হাকাম ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়্যা) মদীনা ও হিজাজের গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। এক পর্যায়ে তাকে হযরত মুয়াবিয়াই দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন।

কারবালা হত্যাকান্ডের পর মদীনার জনগণ মারওয়ানকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। কারন, তিনি মদীনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে হযরত হুসাইন ইবনে আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে মারওয়ান ইবনে হাকাম সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবার আশ্রয়ে মদীনায় ফিরে আসে। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাকে মদীনার জনগণ

www.amarboi.org

পুনরায় মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। তখন সে দামেস্কে ইয়াজিদ পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইয়াজিদ পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর (৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ইয়াজিদের দ্বিতীয় পুত্র খালিদ খেলাফতে উৎসাহী ছিলেন না। এ সময় মুয়াবিয়া পরিবারে খেলাফত সংক্রান্ত বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এ অনিশ্চয়তার সুযোগে কুফার কুচক্রী আমীর উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ইবন আবু সুফিয়ান মারওয়ানকে খেলাফতের দাবীদার হতে প্ররোচনাদেয়। কারবালার হত্যাকান্ডের পর উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিজ অস্তিত্ব ও স্বার্থে খেলাফতে আসীন ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন ছিল।

এ প্রেক্ষাপটে "জাবিয়া" নামক স্থানে তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর স্থির হয় যে, আপাতত মারওয়ান ইবনে হাকাম খলিফা পদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং ইয়াজিদের পুত্র খালিদকে তার উত্তারাধিকারী নিয়োগ করবেন।

চতুর্থ উমাইয়্যা খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকাম
(৬৮৪-৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)

ইয়াজিদের স্ত্রীকে বুঝানো যে, তার পুত্র খালিদ অল্প বয়সের কারনে খলিফা হলেও দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে খলিফা পদে থাকতে পারবেন না। এ প্রেক্ষাপটে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইয়াজিদের পুত্র খালিদের পক্ষ থেকে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং ইয়াজিদের পুত্র খালিদ বয়প্রাপ্ত হলেই খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হবেন।

বিষয়টিকে বিশ্বস্থতা দেয়ার জন্য কুটিল ও দুর্মতি মারওয়ান ইয়াজিদের পত্নীকে বিবাহ করেন। খলিফার পদ দখল করার পরেই মারওয়ান ইবনে হাকাম স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তার পুত্র আব্দুল মালিক হবেন তার উত্তরাধিকারী খলিফা। তিনি তার দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল আজিজকে নিয়োগ করলেন মিশরের আমীর।

মারওয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার বিক্ষুপ্ত ইয়াজিদ পত্নী তার নতুন স্বামী মারওয়ানকে মারাত্মক ভাবে আহত করেন। এ আঘাত মারওয়ান সেরে উঠতে পারেন নি। কিছু কালের মধ্যেই ৬৫ হিজরীর রমজান মাসে (৭ই মে ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) মারওয়ান দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

www.amarboi.org

মতান্তরে বলা হয় যে, তার নবপরিণীতা স্ত্রী এবং খালিদ ইবনে ইয়াজিদের মাতা বিষ প্রয়োগে মারওয়ানকে হত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে মারওয়ান তার সুযোগ্য ও বিচক্ষণ পুত্র আবদুল মালেককে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করে যান।

খলিফা হবার পূর্বে মারওয়ান মদীনার আমীর ছিলেন। তিনি সে সময়ে একটি ভাল কাজ করেন। ঐ সময় মুখান্নাস বা মুখান্নাসুন নামের ব্যক্তিরা তবলা, সাহীন, গিরবাল, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত। তিনি এই মুখান্নাস শ্রেণীর বাদক এবং সংগীতজ্ঞদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ তুওয়াইস'ও ছিলেন।

খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) এর পিতামহ আবুল আস এর পিতা ছিলেন উমাইয়া । অন্য দিকে মারওয়ান ইবনে হাকামের পিতামহ আবুল আস এর পিতা ছিলেন উমাইয়া। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পিতামহ হারব এর পিতা ছিলেন উমাইয়া। অর্থাৎ উমাইয়া ছিলেন তিনজন (উসমান, মুয়াবিয়া, মারওয়ান) খলিফার প্রপিতামহ। এরূপ সৌভাগ্য অন্য কোন কাফিরের হয়নি।

পঞ্চম উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক
(৬৮৫-৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ)

মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র আব্দুল মালিক খেলাফতের মসনদে আসীন হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। হযরত মুয়াবিয়ার (৬৬১-৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ) পর আবদুল মালিকের শাসন ছিল দীর্ঘস্থায়ী বিশ বছর করে। তার সময়ে মুসলিম খেলাফত সম্প্রসারিত এবং সুসংহত হয়। ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছরের কম সময় খলিফা পদে আসীন ছিলেন- (১) ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া (৬৮০-৬৮৩ খ্রী) (২) দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ), (৩) মারওয়ান ইবন হাকাম (৬৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আবদুল মালিক যখন তার খলিফা পদে মনোনীত হওয়ার খবর পান, তখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। খবর পাওয়ার পর তিলাওয়াত তিনি সম্পন্ন করেন। কুরআন মুবারক বন্ধ করে কপালে, নাকে, চোখে, মুখে, বুকে স্পর্শ করান। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলেন "হে আল কুরআন। তোর সঙ্গে কত গভীর ছিল আমার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বোধ হয় দুর্বল এবং ছিন্ন হতে লাগল।" কারো কারো মতে এ ঘটনাটি ঘটে ছিল তার পিতার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর।

www.amarboi.org

আবদুল মালিক ছিলেন একজন স্বভাব কবি। কাব্য রচনায় তাঁর ছিল দক্ষতা। তিনি কবি ও লেখকদের ভালবাসতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। (Muir: Caliphate page 344;[৪০] আল মাসুদী, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১০)[৪১]।

খলিফা আব্দুল মালিক এর সঙ্গীতের প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল। তিনি কিন্তু রাজনৈতিক কারনে তা প্রকাশ করতেন না। ধর্মপ্রাণ সংগীতজ্ঞদের সম্মুখে তিনি সংগীতবিরোধী বক্তব্য রাখতেন এবং সংগীত যে তার পছন্দনীয় নয়, তা তিনি অবলীলাক্রমে বলতেন।

দরবারে উপস্থিত বহু ব্যক্তির সম্মুখে আবদুল মালিক একদিন বলেন যে, সংগীত হলো পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ। এটা নারীসুলভ ব্যক্তিদের পছন্দনীয় কর্ম। কোন আত্ম-মর্যাদাশীল ব্যক্তি সংগীতজ্ঞ হতে পারে না।

খলিফার সম্মুখে তখন উপবিষ্ট ছিলেন খলিফার প্রিয়ভাজন সংগীত সাধক এবং কুরাইশ রত্ন আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. ইবনে আবু তালিব। তিনি সংগীত সম্পর্কে খলিফার এরূপ রুঢ় মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৮)[৪২]।

অন্য এক উপলক্ষ্যে খলিফা আব্দুল মালিক তার দরবারে উদ (বীনা) নামক বাদ্য যন্ত্রটি কি এবং কি ধরনের ধ্বনি তা থেকে সৃষ্টি হয়- এ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উদ ছিল সেকালে প্রচলিত বিনা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

আব্দুল মালেকের উদ সম্পর্কে অজ্ঞতা সুলভ মন্তব্যে দরবারে তার একজন প্রিয়পাত্র রসাত্মক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন উদ দ্বারা কি ধরনের সুর ও স্বর নিগৃত হয়, তা খলিফা ভালভাবে জানেন এবং দরবারে যারা উপস্থিত আছেন, তারাও যন্ত্রটি সম্পর্কে জানেন।

উক্ত সভাসদ আরো বলেন দরবারের মধ্যে উদ বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সবচেয়ে অবহিত ব্যক্তি হলেন খলিফা আব্দুল মালিক নিজে। খলিফা আব্দুল মালিক তার প্রিয় সভাসদের মন্তব্যে রাগান্বিত না হয়ে হেসে উঠলেন (গ্রন্থঃ হালবাত আল-কুমাইত)।

সে যুগের সংগীত চর্চা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "কিতাবুল আঘানিতে" উল্লেখ আছে যে, খলিফা আব্দুল মালিক সংগীত সম্পর্কে ছিলেন সুপরিচিত। তার প্রিয় সংগীত ছিল "হাদা" (উট চালকের গান) "ঘিনা আল রুকবান" এবং "ঘিনা আল-মুতকান"। সে যুগের দুই জন সংগীতজ্ঞ ছিলেন- (১) ইবন মিসজাহ এবং (২) গুদাই-ই আল-মালিহ। খলিফা আব্দুল মালিক ছিলেন তাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যদাতা।

www.amarboi.org

খলিফার ভ্রাতা বিশর ইবনে মারওয়ানও ছিলেন সঙ্গীতের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক। (Henry George Farmer: A History of Arabic Music, পৃষ্ঠা-361)[৪৩]।

মক্কার সংগীতজ্ঞ ইবন মিসজাহ্ : আবূ উসমান সাইদ ইবন মিসজাহ্ ছিলেন উমাইয়া যুগের (৬৬১-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সর্ব প্রথম প্রখ্যাত এবং অনেকের বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ। তার জন্ম হয় মক্কায় ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে। মৃত্যু হয় ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইবন মিসজাহ (মিসজাহ্ পুত্র) ছিলেন বানু জুমাহ্ গোত্রের দাস শ্রেণীভুক্ত। দাসপুত্রের অসাধারন সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মিসজাহ্ এর মনিব তাকে মুক্ত করে দেন।

এই ঘটনাটি ঘটে খলিফা প্রথম মুয়াবিয়ার আমলে (৬৬১-৬৮০) খ্রীষ্টাব্দে। তিনি পারস্য সংগীতের তাল-লয়ে আরবীয় কবিতা ও গান আবৃতি করতেন এবং সংগীত সুরে পরিবেশন করতেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফত কালে (৬৬১-৬৮০ খ্রীঃ) আরব ভূখন্ডে ব্যাপকভাবে পারস্যের দাস-দাসীদের আমদানী শুরু হয়। এই দাস-দাসীদের অনেকেই ছিলেন ইমারত নির্মানের শ্রমজীবি। মদিনায় মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার খেলাফতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পারস্য থেকে আনিত শ্রমিকদের মাধ্যমে মক্কায় ইরানী সংগীত ধারা ব্যাপকতা লাভ করে।

দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে এই আজন্ম প্রতিভাবান শিল্পী আবু উসমান সাইদ ইবনে মিসজাহ্ অন্য দেশের সংগীত সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য সিরিয়ায় চলে যান। তথা হতে পারস্যে। বহু দেশ এবং অঞ্চল ভ্রমণের মাধ্যমে সংগীত জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে আসেন মক্কায়, আরবে। আরব থেকে সিরিয়ায়।

খলিফা আবদুল মালেকের আমলে (৬৮৪-৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ) ইবন মিসজাহ্ এর বিরুদ্ধে সংগীত বিরোধী ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ তাদের রোষাগ্নী প্রজ্জ্বলিত করেন। তারা মক্কার গর্ভনরের নিকট ঈমানদারদেরকে পথ ভ্রষ্ট করার অভিযোগ ইবন মিসজাহ্ এর বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন।

রাওজাত আল সাফা (২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫০) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবলিস শয়তান বাদ্যযন্ত্র আবিস্কার করে। এটা ছিল আদমের আওলাদের জন্য শয়তানের প্রতারণা মূলক একটি ফাঁদ। এ ফাঁদে যারা আটকা পড়বে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে হাবিয়া জাহান্নামে।

ইবনে মিসজাহ্ এর বিরুদ্ধে খলিফা আবদুল মালেকের নিকট ধর্ম বিনষ্ট

www.amarboi.org

করনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। খলিফা মক্কার গর্ভনরকে নির্দেশ দিলেন ইবনে মিসজাহকে দামেস্কে প্রেরণের জন্য । দামেস্কে পৌছার পরেই খলিফার একজন উমাইয়া বংশীয় ভ্রাতার সংঙ্গে ইবনে মিসজাহ এর পরিচয় হয়। তিনি তাকে রাজকীয় ভবনে নিয়ে গেলেন।

খলিফার ভ্রাতার কক্ষটি ছিল খলিফা ভবনের অতি নিকটে। খলিফা আবদুল মালিক সংগীতজ্ঞ ইবনে মিসজাহের সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হন এবং এই মিষ্টি মধুর কণ্ঠের অধিকারীকে খলিফার সম্মুখে হাজিরের পরওয়ানা জারি করেন।

খলিফা আবদুল মালিকের খেদমতে মরুভূমির উষ্ট্র সংগীত হাদা-পেশ করেন ইবন মিসজাহ। অতপর পেশ করেন নসব জাতীয় "গীনা আল রুকবান" এবং ক্লাসিক সংগীত "গীনা আল মুতকান" ইত্যাদি।

খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মিসজাহের সংগীত সাধনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি তাকে আর্থিক ও বস্তুগত উপঢৌকনেও ভূষিত করেন। আর্থিক সম্পদ সম্পন্ন হয়ে ইবন মিসজাহ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রথম ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫) শাসন কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

জম্মসূত্রে মক্কার সংগীতজ্ঞ ইবন মিসজাহ আরবে বিদেশী সংগীত ধারা প্রবর্তনে অগ্র সৈনানী ছিলেন। "কিতাবুল আঘানীতে" আবুল ফারাজ ইস্পাহানী লিখেছেন "সিরিয়ায় ইবনে মিসজাহ বাইজানটিয়াম বা গ্রীক এলহান শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বারবাতিয়া সংগীত প্রশিক্ষকদের নিকট থেকে বসন্তকালীন (Barbiton) সংগীত এবং আসতুখুশিয়া (Astukhusiyya) সংগীতজ্ঞদের থেকে গ্রীক সংগীতের তত্ত্ব বিধি শিক্ষা লাভ করেন।"

তারপর ইবনে মিসজাহ পারসী সংগীতকলার ও ধারার দিকে মনোযোগী হন। তিনি তাদের "গীনা" সংগীত কলাকৌশল শিক্ষা লাভ করেন। হিজাজে যে সমস্ত নাগাম বা সংগীত ধারা প্রবর্তন করা সম্ভব, তা ইবনে মিসজাহ গ্রহণ করেন; যা অসুবিধা জনক, তা প্রত্যাখান করেন।

ইবনে মিসজাহ গ্রীক ও পারস্য সংগীতের কলাকৌশল, ধারা ও বৈশিষ্ট্য আরবী সংগীতে প্রবর্তন করেন। তার প্রবর্তিত সংগীত কলা-কৌশল আরবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। (কিতাবুল আঘানী তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪)[৪৪] ।

বলা হয় যে আরবের আল হেরা এবং গাসসান অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক ও গণিত শাস্ত্রবিদ পিতাগরিয়ান এর স্কেল বা মাপের কিছু প্রভাব ছিল। আরবের প্রচলিত স্কেল ছিল তানবুর আল মিজানী।

সংগীতজ্ঞ আল নাদর ইবনে হারিস "আল-হেরা" থেকে বীণা জাতীয়

www.amarboi.org

বাদ্যযন্ত্র "উদ" মক্কায় প্রবর্তন করেন । ঐ সময় পারস্য এবং গ্রীকের সংগীত ধারা হিজাজ অঞ্চলে প্রবর্তিত হয়।

মক্কার সংগীত প্রতিভা "ইবনে মিসজাহ" পারস্য থেকে আগত সংগীতজ্ঞদের মাধ্যমে প্রথম পারসী সুর, মেলোডী আরবী সংগীতে প্রবর্তন করেন, অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে। (কিতাবুল আঘানী, তৃতীয় খন্ড ,পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫)[৪৫]।

দেশে প্রতাবর্তনের পর ইবন মিসজাহ বিদেশী সংগীতের রাগ, মাত্রা, তান, লয়, সুর, ও স্বর আরবী সংগীতে প্রয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তার খ্যাতি তৎকালীন আরবে ছড়িয়ে পড়ে। সংগীতজ্ঞ হিসাবে প্রভূত খ্যাতি তার জন্য অবিমিশ্র কল্যাণ বয়ে আনেনি। খলিফা আবদুল মালিকের নিকট ইবন মিসজাহ এর বিরুদ্ধে ধর্ম বিরোধীতার অভিযোগ আনা হয়।

সংগীত শিল্পে তৎকালীন আরবে ইবন মিসজাহ ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদার। আরবের চার জন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তার প্রশিক্ষণধন্য সংগীত শিক্ষার্থী ছিলেন ইবন মুহরিজ, ইবনে সুরাইজ ও এবং ইউনুস আল কাতিব। আরবের সংগীত সাধনার ইতিহাসে তারা সকলেই নিজ নিজ স্থান করে নিয়েছেন। (আল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আঘানী, পৃষ্ঠা-৮৪-৮৮)[৪৬]।

৬ষ্ট উমাইয়্যা খলিফা প্রথম ওয়ালিদ
(৭০৫-৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ)

পঞ্চম উমাইয়্যা খলিফা আব্দুল মালিক-এর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-ওয়ালিদ খলিফা পদে মনোনীত হন। আব্দুল ওয়ালিদ ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞদের প্রিয় পৃষ্ঠপোষক। খলিফার সবচেয়ে প্রিয় গীতিকার, সুরকার এবং চারন কবির নাম ছিল আবূ কালাম আল-গুজাইয়্যিল। (কিতাবুল আঘানি ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০)[৪৭]।

ঐ যুগের মক্কা এবং মদীনার সবচেয়ে বিখ্যাত গীতিকার এবং সুরকার ছিলেন ইবনে সুরাইজ এবং মা'বাদ। তারা উভয়েই মক্কা ত্যাগ করে দামেস্কে খলিফা ওয়ালিদ-এর দরবারে চলে আসেন এবং খলিফার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

যদিও খলিফা আল-ওয়ালিদ সংগীতপ্রিয় ছিলেন, তার প্রদেশিক গর্ভনরদের অনেকেই ছিলেন সংগীত বিরোধী। বিচক্ষণ খলিফা ছিলেন তাদের প্রতিও সহনশীল। খলিফার উদারতার কারণে তার পিতা আব্দুল মালিক অপেক্ষা আল-

www.amarboi.org

ওয়ালিদের সময়ে আরব মুলকে সংগীত চর্চা বেশী হয়।

আল ওয়ালিদের আমলে খেলাফতের সীমানা পূর্ব দিকে সুদূর চীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। পশ্চিম দিকে খেলাফতের সীমানা বিস্তারিত হয় আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত। আরব বীর মুজাহিদগণ ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে উমাইয়া খেলাফত স্পেন পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তাঁর খেলাফতকালে শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সংগীত ইত্যাদির নিঃশঙ্ক বিকাশ শুরু হয়। *(Muir: Caliphate :* ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬১)[৪৮]।

আবু ইয়াহইয়া উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সুরাইজ : মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ আবু ইয়াহইয়া উবায়দুল্লাহ (৬৩৪-৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একজন তুর্কী দাস সুরাইজের পুত্র। তিনি খ্যাত ছিলেন ইবন সুরাইজ অর্থ্যাৎ ক্রীতদাস সুরাইজের পুত্র হিসেবে। তার পিতা একজন তুর্কী দাস হওয়া সত্ত্বেও পুত্রের গৌরবে তিনি ইতিহাসে স্থান পেয়ে গেছেন। পুত্রও এমন ছিলেন যে নিজে যত বড়ই হন না কেন পিতা দাস হলেও দাস পিতার সন্তান হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

সংগীত সংক্রান্ত ইতিহাসবিদ ইউনুস আল কাতীব তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ চতুষ্ঠয়ের অন্যতম গণ্য করেন ইবনে সুরাইজকে। তার মতে অপর তিনজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হলেন ইবন মুহরিজ, আল গারীদ,এবং মাবাদ। (আল ফারাজ আল ইস্পাহানী ঃ কিতাবুল আঘানী)[৪৯]।

চল্লিশ (৪০) বছর বয়স পর্যন্ত ইবনে সুরাইজ সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন না। ৬৮৩ সালে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তিনি মদীনায় অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের ওপর নাইহ বা শোক সংগীত রচনা শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। সংগীত সাধনায় ইবনে সুরাইজ হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কন্যা সুকায়না বিনত আল হুসাইন (রাঃ) এর পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন।

৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইবন সুরাইজ–উদ আল ফারসী বা ফারসীয়ান, বীনা বাজান শুরু করেন। এ সময় আল গারীব নামে তার একজন সংগীত শিষ্য 'নাই' বা শোক সংগীত পরিবেশনে স্বীয় উস্তাদ ইবন সুরাইজ থেকেও অত্যধিক শ্রুতিমধুর, আকর্ষণীয় ও প্রখ্যাত হয়ে উঠেন। নিজের সংগীত শিষ্যের সঙ্গে শোক সংগীত গাওয়ায় প্রতিযোগীতা না করে ইবন সুরাইজ নাইহ বা শোক সংগীত চর্চাই বন্ধ করে দেন।

এর পর উবায়দুল্লাহ ইবন সুরাইজ মুগান্নী বা সাধারন সংগীত রচনা ও সুর সংযোগে মনোযোগী হন। সাধারন সংগীত চর্চা ও উপস্থাপনায় ইবন সুরাইজ

www.amarboi.org

নতুন ভাবে প্রখ্যাত হয়ে উঠেন।

ইবনে সুরাইজ "রমল" ছন্দের সংগীত চর্চা ও পদ্ধতিতে চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। তার প্রণীত এবং গীত সুপ্রসিদ্ধ সপ্ত সংগীতের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে সংগীতজ্ঞ মাবাদ এর গীত সংগীত।

কারো কারো মতে উবায়দুল্লাহ ইবন সুরাইজ হযরত উসমানের সময়ে জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কাদীব ছড়ি যোগে মুর্তাজাল সংগীত গাইতেন। কাদিব হলো ওর্কেষ্ট্রাবাদক দলের নেতার ব্যবহৃত সংগীত ছড়ি।

আবু ইয়াহইয়া ওবায়দুল্লাহ ইবনে সুরাইজ ছিলেন বানু নওফল ইবনে আব্দ আল মুত্তালিব ইবনে হাশিম গোত্রের মুক্ত দাস। কারো কারো মতে তিনি হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দাস ছিলেন।

আরব সংগীতজ্ঞ উবায়দুল্লাহ এর পিতার নাম সুরাইজ, নিজের নাম উবায়দুল্লাহ এবং পুত্রের নাম ইয়াহইয়া। আরব নামকরণ ধারা মতে সংগীতজ্ঞ উবায়দুল্লাহ এর নাম হয় আবু ইয়াহইয়া (ইয়াহইয়ার পিতা) উবায়দুল্লাহ (স্বীয় নাম) ইবনে সুরাইজ (সুরাইজ পুত্র)।

ইবনে সুরাইজ যে সকল উস্তাদের নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মক্কায় ইবনে মিসজাহ এবং মদীনায় তুওয়াইস। মদীনায় তিনি সংগীত শিল্পী আজ্জা আল মাইলার সংগীতের আসরেও অংশগ্রহণ করতেন। (ইকদ আল ফারীদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭)[৫০]।

মদীনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ইবন সুরাইজ করুণ শোক সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নাঈহ প্রকৃতির সংগীত গাইতেন।

মক্কায় অনুষ্ঠিত এক সংগীত প্রতিযোগীতায় সুরাইজ উমাইয়্যা যুবরাজ সুলায়মান কর্তৃক পুরস্কৃত হন। সুলায়মান পরবর্তীতে উমাইয়্যা খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। সুলায়মানের স্বল্পকালীন শাসন কালে দামেস্কে গমনের জন্য ইবন সুরাইজ সুলাইমানের দরবারে আমন্ত্রিত হন। ঐ সময় তিনি ছিলেন মক্কায়। দামেস্কে বসবাসের জন্য তাকে একটি প্রকান্ড বিলাসভবন প্রদান করা হয়। তদুপরি বহুবিধ রাজকীয় সম্মানে তিনি ভূষিত হন।

দামেস্কের রাজকীয় সম্মান ও সুযোগ সুবিধা অপেক্ষা মক্কার প্রতি ইবনে সুরাইজ এর হৃদয়ের আকর্ষণ গভীরতর ছিল। তখন মক্কায় উমাইয়্যা গর্ভনর ছিলেন নাফী ইবনে আলকামা। নাফী আল কামা ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম পরায়ন এবং গোড়াপন্থী। তার সময়ে মক্কায় মদ্যপান এবং সংগীত চর্চা আমীরের

www.amarboi.org

নির্দেশক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু ইবনে সুরাইজের সংগীতের প্রতি গণ আবেদনের ফলে তার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করতে হয়।

মক্কার পরিবেশ প্রতিকূল লক্ষ্য করে ইবন সুরাইজ মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসেন। মক্কায় ছিল তার সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত। কারণ মক্কার গভর্নর ছিল সংগীত বিরোধী নাফী ইবন আলকামা। ইবনে সুরাইজের একজন ভক্ত হিশাম ইবনে মির্জা বলেন আল্লাহর নবী দাউদের (আঃ) পর ইবনে সুরাইজের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে- এমন কোনো সংগীতজ্ঞ আল্লাহ্ বোধ হয় সৃষ্টি করেন নি।

আবু ইয়াজিদ আবদ আল মালিক আল গারীদ : আবু ইয়াজিদ আবদ আল মালিক আল গারীদকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ চতুষ্টয়ের অর্ন্তভুক্ত গন্য করা হয়। (ইকদ আল ফরীদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭)[৫১]। সংগীতজ্ঞ আবু ইয়াজিদ আবদ আল মালিকের উপনাম ছিলো আল গারীদ। কারো কারো মতে আল গারীদের প্রকৃত নাম আবূ মারওয়ান। আল গারীদ ছিলেন রারবারী দাস বংশের সন্তান। তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন মক্কার আবালাত বংশীয় বিখ্যাত ভগ্নীগন।

পৃষ্ঠপোষকতা: "আল গারীদ" পরবর্তীতে আরব সংগীতের পৃষ্ঠপোষক সুকায়না বিনত আল হুসাইনের (রা.) পরিবারভুক্ত হয়ে যান। সুকায়না বিনত আল হুসাইন (রাঃ) ইবনে আলী (রাঃ) তাঁর (আবূ গারীদের) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন-বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইবনে সুরাইজের মাধ্যমে। আল গারীদ সাধারন সংগীতে উৎসাহী হয়ে উঠেন। কালক্রমে তিনি ইবন সুরাইজের প্রতিদ্বন্দি হিসেবে আবির্ভূত হন।

আবু ইয়াজিদ আল গারীদ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন উমাইয়্যা খলিফা প্রথম ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে- দামেস্কে।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় আল গারীদ উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময়েও (৭২০-৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) জীবিত ছিলেন। (কিতাবুল আঘানী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১-১২)[৫২]।

দামেস্কে উমাইয়্যা দরবারে আবু ইয়াজিদ আল গারীদ যে সব সংগীত যন্ত্র ব্যবহার করতেন এগুলোর মধ্যে ছিলো কাদীব, দাফ (ঢোল), এবং উদ (বাঁশী)।

দুর্ভাগ্য : দামেস্ক থেকে আবু ইয়াজিদ আল গারিদ মক্কায় চলে যান। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল দুর্ভাগ্য। কারন তথায় গভর্নর ছিলেন

www.amarboi.org

নিষ্ঠাবান নাফী ইবন আল কামা। তিনি মক্কায় মদিরা ও সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

মক্কায় সংগীত চর্চার সুবিধা না পেয়ে আল গারীদ ইয়েমেনে চলে যান। তথায় আবু ইয়াজিদ আল গারিদ উমাইয়্যা খলিফা সুলায়মান এর খেলাফত কালে মৃত্যু বরণ করেন।

আবু ইয়াজিদ আল গারীদের ইন্তেকাল সম্পর্কে "ইকদ আল ফারিদ" গ্রন্থে এক সুন্দর কাহিনী স্থান পেয়েছে। আল গারীদ তার পরিবারের মধ্যে মধুর স্বরে সংগীত সাধনায় তণ্ময় ছিলেন। তিনি যে মুহূর্তে একটি সংগীত গাওয়া শেষ করছেন, তখনই অতো মধুর সংগীতে অতৃপ্ত একটি জীন অসন্তুষ্ট হয়ে তার ঘাড় মটকে দেয় এবং সে কারনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (ইবন আব্দ রাব্বিহী ঃ ইকদ আল ফরীদ , তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭)[৫৩]।

৭ম উমাইয়্যা খলিফা খলিফা সুলাইমান
(৭১৫-৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ)

উমাইয়্যা খলিফাদের মধ্যে সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন সংগীতের অত্যন্ত বড় সমজদার। খলিফা হওয়ার পূর্বে তিনি হজ্জ করতে মক্কা গমন করেন। ঐ সময়ে মক্কায় তিনি সংগীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সে যুগের সেরা সংগীতজ্ঞ ইবন সুরাইজ। প্রথম পুরস্কার ছিল ১০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা। অন্যান্য প্রতিযোগিদের মধ্যে সম্মানজনক মুদ্রা পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করা হয়। (কিতাবুল আঘানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৬)[৫৪]।

খলিফা সুলাইমানকে তার গান বাজনার উৎসাহের জন্য "রঙ্গিলা" হিসাবে বর্ণনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি হেরেমে বালিকা ও মহিলা সংগীতজ্ঞ রক্ষণ করতেন। সুলাইমান মহিলা সংগীতজ্ঞ বিদেশ থেকেও আমদানী করেন। (কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০,৬৫)[৫৫]।

মৃত্যুর পূর্বে সুলায়মান একটি ভাল কাজ করে যান। স্বীয় ভ্রাতাদের কাওকে খলিফা মনোনীত না করে তার পিতৃব্য আবদুল আজীজ এর পুত্র উমর ইবনে আবদুল আজীজকে খলিফা মনোনিত করেন।

সিন্ধু বিজেতা তরুন যুবক মুহাম্মাদ বিন কাসিম এর বিরূদ্ধে সিন্ধুর প্রাক্তন রাজা দাহিরের কন্যাগণ অভিযোগ করে যে মুহাম্মাদ বিন কাসিম তাদের শ্লীলতা

www.amarboi.org

হানী করেছে। তারা বন্দী হিসেবে দামেস্কে প্রেরীত হয়েছিল।

খলিফা সুলাইমান আদেশ জারী করেন যে, মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে জবাই করা গাধার ভেতর জীবন্ত প্রবেশ করিয়ে গাধার চামড়া সেলাই করে খলিফার দরবারে প্রেরণ করতে হবে। মর্দে মুমিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম স্বেচ্ছায় এ নিদের্শের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন। আদেশ পালিত হয়।

দাহিরের কন্যাগণ এমন বিচার দেখে স্বীকার করে যে, তাদের অভিযোগ মিথ্যা এবং এজন্যে শাস্তি দাবী করেন। পিতৃহারা কন্যা বিধায় তাদের এ মিথ্যা অভিযোগের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

বিনা অপরাধে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের ওপর প্রদত্ত শাস্তির কাফফারা হিসেবে খলিফা সুলইমান উমাইয়্যা খান্দানের সর্বোত্তম সন্তান এবং বিলাসী যুবক উমর ইবন আবদুল আজীজকে তার পর উমাইয়্যা খান্দানের খলিফা মনোনীত মনে করে যান। এ মনোনয়নের বিষয়টি উমারের প্রতি আনুগত্য এবং বায়েত গ্রহণের অনুষ্ঠান পর্যন্ত গোপন রাখার জন্যে উজিরে আজমকে নির্দেশ দিয়ে যান।

উজিরে আজম সোলাইমানের মনোনয়নের বিষয়টি গোপন রাখেন। খলিফা সোলাইমানের ইন্তেকালের পর দামেষ্কের উমাইয়্যা মাসজিদে নতুন খলিফার প্রতি বায়েত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্যে উমাইয়্যা খান্দানের শাহজাদাদেরকে এবং অমাত্যদেরকে হাজির করা হয়।

মাসজিদে উজিরে আজম যথাযথ পদ্ধতিতে সকলের সম্মুখে প্রাক্তন খলিফা সোলাইমান কর্তৃক মনোনয়নের ঘোষণা দিয়ে উমর ইবন আবদুল আজীজকে অনেকটা বল পূর্বক মাসজিদের মিম্বরে তুলে নিজে সর্ব প্রথম নতুন খলিফার প্রতি আনুগত্যের শপথ বায়েত ঘোষণা করেন এবং অন্যান্যদেরকে আনুগত্য এবং বায়েতের আহ্বান জানান।

এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা মনোনয়ন সম্পন্ন হয়। এ এক আমলের জন্যে ইনশা আল্লাহ্ উমাইয়্যা খলিফা সোলাইমান নাজাত লাভ করতে পারেন।

কুষ্ঠরোগী আবুল ফাত্তাহ মুসলিম ইবন মুহরিজ : যদিও সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইবনে মুহারিজ ছিলেন আরবের অন্যতম সেরা, কিন্তু কোন রাজকীয় অনুষ্ঠানে অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত হতেন না। কারণ, তিনি ছিলেন একজন কুষ্ঠরোগী। তাকে দেখলেই লোকজন ভয়ে দূরে সরে যেত। এ কারণে আবুল ফাত্তাহ মুসলিম ইবনে মুহারিজ যাপন করতেন ভবঘুরে জীবন। জন্মভূমি

www.amarboi.org

মক্কায় তিনি একাধারে তিন মাসও থাকতেন না। তার সময় কাটতো লোকালয়ের বাইরে, শহর থেকে দূরে এবং পল্লীর জনপদে।

কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হওয়ার কারনে তিনি জনসম্মুখে এসে সংগীত নিবেদন করতেন না। কিন্তু তার সংগীতের আবেদন ছিলো ব্যাপক এবং গভীর। তিনি সংগীত বালিকাদেরকে তার গানের তালীম দিতেন। তারাই তার গান সংগীতামোদীদেরকে গেয়ে শোনাতো।

কিতাবুল আঘানীর রচয়িতা আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর মতে ইবন মুহারিজ ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ চতুষ্টয়ের অন্যতম। (কিতাবুল আঘানী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০)[৫৬]।

আবুল ফাত্তাহ মুসলিম ইবনে মুহরিজ (৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু) জন্মগ্রহন করেন মক্কায়। তার পিতার নাম ছিল মুহরিজ। তাই তিনি ইবনে মুহরিজ অর্থাৎ মুহরিজ পুত্র নামে খ্যাত। তার পুত্রের নাম ফাত্তাহ। তাই তার নাম হয় আবুল ফাত্তাহ অর্থ্যাৎ ফাত্তাহর পিতা। সংগীতজ্ঞের স্বীয় নাম ছিল মুসলিম।

পিতা, পুত্র, পৌত্র এই তিনজনের নাম সংযোগে সংগীতজ্ঞ "মুসলিম" এর নাম হয় আবুল ফাত্তাহ মুসলিম ইবনে মুহরিজ। তাঁর পিতা মুহরিজ ছিলেন পারস্য থেকে মক্কায় আগত এবং দাসত্ব মুক্ত একজন মানব।

মুহরিজ পিতা স্বীয় গুণাবলীর জন্য পবিত্র কাবার সেবক হওয়ার সম্মান অর্জন করেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইবনে মুহরিজও ছিলেন বানু মাখজুম গোত্রের একজন মুক্ত দাস।

ইবনে মুহরিজ এর সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইবনে মিসজাহ এবং আজ্জা আল মাইলাহ। মহিলা শিল্পী আজ্জা আল মাইলা থেকে ইবনে মুহারিজ সংগীত যন্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। সংগীতজ্ঞ ইবনে মিসজাহ এর সুযোগ্য ভক্ত ও শিষ্য ইবনে মুহরিজ আরবীয় সংগীত কলা উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখেন।

ইবনে মুহরিজ বিদেশী সংগীতের কলা কৌশল শিক্ষার জন্য ইরান ও সিরিয়া ভ্রমন করেন। ঐ সমস্ত দেশের এলহান, সুর, তাল, ধ্বনী আরবী সংগীতে প্রয়োগ করেন। এ উদ্যোগ ও সাফল্য অতীতে গৃহিত অর্জিত হয়নি। ইবনে মুহরিজ এ দিগন্তে যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন তা অতীতে কখনও অর্জিতও হয়নি।

ইবনে মুহরিজ এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো দুই দেশের সংগীতের সুর, লয়, তাল অন্য দেশের সংগীতের সমন্বয় এবং মিশ্রণের অপূর্ব দক্ষতা।

www.amarboi.org

ইবন মুহরিজ কতগুলো নতুন ধরনের সংগীত ধারা প্রবর্তন করেন। এর একটি ছিলো ছন্দ বদ্ধ "রমল"। অপরটিকে বলা হতো "জাউজ"। জাউজ হলো প্রতি দুই বাক্যের ছন্দ বিশিষ্ট গান বা কবিতা।

ইবনে মুহরিজের সংগীতের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এর সরলতা। তার সংগীতের মর্মবানী এতো সহজ হতো যে তা বুঝতে কারো অসুবিধা হতো না। দু একবার শুনার পরই তার সংগীত শ্রোতাগণ গায়কের সংঙ্গে সুর মিলাতেন।

সংগীত গায়ক না হলেও যে কোনো ব্যক্তি ইবনে মুহারিজ এর রচিত গান গাইতে পারত। বলা হতো যে, "ইবন মুহরিজের সংগীত ছিল তার হৃদয় নিংড়ানো এবং অন্তরের অন্তস্থল হতে নির্গত"। (কিতাবুল আঘানী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২)[৫৭]।

৮ম উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় উমার (রাঃ) ইবন আবদুল আজীজ (৭১৭-৭২০ খ্রীষ্টাব্দ)

উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (রঃ) খলিফা মনোনিত হওয়ার পূর্বে ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী যুবক ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। তিনি শুধু সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন এবং সংগীত রচনা করতেন। কিতাবুল আঘানীতে তার রচিত সঙ্গীতের বিষয়ও উলেখিত হয়েছে। (কিতাবুল আঘানী, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০)[৫৮]।

উমার ইবনে আব্দুল আজীজ খলিফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে হেজাজের গভর্ণর ছিলেন। তখন বহু সংগীত প্রিয় উপদেষ্টা ও সমজদারগণ তার দরবারে মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

খলিফা মনোনীত হওয়ার পরই দ্বিতীয় উমার এর জীবনে ঘটে আমূল পরিবর্তন। তার জীবন যাত্রা, চাল চলনে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা.) এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। রাতারাতি এমন পরিবর্তন সমগ্র মানব ইতিহাসে খুব কম শাসনকর্তার জীবনে সংঘটিত হয়। তবুও ধর্মীয় মূল্যবাধ সংক্রান্ত সঙ্গীতের প্রতি তার দুর্বলতা হ্রাস পায়নি।

একবার খলিফা দ্বিতীয় উমার ইবনে আবদুল আজিজ খবর পেলেন যে, মদীনার একজন কাজী তার এক সংগীত বালিকার শিল্পকলায় ছিলেন অত্যন্ত অভিভূত। খলিফা তার পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত নিলেন। পরে ভাবলেন ব্যাখ্যা তলব ছাড়া এরূপ শাস্তি সঙ্গত নয়।

www.amarboi.org

তিনি হুকুম দিলেন যে– কাজীকে গায়িকা বালিকাসহ খলিফার সম্মুখে হাজীর করতে হবে। তারা উভয়ই খলিফার দরবারে এলেন। খলিফা সংগীত বালিকাকে নির্দেশ দিলেন দরবারে সংগীত পরিবেশন করতে। বালিকার সংগীত এবং সঙ্গীতের মর্মবানীতে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইলেন।

কাজীকে নির্দেশ দেন আপনি আপনার পদে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। করুনাময় আলাহ আপনাকে সুপথ প্রদর্শন করুন। (আল-মাসুদী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৮)[৫৯]।

খলিফা দ্বিতীয় উমার ইবনে আব্দুল আজীজের পূর্বে উমাইয়া সম্রাটদের দরবার সুসজ্জিত ছিল কবি, সাহিত্যিক, সুবক্তা, সংগীতজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা। তিনি তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে বিদায় করেন। উমার ইবনে আব্দুল আজিজ এবং তার পূর্ববর্তী দু'জন খলিফার তুলনামূলক আলোচনায় বলা হয় যে, ওয়ালিদ-এর যুগে সমাদৃত হতো শিল্পকলা। সুলাইমান এর দরবার সুশোভিত করেছিল নারীগণ। উমার ইবনে আব্দুল আজিজ এর দরবারের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতা। (আল ফাখরী, পৃষ্ঠা-১৭৩; ইবন আ'ত তিকতাকা বর্ণিত মুসলিম রাজবংশের ইতিহাস)[৬০]।

৯ম উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ
(৭২০ খৃঃ-৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ)

উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের ধর্ম পরায়নতা অথবা ধর্মীয় প্রবণতা তেমন ছিল না বললে বেশী বলা হবে না। দ্বিতীয় ইয়াজিদ খলিফা হয়েছিলেন দ্বিতীয় উমর ইবন আবদুল আজীজ রা. এর পর। দু'জনের মধ্যে ছিল আকাশ পাতাল পার্থক্য।

২য় ইয়াজিদের আমলে উমাইয়্যা খলিফাদের দরবার কাব্য ও সঙ্গীতের তীর্থে পরিণত হয়। তার সময়ে দরবারে শুধু পুরুষ, সংগীতজ্ঞ নয়, সালামা, আলা-কাছ এবং হাব্বাবা প্রমুখ গায়িকা ও সংগীত শিল্পীদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঐ ভূমিকা সঙ্গীতের দিগন্ত অতিক্রম করে রাজনৈতিক-ও কুটনৈতিক অঙ্গঁন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ইয়াজিদ সংগীত ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অত্যন্ত উদার। তার দরবারে একজন সংগীতজ্ঞ ছিল ইসলামের দুষমন আবু লাহাবের পুত্র ইবনে আবূ লাহাব। ইবনে আবূ লাহাবের সংগীত উপস্থাপনায় অতীব মুগ্ধ হয়ে খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাকে জিজ্ঞাসা করেন– ঐ উন্নত মানের সংগীত

www.amarboi.org

সাধনার দীক্ষা তুমি কার নিকট পেয়েছ? আবূ লাহাবের পুত্র বলল- আমার দীক্ষা দাতা ও প্রশিক্ষক হলেন আমার পিতা।

ইয়াজিদ মন্তব্য করলেন, তোমার পিতা আবূ লাহাব এর নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যদি তুমি কিছুই না পেয়ে থাক, তবে তোমার একটি মাত্র সংগীতই গন্য হতে পারে বিরাট ঐশ্বর্য্যের প্রতীক।

আবূ লাহাব পুত্র বললেন- আমার পিতা তো ছিলেন একজন ঘৃণিত কাফির ও মুশরিক। তার সমগ্র জীবন কেটেছে আলাহর নবীর শত্রুতায়। ইয়াজিদ বললো "তা আমি জানি। কিন্তু তোমার সংগীত থেকে তো মনে হয় তোমার পিতা ছিলেন মহাকুশলী সংগীতজ্ঞ। এই একটি দিকে তো তিনি প্রশংসা ও সহানুভূতির দাবীদার"। (আল-মাসুদী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৯)[৬১]।

আল বাইদাক আনসারী : আল বাইদাক আনসারী ছিলেন খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের (৭২০-২৪ খ্রীঃ) একজন দরবারী সংগীতজ্ঞ। (কিতাবুল আঘানী, ১৩ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩)[৬২]।

মাবাদ ইবনে ওয়াহহাব

উমাইয়্যা শতাব্দীর সংগীত শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান শিল্পী ছিলেন আবূ আব্দ মাবাদ ইবনে ওয়াহহাব (মৃত্যু ৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তার জীবনে সৌভাগ্য সূর্য কখনো অস্তমিত হয়নি। শিল্পী হিসেবে তার স্বীকৃতি ছিল বিভিন্ন দিগন্তে এবং সর্বাঙ্গীন। কথায় বলে যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। তিনি ছিলেন উমাইয়্যা যুগের চারজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞের অন্যতম।

একাধিক উমাইয়্যা খলিফা মাবাদকে তার মেধার জন্য আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেছেন। উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে তিনি খলিফার দরবারে আমন্ত্রিত হন। খলিফার প্রাসাদে তার বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

সংগীতামোদী মাবাদ ইবনে ওয়াহহাবের মৃত্যু বছর (৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে এক বিরাট সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে মাবাদ ইবন ওয়াহহাবকে সংগীতে তার অবদানের জন্যে ১২,০০০(বার হাজার) স্বর্ণ মুদ্রায় পুরস্কৃত করা হয়। এটা ছিল ঐ আমলের বৃহত্তম অংকের এককালীন সংগীত পুরস্কার।

সংগীতজ্ঞ আবূ আবদ মাবাদ তিনজন উমাইয়্যা খলিফার দরবারের সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাদের মধ্যে আছেন প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ), দ্বিতীয় ইয়াজীদ (৭২০-৭২৪ খ্রীঃ), এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রীঃ)।

www.amarboi.org

পিতৃ পরিচয় : আবূ আবদ মাবাদ ইবন ওয়াহ্হাব এর পিতা ওয়াহ্হাব ছিলেন একজন কৃষ্ণকায় হাবশী এবং মাতা ছিলেন আরব। মাবাদ পিতা ওয়াহ্হাব ছিলেন মদীনার আবদ আল রহ্মান ইবন লাতানের দাস। দাস মালিক আবদ আল রহ্মান সংগীতজ্ঞ মাবাদ পিতার আচরন ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।

মূল্যায়ন : সংগীত বিশেষজ্ঞ ইসহাক মাওসুলি লিখেছেন যে, মাবাদ ছিলেন ত্রুটিহীন উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়ক। তার রচিত এবং গীত সংগীতে প্রতিভাত হয় যে, তিনি ছিলেন তার প্রতিদ্বন্ধি সংগীতজ্ঞদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

মদীনার এক কবি লিখেছিলেন যে, সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তুওয়াইশ মাদানী এবং তার পরের স্থান হলো ইবন সুরাইজ এর। তবে, মাবাদের সংগে কোনো সংগীতজ্ঞের তুলনা হয় না।

আরবী সংগীতজ্ঞ ও গবেষক এবং কবি আল বুহতুরী(মৃত্যু ৮৯৭ খ্রীঃ) এবং আবূ তাম্মাম (মৃত্যু ৮৪৬ খ্রীঃ) আরবীয় সংগীতের ইতিহাসে মাবাদের স্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ণয় করেছেন। (আল বুহতুরীঃ দিওয়ান, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬০, ১৯৩, ২১৮, আবু তাম্মাম ঃ দিওয়ান, পৃষ্ঠা-১০৩)[৬৩]।

প্রশিক্ষণ : যৌবনে মাবাদ পেশাগত হিসাব রক্ষক হিসেবে পরিচিত হন। তিনি বিখ্যাত সংগীতজ্ঞত্রয় সাঈব কাসির, নাশিত আল কারিসী এবং জামিলা এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সংগীত শিক্ষা সংক্রান্ত পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ধন্য হন। কালক্রমে তিনি হিসাব রক্ষকের পেশা ছেড়ে দিয়ে সংগীতজ্ঞের পেশায়ই হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন।

সংগীতে খ্যাতি অর্জন করার পর মাবাদ আরব উপদ্বীপের বহু শহরে ও জনপদে সংগীত পরিবেশন করেন। এক পর্যায়ে তিনি জন্মভূমি মদীনায় ফিরে আসেন। ইবন সাফওয়া নামে একজন সংগীতামোদী অভিজাত ব্যক্তি একটি সংগীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এতে মাবাদ প্রথম পুরস্কার পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা : মাবাদের সংগীতের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ। তিনি তার সংগীতের দৃঢ়তায় (মতন) অত্যন্ত মুগ্ধ হন। খলিফা মন্তব্য করেন যে, মাবাদের উস্তাদ ইবন সুরাইজ সংগীতে ছিলেন ইনহিনা বৈশিষ্ট সম্পন্ন (Pliability)। কিন্তু মতন বা সুস্পষ্টতা এবং দৃঢ়তায় সংগীতজ্ঞ ইবন সুরাইজ অপেক্ষা মাবাদই শ্রেষ্ঠতর।

খলিফার প্রশংসায় মুগ্ধ মাবাদ বলেন, আমার উস্তাদ খাফিফ বা মৃদুস্বরের

www.amarboi.org

সংগীত চর্চা করেন। কিন্তু আমি (মাবাদ) অধিকতর কঠোর (কামীল তাম্মা) প্রকৃতির সংগীত চর্চা করি। ইবন সুরাইজের সংগীত যদি হয় পূর্বমুখী, আমার সংগীত পশ্চিমমুখী। সুতরাং আমাদের দু'জনের সংগীতের মধ্যে মান নির্ণয়ে তুলনা হতে পারে না। মাবাদ আরো বলেন, ইবনে সুরাইজ আমার উস্তাদ এবং আমা অপেক্ষা সর্বক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতর। (কিতাবুল আঘানী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৬)[৬৪]।

মাবাদ রচিত এবং গীত সংগীতগুলো সংকলিত হয়েছে হুসুন মাবাদ (মাবাদের দুর্গ) মুদুন মাবাদ (মাবাদ নগরীসমুহ) মাবাদাত (মাবাদ সংক্রান্ত), মারাত, ইত্যাদি সংকলনে ।

মাবাদ শুধু নিজে উচ্চমানের সংগীতজ্ঞই ছিলেন, তা নয়। তার শিষ্যগণ ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তারা হলেন ১. ইবনে আয়শা ২. মালিক, ৩. সাল্লামা আল কাস, ৪. হাব্বাবা, ৫. ইউনুস আল কাতীব, ৬. সীয়্যাত প্রমুখ। (Khallikan: Biographical Dictionary, 2nd vol, P.394;[৬৫] Kitabul Aghani, 8th vol, P. 91)[৬৬].

মৃত্যু : ইবন সুরাইজের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য শিষ্য মাবাদই শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। একদিন খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ মাবাদকে রাজকীয় দরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য আহবান করেন। কিন্তু মাবাদ তখন ছিলেন খলিফার প্রাসাদে আসায় অক্ষম ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ। তার কিছুদিন পরেই মাবাদ ইন্তেকাল করেন।

মাবাদের জানাজায় খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ এবং তার ভ্রাতা ঘামর অতি সাধাসিধা পোশাকে অংশ গ্রহণ করেন এবং জানাজার সঙ্গে প্রাসাদ সীমানা পর্যন্ত গমন করেন। জানাজায় শোক সংগীত পরিবেশন করেন মাবাদের সংগীত শিষ্যা সাল্লামা আল কাস। শোক সংগীতটি ছিলো মাবাদেরই রচিত। তারই রচিত শোক সংগীতের মাধ্যমে তাকে ইহকাল থেকে বিদায় জ্ঞাপন করা হয়।

অষ্টম শতাব্দীর মূল্যবোধ মনে হয় ছিল আধুনিক মুসলিমদের থেকে অনেক বেশী আধুনিক এবং সহনশীল। জানাজার নামাজের অনুষ্ঠানে এবং সমকালীন রাষ্ট্র প্রধানের উপস্থিতিতে নারী সংগীতজ্ঞ কর্তৃক শোক সংগীত গীত হওয়া বর্তমান সময়ে অস্বাভাবিক।

www.amarboi.org

১০ম উমাইয়্যা খলিফা হিশাম
(৭২৪-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)

উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন অত্যন্ত সফল ব্যক্তিত্ব এবং জাঁদরেল খলিফা। খলিফা হিশামের রাজত্বকাল ছিল সুদীর্ঘ ২০ বছর। এ খিলাফত ছিল সম্পদে প্রচুর্য্যময়। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা। তার দরবারে সংগীতজ্ঞের স্থান ছিল উঁচুতে। তবে দ্বিতীয় ইয়াজিদের আমলের ন্যায় তত প্রভাবশালী নয়।

খলিফা তনয় হিশাম খলিফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে ইরাকের সংগীতজ্ঞদেরকে উৎসাহিত করতেন। হিশাম সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তারা অধিকাংশ ছিলেন ইরাকী সংগীতজ্ঞ। হুনাইন আল হিরীর ন্যায় ইরাকী সংগীতজ্ঞ বৃন্দ তার অনুদানে ধন্য হয়েছিলেন।

খলিফা হিশাম হজ্জ সফরকালেও সংগীতজ্ঞদের সংগীতচর্চা উপভোগ করতেন এবং তাদেরকে অর্থিক উপঢৌকণে ভূষিত করতেন। হজ্জ উপলক্ষে যখন মক্কায় গমন করেন, তখনও কয়েকজন সংগীতজ্ঞ তার অনুসঙ্গী হয়েছিল। (কিতাবুল আঘানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২১)[৬৭]।

তবে খলিফা হওয়ার পর কৌশল ও প্রজ্ঞার খাতিরে তিনি সংগীত এর প্রতি তার উৎসাহ তেমন প্রদর্শন করতেন না। সঙ্গীতের প্রতি তার উদাসীনতা প্রদর্শনের জন্য হিশাম এক সময় বলেছিলেন তাম্বুরা (বিনা), এবং বারবাত (বাঁশী) স্বরের মধ্যে পার্থক্য কি– তা তিনি বুঝেন না। তার ঐ কথা শ্রোতারা বিশ্বাস করেননি। বরং, এটা তিনি বলেছেন তার ধর্মপরায়ণতা দেখানোর উদ্দেশ্য। এরূপ ধারনাই শ্রোতারা করেছিলেন| *(Bar Hebraeus, page-207)*[৬৮].

ইবনে মুশাব আল তায়েবী আল হিজাজী : উমাইয়্যার আমলে সংগীতজ্ঞদের মধ্যে একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন ইবন মুশাব আল তায়েফী আল হিজাজী। (কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮২)[৬৯]।

ইবন তানবুরা : সংগীতজ্ঞ ইবন তানবুরা ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী। তবুও হেজাজী সংগীতের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অগ্রগন্য ছিলেন ইবনে তানবুরা। (ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭)[৭০]।

ইউনুস আল কাতিব : ইউনুস আল কাতিবের পূর্ণ নাম ইউনুস ইবন সুলায়মান। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন আমর ইবন আল যুবায়েরের একজন মুক্ত

www.amarboi.org

দাস। তার পিতা ছিলেন পারস্য বংশদ্ভুত একজন আইনজ্ঞ। ইউনুস আল কাতিব শিক্ষা লাভ করেন মদীনায়।

শ্রমের পুরস্কার : প্রকৃতিগত সংগীতজ্ঞদের সংগীত সাধনা শুরু হয় শিশুকাল থেকে। ইউনুসের সংগীত চর্চা শুরু হয় মধ্য বয়স থেকে। প্রকৃতিগত ভাবে সংগীতজ্ঞ না হয়ে চেষ্টার মাধ্যমে যে কোন সাধক ইতিহাস খ্যাত ও বিশ্ব বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হতে পারেন তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা হতে পারেন ইউনুস আল কাতিব। কাতিব শব্দের অর্থ লেখক।

ইউনুস আল কাতিব ছিলেন মদিনার পৌর প্রশাসনের একজন সম্মানিত কর্মকর্তা। পৌর সভায় তিনি কাতিব বা সচিব হিসেবে চাকরি নেন। তাই তার নাম হয় উইনুস আল কাতিব।

পৌর প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে ইউনুস আল কাতীব ইতিহাসে স্থান পান নি। তবে তার নাম সংগীত চর্চা প্রসঙ্গে উচ্চকিত হয় এবং সে পরিচয়ে তিনি ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

সংগীতকে ইউনুস আল কাতিব আনন্দের উপকরণ হিসেবে এবং অবসর সময় কাটাবার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহন করেন। ক্রমশঃ সংগীত তার নেশা এবং পরবর্তীতে পেশা হিসেবে দাড়িয়ে যায়। তিনি সেকালের সেরা সংগীতজ্ঞদের সংস্পর্শে আসেন এবং সংগীত সাধনায় তার আগ্রহের বিষয় তাদেরকে উপলব্ধি করান।

গুণীজনের শিষ্যত্ব : নিজের উৎসাহ, আগ্রহ এবং ঐকান্তিকতার কারণে ইউনুস আল কাতিবকে শিষ্য হিসেবে গ্রহন করেন সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ইবন মুহরিজ, ইবন সুরাইজ, আল গারিদ, মুহাম্মাদ ইবন আব্বাত,আল কাতিব প্রমুখ। (কিতাবুল আঘানী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫)[৭১]।

যেহেতু ইউনুস আল কাতিবের সাধনা ও শিক্ষা ছিলো উচ্চমানের, তিনি অতি সহজেই সংগীত সংক্রান্ত কলা কৌশল আয়ত্ব করে ফেলেন।

ইউনুস আল কাতিব সংগীতজ্ঞ হিসেবে এতো প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে, বলা হতো যে সংগীতজ্ঞ ইবন আয়শার সঙ্গে তার পেশাগত ঈর্ষা সৃষ্টি হয়।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ও লোপ : খলিফা হিশামের খেলাফত কালে (৭২৪-৪৩ খ্রীঃ) খলিফার ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ালিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও বন্ধুত্ব ইউনুস আল কাতিব লাভ করেন। পরবর্তীতে ওয়ালিদ দ্বিতীয় ওয়ালিদ হিসেবে খেলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ খলিফা হওয়ার পর খলিফার বন্ধু হিসেবে ৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে

www.amarboi.org

ইউনুস আল কাতিব দামেস্কে ফিরে আসেন এবং খলিফার প্রসাদেই স্থান লাভ করেন। কিন্তু খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ এতো আমোদ প্রমোদে অভ্যস্থ ছিলেন যে, ইউনুস আল কাতিবের দুর্ভাগ্যক্রমে ৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ওয়ালিদ মৃত্যুবরণ করেন। উমাইয়্যা খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যুর ফলে ইউনুস আল কাতিব নিরাশ্রয় হন।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ এবং সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিবের বন্ধুত্বের বিষয়টি আরব্য উপন্যাসের ৬৮৪তম রজনীর একটি কাহিনী হিসেবে আরব্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

ইউনুস আল কাতিব কোনো এক সুন্দরী মহিলার সৌন্দর্য্য নিয়ে একটি উন্নতমানের সংগীত রচনা করেন। উক্ত মহিলা ছিলো অভিজাত বংশের এবং তার নাম ছিলো যায়নাব। উক্ত সংগীতের মধ্যে শুধু যে, দৈহিক সৌন্দর্য্যই ছিলো তা নয়, তার মধ্যে কামজ অনুভূতিও কিছুটা ছিলো। এই সংগীতটি "যায়নাবীয় সংগীত" হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

যদি ইউনুস আল কাতিব কোনো কল্পিত যায়নাব সম্বন্ধে সংগীত রচনা করতেন, তাহলে তেমন কোনো দোষের ছিলো না। কিন্তু যায়নাব নামে এক অভিজাত মহিলা তৎকালে জীবিত এবং পরিচিত ছিলো। তাই অনেকেই মনে করতো সংগীতটি ঐ মহিলাকে নিয়েই রচিত।

এর ফলে যায়নাবের পরিবার অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয় এবং ধরতে পারলে সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিবকে হত্যার ঘোষনা দেয়। এ খবরও প্রচারিত হয়। এ কারণে জীবন রক্ষার তাগিদে সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতীবকে দেশ ত্যাগও করতে হয়।

জীবন রক্ষার তাগিদে ইউনুস আল কাতিব দামেস্ক থেকে হারিয়ে যান। তিনি প্রান ভয়ে এমন ভাবে আত্মগোপন করেন যে, তার আর কোনো হদীসই পাওয়া গেলো না।

তবু, কেও কেও তাকে কোনো শহরে দেখেছে এমন খবর শুনা যেতো। তবে তার সংগীত শ্রবণের জন্য ধরা যায়নি। কারো কারো ধারনা উমাইয়্যাদের পতনের পর এবং আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের খেলাফত কালে মাঝে মাঝে তাকে কোথাও দেখা গেছে।

যদিও "যায়নাব সংগীত" খ্যাতি প্রাপ্তি বা খ্যাতি লাভ করার পর তাকে প্রাণ রক্ষার তাগীদে আত্মগোপন করতে হয়েছিল, তবে সংগীত জগত থেকে

www.amarboi.org

তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাননি। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রেক্ষাপট থাকায় তিনি সংগীত রচনায় মনোযোগ দেন এবং তার রচিত সংগীতের বিবরণ ফিহরিস্ততে (৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) স্থান পেয়েছে।

সংগীত সাহিত্যিক : সংগীত সংক্রান্ত ইউনুস আল কাতিবের দুটি পুস্তক হলো ১. কিতাব আল নাগাম(সুর সংক্রান্ত গ্রন্থ)। এবং ২. কিতাব আল কিয়ান (সংগীত বালিকাদের তথ্যবলি গ্রন্থ)। (ফিহরিস্ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৩)[৭২]।

ইউনুস আল আল কাতিব সংকলিত "কিতাব আল নাগামে" শুধু তার রচনা নয়, অন্যান্যদের রচিত ও গীত সংগীতও কিছু কিছু এতে স্থান পেয়েছে।

ইউনুস আল কতিবের শিষ্যদের মধ্যে আছেন সিয়াত এবং ইব্রাহীম আল মাওসীলি। (কিতাবুল আঘানী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭)[৭৩]।

কিতাব আল আঘানীর রচয়িতা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী উল্লেখ করেছেন যে, আরবদের সংগীত, সুর, মেলোডি, মোড, ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত ইউনুস আল কাতিব এর 'কিতাব আল নাগাম' এর সঙ্গে তুলনীয় পুস্তক ইতোপূর্বে আর রচিত হয়নি।

আমর ইবনে উসমান : সংগীতজ্ঞ আমর ইবনে উসমান ইবন আবিল বান্নাত ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইবন আয়শার সমসাময়িক। তার কণ্ঠস্বর বহু প্রসঙ্গে প্রশংসিত হয়েছে। কথিত আছে যে, একদল হজ্জ যাত্রী হজ্জে যাচ্ছিলেন। তাদের গমন পথের পাশেই আমর ইবনে উসমান গান গাইতেছিলেন। তার গানের স্বর শুনে যাত্রী দলটি সেখানে থেমে যায়। (কিতাবুল আঘানী, ১৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৬-৮)[৭৪]।

উমাইয়্যা খলিফা হিশামের আমলে (৭২৪-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিব খলিফা কর্তৃক দন্ডিত হন। তবে তার সংগীত চর্চা ও সাধনার জন্য নয়। কারণ ছিল এক ভদ্র মহিলার বিরুদ্ধে ব্যঁঙ্গ সংগীত রচনা।

হিসাব সংগীতজ্ঞ ইবনে আয়শাকেও তিরস্কার করেছিলেন। তবে তা সংগীত চর্চার জন্য নয় সঙ্গীতের মাধ্যমে কোন একটি কাফেলার গতিধারা প্রতিহত করার কারণে।

www.amarboi.org

১১তম উমাইয়্যা খলিফা রঙিলা দ্বিতীয় ওয়ালিদ
(৭৪৩-৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)

উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ ছিলেন জন্মগতভাবে সংগীত প্রেমিক। তিনি সংগীত ও কাব্য রচনার দক্ষ ছিলেন। কিতাবুল আঘানীতে একটি অধ্যায় তার সংগীত সাধনার ওপর নির্ধারিত হয়েছে। তিনি সংগীত রচনা করতেন, সুর দিতেন এবং গান গাইতেন। তার প্রিয় সংগীত যন্ত্র ছিল উদ, বিনা, তবলা, ঢোল। (কিতাবুল আঘানী অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ১৬১)[৭৫]।

খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের খেলাফত ছিল সল্পকালীন (৭৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি খলিফা প্রথম ওয়ালিদ এবং দ্বিতীয় ইয়াজিদের ন্যায় ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয় ওয়ালিদ সকল প্রকার শিল্প ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

সংগীত সাধনা দ্বিতীয় ওয়ালিদের যুগে পাগলামী ও মাতলামীতে পরিণত হয়। গায়ক সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তার খিলাফত বা রাজত্বের মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছর। এ এক বছরেই তিনি সংগীত বিপ্লব সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবারে নর-সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অনেকে। সংগীতজ্ঞদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ১। ইবনে সুরাইজ, ২। ইবনে আবি লাহাব, ৩। মালিক, ৪। মাআবাদ, ৫। আল আবজার, ৬। ইউনুস আল কাতিব, ৭। হাকাম আল ওয়াদি, ৮। আল উমার আল ওয়াদি, ৯। ইবনে আয়শা, ১০। আত-তাররাদ, ১১। দাহমান আল গুজাইলী, ১২। আশাব ইবনে জাবীর, ১৩। ইয়াহিয়া কাইল, ১৪। আবু কামিল আল গুজাইল, ১৫। আল বায়দাক প্রমুখ।

ঐতিহাসিক আল মাসুদীর মতে দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময়ে বিদেশী সংগীতজ্ঞদেরকে উমাইয়্যা দরবার থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে মালাহী সঙ্গীতের অনুরাগী। তার আমলে প্রধান সংগীত যন্ত্র মালাহী চর্চা অত্যধিক হত।

অতীতে সংগীত ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের অনুরাগের বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময়ে সংগীতজ্ঞগনের পৃষ্টপোষকতা এবং সার্বজনীনতা লাভ করে। মহিলা সংগীতজ্ঞদের সংগীত চর্চাকালে শ্রোতারা উৎসাহ আবেগে উল্লসিত ও আবেগ প্রবণ হয়ে উঠত।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় ওয়ালিদ সংগীতজ্ঞদেরকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দরাজদিল। তার রচতি এবং তার মসয়ে রচিত সঙ্গীতের কিছু কিছু সংরক্ষিত হয়েছে। (কিতাবুল আঘানী, ১৩ তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬১)[৭৬]।

ইয়াহইয়াহ কায়ীল : সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়া কায়িল ছিলেন বিখ্যাত আবালাত পরিবারের মুক্ত দাস। তিনি ছিলেন খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ) সংগীত শিক্ষক। মক্কায় হজ্জ কালেও তিনি তার শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ওয়ালিদকে সংগীত প্রশিক্ষণ দিতেন। এতে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্ম পরায়ণগণ তার প্রতি খুবই বিক্ষুব্ধ হন।

উমার আল ওয়াদি : সংগীতজ্ঞ উমার ইবন আল ওয়াদির প্রকৃত নাম ছিলো উমর ইবন দাউদ ইবন জাদান। তিনি ছিলেন আমর ইবনে উসমান (রাঃ) ইবন আফফান গোত্রের মুক্ত দাস। জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো। উমার আল ওয়াদি ছিলেন ওয়াদি আল কুরা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়।

সংগীতজ্ঞ হিসেবে উমর আল ওয়াদী ছিলেন উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) অত্যন্ত প্রিয় এবং সঙ্গী। খলিফা তার সম্বন্ধে বলতেন উমার আল ওয়াদি আমার জীবনের আনন্দ। খলিফার হত্যাকান্ডের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খলিফার কাছে বসে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

আবু কামিল আল ঘুজাইল : আবু কামিল আল ঘুজাইল ছিলেন খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবারের একজন শীর্ষ সংগীতজ্ঞ। তার সম্বন্ধে খলিফা এক সময় বলেন, "যখন আবু কামীল আমাদের সম্মুখে না থাকে, আমরা শূন্য হয়ে যাই"। (কিতাবুল আঘানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪)[৭৭]।

আবুল আলা আশাব ইবন যুবায়ের : খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) একজন প্রিয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন আবুল আলা আশাব ইবন যুবায়ের। তিনি একবার খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদকে আনন্দ দেওয়ার জন্য গাধার চামড়ার পায়জামা পরিধান করে সংগীত পরিবেশন করেন। তার কণ্ঠস্বর ছিলো অতি চমৎকার। (কিতাবুল আঘানী, ১৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩-১০৫)[৭৮]।

আতাররাদ আবু হারুন : আতাররাদ আবূ হারুন (মৃত্যু ৭৮৬ খ্রীঃ) ছিলেন সংগীতজ্ঞ মাবাদের একজন শিষ্য এবং মদীনার আনসার গোত্রের একজন মুক্ত মানব। দুটি কারনে ছিলো তাঁর বিশেষ মর্যাদা। একটি হলো তার আইন সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অন্যটি হলো সংগীতে দক্ষতা। তার কণ্ঠ ছিলো মধুর এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি ছিলেন অতি উচ্চ মানের।

www.amarboi.org

মদীনার ধনাঢ্য ও অভিজাত পরিবারের সাথে ছিলো আতাররাদ এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুলায়মান ইবন আলী ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন সংগীতের সমঝদার এবং আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে বসরার আমীর।

আতাররাদ আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদী (৭৫৫-৮৫ খ্রীঃ) এবং খলিফা হারুন অর রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ এর সময়ে (৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ) আতাররাদ খলিফার প্রাসাদে সংগীত পরিবেশনের জন্য আহুত হন। একদিন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে আতাররাদ গান গেয়েছিলেন।

আতাররাদের গান শুনে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ আনন্দের অতিশয্যে নাঁচতে শুরু করেন এবং নিজের রাজকীয় পরিচ্ছদ ছিড়ে ফেলেন। এমন উত্তম মানের সংগীত পরিবেশনের জন্য খলিফা ওয়ালিদ সংগীতজ্ঞ আতাররাদকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ঐ দিন পুরস্কার প্রদান করেন।

খলিফা পরম স্নেহে আতাররাদকে বলেন– "তুমি যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে, তোমার ইচ্ছা হবে–এ তথ্য অন্যদেরকে জানাতে যে, আমি দামেস্কের এমন উন্নত মানের সংগীত পরিবেশন করেছিলাম যা শ্রবণে খলিফাতুন মুসলেমিন পাগল হয়ে যান এবং আনন্দে জামা ছিড়ে ফেলেন।"

এটুকু পর্যন্ত তুমি বলতে পার। কিন্তু যা দেখেছো বা শুনেছো এর মধ্যে কম বেশী করো না। যদি তা কর এর জন্য তোমার মাথা চলে যেতে পারে। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ এক বছরের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু সংগীতজ্ঞ আতাররাদ আরো ৪২ বছর বেঁচে ছিলেন (মৃত্যু ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

১২তম উমাইয়্যা খলিফা তৃতীয় ইয়াজীদ
(৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)

খলিফা তৃতীয় ইয়াজীদ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন মাত্র ৬ মাস। এর মধ্যেই তার সংগীত পৃষ্ঠপোষকতার তথ্য ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তার সময়ে নাছর ইবন সাইয়ার ছিলেন খোরাসনের গভর্ণর। তিনি খোরাসনের গভর্ণরকে নির্দেশ দেন– তার এলাকায় যত ধরনের সংগীতযন্ত্র পাওয়া যায়, তার এক বা একাধিক খলিফার মালাখানায় প্রেরণের জন্যে। শুধু তাই নয়, তিনি খোরাসান এলাকায় বিখ্যাত গায়িকা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে যারা রাজদরবারে আসতে চায়, তাদেরকে দামেস্ক প্রেরনের জন্য নির্দেশ দান করেন। (Muir: Caliphate, page 406)[৭৯]

www.amarboi.org

তৃতীয় ইয়াজিদের সমসাময়িক ইমাম আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রঃ.) বর্ণনা করেছেন, "সংগীত সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। সংগীত নম্রতা বিনষ্ট করে। যৌন কামনা বৃদ্ধি করে এবং নেকী ধ্বংস করে দেয়। সংগীত হলো সূরার বিকল্প। মদ্যপান যেরূপ ক্ষতি করে, সংগীত অনুরূপ ক্ষতিকর। যদি তোমরা সংগীত পরিহার করতে না পার, তবে অন্তত মেয়েদেরকে তা থেকে দূরে রাখ। সংগীত এর কারণে সংগীতজ্ঞগণ অবৈধ যৌন সম্পর্কে প্রলুদ্ধ হয়" আল-গাজ্জালী। (ইহয়াউল উলুমুদ্দিন ২৪৮-২৪৯)[৮০]।

আল বুরদান : মদিনা নগর প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন মহা সংগীতজ্ঞ আল বুরদান। তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা প্রচলিত আছে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সংগীত পেশা ছেড়ে দিয়ে মদীনার বাজার তদারককারীর চাকরি গ্রহন করেন। ইতিহাসে তিনি স্থান অবশ্য পেয়েছেন উমাইয়্যা যুগের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ হিসেবে। (আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী : (কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮)[৮১]।

প্রশাসনিক কাজে দায়িত্ব পালন করেও যে শিল্প এবং সংগীতে সাধনা করে মানব ইতিহাসে স্থান করে নেয়া যায়, তার অন্যতম উদাহরন হলেন আল বুরদান।

সংগীতজ্ঞ আল বুরদান ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত বিশেষজ্ঞ মাবাদের শিক্ষার্থী। আল বুরদান ছিলেন আজ্জা আল মাইলা, জামিলা, এবং মুহারিজের সমসাময়িক। আরব সংগীত ইতিহাসে তার বিশেষ ভূমিকা আছে। তার মাধ্যমে উমাইয়্যা যুগের ক্লাসিকেল সংগীতের ঐতিহ্য আব্বাসিয়া যুগের সংগীতজ্ঞদের নিকট স্থানান্তরিত হয়। (কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯)[৮২]।

সাঈদ ইবন মাসুদ : সংগীতজ্ঞ আবূ আব্দ আল রহমান সাঈদ ইবন মাসুদ সাধারনত হুজালী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন পেশাগত ভাবে একজন Sculptor বা ভাস্কর্যবিদ। তবে সংগীতজ্ঞ হিসেবেও তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। সংগীত গগণে তার গৃহ শিক্ষক ছিলেন স্বীয় ভার্যা।

সংগীতজ্ঞ আবু আব্দুর রহমান ইবন মাসুদ বিয়ে করেন তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত সংগীত বিশারদ ইবন সুরাইজের কন্যাকে। সুরাইজ দুহিতা তদীয় স্বামী আবু আব্দ আল রহমানকে পিতার সংগীত কলা শিক্ষা দেন। কুরাইশদের মধ্যে সংগীতজ্ঞ হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি ছিলো। (কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫২)[৮৩]।

www.amarboi.org

১৩তম উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান
(৭৪৪-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

দ্বিতীয় মারওয়ান ছিল সর্বশেষ উমাইয়্যা খলিফা। উমাইয়্যা এবং আব্বাসিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে যুগান্তকারী যুদ্ধ ঘটে ২৫শে জানুয়ারী ৭৫০ খৃষ্টাব্দে "জাব" নামক স্থানে। পরাজয়ের পরিণতিতে দ্বিতীয় মারওয়ানের মৃত্যু ঘটে।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাত আল কাতিব : মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাত আল কাতিব ছিলেন হেজাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন বানু মাকযুম গোত্রের একজন মুক্ত দাস। তার সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইউনুস আল কাতিব।

তিনি প্রখ্যাত শরীয়াহ্ আইন বিশেষজ্ঞ মালিক ইবনে আনাসের (মৃত্যু ৭৯৫ খ্রীঃ) পরিচিত ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদীর রাজত্বকালে (৭৫৫-৮৫ খ্রীঃ) মুহাম্মাদ ইবন আব্বাত আল কাতিব বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

দাহ্মান আব্দুর রহ্মান ইবন আমর : দাহ্মান আব্দুর রহ্মান ছিলেন ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বার্মাকীর সমকালীন এবং অষ্টম শতাব্দীর সংগীতজ্ঞ। (কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১-৪৬)[৮৪]। তার সঙ্গে সংগীত শাস্ত্রবিদ হাকাম আল ওয়াদীর সংগীত প্রতিযোগিতা হয়।

মালিক আল তাঈ : সংগীত বিশেষজ্ঞ ও সংগীত সাহিত্যিক "ইসহাক আল মাওসুলি" মতে মালিক আল গারীদ হতে মালিক আল তাঈ সংগীতজ্ঞ হিসেবে শ্রেষ্ঠতর। সংগীতজ্ঞ হিসেবে কারো কারো মতে মালিক আল তাঈ আরবে সেরা সংগীতজ্ঞ চতুষ্ঠয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মালিক আল তাঈ এর পূর্ণ নাম আবূ ওয়ালিদ মালিক ইবনে আবিল শামহ্ (মৃত্যু ৭৫৪ খ্রীঃ)। মালিকের পিতা আবিল শামহ্ ছিলেন বানু তাঈ বংশের বনু সুল শাখার একজন অভিজাত ব্যক্তি। তাঈ গোত্র আরবের অন্যতম প্রখ্যাত গোত্র। মালিক আল তাঈ এর মাতা ছিলেন কুরাইশ বংশীয় বানু মাখযুমের কন্যা। তাঈ বংশীয় মালিক তাদের গোত্রীয় এলাকায় এবং ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন।

অভিভাবকত্ব : শিশু কালেই মালিক আল তাঈ পিতৃহারা হন। মদীনার আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবূ তালিব তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহন করেন।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার গৃহে মালিক আল তাঈ সুশিক্ষার সুযোগ পান।

মালিক আল তাঈ এর পৃষ্ঠপোষক আব্দুল্লাহ ইবন জাফর ইবনে আবু তালিব এর ইন্তেকালের পর (৭০০ খ্রীঃ) তিনি হাশেমী বংশীয় সুলায়মান ইবন আলীর আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় আসেন।

প্রশিক্ষণ : আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের তত্ত্বাবধানে থাকা কালেই অপর কুরাইশ ব্যক্তিত্ব হামযাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রাঃ) এর গৃহে আরবের অন্যতম সেরা সংগীতজ্ঞ মাবাদ আমন্ত্রিত হন (৬৮৪ খ্রীঃ) এখানেই মালিক আল তাঈ তার গুরু মাবাদ ইবনে ওয়াহহাব এর সুসংস্পর্শে আসেন। এই সাক্ষাত ছিল তার জীবনের একটি যুগান্তকরী ঘটনা।

মালিক আল তাঈ সঙ্গে সঙ্গে সংগীতজ্ঞ মাবাদের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার সংগীত নৈপুন্যের মাধ্যমে বহু জনের হৃদয় জয় করেন। মালিক আল তাঈ এর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মদীনার অতি উচ্চ মহলেও তার কদর এবং উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।

সংগীতজ্ঞ মালিক আল তাঈ খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের (৭২০-৭২৪ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রীঃ) এর দরবারে আগমনের সুযোগ পান– আরবের দুজন সেরা সংগীতজ্ঞের মাধ্যমে। এরা হলেন ১. মাবাদ এবং ২. ইবন আয়শা। (কিতাবুল আঘানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭)[৮৫]।

মৃত্যু : উমাইয়্যাদেরকে উৎখাত করে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে হাশেমী বংশীয় আব্বাসীয়গণ মুসলিম খেলাফতের উত্তরাধিকারী হন। হাশেমীয় সুলায়মান ইবনে আলী তখন ইরাকের বসরায় গভর্ণর নিযুক্ত হন। মালিক আল তাঈ সুলায়মানের সঙ্গে বসরায় যান।

বসরায় অবস্থিতি মালিক আল তাঈ নিজের জন্য সুখকর মনে করেননি। তাই তিনি (মালিক তাঈ) মদীনায় ফিরে আসেন এবং ৮০ এর উর্ধ্ব বয়সে ৭৫৪ খ্রীঃ মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। (Henry George Farmer: A History of Arabic Music, page 84)[৮৬].

মূল্যায়ন : কেও কেও মালিক আল তাঈকে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ চতুষ্টয়ের মর্যাদা দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। কারন, তিনি মৌলিক সংগীত রচয়িতা ছিলেন না এবং উদ বা বীণা বাজাতে দক্ষ ছিলেন না। তৎকালে সংগীতজ্ঞগণ শুধু গায়কই ছিলেন না। সংগীতজ্ঞদেরকে হতে হতো সংগীত রচয়িতা। তৎকালে সংগীত যন্ত্র খুব বেশী ছিলো না। তার ফলে উদ (বীনা) এর প্রভাব ছিলো ব্যাপক।

www.amarboi.org

মালিক যেহেতু মৌলিক সংগীত রচয়িতা ছিলেন না, তাই তাকে অন্যের রচিত সংগীত গাইতে হতো। অন্যের রচিত সংগীত যিনি গান, তাকে আরব সংগীতের পরিভাষায় বলা হয় মুর্তাজাল ।

মালিক আল-তাঈ যে সংগীত রচয়িতা ছিলেন না, তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তিনি সংগীত রচনা করতেন। তবে, অন্যদের ন্যায় ততো বেশী নয়। তার রচিত সংগীত সেকালের সেরা সংগীতজ্ঞ মাবাদ সংশোধনও করে দিতেন। (কিতাবুল আঘানী, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮-৭৫)[৮৭]।

উমাইয়্যা যুগের চারজন মহিলা সংগীতজ্ঞ

সংখ্যা হিসেবে চার এর অগ্রাধিকার : পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হয়ে থাকেন। তাদেরকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কৃত করার জন্য আরব সমাজে ও সংস্কৃতিতে চারটি বা চারজন নির্ধারিন করা হতো।

সংগীত পরিবেশনের সময় সম্ভব হলে চারজনকে নিমন্ত্রণ করা হতো। সকলকে এক জায়গায় না বসিয়ে চার কোনায় বসানো হতো। এক কোন্ থেকে আগত একজনের সংগীত পেশ শেষ হলে উৎসাহী আরেকজন এগিয়ে আসতো। যে সাহস করে এগিয়ে আসতো, তার নাম ঘোষনা করা হতো। এবং তাকে সংগীত শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো।

আরব দেশে সংগীত ছিলো মুলত দাসী বালিকাদের পেশা। কাজের মেয়ে রাখার সময় তাদের জিজ্ঞাসা করা হতো তারা কি গান গাইতে পারে ? যারা গান গাইতে পারে নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার এবং অধিকতর সুবিধা পেতো। দাসী বালিকা অথবা কাজের মেয়েদের মধ্যে যারা সংগীতে উৎকর্ষতা লাভ করতো, তারা সংগীতামোদী অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতো।

উমাইয়্যা যুগে চার জন শ্রেষ্ঠ মহিলা সংগীতজ্ঞা ছিলেন-

১. জামীলা, ২. সাল্লামা আল কাস্, ৩. হাব্বাবা, ৪. সাল্লামা আল জালকা।

মহিলা সংগীতজ্ঞ জামিলা

জামিলা (মৃত্যু ৭২০ খ্রীঃ) বনু সুলাইমান গোত্রের একজন মুক্ত দাসী ছিলেন। এই গোত্রের একটি শাখা বানূ বাহজ। বনূ সুলাইমান গোত্রে কর্মরত থাকাকালে জামিলা নিজে নিজে গান গাইতো। বনু সুলাইমান গোত্রের প্রতিবেশী ছিলেন কবি ও সংগীতজ্ঞ সাঈব কাসির।

www.amarboi.org

দাসী বালিকা জামিলা প্রতিবেশী সংগীতজ্ঞ সাঈব কাসিরের গান মনোযোগ সহকারে শুনতেন। শ্রবণ করে ব্যর্থ অনুকরণ নয়, বরং অনুরূপ সুর ও স্বরে (নাগামাৎ) ঐ গান অনুকরণ করতেন। তাঁর গৃহকর্তী তাঁর থেকে সাঈব কাসিরের গীত শুনতে চাইত।

একদিন জামিলা এমন গান গাইলেন যা গৃহকর্তী পূর্বে সাঈদ কাসিরের গীত গান হিসেবে শুনেননি। ঐ গানের রচয়িতা ও সুর দাতা কে তা জানতে চেয়ে বনু বাহজের গৃহকর্তী জানলেন যে সংগীতটি জামিলার নিজের রচিত এবং সুরও তারই দেওয়া। (কিতাবুল আঘানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮) [৮৮]।

মহিলা সংগীত কেন্দ্র : এ ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর সংগীত রচয়িতা ও গায়িকা হিসেবে জামিলার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অনেকেই তাকে গৃহে সংগীত শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিয়োগ দানে উৎসাহী হলো। কয়েকদিনের মধ্যে তার গৃহটি আরবের গায়িকা বালিকাদের জন্য সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠল।

খ্যাতি বৃদ্ধির সাথে সাথে জামিলা স্বীয় মালিক পক্ষ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি আকর্ষণীয় বিরাট ভবনেরও মালিক হয়ে যান। জামিলার খ্যাতি গায়িকা হিসেবে যতটুকু তার চেয়ে বেশী সংগীত শিক্ষয়িত্রী হিসেবে। উমাইয়্যা যুগের সেরা সংগীতজ্ঞদের অনেকেই ছিলেন জামিলার শিক্ষার্থী।

সেরা সংগীতজ্ঞ মাবাদের ভাষায় "সংগীত বিজ্ঞানে জামিলা ছিল মহীরুহ সম। আমরা হলাম তাঁর শাখা প্রশাখা"। (কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৪-৪৮)[৮৯]।

শিল্পীদের বিশ্রাম কেন্দ্র : মক্কা মদিনার সংগীতজ্ঞগন জামিলার গৃহে সংগীত পরিবেশন ও শ্রবনের জন্য আতিথ্য বরন করতেন। যাদের মধ্যে ছিলেন সেরা আরব সংগীতজ্ঞগণ।

পরবর্তী কালে সেরা আরব সংগীতজ্ঞ যেমন ১. ইবন মিসজাহ ২. ইবন মুহারীজ, ৩. ইবন সুরাইজ, ৪. আল গারিদ ৫. ইবন আয়শা ৬. ইবনে মাবাদ ৭. মালিক প্রমুখের বিশ্রাম স্থান হয়ে পড়লো জামিলার গৃহ।

শুধু সংগীতজ্ঞ নয়, কবিগণও তার গৃহে পদধুলি দিতেন। এদের মধ্যে থাকতেন ১. উমর ইবনে আবি রাবিআ, ২. আল আহাওয়াস এবং ৩. আল আরজি। এরা ছাড়াও আরো তশরীফ আনতেন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং জামিলার শিক্ষার্থীবৃন্দ।

www.amarboi.org

পবিত্র হজ্জ প্রতিপালন : সংগীতজ্ঞা জামিলার মদীনার জীবনে একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো মক্কা মদিনায় হজ্জ উপলক্ষে গমন এবং সংগীত পরিবেশন।

উমাইয়্যা যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংগীতবিতদের মধ্যে ছিলেন ১. আল ফুয়াদ, ২. হিব্বাতুল্লাহ, ৩. রহমত উল্লাহ। তারা সংগীতজ্ঞ জামিলার সঙ্গে হজ্জ যাত্রীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

হজ্জযাত্রী অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঃ- ১. আবু তালিব ওবায়দুল্লাহ আবজার, ২. আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম, ৩. ইবন জুন্দব, ৪. সুলায়মানের দরবারের তানবি, ৫. দ্বিতীয় ইয়াজিদের দরবারের উম্মে আউফ, ৬. প্রথম ওয়ালিদের দরবারে সুহদা এবং তার কন্যা আতিকা।

জামিলার সংগীতানুষ্ঠানে শিল্পীবৃন্দ ছিলেন ১. সুলাইদা, ২. বুরবুলা, ৩. লাদহাত আল আইশ, ৪. আল ফারিহা প্রমুখ। (কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪)[৯০]।

সংগীতজ্ঞা জামিলার হজ্জকালীন সংগীতানুষ্ঠান : উমাইয়্যা যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সংগীতজ্ঞ ছিলেন- জামিলা। তিনি উমাইয়্যা খলিফা প্রথম ওয়ালিদের (৬০৫-১৫ খ্রীঃ) সময় হজ্জ উপলক্ষে মক্কা মদীনা গমন করেন। মদীনায় এতোবড় আকারের সংগীতানুষ্ঠান অতীতে আরব ইতিহাসে হয়েছিলো কিনা- তার কোনো নজীর নেই। সিরীয়া থেকে প্রথমে এ সংগীতজ্ঞ দল মদীনায় আসেন। মদীনা থেকে মক্কায় যান। মক্কায় হজ্জ সম্পাদনের পর এই সংগীতজ্ঞ দল মদীনায় ফিরে যায়।

জামিলার আগমন উপলক্ষে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে মদীনার প্রায় সকল নামজাদা সংগীতজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। কবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-আহওয়াশ, ইবন আবি আতিক, আবু নুসাইব এবং সংগীতামোদী ভদ্র মন্ডলী। এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলো ৫০ জন কাইনা (সংগীত বালিকা)।

জামিলার নেতৃত্বে এই সংগীতজ্ঞ দল যখন মক্কায় পৌঁছে, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান মক্কার কবি ও সংগীতজ্ঞগণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- উমার ইবন রাবিয়া, আল আরজী, হারিস ইবন খালিদ আল মাকযুমি।

ঐ সময় মদীনায় তিন দিনের ঐতিহাসিক সংগীতানুষ্ঠান হয়, যা হিজাজের ইতিহাসে অতীতে কখনো হয়নি।

প্রথম দু'দিনের অনুষ্ঠান : প্রথম দু'দিনের অনুষ্ঠানে দেশ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-(১) জামিলা, (২) ইবন মুহারিজ, (৩) ইবন সুরাইজ, (৪) ইবন মিসজাহ, (৫) আল

www.amarboi.org

গারিদ, (৬) মাবাদ, (৭) মালিক, (৮) ইবন আয়শা, (৯) নাফি ইবন তানবুরা, (১০) নাফি আল খায়ের, (১১) আল দালাল নাফিদ, (১২) ফান্দ, (১৩) নাওমা আল দুহা, (১৪) বারদ আল ফুয়াদ, (১৫) গুদাইহ আল মায়িহ, (১৬) হিব্বাত আল্লা, (১৭) রহমত আল্লা (১৮) আল হুজাইলী প্রমুখ।

এই সংগীতজ্ঞগণ কখনো এককভাবে, কখনো দুজনে, কখনো তিনজনে একসঙ্গে এসে সংগীত উপস্থাপন করতেন। প্রথম দু'দিন এভাবেই চলেছিলো।

তৃতীয় দিনের সংগীতানুষ্ঠান : তৃতীয় দিনে জামিলা তার ৫০ জন সংগীত বালিকা সহ সংগীত উপস্থাপন করেন। তারা বীনা (Lute) এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। এদের মধ্যে জামিলার নিজের ভূমিকা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

মহিলা সংগীতজ্ঞাবৃন্দ

যে সমস্ত মহিলা সংগীতজ্ঞ মদিনার উক্ত সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, তারা হলেন– ১) সাল্লামা আল জারকা, (২) সাল্লামা আল কাস, (৩) আয্যা আল মাইলা, (৪) হাব্বাবা, (৫) খুলাইদা, (৬) আল ফারাহ/ফারিহা, (৭) রাবিহা, (৮) বুলবুলা, (৯) লাদহাত আল আইশ এবং (১০) সাঈদা (সাদা) প্রমুখ।

সংগীত বালিকাগণ সংগীত উপস্থাপন করেন পাতলা পর্দার আড়ালে থেকে। পর্দা অমন ছিলো যে– বালিকাদের দেখা যেতো আকারে আয়তনে, বয়স্কা না হলে কাওকে অনুমান করা যেতো না।

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ জামিলা যে সমস্ত বালিকা ও মহিলা সংগীতজ্ঞকে মদীনায় সংগীতানুষ্ঠানে উপস্থিত করেছিলেন তাদের অনেকেই উমাইয়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা সংগীতজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

মদীনায় অনুষ্ঠিত জামিলা সংগীতানুষ্ঠানে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৎকালীন সংগীতজ্ঞ ইউনুস আল কাতিবের বর্ণনায়। (Encyclopaedia of Music, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০, ১২)[৯১]।

সাল্লামা আল জারকা : সাল্লামা আল জারকা ছিলেন উমাইয়্যা যুগের প্রখ্যাত মহিলা সংগীত শিল্পী "জামিলার" সংগীত শিক্ষার্থীনী। তারই সংগীত বিদ্যালয়ে সাল্লামা আল জারকা সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। উমাইয়্যা খলিফা প্রথম ইয়াজিদের দরবারে (৬৮০-৮৩ খ্রীঃ) সে যুগের কবি আল আহাওয়াস এর সঙ্গে মহিলা সংগীতজ্ঞ সাল্লামা আল জারকার সাক্ষাত হয়।

www.amarboi.org

প্রথম দর্শনেই কবি আল- আওয়াস সংগীত শিল্পী সাল্লামা আল জারকার প্রেমে পড়ে যান। সাল্লামা যেমন ছিলেন সংগীতকলায় পারদর্শী তেমনি ছিলো তার দৈহিক সৌন্দর্য্য। সাল্লামা আল জারকার সংগীতামোদীর সংখ্যা ছিলো প্রচুর। জীবনের শেষ দিনও সাল্লামা আল জারকা উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের (৭২০-৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজ দরবারে আসেন। (কিতাবুল আঘানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০) [৯২]।

সাল্লামা আল জারকার ভগ্নী রাইয়াও বিখ্যাত সংগীতজ্ঞা ছিলেন। (কিতাবুল আঘানী , ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭, ৯)[৯৩]।

সাল্লামা আল কায়স : সংগীত বালিকা সাল্লামা আল কায়স ছিলেন বনু জোহরা গোত্রের কুরাইশী অভিজাত ব্যক্তিত্ব সুহাইল এর মুক্ত দাসী। তিনি ছিলেন মিশ্র গোত্রের সুদর্শনা কন্যা। মদীনায় জন্ম গ্রহন না করলেও তিনি মদীনায় বড় হয়ে উঠেন। গায়িকা হিসেবে সাল্লামা আল কায়স মদীনার সেরা সংগীতজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যাদের কাছ থেকে সাল্লামা আল কায়স সংগীত শিক্ষা করেন– তাদের মধ্যে ছিলেন জামীলা, মাবাদ, মালিক এবং ইবন আয়শা প্রমুখ।

দাসী বালিকা সাল্লামার মালিক সুহাইল কুরাইশীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসাব সংগীতজ্ঞ সাল্লামাকে উত্তারাধীকার সূত্রে লাভ করেন। মুসাব সংগীতে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি সাল্লামা আল কাসকে তিন হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে উমাইয়্যা যুবরাজ দ্বিতীয় ইয়াজিদের নিকট বিক্রয় করে দেন। ইয়াজিদ ছিলো সাল্লামা আল কাসের পৃষ্ঠপোষক এবং অভিভাবক।

দ্বিতীয় ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার পর আরবের অন্যতম সেরা গায়িকা সাল্লামার সংগীতেও মুগ্ধ হয়ে পড়েন। রাজ প্রাসাদের সকলের নিকট সাল্লামা আল কায়স গায়িকা হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

সংগীতজ্ঞা হাব্বাবা : হাব্বাবা ছিলেন বানু লাশিক গোত্রের ইবনে রুম্মানা এবং ইবনে মীনা এর গায়িকা বালিকা। উমাইয়্যা রাজপুত্র দ্বিতীয় ইয়াজিদ হাব্বাবার খবর পেয়ে তাকে দামেস্কে আনায়ন করেন এবং তার গান শুনে হাব্বাবাকে দ্বিতীয় ইয়াজিদ চার হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

এ খবর তৎকালীন খলিফা সুলায়মানের নিকট পৌছলে তিনি অত্যন্ত রিবক্ত হন এবং ভ্রাতা ইয়াজিদকে নির্দেশ দেন– হাব্বাবাকে তার প্রাক্তন পরিবারে ফেরৎ পাঠাতে। ইয়াজিদ সে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হন।

www.amarboi.org

সুলায়মানের (৭১৫-৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর উমাইয়্যা খলিফা হন দ্বিতীয় উমার নামে খ্যাত উমার ইবন আবদুল আজিজ (৭১৭-৭২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

তার পর খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ খলিফা মনোনিত হন (৭২০-৭২৪খ্রীঃ)। খলিফা হওয়ার পরই দ্বিতীয় ইয়াজিদ তার প্রিয় গায়িকা হাব্বাবাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন। সংগীতজ্ঞা হিসেবে হাব্বাবার বিশেষ সুখ্যাতি ও ব্যাপক পরিচিতি ছিলো। তিনি তৎকালীন আরবদের সেরা সংগীতজ্ঞদের নিকট থেকে সংগীতের প্রশিক্ষন নেওয়ার সুযোগ পেয়ে ছিলেন।

হাব্বাবার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ১. জামিলা ২. আজজাহ আল মাইলা ৩. ইবনে মুহরিজ ৪. ইবন সুরাইজ ৫. মাবাদ এবং ৬. মালিক। (কিতাবুল আঘানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৪-৬৫)[৯৪]।

খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন হাব্বাবার রূপ, গুণ এবং সুরে মুগ্ধ। তিনি তার সান্নিধ্য তীব্র ভাবে কামনা করতেন। হাব্বাবা ৭২৪ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ হাব্বাবার মৃত্যুতে শোকাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং শয্যা গ্রহণ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনিও (দ্বিতীয় ইয়াজিদ) মৃত্যু বরণ করেন।

www.amarboi.org

উমাইয়্যা যুগে সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র

১. আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী, কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮-৭৫
২. কিতাবুল আঘানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৪
৩. কিতাবুল আমানী, ২য় খন্ড, পৃ- ১৫৩, 2nd volume, page-153
৪. ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯
৫. ইকদ আল ফরীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৯
৬. আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী : Kitabul Aghani, 7th Volume, page-168
৭. Burck Hards ; Arab Proverb, Page- ৪৬৪
৮. কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড,পৃষ্ঠা-১৫৭
৯. কিতাবুল আঘানী, ১০ম খন্ড,পৃষ্ঠা-৫৫
১০. কিতাবুল আঘানী, ১৫তম খন্ড,পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২
১১. ইবন আবদ রাব্বিহি, ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮
১২. আল মাসুদী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭
১৩. জুরহি জাইদান, পৃষ্ঠা-১৩৯
১৪. কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬
১৫. আল-মাসুদী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮
১৬. কিতাবুল আঘানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৯
১৭. কিতাবুল আঘানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৭
১৮. কিতাবুল আঘানী, পৃষ্ঠা-৭০
১৯. কিতাবুল আগানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৮
২০. কিতাবুল আঘানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫২
২১. Nicholson: Literary History of The Arabs : Page 123
২২. Henry George Farmer: History of Arabian Music. Facts for the Arabian Musical Influence Appendix, 24
২৩. কিতাবুল আঘানী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬২
২৪. ইকদ আলে ফরিদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮১
২৫. কিতাবুল আঘানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২১
২৬. কিতাবুল আঘানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৯
২৭. কিতাবুল আঘানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯
২৮. কিতাবুল আগানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮
২৯. P N Land: Remarks on the Earliest Development of Arabic Music, page-156

www.amarboi.org

৩০. আল মাসুদী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭
৩১. ইকদ আল ফরিদ, পৃষ্ঠা-৩১৮
৩২. তাবারি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬
৩৩. আল মাসুদী, ৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৬
৩৪. কিতাবুল আগানি, পৃষ্ঠা-৭০
৩৫. কিতাবুল আঘানী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২,৭৯
৩৬. ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭
৩৭. কিতাবুল আঘানী , অষ্টাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৭
৩৮. আল মাসুদী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৯-১০
৩৯. কিতাবুল আঘানী, পঞ্চম খন্ড , পৃষ্ঠা- ১৭, ৫৪
৪০. Muir: Caliphate page 344;
৪১. আল মাসুদী, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১০
৪২. ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৮
৪৩. Henry George Farmer: A History of Arabic Music, পৃষ্ঠা-৩৬১;
৪৪. কিতাবুল আঘানী তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪
৪৫. কিতাবুল আঘানী, তৃতীয় খন্ড ,পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫
৪৬. আল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আঘানী, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৮
৪৭. কিতাবুল আঘানি ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০
৪৮. Muir : Caliphate : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- 361
৪৯. আল ফারাজ আল ইস্পাহানী ঃ কিতাবুল আঘানী
৫০. ইকদ আল ফারীদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭
৫১. ইকদ আল ফরীদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭
৫২. কিতাবুল আঘানী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১-১২
৫৩. ইবন আব্দ রাব্বিহী ঃ ইকদ আল ফরীদ , তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭
৫৪. কিতাবুল আঘানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৬
৫৫. কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০,৬৫
৫৬. কিতাবুল আঘানী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০
৫৭. কিতাবুল আঘানী , প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২
৫৮. কিতাবুল আঘানী, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০
৫৯. আল-মাসুদী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৮
৬০. আল ফাখরী, পৃষ্ঠা-১৭৩; ইবন আ'ত তিকতাকা বর্ণিত মুসলিম রাজবংশের ইতিহাস
৬১. আল-মাসুদী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৯
৬২. কিতাবুল আঘানী, ১৩ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩

www.amarboi.org

৬৩. আল বুহতুরীঃ দিওয়ান, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬০, ১৯৩, ২১৮, আবু তাম্মাম ঃ দিওয়ান, পৃষ্ঠা-১০৩

৬৪. কিতাবুল আঘানী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৬

৬৫. Khallikan: Biographical Dictionary, 2nd vol, p.394

৬৬. Kitabul Aghani, 8th vol, p. 91

৬৭. কিতাবুল আঘানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২১

৬৮. *Bar Hebraeus, page- 207*

৬৯. কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮২

৭০. ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭

৭১. কিতাবুল আঘানী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫

৭২. ফিহরিস্ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৩

৭৩. কিতাবুল আঘানী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭

৭৪. কিতাবুল আঘানী , ১৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৬-৮

৭৫. কিতাবুল আঘানী অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ১৬১

৭৬. কিতাবুল আঘানী, ১৩ তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬১

৭৭. কিতাবুল আঘানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪

৭৮. কিতাবুল আঘানী, ১৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩-১০৫

৭৯. Muir : Caliphate, page 406

৮০. ইহয়াউল উলুমুদ্দিন ২৪৮-২৪৯

৮১. আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী : কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮

৮২. কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯

৮৩. কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫২

৮৪. কিতাবুল আঘানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১-৪৬

৮৫. কিতাবুল আঘানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭

৮৬. Henry George Farmer : A History of Arabic Music, page 84

৮৭. কিতাবুল আঘানী, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮-৭৫

৮৮. কিতাবুল আঘানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮

৮৯. কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৪-৪৮

৯০. কিতাবুল আঘানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪

৯১. Encyclo paedia of, Music ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০, ১২

৯২. কিতাবুল আঘানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০

৯৩. কিতাবুল আঘানী , ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭, ৯

৯৪. কিতাবুল আঘানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৪-৬৫

www.amarboi.org

তৃতীয় অংশ

আব্বাসিয় যুগ

আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চা

মদীনায় ইসলামী খেলাফতের অবসানের পর দামেস্ক কেন্দ্রীক উমাইয়্যাদের আমলে রাজতন্ত্রের শুরু হয়। রাজা–বাদশাহগণ রাজত্ব এবং রাজ্য জয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না। ক্ষমতার সঙ্গে ঐশ্বর্যের সংযোগ হলে আরাম আয়েশ, বিলাসিতা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়। নৃত্যকলা, অভিনয়, ক্রীড়া, ইত্যাদিও উপেক্ষিত হয় না।

তথাকথিত উমাইয়্যা খলিফাদের আমলে আরবে সংগীত চর্চার নতুন প্রবাহ ও যুগের সৃষ্টি হয় যা এশিয়া আফ্রিকার সেমেটিক, হেমিটিক সভ্যতায় ছিল অনেকটা অকল্পনীয়। মিশরের ফেরাউনদের আমলে সাম্রাজ্য বিস্তার, নগর নির্মাণ ও স্থাপত্যশৈলীর দিকে শাসকদের দৃষ্টি অধিকতর ছিল।

উমাইয়্যাদের পর আব্বাসিয়া খলিফাদের আমলে যে মানে এবং স্তরে সংগীতের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়, ভারত, চীন, মিশর, গ্রীস এবং রুশ-বৃটিশ সাম্রাজ্য ও সভ্যতায়ও ততটুকু পৃষ্টপোষকতা লাভ করেনি।

উমাইয়্যাদের আমলে আরবদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল রাজ্য জয় ও শাসন সুসংহত করন। সে কারণে আরবদের মধ্যে সামরিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণী ও গোষ্ঠির বিকাশ ঘটে। আব্বাসীয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আরবদের মধ্যে নব্য বিত্তশালীদের আবির্ভাব ঘটে। তারা ক্ষমতা ও বিত্তের সঙ্গে শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন।

জনগণের আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে তাদের মধ্যে সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংগীত চর্চা বৃদ্ধি পায়। আব্বাসীয়দের সমকালীন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ট সম্রাট ছিলেন শার্লামেন। যখন সমগ্র ইউরোপ ছিল অজ্ঞতা ও বার্বারিজমের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন সার্লাম্যানের খ্যাতি ছিল আন্দলুসিয়া এবং বাগদাদের তুলনায় প্রদীপের মত। (J. Owen, The Skeptics in the Italian Renaissance, London, 1893, P.-65)[১]

www.amarboi.org

আব্বাসীয় তৃতীয় খলিফা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল মাহাদী (৭৭৩-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) এক হজ্জ সফরে সামাজিক অনুষ্ঠান ও আনন্দ উৎসবে ব্যয় করেন **ষাট লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা**। পঞ্চম আব্বাসিয়া খলিফা আবু জাফর হারুন আর রাশীদ (৭৮৬-৮০১ খ্রীষ্টাব্দ) **পচিশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা** ব্যয় করেন মাত্র এক অনুষ্ঠানে। তার সময়ে কোষাগারে পুঞ্জিভূত ছিল নব্বই কোটি পাউন্ড ষ্টার্লিং এর সমপরিমান মুদ্রা।

উমমাইয়্যা ও আব্বাসিয়া যুগে চারুকলাবিদ, সংগীতজ্ঞগণ যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন, তা ছিল ৯ম শতাব্দীর পর ইউরোপে হ্যড্‌ন্‌ (Haydn) এবং মোজার্ট যা পেতেন, তার সঙ্গে অকল্পনীয়ভাবে অত্যধিক। (Henry George Farmer : A History of Arabic Music, Luzac and Company, London, 1929, P.-101)[২]।

আব্বাসিয়া আমলে হাসপাতালে সংগীতের ব্যবস্থা ছিল। বলা হত যে, রোগের অস্তিত্ব, ব্যথা, বেদনা, ইত্যাদি সংগীতের মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। (ইখওয়ান আল সাফা, বোম্বে সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৭, ৯২, ১০১)[৩]।

উলামা, ফুকাহা এবং সংগীত : আলিম, উলামা, শায়খ এবং ফুকাহাগণ কোন অবস্থাতেই সংগীতকে উমাইয়্যা এবং আব্বাসিয়া যুগে সমর্থন দান করেন নি। ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন এবং সংগীত বিরোধী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবিল। অন্য দিকে আব্বাসিয়া যুগে কোনো কোনো সুফী দরবেশ যখন কোন অনুষ্ঠানে জিকির করতেন, সংগীতের ছন্দে ও তারা জিকির করতেন।

সংগীতজ্ঞের সংগীতের দিকে উলামা এবং ফুকাহাগণ অনুমোদনকারীর দৃষ্টিতে তাকাতেন না। কিন্তু ইখওয়ান আল সাফা (পবিত্র ভ্রাতৃ সংঘ), ইবনে সিনা এবং ইবন জায়লা প্রমুখ তত ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেননি সংগীতজ্ঞদেরকে। তবে তাদেরকে দ্বীন বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবেও উল্লেখ করতেন।

তৎকালীন বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানসাধক, দার্শনিক, সাহিত্যিক আবূ সালাত উমাইয়্যা ইবন বাজ্জা, আবুল হাকাম আল বাহিলী, আবুল মাজদ মুহাম্মদ ইবন আবীল হাকাম এর ন্যায় প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ গৌরব বোধ করতেন– এ কথা বলে যে তারা দক্ষ উদ বা বীণা বাদক।

আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা (হাজার রজনীর উপখ্যান) এর নায়ক চরিত্রের একজন বলেন – কিছু লোকের নিকট সংগীত হলো গোশতের ন্যায় প্রিয় এবং কিছু লোকের নিকট ঔষধের ন্যায় প্রয়োজনীয়।

www.amarboi.org

কবি ও সাহিত্যিকগণ সংগীত, সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত যন্ত্রের প্রশংসায় থাকতেন উচ্চকণ্ঠ। (আল-নুওয়াইরি : নিহাইয়্যাত আল-আরাব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৩-২২)[৪] মুগান্নী বা পেশাগত সংগীতজ্ঞাগণ সরকারী এবং বেসরকারী অনুষ্ঠানে আববাসীয়া যুগে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হতেন।

গৃহ ভৃত্যা বনাম দাসী (কায়না) সংগীত বালিকা : পৌত্তলিক আরব সমাজে অভিজাত্য বোধ ছিল চরম। ধর্মীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সংগীতানন্দ উপভোগ করতেন। কিন্তু নিজেদের সংগীত চর্চাকে মনে করতেন অবমাননাকর। গৃহ ভৃত্যা ও দাসী বালিকাদের সংগীত চর্চায় আরব বিত্তশালীগণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

কায়না বা সংগীত বালিকা বেসরকারী ভবনে বা হারিমে প্রতিপালন করা ছিল অভিজাত্যের একটি মাপকাঠি। অভিজাত গৃহে চাকুরীর লক্ষ্যে দরিদ্রগণ তাদের কন্যাদেরকে সংগীত শিক্ষায় উৎসাহীত করতেন।

যে সমস্ত গৃহ ভৃত্যাগণ সংগীত চর্চায় উৎকর্ষতা অর্জন করতেন, তাদের পারিশ্রমিক হতো অধিকতর। কাজের মান হতো সম্মানজনক। তারা পরিবারের অলঙ্কার হিসাবে গন্য হতেন।

আব্বাসিয়া খলিফাদের দরবারে কখনো কখনো ১০০ (একশত) এর অধিক সংগীতজ্ঞ, বাদ্য বাদক, চিত্রাঙ্কন শিল্পী, কবি, কৌতুক বিদ, প্রভৃতি ললিত এবং চারুকলাবিদ থাকতেন। অভিজাতদের বহু গৃহে দশ বা ততোধিক সংগীতজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞা সংশ্লিষ্ট রাখা হতো।

সংগীতজ্ঞা গৃহ ভৃত্যাগণ তাদের কণ্ঠস্বরে গৃহ স্বামী, তার পুত্র এবং অতিথি নন্দনের হৃদয় আলোড়নে সমর্থ হয়ে গৃহ বধু স্তরে উন্নীত না হলেও অতিরিক্ত বধুতে উন্নীত হতেন।

দাসী সংগীত-বালিকাদেরকে বিবাহের সময় সাধারনত মুক্ত করে দেয়া হত। যদিও কেও ক্রয়কৃত দাসী বালিকা বিবাহ করতেন, সন্তান জন্মের পর তাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করা হত।

দাসী সংগীত বালিকাদের বিক্রয় মূল্য ছিল অত্যন্ত চড়া। তবে তাদের অবস্থা সাধারণ দাসীদের মত ছিল না। তাদের রুচিবোধ, চাল চলন, শিক্ষা ও রসবোধ ছিল অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন মুক্ত নাগরিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের।

এরা পরিবারে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করা দাসী হলেও তারা খেদমতগার সেবা দাসী ছিলেন না, বরং উচ্চতর মর্যাদার সঙ্গী এবং অতিথিসম ছিলেন।

www.amarboi.org

গৃহ সংগীতজ্ঞদের আদর আপ্যায়ণ এর মাত্রা গৃহসংযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষকদের থেকেও উচ্চতর ছিল। কারন, তাদেরকে তাদের চারুকলার মান রক্ষার জন্য সাধনা করতে হত এবং প্রায়সই অন্য পরিবারের সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে হত। তা দ্বারা অভিজাতদের তুলনামূলক মর্যাদা নির্ণয় হতো।

মালটায় গৃহ সেবিকাদের অবদান : বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মালটায় গৃহসেবিকাদের জন্য শিশুদেরকে শুদ্ধ ভাষা ও স্বাক্ষরতা দানের দক্ষতা সম্পন্ন হওয়া আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত দক্ষতা ছাড়া কোনো দেশী এবং বিদেশী নারী গৃহসেবিকা হিসাবে কোন পরিবারে গৃহ কর্মের লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না।

আরবদের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা ও সভ্যতার মান উন্নীত হওয়ার সাথে সাথে গ্রীক সভ্যতার প্রভাব তাদের দেহ মনে অনুভূত হতে থাকে। গ্রীক সভ্যতায় সংগীতের কদর ছিল। সংগীতের ওপর গ্রীক গ্রন্থাবলী অনুবাদের ফলে আরব সংগীতের ওপর গ্রীক প্রভাবও বৃদ্ধি পায়। (E. G. Browne : A Literary Histroy of Persia from the Earliest times till Firdousi, Vol- 1, London, 1902, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- 6)[৫]।

পারস্য সংগীতের প্রভাব : আব্বাসিয়াদের উত্থানের (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পর আরব সংগীতের ওপর পারস্য প্রভাব– বিশেষ করে খোরাসানী প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। আব্বাসিয়াদের প্রাদেশিক ইরানী সাসানীয় সুলতানাতের উত্থানের পর ইরানী প্রভাব আরবে আরো বাড়তে থাকে।

খলিফা হারুন অর রাশীদের আমলে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) আব্বাসিয়া রাজ দরবারের সংগীতজ্ঞগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এ বিভক্তির কারন ধর্মীয় আদর্শ চেতনা ছিল না। বরং, তা ছিল দরবারের দু'জন সংগীত ব্যক্তিত্বকেন্দ্রীক। এক দলের নেতা ছিলেন হারুন অর রাশীদের বৈমাত্রিয় ভ্রাতা ইব্রাহীম ইবন খলিফা মাহদী। অপর জন ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইব্রাহীম আল মাওসুলী।

শাহজাদা ইব্রাহীম ইবন মাহদী ছিলেন সংগীতে পারস্য প্রভাবের পক্ষপাতী। এ দল পরিচিত হয় প্রগতিশীল রোমান্টিক স্কুল হিসেবে। ইব্রাহীম আল মাওসুলী ছিলেন মূল আরবী ধারার পক্ষপাতী।

শাহজাদা ইব্রাহীম ইবন আল মাহদী আরবী সংগীতের নীতিমালা মেনে চলতেন না। তিনি সংগীতের গ্রামার অনুসরণ না করে সংগীতের সুর, তাল,

www.amarboi.org

তান, লয়, ইচ্ছামত পরিবর্তন করেতেন। তবে তার কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর।

সংগীতের নীতিমালা ভঙ্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন- আমি সংগীতের সুলতান। আমি সুলতানের পুত্র। আমি যা সঙ্গত মনে করি, সেভাবে গান গাই।

তার প্রশ্রয়ে তরুন এবং আধুনিক সংগীতজ্ঞগন সংগীত ভূবনে স্বাধীনতার চর্চা করতেন। ফলে আরব সংগীতে বহু নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। এই ধারা ইব্রাহীম আল মাওসুলীর সময় বিজয়ী না হলেও পরবর্তী সংগীতজ্ঞদের জন্য তা ছিল সুবধিাজনক।

তুলুনিজ সুলতানদের উত্থানের পর (৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) আরবী সংগীতের ওপর তুর্কী সংগীতের ছায়া পড়ে এবং তা মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সংগীতের ক্ষেত্রে যদিও পারস্য প্রভাব আরবদের ওপর পড়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান, দর্শন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরব গবেষণায় প্রভাব পারস্যের ওপর পড়তে থাকে। *Noel Deke* এর মতে পারস্য সংস্কৃতি এবং গ্রীক প্রভাব আরব জাতীয় জীবনের ওপর ছিল ভাসা ভাসা। কিন্তু ধর্মীয় কারনে আরব প্রভাব পারস্য জীবনধারা ও সংস্কৃতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিল। (Henry George Farmer : A History of Arabian Music, পৃষ্ঠা 145)[৬]।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং কারনে আরব প্রভাব পারস্য এবং আন্দালুসিয়া সংস্কৃতিতে তীব্রভাবে পড়েছিল। কিন্তু একটি ক্ষেত্র এ প্রভাব থেকে ছিল মুক্ত। তা হল সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে। সংগীতের প্রতি দুর্বলতা একমাত্র চতুর্দশ আব্বাসিয়া খলিফা আল মুহতাদি (৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছাড়া সকলেরই ছিল। উলামাগণও জনগণের অনুসৃত বিষয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতাধর অথবা সেনা প্রধানদের অভিমতের প্রতি ছিলেন উদাসীন অথবা সহনশীল।

আব্বাসিয়া যুগে সংগীত সাধনা

আব্বাসিয়া যুগে সংগীতচর্চা আধুনিক কালের ন্যায় অত্যন্ত জটিল এবং সাধনালব্ধ স্তরে পৌছেছিল। এরূপ পরিশ্রমলব্ধ সাধনা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে দৃশ্যমান হয় না। তৎকালে সংগীত চর্চার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সাধনা। এই সাধনা ছিল জীবনব্যাপী। সংগীত চর্চা কোন সৌখিন পেশা ছিল না। তারাই এই পেশায় সফল হতেন, যারা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজস্ব সাফল্য অর্জনের জন্য একনিষ্ঠ।

www.amarboi.org

বায়তুল হিকমা : আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গ্রীক সংগীত বিজ্ঞান ও সংগীত কলার প্রভাব যা উমাইয়্যা আমলে ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছিল বায়তুল হিকমা (বিজ্ঞান গবেষনাগার) এর প্রভাবে। বায়তুল হিকমা এর কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, গবেষক, বৈজ্ঞানিক– সকলেরই মধ্যে ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের তৃপ্তিহীন ক্ষুধা। জ্ঞানচর্চা ছিল বায়তুল হিকমার প্রভাবিত জ্ঞানযোগিদের অন্যতম সাধনা ও আরাধনা।

বায়তুল হিকমা প্রভাবিত উদারপন্থী আব্বাসিয়া সংগীতজ্ঞদের মধ্যে প্রথম কাতারে ছিলেন ১। বানু মুসা, ২। আল কিনদী, ৩। আল সারাকাসি, ৪। সাবীত ইবন কুব্বা, ৫। কুস্তা ইবন লুকা, ৬। মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া আল রাজী, আল ফারাবী, প্রমুখ।

সেরা সংগীতজ্ঞগণ উমাইয়্যা ও আব্বাসিয়া যুগে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তন্মধ্যে ইব্রাহিম আল মাওসুলির সংগীত কলেজ ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত।

ইখওয়ানুস সাফা : সংগীতজ্ঞ, সংগীততত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক হিসাবে চিন্তাবিদদের একটি গ্রুপ আব্বাসিয়া আমলে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। এরা "ইখওয়ানুস সাফা" নামে পরিচিত ছিল। "ইখওয়ান আস সাফা" এর মতে গ্রহ নক্ষত্রের চলার গতির মধ্যে নাগামাত (সংগীতের কলা) এবং আলহান (Melody) আছে। তারা বিশ্বাস করতেন মানব দেহের বিভিন্ন ভাব, অনুভূতি, ক্রোধ, ঘৃণা, হাসি, আনন্দ, বেদনা এবং মেজাজ, ইত্যাদি সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

ইখওয়ানুস সাফা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য **একান্নটি** গ্রন্থের সংকলন করেছিলেন। এর মধ্যে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগীত ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংগীত সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় ইখওয়ান সাফার নির্বাচিত রিসালার অর্ন্তভূক্ত ছিল–তা Henry George Farmer এর Arabic Musical Manuscript এ উল্লেখ আছে। (Al-Maqqari, The History of Mohammedan Dynasties in Spain, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০, ১১৭-৮)[৭]।

দার্শনিক ইবনে আল কিফতীর মতে ইখওয়ানুস সাফা গোষ্ঠির সদস্যরা ছিলেন নেকভক্ত, পবিত্রমনা, সত্য সন্ধানী এবং জান্নাত কামী। তাদের ধর্ম চিন্তার মান ছিল সমকালীন ধর্ম চিন্তা থেকে অতি উন্নত।

তাদের বিশ্বাস ছিল ইতিহাস– বিশেষ করে অতীতের জ্ঞান সাধক জাতি গ্রীকদের থেকে মুসলিমদের শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে।

www.amarboi.org

তারা মনে করতেন যে, ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে। জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এই অপবিত্রতা ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে। তাই তারা ছিলেন জ্ঞানের সাধক। তাদের জ্ঞান চর্চার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা অন্যদেরকে জাহেল, কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, বেদাতী, ইত্যাদি ফতোয়াবাজী করে গালাগালি করতেন না। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়।

আব্বাসিয়া প্রদেশসমূহে সংগীতচর্চা : আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চা শুধু কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং রাজকীয় দরবারেরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি, প্রদেশিক রাজধানীগুলোতেও সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। স্থানীয় সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি কর্তৃক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করা হত।

ইরানের টানসক্সিয়ানা রাজ্যের সামানিয়া শাসকগণ ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষক। সামানীয় শাসকগণই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তৎকালীন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক এবং সংগীত তত্ত্ববিদ মুহাম্মাদ **ইবন জাকারিয়া আল রাজী** এবং পরবর্তীতে **ইবনে সিনার** মত মহা মনীষীকে।

সিরিয়া ও দামেস্ক দরবারের মধ্যমনি ছিলেন দার্শনিক, সংগীত-তত্ত্ববিদ **আল ফারাহবী আল ইস্পাহানী** (ইহসা আল-উলুম) **এবং আল মাসুদী**। সিরিয়ার শাসকগণ ছিলেন হামদানীদ নামে খ্যাত।

আব্বাসিয়াদের পতনের যুগের খলিফাগণ ছিল নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী। আসল ক্ষমতা ছিল বুওয়াইহিডস, সেলজুকী এবং খাওরিজমী আমীরদের হাতে। বাগদাদের খলিফারা ছিলেন ঐ যুগে প্রকৃত ক্ষমতাধরদের আশ্রিত খলিফা। ক্ষমতাধরদেরকে বলা হত প্রটেকটর বা রক্ষাকর্তা।

আব্বাসিয়া রাজত্বের শেষ তৃতীয়াংশে (৯৪৫-১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) আব্বাসিয়া খেলাফতের প্রকৃত ক্ষমতা বিভিন্ন আঞ্চলিক বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন হয়ে যায়। আঞ্চলিক প্রধানগণ সকলেই তাদের ক্ষমতা দখল বৈধ করার জন্য বাগদাদের খলিফার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতেন। নজর, নেয়াজ, উপহার দিতেন। বার্ষিক কর দিতেন।

অতঃপর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও খলিফার হস্তক্ষেপ বহির্ভূত ভাবে নিজেদের দখলকৃত এলাকা আঞ্চলিক শাসকদের নামে পরিচালনা করতেন। (Zakariyyah Al-Qazwini : Athar al Bilad, পৃষ্ঠা- ৩৬৪)[৮]।

দিল্লীর দাস বংশীয় সুলতান শামস উদ্দীন ইলতুতমিস (১২১১-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) আব্বাসিয়া খলিফা আবূ জাফর মানসুর আল মুনতাসির বি আমরুউল্লাহ (১২২৬-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে "সুলতান-ই আজম" উপাধি গ্রহন করেন ১২২৯

www.amarboi.org

খ্রীষ্টাব্দে। তখন আব্বাসিয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রদীপ ছিল নিভু নিভু।

শুধু মাত্র খলিফার প্রাসাদেই নয়, খেলাফতের অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে জ্ঞানী, গুনী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কাব্য সাধক, সাধক, নাট্যকার, উপন্যাসবিদ এবং রস সাহিত্যবিদদেরও পৃষ্ঠপোষকতা আব্বাসিয়া খলিফাদের আমলে হত। বুওয়াইহিডস বংশের সুলতানগণও সংগীতজ্ঞ, সংগীতচর্চাবিদ, সংগীত সাহিত্য ও সংগীত দর্শনবিদদের বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

যুগ পথ কবিতা ও সংগীত : আব্বাসিয়া যুগে বহু কবির কবিতার স্বরগ্রাম তৈরী করা হয়। তাদের কবিতাসমূহ– কবিতা হিসাবে আবৃতি করা হত এবং সংগীত হিসাবেও গীত হত। যাদের কবিতার স্বরগ্রাম তৈরী করা হয়েছিল তাদের কয়েকজন হলেন ঃ- ১. আল বায়াদী (মৃত্যু ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দ), ২. ইবন হামদীস (মৃত্যু ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দ), ৩. বাগদাদের আবু আবদাল্লা আল আবলা (মৃত্যু ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), ৪. কায়রো এর তাকি আল দীন সারুকী (মৃত্যু ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) আরো অনেকে (British Musium Manuscript)

আন্দালুসিয়া (স্পেন) : আন্দালুসিয়া শুধু মধ্য যুগে নয়, পরবর্তী কালেও সংগীত চর্চায় ছিল বিত্তশালীদের চিত্তবিনোদনের অঞ্চল। সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে সহজ, সরল, গণসংগীতের আবেদন। সুদূর অতীতে বাউল কবিগণই মরমী সংগীত পরিবেশন করতেন। চারন কবিরা গাইতেন বিভিন্ন ধরনের গান। পল্লী কবিগণই ছিলেন সহজ সরল গানের প্রচারক যা দিবসে, রজনীতে, কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনীত হত।

আন্দালুসিয়ার সংগীত চর্চা বিত্তশালী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সংগীত ছিল শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবিক অধিকার।

জাকারিয়া আল কাজবিনি তার (মৃত্যু ১০৮৩) "আসার আল বিলাদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আন্দালুসিয়ার প্রায় সকল অধিবাসীদের মধ্যে সাহিত্য ও সংগীতের প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। সাধারন কৃষকেরাও ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতেন এবং তাতে সুর দিতেন। (Henry George Farmer: A History of Arabic Music, P.- 215)[১]।

আব্বাসিয়া যুগে মুসলিম স্পেনে সংগীত চর্চা : আব্বাসিয়া যুগে উমাইয়্যা বংশীয় শাসকদের শাসনকৃত আন্দালুসিয়া নামে কথিত স্পেনে যে মুসলিম রাজত্ব ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, তা মুসলিম বিশ্বকে যতটুকু প্রভাবিত করেছিল, তা থেকে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ইউরোপকে।

গ্রীস ও ইতালিতে যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা হয়েছিল, তা কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল। গ্রীক ও ইতালীয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

www.amarboi.org

সংরক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ে মুসলিম স্পেনের ওপরে। এ দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে সু সম্পন্ন করে ইউরোপকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।

গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল, তার ওপর গবেষণা করে নতুন সভ্যতা সৃষ্টিতে মুসলিম স্পেনে নতুন ইউরোপ সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রাখে। মুসলিম স্পেনে শুধু সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয়, বিজ্ঞান চর্চাও সম গুরুত্ব পেয়েছিল।

ইবনে গালিব (মৃত্যু ১০৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) স্পেনিস আরবদেরকে গানচর্চার ক্ষেত্রে তুলনা করেছেন ভারতীয়দের সঙ্গে। বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তুলনা করেছেন গ্রীকদের সঙ্গে। তার মতে মুসলিম স্পেনে জনগণের সংগীতের প্রতি আকর্ষণ এসেছে শুক্র (ভেনাস) গ্রহ থেকে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এসেছে বুধ (মারকারি) গ্রহ থেকে।

ইবন আল হিজারী (মৃত্যু ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) লিখেছেন যে, অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সকল অংশ থেকে শিক্ষার্থীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র কর্দোভাতে এবং আন্দালুসিয়ায় আসত। উলামা এবং শিক্ষাবিদদেরকে তারা মৌমাছির মত ঘিরে ধরত। (আবুল হাসান আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২১-২২)[১০]।

www.amarboi.org

আব্বাসিয়াদের উত্থান যুগ

১ম আব্বাসিয়া খলিফা আবদুল্লাহ 'আব্বাস আস সাফফা' (৭৫০-৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)

আব্বাসিয়া খেলাফতের প্রথম শাসক ছিলেন "আস সাফফা" নামে কুখ্যাত প্রথম আব্বসিয়া খলিফা "আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ"। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস সাফফা ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পিতৃব্য আব্বাস ইবন মুত্তালিবের বংশধর।

আব্বাসিয়দের ক্ষমতার উৎস ছিল খোরাসান এবং পারস্য। তাই তারা বাইজানটাইন এবং উমাইয়া প্রভাবিত সিরিয়া থেকে রাজধানী ইরাকে স্থানান্তর করেন। প্রথমত রাজধানী স্থাপন করা হয় কুফাতে এবং পরবর্তীতে তা স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে। আবুল আব্বাস ছিলেন একজন কঠোর ও স্বৈরচারী শাসক। তবুও সংগীত ও শিল্প কলার প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন না। ঐতিহাসিক আবুল হাসান আল মাসুদী লিখেছেন যে, কোনো বুদ্ধিমান সংগীতজ্ঞই প্রচুর আর্থিক উপহার না নিয়ে আবুল আব্বাসের দরবার ত্যাগ করেননি।[১০]

আল খলিল ইবনে আহমাদ : আল খলিল ইবনে আহমাদ (৭১৮-৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন বসরা কেন্দ্রিক আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত। তিনি ছিলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠতম সংগীততত্ত্ববিদ। তিনি আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম অভিধান রচয়িতা ও সংকলক হিসাবে খ্যাত। এই অভিধানের নাম "কিতাব আল আইন"। তিনি ছন্দ এবং সংগীতজ্ঞ হিসাবেও পরিচিত।

আল খলিল ইবনে আহমাদ এর সংগীত শাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণা কর্মের দুটি পুস্তক "কিতাব আল ফিহরিষ্টে" উল্লেখ আছে। এগুলো হলো- (১). "কিতাব আল নাগাম" (সংগীত সংক্রান্ত পুস্তক) এবং (২). "কিতাব আল ইকা" (ছন্দ সংক্রান্ত পুস্তক)। (নাদিম আল-ওয়াররাক বাগদাদী, কিতাব আল ফিহরিষ্ট, পৃষ্ঠা- ৪৩)[১১]।

দশম শতকের সুপন্ডিত হামজা ইবন আল হাসান আল ইস্পাহানী লিখেছেন আল খলিল ইবনে আহমাদের ন্যায় এমন পন্ডিতজ্ঞের জন্ম ইসলামের ইতিহাসে হয় নি। তিনি অজানা বিজ্ঞানসমূহ আবিষ্কার করেছেন। ঐ সমস্ত বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলোও আরবদের অজানা ছিল। (কিতাবুল আগানী, খন্ড

www.amarboi.org

৬, পৃষ্ঠা ৭৮-৮০)[১২]।

ইসমাইল ইবনে হারবিদ ঃ ইসমাইল ইবনে হারবিদ ছিলেন বনু কিনাফ এবং বনু জোবায়ের ইবনে আওয়াম পরিবারের মুক্ত দাস। তিনি উমাইয়্যা খলিফা ২য় ওয়ালিদের থেকে শুরু করে হারুন আর রশীদের দরবারে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। (আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮)[১৩]।

২য় আব্বাসিয়া খলিফা আবূ জাফর আব্দুল্লাহ,আল মানসুর (৭৫৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)

আব্বাসিয়া প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ এর ইন্তিকালের পর আল মানসূর নামে খ্যাত তার ভ্রাতা আবূ জাফর আবদুল্লাহ আল মানসূর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করেন ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। খলিফা আল মানসূর ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

বাগদাদ শুধু রাজ্যের রাজধানী ছিল না। কালক্রমে এই নগরী শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সারা বিশ্ব থেকে কবি, সংগীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানতাপসগণ বাগদাদে আকর্ষিত হতে থাকেন।

আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল আল মানসুরের দুটি বিলাস প্রসাদ "বাব আল দাহাব" এবং "কাছর খুলদ"।

অন্যান্য খলিফাদের তুলনায় আল মানসুর সংগীতের প্রতি তুলনামূলক ভাবে উদাসীন ছিলেন। তবে তিনি তার অভিমত ও চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেননি। যদিও খলিফা মানসূর সংগীতকলার প্রতি উদাসীন ছিলেন, কিন্তু তার পিতৃব্য সুলাইমান ইবন আলী এর দু'পুত্র এবং স্বীয় পুত্র আল মাহাদী এবং ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস প্রমুখ ছিলেন সংগীতের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহী ও সংগীতজ্ঞদের উদার পৃষ্ঠপোষক।

হাকাম আল ওয়াদী : দ্বিতীয় আব্বাসিয়া খলিফা আল মানসূর এর আমলে আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন "হাকাম আল ওয়াদী"। তার পূর্ণ নাম- আবূ ইয়াহিয়া হাকাম ইবনে মাইমুন আল ওয়াদী। আবূ ইয়াহিয়া হাকাম আল ওয়াদী ছিলেন উমাইয়্যা খান্দানের একজন মুক্ত দাস ও জন্ম সূত্রে নরসুন্দর নাপিত। তার পিতা মাইমুন আল ওয়াদী ছিলেন জন্মগতভাবে ইরানীয়ান। পেশাগতভাবে নরসুন্দর। সংগীতজ্ঞ আবূ ইয়াহিয়া

www.amarboi.org

হাকামের জন্ম ওয়াদী আল কুরা নামক উপত্যকায়।

আবূ ইয়াহিয়া হাকামকে উমাইয়্যা খলিফা প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ) দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। মুক্তি পাওয়ার পর হাকাম আল ওয়াদী পেশা হিসেবে ব্যবসা বানিজ্য গ্রহন করেন। ঐ ব্যবসায় তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করেন।

প্রকৃতিগতভাবে হাকাম আল ওয়াদী ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ। শ্রোতারা তার গীত সংগীত মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করত। পেশাগত ব্যবসা সংক্রান্ত্র অর্থের জন্য কেও তার ভক্ত ছিল না। কিন্তু সংগীত শ্রোতা হিসেবে তার ভক্তের কোন অভাব ছিল না।

হাকাম আল ওয়াদী তার জম্মস্থানের শ্রেষ্টতম সংগীত শিল্পী উস্তাদ উমর আল ওয়াদীর নিকট সংগীত শিক্ষার্থী হিসেবে মধ্য বয়সে আশ্রয় নেন এবং উস্ত াদের খেদমত ও সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

সেকালে অর্থের বিনিময়ে জ্ঞান বিক্রয় হত না। সত্যিকার জ্ঞানীরা অর্থ পিপাসু ছিলেন না। তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে খোঁজ করতেন শিক্ষার প্রতি সত্যিকার অনুরাগ এবং নেশা কার কতটুকু আছে ।

যারা যে কোন বিদ্যায় ছিল নিবেদিতপ্রাণ, উস্তাদগণ তাদেরকে মনে করতেন তাদের পেশাগত উত্তরাধিকারী। নিবেদিত প্রাণ শিক্ষার্থীদেরকে তারা পুত্রসম ভালবাসতেন এবং তাদের জ্ঞানের আলোকে অভিসিক্ত করে তুলতেন।

হাকাম আল ওয়াদীর শিক্ষক উমার আল ওয়াদী তার সফলকাম সংগীত শিষ্য হাকাম আল ওয়াদীকে নিয়ে যান উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবারে (৭৪৩-৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। উদ্দেশ্য ছিল সংগীত শিক্ষার্থী হিসেবে শিষ্যের মূল্যায়ন এবং সংগীত শিক্ষক হিসেবে নিজের মূল্যায়ন ও ভাব মর্যাদা উন্নত করন।

উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবারে সংগীত উপস্থাপনার পুরস্কার হিসেবে হাকাম আল ওয়াদী পেলেন **এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা**। খলিফা ২য় ওয়ালিদ ছিলেন সংগীতের নেশায় পাগল। এ পাগলামীর জন্য তিনি বেশীদিন বাঁচেননি। এক বছর খেলাফতের পরেই ৭৪৩-৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

দ্বিতীয় আল ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তার সংক্ষিপ্ত খেলাফতের অনেক কিছুই বর্জিত হয়। এই বর্জন সামগ্রীর মধ্যে একটি ছিল দরবারের জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদী, যদিও হাকাম আল ওয়াদী ছিলেন আরবদের শ্রেষ্ঠ

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞদের অন্যতম। (আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা -৯)[১৪]।

খলিফা আল মানসূরের সময় (৭৫৪-৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হাকাম) আল ওয়াদী ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সংগীতজ্ঞ হিসেবে হাকাম আল ওয়াদী খলিফা মানসুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। কিন্তু খলিফার পিতৃব্য পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে আবিল আব্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাফল্য মন্ডিত হন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবিল আব্বাস ছিলেন সংগীতের খাঁটি সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক। শীঘ্রই তার সংগীত আসরের মধ্যমনি হয়ে উঠলেন আবূ ইয়াহিয়া হাকাম আল ওয়াদী। কিন্তু বয়স তার জন্য অপেক্ষা করেনি। তিনি তখন ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ বয়স্ক। সংগীত উপস্থাপনার জন্য প্রাসঙ্গিক পরিবেশ প্রয়োজন হয়। সঠিক পরিবেশে সংগীতামোদীগণ একত্রিত হন এবং সংগীতজ্ঞদের খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে।

কণ্ঠস্বরে বাধ্যর্ক্যের চাপ থাকলেও "হাকাম আল ওয়াদী" অল্প সময়ের মধ্যেই বাগদাদের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। সুখ্যাতির সঙ্গে লাভ করেন প্রচুর অর্থ। এ অর্থ উপভোগের জন্য তিনি তার জন্মস্থান ওয়াদী আল কুরায় ফিরে যান। উপত্যকার নীরবতায় তার সংগীতের শ্রোতা ও সমজদার বেশী হত না।

বাগদাদে হাকাম আল ওয়াদির খ্যাতি ছিল রাজধানীব্যাপী। নিজ পিতৃভূমিতে তিনি মূল্যায়িত হতেন সংগীতজ্ঞ হিসেবে নয়। বরং, অন্য পাঁচ দশ জনের ন্যায় নিজস্ব এলাকার সুসন্তান হিসেবে।

মাতৃভূমির অমায়িক স্নেহ ও ভালবাসায় হাকাম আল ওয়াদির সংগীত পিয়াসী অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হলো না। তিনি ফিরে এলেন বাগদাদে। বাগদাদে হাকাম আল ওয়াদি তৎকালীন খলিফা আল মাহাদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ), খলিফা আল হাদী (৭৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খলিফা হারুন আর রশীদের মাহফিলে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীত উপস্থাপন করতেন। উপরোক্ত তিনজন খলিফার মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ালিদের ন্যায় খলিফা আল হাদী ছিলেন সংগীতের নিবেদিতপ্রাণ পৃষ্ঠপোষক।

খলিফা আল হাদীর (৭৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) উৎসাহ ও বদন্যতায় তার দরবারে অনুষ্ঠিত হয় ইতিহাস খ্যাত সংগীত প্রতিযোগীতা। বাগদাদে অনুষ্ঠিত

www.amarboi.org

ঐ সংগীত প্রতিযোগীতায় হাকাম আল ওয়াদী সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পী হিসেবে বিবেচিত হন।

ইব্রাহীম আল মাওসুলী এবং ইবনে জামীকে পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করেন হাকাম আল ওয়াদী। অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রথম পুরস্কারটি ছিল **তিন লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা**।

দেশের সেরা সংগীতজ্ঞদের পরাজিত করে বিনয়ী সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদী নিজের সাফল্যে অপ্রস্তুত এবং অভিভূত হয়ে যান।

দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবার থেকে **এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা** পেয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন নিজ জন্ম ভূমি ওয়াদি আল কুরা উপত্যকায়। আল হাদীর দরবার থেকে এ প্রতিযোগিতায় তিন লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা পেয়ে তিনি বাগদাদ পরিত্যাগ করে পুনরায় চলে যান প্রিয় মাতৃভূমিতে।

মরুদ্যানের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি। হাকাম আল ওয়াদি তার জন্ম ভূমি ওয়াদি আল কুরা ছেড়ে চলে যান দামেস্কে। দামেস্কের গর্ভনর ছিলেন সংগীতজ্ঞ শাহাজাদা ইব্রাহীম আল-মাহাদী।

শাহাজাদা ইব্রাহীম আল মাহাদী নিজেই ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও সংগীত শিক্ষক এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। গর্ভনর ইব্রাহীম আল মাহাদী সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদি থেকে নতুন নতুন সংগীত এবং সংগীতের সুর লহরী সংগ্রহ করতে থাকেন। হাকাম আল ওয়াদী রচিত দু'শত সংগীত এবং সংগীত স্বরগ্রাম ইত্যাদির প্রতিদানে শাহাজাদা "ইব্রাহীম আল মাহাদী" সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদীকে উপহার দেন **দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার রৌপ্য মুদ্রা**।

সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদীর সর্বাধিক অবদান ছিল আরবের বিখ্যাত হেজাজ ছন্দ উন্নয়ন এবং সাফল্য ছিল তা পরিবেশনে। (আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ঃ কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩, ৬৬)[১৫]।

এ বিরাট অঙ্কের অর্থ পুরস্কার পেয়ে মনের আনন্দে হাকাম আল ওয়াদী ফিরে যান তার শান্তির নীড় জন্মভূমি ওয়াদী আল কুরাতে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাটান।

মুহাম্মাদ ইবনে হামজা আবূ জাফর : মুহাম্মাদ ইবনে হামজা আবূ জাফর ছিলেন বাগদাদের খলিফা মানসুরের (৭৫৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) মুক্ত দাস। তার সংগীতের উস্তাদ ছিলেন ইব্রাহিম আল মাওসুলি। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ, ক্রিয়াবিদ, এবং গল্প কথক হিসাবে গণ্য হতেন। খলিফা হারুন আর

www.amarboi.org

রশীদের দরবারেও তিনি সংগীত পারিষদ ছিলেন।

খলিফা হারুন আর রশীদ এর রাজত্বের মধ্যভাগে ৮১ বছর বয়সে আরব সংগীতজ্ঞ আবু ইয়াহিয়া হাকাম ইবনে মাঈমুন আল ওয়াদী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এবং জন্মভূমিতেই সমাহিত হন। (আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪)[১৬]।

মুসলিমদের সোনালী যুগের একজন সংগীতজ্ঞ হাকাম আল ওয়াদীর জীবনের এ ক্ষুদ্র বর্ণনা থেকে শিক্ষনীয় বিষয় হতে পারে খাটি শিল্পী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা কতটুকু হয়া উচিত।

৩য় আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল-মাহদী, আবু আবদুল্লাহ (৭৭৩ -৭৮৫ খ্রী.)

আব্বাসিয়া বংশের তৃতীয় খলিফা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) এর রাজত্ব কালে "আবু ওয়াহ্হাব আবদুল্লাহ সিয়্যাত" ছিলেন বাগদাদের প্রতিষ্ঠিত সংগীতজ্ঞ। রাজদরবারে ছিলো তার অবাধ গতিবিধি এবং সম্মানজনক স্থান। কিন্তু, সুদীর্ঘ জীবনে তার সমস্তরের সংগীতজ্ঞদের ন্যায় তার খ্যাতি সুপ্রসারিত হয়নি। তবে তার শিষ্যগণ ছিলেন উস্তাদের চেয়েও খ্যাতিমান। তার দুজন সফল শিষ্য ও সংগীত সাধক ছিলেন আব্বাসিয়া দরবারের প্রখ্যাত "ইব্রাহিম আল মাউসুলি" এবং "ইবনে জামী"।

ইব্রাহিম আল মাওসুলি নন্দন ইসহাক আল মাউসুলি তার পিতাকে একটি বিশেষ সংগীতের রচয়িতা কে তা জিজ্ঞাসা করেন। ইব্রাহিম আল মাওসুলি তদীয় পুত্র ইসহাক আল মাওসুলিকে বলেন– এই সংগীত রচয়িতা হলেন এমন এক ব্যক্তি তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার পরবর্তী আসনে থাকতেন না।

এখন যারা আব্বাসিয়া রাজদরবারে সেরা সংগীতজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত– তাদের কারো থেকেও দ্বিতীয় স্থানে থাকতেন না। এই সংগীতের রচয়িতা হলেন সেই মহান সংগীতজ্ঞ আবু ওয়াহ্হাব আবদুল্লাহ সিয়্যাত। (আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭-১০)[১৭] সংগীতজ্ঞ আবু ওয়াহাব আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব খ্যাত ছিলেন সিয়্যাত নামে।

আবূ ওয়াহহাব আবদুল্লাহ সিয়্যাত : সংগীতজ্ঞ আবূ ওয়াহাব আবদুল্লাহ

www.amarboi.org

সিয়্যাতের জন্ম হয় মক্কায় ৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র, ৪৬ বছর বয়সে। যদিও তিনি দীর্ঘ হায়াত পাননি, কিন্তু তার জীবন ছিল গৌরবময়।

সংগীতজ্ঞ আবূ ওয়াহহাব আবদুল্লাহ্ সিয়্যাত ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ট যন্ত্র সংগীতজ্ঞ। তদুপরি তিনি ছিলেন সংগীত রচয়িতা এবং সেরা গায়ক (আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯)[১৮]। অতি জনপ্রিয় আবূ ওয়াহ্হাব আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হাবের প্রচলিত উপনাম হলো সিয়্যাত। আবূ ওয়াহ্হাব আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হাব ছিলেন বানু খোজা গোত্রের মুক্ত দাস।

সে যুগের দুজন সেরা সংগীতজ্ঞের শিষ্য হওয়ার সুযোগ সিয়্যাত পেয়েছিলেন। তারা হলেন ইউনুছ আল কাতিব এবং বুরদান। উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ "ইউনুছ আল কাতিব" ছিলেন সে যুগের প্রথম সংগীত গ্রন্থ "কিতাব আল আগানী" এর রচয়িতা। "কিতাব আল আগানী" শীর্ষক পুস্তকের রচয়িতা আরও বহুজন ছিলেন।

সিয়্যাতের অন্যতম শিক্ষক "বুরদান" এর শিক্ষক ছিলেন উমাইয়্যা যুগের সেরা মহিলা সংগীতজ্ঞা "আজ্জা আল মাইলা" এবং "জামিলা"।

বুরদানের অন্য শিক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন উমাইয়্যা যুগের সংগীত বিশেষজ্ঞ "ইবন মুহরীজ" ও "ইবন সুরাইজ", "মাবাদ" প্রমুখ। (আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১)[১৯]।

ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহ : সংগীতজ্ঞ ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহ ছিলেন মক্কার অধিবাসী এবং বানু মাখজুন গোত্রের মুক্ত দাস। তার সংগীত শিক্ষক ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়া আল মাক্কী। সংগীতজ্ঞ ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহ মুক্ত দাস হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন একমাত্র সংগীতজ্ঞ যিনি খলিফা আল মাহদীর (৭৭৫-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) সন্নিকটে এবং খলিফার সন্মুখে বসতে পারতেন। সে কালের খলিফা এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে ক্ষীণ পাতলা পর্দা থাকতো। সংগীতজ্ঞ ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহ খলিফা আল মাহদীর দরবারে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

খলিফা হারুন আর রাশীদ আরবের শ্রেষ্ঠ সংগীতের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহ। অপর দুজন সদস্য ছিলেন ইব্রাহিম

www.amarboi.org

আল মাওসুলি এবং ইবনে জামী।

এই সংকলনটি খ্যাত ছিলো "শ্রেষ্ঠ সংগীত শতক" নামে। (কিতাবুল আগানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮-১০১)[২০]। ইসহাক আল মাওসুলি সংগীতজ্ঞ হিসাবে ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহর প্রশংসা করেছেন। ফুলাইয়া ইবনে আবিল আওরাহর সংগীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সংগীতজ্ঞা বাদল এবং দানানী।

ইসমাইল ইবনে জামী : "আবুল কাসিম ইসমাইল, ইবনে জামী" খ্যাত ছিলেন পিতা জামী এর পুত্র – ইবনে জামী হিসাবে। তার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন শাহম পরিবারের সন্তান। এই অভিজাত শাহম পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রেরই একটি প্রধান শাখা। ইবনে জামী এর জন্ম হয় মক্কা নগরীতে।

ইসমাঈল ইবনে জামী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রথমেই তিনি কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। তারপর জ্ঞান অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আইন শাস্ত্রে ভূৎপত্তি লাভ করেন। ইবনে জামী যুব বয়সে পিতৃহারা হন।

ইসমাইল ইবনে জামী এর বিধবা মাতার বিয়ে হয় আব্বাসিয়া স্বর্ণ যুগের অন্যতম সেরা সংগীতজ্ঞ আবদুল্লাহ সিয়্যাতের সঙ্গে (৭৩৯-৭৮৫ খিঃ)। সৎ পিতার স্নেহ যত্নেই ইবনে জামী সংগীতের দিকে আকর্ষিত হন। সংগীতজ্ঞ সিয়্যাতই ছিল তার সংগীতের উস্তাদ। পরে অবশ্য তিনি আব্বাসিয়া যুগে সঙ্গীতের অন্যতম দিকপাল "ইয়াহইয়া আল মক্কীর" নিকটও সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

এক পর্যায়ে সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল্লাহ সিয়্যাত জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে সঙ্গীতের পাদপীঠ বাগদাদে চলে যান। সিয়্যাত তার প্রতিভা বলে অতি সহজেই খলিফা মাহদীর দরবারে মর্যাদার আসন গ্রহণ করেণ। তার সঙ্গে সঙ্গে সিয়্যাতের শিষ্য ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং সৎ পুত্র ইসমাইল ইবনে জামীও খলিফার দরবারে প্রবেশ এবং সংগীতজ্ঞ হিসাবে খলিফা মাহদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

খলিফা আল মাহদী ভাবলেন যে, এই দুই তরুন সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম এবং ইবন জামী খলিফার পুত্রদ্বয় 'হারুন' এবং 'আল হাদীর' সম-বয়সী সন্তানদের সাহচর্যে আসবে এবং খলিফার পুত্রদ্বয়ও সংগীতের দিকে ঝুঁকে পড়বে। খলিফার পুত্রদ্বয় সংগীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হলে খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে

www.amarboi.org

তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।

খলিফা আল মাহদী ঘোষণা করলেন যে, তরুন সংগীতজ্ঞ ইবনে জামী এবং ইব্রাহীম আল মাওসুলি কখনও খলিফার পুত্রদ্বয়-আল হাদী এবং হারুনের ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না এবং কখনও তাদের আবাস স্থলের দিকে পা বাড়াবে না।

সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং ইসমাইল ইবনে জামী দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন খলিফা পুত্রদ্বয়ের কক্ষে ধরা পড়ে গেলেন।

আব্বাসিয়া খলিফা আল মাহদীর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইব্রাহিম আল মাওসুলিকে খলিফা পুত্র আল হাদীর কক্ষে পাওয়ার কারনে তাকে খলিফা আল মাহাদী কর্তৃক তিনশত চাবুকের আঘাতের দন্ডে দন্ডিত হতে হয়।

যেহেতু আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে জামী ছিল কুরাইশ গোত্রের সন্তান তাই খলিফা তার প্রতি আরও বেশী ক্ষুব্ধ হলেন। দরবারে চীৎকার করে বললেন – তুমি কুরাইশ বংশের কুলাঙ্গার ! সংগীতজ্ঞদের পেশা গ্রহন করতে তোমার লজ্জা করে না ? কুরাইশ বংশের কি অবমাননা ! আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও। বাগদাদের অবমাননা করো না। (আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪)[২১]।

তাৎক্ষণিক ভাবে দরবার থেকে ইবন জামীকে বের করে দেওয়া হয় এবং তিনি দ্বিতীয় শাস্তির পূর্বেই বাগদাদ থেকে মক্কায় পলায়ন করেন এবং স্বীয় মাতাকে অশ্রুজলে সিক্ত করেন। খলিফা আল মাহদী জীবিত থাকা কালে ইসমাইল ইবনে জামী বাগদাদে আসতে সাহস করেননি।

৪র্থ আব্বাসিয়া খলিফা মূসা আল হাদী, আবূ মুহাম্মাদ (৭৮৫-৮৬ খ্রী.)

চতুর্থ আব্বাসিয়া খলিফা আবূ মুহাম্মাদ মূসা আল হাদীর রাজত্বকাল ছিল অতি স্বল্পকালীন, মাত্র এক বৎসর (৭৮৫-৬ খ্রীষ্টাব্দ)। খলিফা আল মাহদী ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবূ মহাম্মদ মুসা আল হাদী চতুর্থ আব্বাসিয়া খলিফা পদে অভিসিক্ত হন।

খলিফা মাহদীর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে জামি তাদের সমবয়সী খলিফা পুত্র আল হাদী এবং হারুনের বাসস্থানে গিয়েছিলেন।

ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং ইবনে জামী একই সঙ্গে খলিফা মাহদী কর্তৃক দন্ডিত ও দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এতে তাদের মধ্যে প্রীতির ভাব

www.amarboi.org

হয়নি। বরং দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড ঈর্ষা ও শত্রুতা। দরবারের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ইব্রাহিম আল মাওসুলির সমর্থকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তার ভগ্নিপতি জাল জাল, স্বীয় পুত্র ইসহাক আল মাওসুলি এবং এবং মুহাম্মদ আল রাফ। ইবনে জামীর সমর্থকদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মুখরিক এবং আকিদ।

চতুর্থ খলিফা মূছা আল হাদী খলিফা মনোনীত হয়ে ইবনে জামীকে বাগদাদে আহবান করেন। তার সংগীত শ্রবণে তাকে **ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা** পুরস্কার প্রদান করেন। বাধ্য হয়ে ইবনে জামীকে সংগীতজ্ঞের পেশা অবলম্বন করতে হলো।

খলিফা মুসা আল হাদী (৭৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) খলিফা হওয়ার পরে ইব্রাহিম আল মাওসুলিকে খলিফার পিতা আল মাহদী কর্তৃক শাস্তির আর্থিক ক্ষতিপুরণের পরিমান ছিলো **এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা।**

এক সঙ্গে এত অর্থ (ত্রিশ) হাজেরা স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে ইসমাইল ইবনে জামী এর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অল্প সময়ের মধ্যে বিলাসীতা ও অপচয়ে পুরস্কারের সম্পূর্ণ অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেল।

বছর খানেকের মধ্যেই খলিফা আল হাদী মৃত্যু বরণ করেন এবং হারুন আর রাশীদ খলিফা মনোনীত হন (৭৮৬-৮০৯) খ্রীষ্টাব্দ)। সংগীতের প্রসার ও বিকাশ আব্বাসিয়া যুগে চলতে থাকে।

জীবিকার তাগীদেই ইসমাইল ইবন জামীকে হারুন আর রাশীদের দরবারে ঘুরাফেরা করতে দেখা গেল। দরবারে তার সংগীত সহযোগী শিক্ষার্থী ইব্রাহিম আল মাওসুলি ছিলেন। তিনি এর মধ্যেই নিজের স্থান খলিফার দরবারে সুসংহত করে নিয়েছিলেন।

ইব্রাহিম আল মাওসুলি : ইব্রাহীম আল মাওসুলি যুবরাজ আল হাদীর কক্ষে গমনের অপরাধে তিনশত বেতের আঘাত পেলেও বাগদাদ থেকে নির্বাসিত হননি। কালক্রমে ইব্রাহিম আল মাওসুলি খলিফার দরবারে সেরা সংগীতজ্ঞের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

একদিন খলিফার দরবারে বিশেষ এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর উপস্থাপনা ও নেতৃত্বে ছিলেন ইব্রাহিম আল মাওসুলি। এ অনুষ্ঠানে যৌথ সংগীতে ত্রিশ জন সংগীতজ্ঞা বালিকা বীনা জাতীয় বাদ্য যন্ত্র সংগত করছিলেন। ইবনে জামী অভিযোগের সুরে বললেন একটি বীণার সুর অন্য গুলোর সাথে সংগত হচ্ছে না এবং বালিকাটি ভিন্ন সুর সংগত করছেন।

ইব্রাহিম আল মাওসুলি সঙ্গে সঙ্গে কোন্ বালিকার বীণায় অসঙ্গত সুর হচ্ছে

www.amarboi.org

তার নাম বললেন। আরও বললেন যে বালিকাটি অন্যদের সঙ্গে সমঞ্জস্যশীল সংগতই করছেন। কিন্তু তারের মধ্যে কোথাও গন্ডগোল আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল ইব্রাহিম আর মাওসুলির ধারনাটি সঠিক। এতে দরবারের সংগীতামোদি মহল বিস্ময়াভিভূত হন। ইবনে জামী এরূপ ভুল ধরার জন্য হলেন বিব্রত, বিহ্বল।

ইবনে জামীর মধ্যে ইব্রাহিম আল মাওসুলি তার ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বির সুবাস চিহ্নিত করে ফেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাগদাদের সংগীতজ্ঞগন দুভাবে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এ দু'দলের পারস্পারিক ঈর্ষা এবং শত্রুতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

অবস্থা প্রতিকুল দেখে ইবনে জামী বাগদাদ ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দীর্ঘকাল পর ফিরে এসে তিনি ছদ্ম নামে বাগদাদ অঞ্চলে সংগীত পরিবেশন শুরু করেন। খলিফা আবূ মুহাম্মাদ মূসা আল হাদী মাত্র এক বছর খলিফা হিসাবে জীবিত ছিলেন।

পরবর্তী খলিফা হারুন এর দরবারে একজন অপরিচিত কিন্তু গুণগত মানে উন্নত সংগীতজ্ঞকে আনা হলো সংগীত পরিবেশনের জন্য। এ সংগীতজ্ঞ ছিলেন ভুলে যাওয়া প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইসমাইল ইবন জামী।

সংগীত পরিবেশনার হল ঘর

আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে জামী : সংগীতজ্ঞ "ইবনে জামী" খলিফা হারুন অর রশীদের দরবারে সংগীতের ডায়াস বা সেলুন সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিয়েছেন যা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী প্রণীত কিতাবুল আগানীতে উল্লেখ করা হয়েছিল। বর্ণনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমাকে একটি বিরাট সেলুন বা ডায়াসে নেওয়া হয়। ডায়াসের চারিদিকে ছিল অত্যন্ত দামী সিল্ক এর পর্দা। এ দরবার হলে ডায়াসের উপরে কয়েকটি চেয়ার ছিল হল মুখা-মুখী।

এর মধ্যে তিনটি চেয়ারে তিন জন মহিলা সংগীতজ্ঞ এবং একজন পুরুষ বসা ছিলেন। চারজনের হাতেই ছিল ইদন জাতীয় বীণা। পুরুষের পাশেই আমাকে বসতে দেওয়া হলো।

এক পর্যায়ে অনুষ্ঠান প্রারম্ভের ঘোষণা দেয়া হল। প্রথমে বারজন সংগীতজ্ঞই বীনা সংযোগে তাদের সংগীত পরিবেশন করলেন।

এর পর এলো আমার পালা। আমি তখন একজন যন্ত্র সংগীতজ্ঞকে ইশারা করলাম। সংগী বাদকদের বললাম, এভাবে বীনার তারগুলো শক্ত বা দৃঢ় কর।

www.amarboi.org

এভাবে তাবাকা আটকাও। এভাবে দাসতান (তরঙ্গ) তোল।

যন্ত্র সংগীতজ্ঞকে নির্দেশ দিয়ে আমি আমার রচিত সুরে একটি গান গাইলাম। আমার গানটি শেষ হওয়ার পর পর্দার বিপরীত দিক থেকে ৫-৬ জন এল। তারা জিজ্ঞাসা করল- আমি কার এবং কোন সুরে গানটি গেয়েছি। আমি বললাম এই সুরটি আমারই। আমার কথা শুনে তারা চলে গেল।

তারপর আসলেন প্রধান বার্তবাহক "মোল্লা আল আব্রাস" এবং এসে বললেন, তুমি একজন মিথ্যা বাদী। এই সুর তো ইবনে জামীর।

তারপর আমি আরো একটি সংগীত পেশ করলাম একই পদ্ধতিতে। প্রথমে তারা আমার সুরকারের নাম জানতে চাইল। আমি জানালাম এ সুর আমার এবং সুরকার আমিই। পরে এল প্রধান বার্তাবাহক। প্রত্যেক বারই জানিয়ে গেল তুমি একজন মিথ্যাবাদী। এই সুরও ইবনে জামীর। সংগীত শেষ করো। তার পর হবে তোমার যথার্থ বিচার।

এভাবে কয়েকবারই আমাকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করা হলো এবং সতর্ক করা হলো। আমার গান যখন শেষ হলো তখন আমাকে ডাকা হলো। আমি বললাম, তোমরা যা বলেছ তাই ঠিক। এই গান ও সুর ইবনে জামীর এবং আমিই ইসমাইল ইবনে জামী।

আমার এই ঘোষণার কিছুক্ষণ পরে অন্য দিকে অর্থাৎ খলিফার দিকের পর্দা সরে গেল। ফাজাল ইবনে রাবী ঘোষনা করলেন– খলিফাতুল মুসলিমিন আসছেন। তারপর খলিফা হারুন অর রশীদ আসলেন প্রধানমন্ত্রী জাফর বার্মাকির কাঁধে হাত রেখে। এসে আমাকে বললেন– তাহলে আপনিই ইবনে জামী।

খলিফা তখন একটি দিবান চেয়ারে আরাম করে বসলেন এবং আমাকে বললেন নতুন করে গান শুরু করতে। তখন আমি কয়েকটি মিশ্র সংগীত গাইলাম। (কিতাবুল আগানী, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৮-৮০)[২২] এ অনুষ্ঠানে খলিফা প্রথম পর্দার আড়ালে থেকে গান শুনেছেন, তার পর সংগীতজ্ঞের পাশাপাশি বসেও সংগীত উপভোগ করছেন।

অন্য বর্ণনায় দেখা যায় খলিফা মাহাদী এবং সংগীতজ্ঞ ইসহাক মাওসুলি পাশাপাশি বসেছেন। সংগীত শেষ হওয়ার পর খলিফা ইসহাক মাওসুলিকে পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহিত করেছেন। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮)[২৩]।

সংগীতের ডায়াস : দরবারে সংগীতজ্ঞগণ একটি পৃথক ডায়াসে বসতেন। যেহেতু মজলিসে অংশগ্রহনকারীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক,

www.amarboi.org

তাই ডায়াসের চারদিকে পর্দা থাকত। এই পর্দার একাধিক স্তর ছিল। অনুষ্ঠানের সময় মোটা পর্দা সরিয়ে দেওয়া হত এবং হালকা পর্দার ভেতরে সংগীতজ্ঞদেরকে দেখা যেত।

ইকদ আল ফরিদের রচয়িতা ইবনে আবদ রাব্বিহি–দুজনেরই ইব্রাহিম এবং ইবন জামী মূল্যায়ন করেছেন অত্যন্ত সুক্ষভাবে। তার ভাষায় বহুমুখী প্রতিভায় ইব্রাহিম আল মাওসুলী ছিলেন সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইবনে জামীর কণ্ঠস্বর ও সুর ছিলো মধুরতম। (ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯)[২৪] শিল্প কৌশলতা ও মানে জামী ছিলে অতি উন্নত পর্যায়ের। সামগ্রিক ভাবে ইব্রাহিম আল মাওসুলির খ্যাতি ছিল ব্যাপকতর। (কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১২)[২৫]।

সংগীতজ্ঞ **"ভারসাওমা"** ছিলেন খলিফা হারুনের একজন অনুগ্রহভাজন সুর শিল্পী। খলিফা হারুন ইবনে জামী সম্ভর্কে ভারসাওমার অভিমত জানতে চান। উত্তরে ভারসাওমা বলেন মধু সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলে অভিমত দেওয়া আরও সহজতর ছিলো। ইবনে জামী তো মধুর থেকেও মধুরতর। (ইকদ আল ফরিদ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯)[২৬]।

৫ম আব্বাসিয়া খলিফা হারুন আর রাশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রী.)

সুশাসন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, রাজ্য জয়, ন্যায় বিচার, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে ৫ম আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর হারুন আর রাশীদের নাম কিংবদন্তীর ন্যায়। বাগদাদের দু'টি প্রাসাদ "আল আনবার" এবং "আল বাক্কা" ছিল তৎকালীন বিশ্বের অত্যাশ্চর্য।

হারুন আর রাশীদের ২৩ বছর দীর্ঘ খেলাফতকালে তার দেশ এবং বিদেশ থেকেও জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিদ, ঐতিহাসিক, কবি, সংগীতবিদ তার দরবারে ভীড় জমাতেন এবং আকর্ষীত হতেন। তার রাজকীয় দ্যুতির প্রভাব আব্বাসিয়া বংশের ইতিহাসকে প্রভাবিত ও দ্যুতিময় করেছিল।

খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারে যে সমস্ত কৃতিমান শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ সমবেত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ঃ ১.হাকাম আল ওয়াদী, ২. ইসমাইল ইবনে জামী, ৩. ইব্রাহিম আল মাওসুলি, ৪. ইয়াজিদ হাওড়া, ৫. জালজাল, ৬. ইয়াহইয়া আল মাক্কী, ৭. ফুলাইহ ইবনে আবুল আওরাহ, ৮. আল জোবায়ের ইবন দাওমান, ৯. আবদুল্লাহ ইবন দাওমান, ১০. মুখারিক, ১১. আল্লুইয়াহ, ১২. ইসহাক আল মাওসুলি, ১৩. মুহাম্মদ ইবন হারিছ, ১৪. আবু

www.amarboi.org

সাদাকা, ১৫. আমর আল গাঞ্জাল, ১৬. মুহাম্মদ আল রাফ, ১৭. ভারসাওমা প্রমুখ।

হিশাম-১ (৭৮৮-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) : খলিফা হারুন আর রশীদের সমকালীন আন্দালুসিয়ার উমাইয়্যা সুলতান হিশাম-১ (৭৮৮-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং মালিকী মাজহাবের অনুসারী। তার দরবারে সংগীত অপেক্ষা কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, গবেষক, বৈজ্ঞানিকদের কদর ছিল বেশী।

সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি

খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারের সেরা সংগীতজ্ঞ ইব্রাহীম আল মাওসুলি বংশগত ভাবে ছিলেন একজন ইরানীয়ান। তার জন্ম ৭৪২ সালে কুফায় এবং মৃত্যু হয় ৮০৪ সালে। তার পিতার নাম ছিল মাহান। কিন্তু আরবগণ তাকে মাইমুন শব্দে ডাকত। ইব্রাহিম ইবনে মাহান ছিলেন পারস্যের একজন অভিজাত পরিবারের সন্তান। ভাগ্যের সন্ধানে তিনি কুফায় আসেন।

আরবের অভিজাত গোত্রের বনু তামিমে ইব্রাহিম ইবনে মাহান প্রতিপালিত হন। কিশোর কালে ইব্রাহিম ইবনে মাহান বনু তামিম গোত্র থেকে পালিয়ে যান এবং ইরাকের মাওসুল (মাসুল) শহরে বসতি স্থাপন করেন।

ইব্রাহিম জন্মগত ভাবে ছিলেন প্রতিভাবান। কিশোর জীবনে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে কুর্দিস্থানের মওসুল শহর তার পছন্দ হয়। তাই নামের শেষে পিতার নাম অনুসারে মাহানী বা মাইমুনী অথবা বানু তামিম গোত্রের নাম অনুসারে তামিমি উপনামে পরিচিত না হয়ে মাওসুলি নামই গ্রহন করেন। তিনি ইব্রাহিম আল মাওসুলি নামে ইতিহাস খ্যাত হয়ে যান।

এই মাওসুল শহরে ইব্রাহিম আল মাওসুলি তাঁর জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পান এবং সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। কিন্তু মাওসুলে লব্দ সংগীতজ্ঞানে তিনি তৃপ্ত থাকেননি। পারস্য ছিলো অভিজাতগতভাবে সংগীতের প্রাণকেন্দ্র। সংগীত শিক্ষার জন্য তিনি উত্তর পারস্যের "আল রাই" শহরে চলে যান। সেখানেই তিনি পারস্য সংগীত এবং আরব সংগীতের ওপর ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করেন।

আলরাই শহরে ইব্রাহিম আল মাওসুলি বাগদাদের খলিফা আল মানসূরের (৭৫৪-৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) একজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাকে সংগীত সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বসরা নগরীতে গমন ও সংগীতে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। (আল ওয়ার্দত: আবু নুয়াস, পৃষ্ঠা-১০১)[২৭]

www.amarboi.org

অতঃপর তিনি বসরা থেকে আব্বাসিয়া খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে গমন করেন এবং দরবারের সেরা সংগীতজ্ঞ সিয়্যাতের আনুকূল্য লাভ করেন।

সংগীতজ্ঞ আবূ ওয়াহহাব আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের পরিচিতি ছিলো সিয়্যাত নামে। সিয়্যাতের তত্ত্বাধানে ইব্রাহিম আর মাওসুলির সংগীত শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি ছিলেন অন্যদের তুলনায় অকল্পনীয় সম্পদের মালিক। তার মাসিক ভাতা ছিলো সে যুগের দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা। তদুপরি ছিলো খলিফা ও দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপহার ও উপঢৌকন – যা ছিলো অনেকটা অবিশ্বাস্য। তদুপরি ছিলো তার বিশাল ভূমি সম্পদ ও বাগবাগিচা।

ইব্রাহিম আল মাওসুলির যে সংগীত স্কুলটি পরিচালনা করতেন তা হতে মুনাফা দাড়িয়েছিলো তৎকালীন মুদ্রা মূল্যে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা। এ থেকে অনুমান করা যায় সে কালে বাগদাদের অধিবাসীদের সংগীত চেতনা ও পৃষ্ঠপোষকতা কোন স্তরের ছিলো।

সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলির বিস্ময় বাগদাদস্থ বাসভবনটি ছিল শহরের আলোচনা ও পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান। বলা হতো যে, এ ধরনের প্রাইভেট ভবন বাগদাদে আর একটিও ছিল না। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)[২৮]।

গায়ক এবং সংগীত যন্ত্র বাদক হিসাবে সে কালে ইব্রাহিম আল মাওসুলির সমকক্ষ আর কেও ছিল না। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১) [২৯]।

সংগীত রচয়িতা হিসাবেও ইব্রাহিম আল মাওসুলি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্ধী। ইবনে খাল্লিকানের মতে ইব্রাহিম আল মাওসুলির বহু নতুন ধারার সংগীত প্রবর্তন করেন। (Ibn Khallikan: Biographical Dictionary, Vol 1, Page 21)[৩০] মাখুরী শীর্ষক সংগীতের রিদমের তিনি ছিলেন প্রবর্তক। (আল মাসুদী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮)[৩১]।

খলিফা হারুন অর রশিদের খেলাফত কালেও ইব্রাহিম আল মাওসুলি ছিলেন পূর্ববর্তী খলিফাদের কালের ন্যায় সমগুরুত্ব সম্পন্ন বরং অধিকতর মর্যাদাবান। তাকে খলিফার বর পুত্র (আল নাদিম) বলা হতো।

ইব্রাহিম আল মাওসুলির অন্তিম সময়ে সার্বক্ষণিক ভাবে হাজির ছিলেন খলিফা হারুন আর রাশীদ। জানাজা নামাজ পড়ান খলিফার পুত্র মামুনুর রশিদ।

www.amarboi.org

ইব্রাহিম আল মাওসুলির বিশ্ব বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন তার পুত্র (১) ইসহাক আল মাওসুলি এবং অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন (২) জিলজাল, (৩) আলুইয়া, (৪) আবু সাদাকা, (৫) মুখারীজ, (৬) মুহাম্মাদ ইবনে আল হারীছ, (৭) সুলাইম ইবনে সাল্লাম প্রমুখ।

পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যে ইব্রাহিম আল মাওসুলির নামের খ্যাতি প্রচারিত হয় আলিফ লায়লা খ্যাত হাজার এক রজনী উপাখ্যানে। (আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭. ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮)[৩২] এবং অন্যান্য গ্রন্থে। (কিতাবুল আগানী ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১, ইবনে বদরুন রচিত ইতিহাস এবং ইবন আব্দুন এর ভাষ্য সম্পাদনায় R.P.A. Dozy, London, ১৮৪৬, পৃষ্ঠা ২৭২; আল গুজুলী, মাতালী আল বুদুর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪১)[৩৩-৩৫]।

সুলাইম ইবনে সাল্লাম আবু আবদুল্লাহ : সুলাইম ইবনে সাল্লাম ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলির একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং সংগীতজ্ঞ। অতি উত্তম কণ্ঠের জন্য তিনি দরবারে খ্যাত ছিলেন। (কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৫)[৩৬]।

সংগীতজ্ঞ ইয়াজীদ হাওরা আবু খালিদ : সংগীতজ্ঞ "ইয়াজীদ হাওরা আবু খালিদ" ছিলেন মদীনার বানু লাইজ ইবনে বাকর গোত্রের মুক্ত দাস। বিভিন্ন স্থানে সংগীত পর্যটন শেষে তিনি বাগদাদে এসে বসবাস শুরু করেন। বাগদাদে তিনি খলিফা আল মাহদির (৭৭৩-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

বিত্তশালী সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি ইয়াজিদ হাওরাকে তার সংগীত স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করেন। সংগীত শিক্ষক হিসাবে তার খ্যাতি ছিলো গভীর এবং ব্যাপক। কিন্তু তাকে নিয়ে সমস্যা ছিলো। কারন, তার কণ্ঠস্বর এত মধুর ও আকষর্ণীয় ছিল যে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে তার স্তরে পৌঁছা সম্ভব হতো না।

ইয়াজিদ হাওরা শুধু মাত্র গায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংগীত রচয়িতা। তার রচিত সংগীত সেরা সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি ও ইবনে জামীর কণ্ঠেও গীত হত।

ইয়াজীদ হাওরা ছিলেন সেকালের সেরা কবি আবুল আতাহিয়া এবং আবু মালিক আরাজের ব্যক্তিগত বন্ধু। আবূ মালিক আল আরাজ তার বন্ধু ইয়াজিদ হাওরার মৃত্যুর পর শোক সংগীত রচনা করেন।

সঠিক সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইয়াজিদ হাওরাকে ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং ইবনে জামীর স্তরে স্থান দেয়া হয়। (কিতাবুল আগানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫)[৩৭]।

www.amarboi.org

খলিফা হারুন আর রাশীদ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইয়াজিদ হাওরা আবু খালিদের একজন পৃষ্ঠপোষক ও গুণমুগ্ধ। ইয়াজিদ হাওরা যখন ছিলেন মৃত্যু শয্যায় – তখন খলিফা হারুন আর রাশীদ প্রত্যেক দিনই তার প্রধান সেবককে পাঠিয়ে ইয়াজিদ হাওরার স্বাস্থ্যের খবর নিতেন। (Henry George Farmer ঃ A History of Arabic Music, Luzac and Company, London ,1920)[৩৮]।

আল যুবায়ের্ ইবনে দাওমান : আল-যুবায়ের ইবনে দাওমান ছিলেন মক্কার সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন বানু লাইজ ইবনে বাকর গোত্রের মুক্ত দাস। তার পিতাও ছিলেন উমাইয়্যা যুগের একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। আল যুবায়ের এর ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। কিন্তু, তিনি পিতার শখ সংগীতের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। খলিফা হারুন অর রশিদের সময় তিনি আব্বাসীয় দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে স্থান লাভ করেন।

ঐ সময়ে শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহদী এবং ইব্রাহিম আল মাওসুলির পুত্র ইসহাক আল মাওসুলির মধ্যে সংগীতে আরব ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখা এবং পারস্যের রোমান্টিক ধারা অন্তর্ভূক্ত করার দ্বন্ধ চলছিল। আল যুবায়ের এবং তার ভ্রাতা আবদুল্লাহ শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহদীর পক্ষ গ্রহন করেন।

দ্বন্ধ থাকলেও ইসহাক আল মাওসুলি ছিলেন আল-যুবায়ের এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি খলিফা হারুনেরও কৃপাদৃষ্টি অর্জন করেছিলেন। এক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীতায় ছন্দবদ্ধ কবিতাকে সংগীতের রূপ দানের প্রতিযোগীতা হয়েছিল এবং বিশজন সংগীতজ্ঞ এতে অংশ গ্রহন করেন। আল যুবায়ের এতে প্রথম স্থান অধিকার করে **বিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা** পুরস্কার হিসাবে গ্রহন করেন। (কিতাবুল আগানী, ১৭ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩)[৩৯]।

আল যুবায়ের ইবন দাহমানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে ছিলেন সংগীতজ্ঞা কালাম আল-সালাহিয়্যা।(কিতাবুল আগানী, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৫)[৪০]।

ভারসাওমা আল জামির : সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলির অন্যতম শিষ্য ছিলেন ভারসাওমা আল জামির। তিনি সংগীত যন্ত্র মিজমার (বাঁশী) বাদক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। কারো কারো মূল্যায়নে তিনি জিরিয়াব থেকে অধিকতর প্রশংসিত এবং প্রিয় ছিলেন। (Henry George Farmer ; পৃষ্ঠা ১৩০)[৪১]।

জিরিয়াব সমকালীন সংগীতের একজন মূল্যায়ক ও সমালোচক ছিলেন। সংগীতজ্ঞ মূল্যায়নে খলিফা হারুন অর রশীদের তিনি একজন উপদেষ্টা ছিলেন। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)[৪২]।

www.amarboi.org

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে রাফ : মুহাম্মাদ ইবনে আমর আল রাফ ছিলেন বানু তামীম গোত্রের একজন মুক্ত দাস। তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ বীণা বাদক। ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং ইবনে জামীর নেতৃত্বাধীন আব্বাসিয়া দরবারের দুই সংগীতজ্ঞ গোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই ছিলেন ইসমাইল ইবনে জামী গোষ্ঠি বিরোধী এবং ইব্রাহিম আল মাওসুলি সমর্থক। (কিতাবুল আগানী, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯-২২)[৪৩]।

আবু সাদাকা : খলিফা হারুন আর রাশীদের যুগে আবু সাদাকা ছিলেন মদীনার একজন চারণ কবি। গল্প কথক এবং বাজারী সংগীতজ্ঞ হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল। তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারে প্রবেশ লাভ করেন।

চারন কবিদের মত তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন এবং তাৎক্ষণিক (ইকতিরাহ্) কবিতা সংগীতের আঙ্গিকে ইকাত পেশ করতেন। এ সংগীত পেশ কালে তিনি ক্ষুদ্র লাঠি (wand) ব্যবহার করতেন।

এক সংগীতানুষ্ঠানে আবু সাদাকা এর একটি সংগীত খলিফা হারুন আর রশীদ খুবই পছন্দ করলেন। কৌতুক বোধে খলিফা নির্দেশ জারি করলেন যে পেশ কৃত ঐ সংগীতটি দরবারে উপস্থিত অন্যান্য সংগীতজ্ঞ সকলেই গেয়ে যাবে। এটা ছিল পেশাদার শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞের জন্য একটি বড় পরীক্ষা।

সংগীতজ্ঞদের পক্ষে নিজের সংগীত যত সুন্দর ভাবেই পেশ করা সহজ হোক না কেন, অন্যের সংগীত পেশ করা ছিল কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই খলিফা দরবারের সেরা সংগীতজ্ঞদের দ্বারা অন্যের গীত সংগীত উপস্থাপনায় খলিফা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

সর্বশেষে পুনরায় আগত হলেন চারন কবি আবু সাদাকা। তার ওপরেই খলিফা হারুন আর রশীদের প্রশংসা স্তর সবচেয়ে বেশী বর্ষিত হলো। খলিফা তাকে পর্দা সরিয়ে নিজের খুবই কাছে ডাকেন।

সাদাকা ইবনে আবু সাদাকা এবং তার পুত্র আহমাদ ইবনে সাদাকা ইবনে আবু সাদাকাও প্রখ্যাত চারণ কবি ছিলেন। (আল মাসুদী, পৃষ্ঠা ৩৪২-৪৭)[৪৪]।

খলিফা হারুনের দরবারী সংগীতজ্ঞ : খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারী সংগীতজ্ঞদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন (১) আল হুসাইন ইবনে মুহরীজ, (২) আমর আল আজ্জাল, (৩) মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ, (৪) ইবনে ইসমাইল, (৫) আবদুর রহিম ইবনে ফজল, প্রমুখ। তাদের সকলের বিষয়ে কিতাবুল আগানীতে উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে।

www.amarboi.org

অন্য দিকে হারুন আর রাশীদের খেলাফতের প্রধান মন্ত্রী জাফর বার্মিকী ও ইয়াহইয়া বার্মিকী পরিবারেরও পৃথক সংগীতগোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। বার্মিকী দরবারে সংগীত গোষ্ঠীর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন মুহাম্মাদ আল ইয়াক আবূ জাক্কার এবং জাফর আল তাব্বাল।

মানসুর জালজাল আল দারীব : "জালজাল" নামে খ্যাত "মানসুর জালজাল আল দারিব" ছিলেন আব্বাসিয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ। তিনি সংগীতজ্ঞ হিসাবে যেমন ছিলেন খ্যাত, মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সম্মানীত ও শ্রদ্ধেয়। তিনি বাগদাদে একটি গভীর পানির কূপ খনন করান এবং মৃত্যুর সময় কুপটি সর্ব সাধারনের ব্যবহারের জন্য অসিয়ত করে যান। এই কূপটি সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তিনি ব্যয় করেন । কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই কূপটি বরকত আল জালজাল নামে খ্যাত ছিল। (Henry George Farmer, A History of Arabic Music, page 62)[৪৫]।

"ইকদ আল ফরিদ" প্রণেতা "ইবনে আবদ রাব্বীহি" এর মতে, জালজাল ছিলেন সর্বাধিক মধুরতম সংগীতযন্ত্র বাদক। তার পুর্বে অথবা পরে তার স্তরের সংগীতযন্ত্র বিশারদ এর আর্বিভাব হয়নি। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯০)[৪৬]।

ইসহাক মাওসুলির মতে, বীনা বাদক হিসাবে জালজাল ছিলেন অদ্বিতীয়। এই বক্তব্য তিনি পেশ করেছিলেন খলিফা আল ওয়াসিক এর দরবারে। (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮)[৪৭]।

জালজাল ছিলেন ইব্রাহিম আল মাওসুলির নিত্য সঙ্গী। তদুপরি তিনি ছিলেন ইব্রাহিম আল মাওসুলির বৈবাহিক ভ্রাতা। তিনি সংগীত গায়ক হিসাবে যতটুকু খ্যাত ছিলেন, ততধিক খ্যাতি ছিলো তার যন্ত্রসংগীতবিদ হিসাবে।

যন্ত্র সংগীত উন্নয়নে জালজাল এর অবদান ছিলো। তিনি সংগীতের মাত্রা ও লয়ে সংস্কার আনয়ন করেন এবং বীণাতে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় তারের সংযোগ করেন। জালজাল ছিলেন বহু সংগীত যন্ত্রের আবিষ্কারক। তিনি "ওদআল সাব্বুত" নামক একটি সেকালের ক্রুটিহীন বীনা আবিস্কার করেন। যা ছিলো তৎকালে ব্যবহৃত পারস্য দেশীয় বীনা থেকে উন্নত মানের।

মানুষ হিসাবে মানসুর আল জালজাল ছিলেন উন্নত মানসিক গুণাবলীসম্পন্ন। দরবারের আদব কায়দা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অনেকটা উদাসীন। দুর্ভাগ্য বশত খলিফা হারুন আর রাশীদ তাকে ভুল বুঝেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারে নীরব, নিস্তেজ, অবসন্ন জীবন যাপন করেন বহু বছর।

www.amarboi.org

ভুল বুঝাবুঝি নিরসন বা খলিফার ক্ষমা লাভের কোন উদ্যোগই তিনি গ্রহন করেননি বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

যদিও দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলির তিনি ছিলেন বৈবাহিক ভ্রাতা। যখন মানসুর তালজাল কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন তখন তার শশ্রু ছিল শ্বেত বর্ন, স্বাস্থ্য ছিল ক্ষীণ, অবসন্ন এবং অসার। তিনি ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

৬ষ্ঠ আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মদ আল আমিন (৮০৯-১৩ খ্রী.)

খলিফা হারুন অর রশীদের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল আমিন এবং শাহজাদা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আল মামুনের মধ্যেই বন্টন হয়। দু'জনেই খলিফাতুল মুসলিমিন উপাধি ধারন করেন। সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ আসে বেগম জুবাইদার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল আমিনের অংশে। তার রাজধানী ছিল বাগদাদ। পূর্বাংশ পড়ে দাসী স্ত্রীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র আল মামুনের হাতে। তিনি মারভ নগরী থেকে রাজ্যের পূর্বাংশ শাসন করতেন।

আবূ আলী ইয়াহ্ইয়া আল মাক্কী : ইয়াহইয়া আল মাক্কী ছিলেন আব্বাসিয়া খলিফাদের মধ্যে আল মাহদী (৭৭৫-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ), আল আমিন (৮০৯-১৩ খ্রী.) এবং আল-মামুন (৮১৫-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এর খেলাফত কালীন সংগীতজ্ঞ।

আব্বাসিয়া খলিফা আল আমিন ইয়াহইয়া আল মাক্কীর এক দিনের সংগীত সুর শুনে ইয়াহইয়া আল মাক্কীকে **দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা** উপঢৌকন দিয়েছিলেন। সেদিন ইয়াহইয়া আল মাক্কী খলিফার পিতৃব্য ইব্রাহীম ইবন আল মাহাদীকে সংগীত শিক্ষক হিসাবে সংগীতের তালিম দিতেছিলেন।

ইয়াহইয়া আল মাক্কীর পূর্ণ নাম ছিলো আবূ উসমান ইবন মারজুক ইয়াহইয়া আল মাক্কী। তিনি ছিলেন উমাইয়্যা খানদানের একজন মুক্ত দাস। তার যুগে তিনি বিবেচিত হতেন হেজাজের সংগীত সম্রাট হিসাবে। তারই সুযোগ্য শিক্ষকগণ ছিলেন উমাইয়্যা যুগের হেজাজী সংগীতের ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। তারা হলেন- ইব্রাহিম আল মাওসুলি, ইসমাইল ইবন জামী, ফুলাইহ ইবন আবীল আওরাহ। (কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭)[৪৮]।

সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইয়াহইয়া আল মাক্কী যে একজন সেরা সংগীতজ্ঞ ছিলেন– এতে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি উত্তরাধিকারীদের নিকট ইয়াহইয়া

www.amarboi.org

আল মাক্কীর গুরুত্ব ছিলে সংগীত গ্রন্থ "কিতাবুল আগানী" প্রণেতা হিসাবে। কিতাবুল আগানী শীর্ষক আরও বহু সংগীত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার আছে।

"কিতাবুল আগানী" শব্দের অর্থ হলো সংগীতের গ্রন্থ বা পুস্তক। ইয়াহইয়া আল মাক্কী প্রণীত "কিতাবুল আগানী"তে তার নিজের সংগীত ছাড়াও প্রাচীন যুগের সংগীতও (ঘিনা আল কাদিম) স্থান পেয়েছিল।

তদীয় পুত্র আহমাদ আল মাক্কী এই সংগীত গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ করে তা তিন হাজার সংগীতে উন্নীত করেন। তা লেখা হয়েছিল কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী।

কিতাবুল আগানী শীর্ষক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত সংগ্রাহক আবুল ফারায়েজ আল ইস্পাহানী সংকলনটির সংগীত প্রকরণ বিভাগ করনে সন্তোষবোধ করেননি। এ ভ্রান্তি বা দুর্বলতা তার না হয়ে তার পুত্র আহমাদের অথবা অপর একজন সংগ্রাহক এবং সম্পাদক আমর ইবনে মান্নারও হতে পারে।

উমাইয়্যা যুগের সংগীতজ্ঞ ইব্রাহীম আল মাওসুলির সুযোগ্য পুত্র ইসহাক আল মাওসুলি প্রতিদ্বন্ধী সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়া আল মাক্কীর প্রতি অনির্ভরশীলতা প্রমাণের জন্য একদিন একটি ফাঁদ পেতে ছিলেন।

একদিন ইসহাক আল মাওসুলি হারুন আর রাশিদ এর দরবারে তার (ইসহাক) কল্পিত একজন প্রাচীন সংগীতজ্ঞের সংগীত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তার পর বলেন যে ঐ সংগীতজ্ঞের বংশধারা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন এবং সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়্যা আল মাক্কীকে জিজ্ঞাসা করেন – ঐ সংগীতজ্ঞের বংশধারা সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকলে খলিফা হারুনকে তা জানাতে পারেন।

ইয়াহইয়া আল মাক্কী সংগীতজ্ঞ ইসহাকের উল্লেখিত সংগীতজ্ঞ সম্পর্কে অজ্ঞতা স্বীকার করার মত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। ইয়াহইয়া আল মাক্কী ঐ সংগীতজ্ঞের পূর্ব পুরুষদের একটি তালিকা তাৎক্ষণিকভাবে কল্পনা করে তার সমকালীন কোন সংগীতজ্ঞের সংঙ্গে উক্ত সংগীতজ্ঞের মোকাবিলা হয়েছিলো এবং কার সংগীতের বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিলো এর একটি মনোমুগ্ধকর বর্ণনা খলিফার সম্মুখে পেশ করেন।

খলিফা সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে ইয়াহইয়া আল মাক্কীর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ধন্যবাদ জানান। এর পর ইসহাক আল মাওসুলি সমূর্তীতে আবির্ভূত হয়ে খলিফা হারুন অর রশীদকে অবহিত করেন যে – তার কল্পিত সংগীতজ্ঞদের কোন অস্তিত্ব অতীতে কখনো ছিল না।

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়া আল মাক্কী কিভাবে মিথ্যাকে বা অস্তিত্বহীন ব্যক্তি সম্পর্কে কল্পিত চিত্র অংকন করতে পারেন – এই দক্ষতা প্রমাণের জন্য এ ফাঁদ ইসহাক আল মাওসুলি পেতেছিলেন। সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইয়াহইয়্যা আল মাক্কী ছিলেন অতি উচ্চ পর্যায়ের। মিথ্যাকে সত্যের রূপ দেয়ার দক্ষতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

এই ঘটনায় খলিফা হারুন অর রশিদ ইসহাক আল মাওসুলির কৌতুক রসমুগ্ধ না হয়ে মিথ্যা চারনের জন্য "ইয়াহইয়া আল মাক্কী" এর প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন। (কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬-২৪)[৪৯]।

আবুল মাহান্না মুখারিক ইবন ইয়াহইয়া : সংগীতজ্ঞা আতিকা বিনত সুধার দাস ছিলেন আবুল মাহান্না মুখারিক। তার জন্ম মদীনায়। কারো কারো মতে কুফায়। সংগীতজ্ঞা সুধা থেকেই তিনি সংগীতের প্রথম শিক্ষা ও ট্রেনিং অর্জন করেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয়।

আব্বাসিয়া মন্ত্রী ফজল আল বার্মাকি সংগীতজ্ঞ মুখারিককে ক্রয় করে নেন তার মালিক আতিকা বিনতা সুধা থেকে। খলিফা হারুন আর রাশিদ মুখারিকের কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হলে মন্ত্রী ফজল আল বার্মাকি তাকে উপহার দেন খলিফার খেদমতে।

খলিফা হারুন আর রাশীদ এর নিয়মিত সংগীত শ্রবনের উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। তিনি মুখারিককে সংগীত প্রশিক্ষণের জন্য অর্পন করে ইব্রাহিম আল মাওসুলির নিকট। সংগীতে তার আগ্রহ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করে হারুন অর রশীদ তাকে মুক্ত করে দেন।

এর পর মুখারিক খলিফার দরবারেই সংগীতজ্ঞ হিসাবে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। বিভিন্ন উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন করে মুখারিক **এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা** উপহার পান এবং কোন এক অনুষ্ঠানে খলিফার পার্শ্বে বসারও সম্মান লাভ করেন। (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০)[৫০]।

হারুন আর রাশীদের পুত্র খলিফা আল আমিন (৮০৯-১৩ খ্রীষ্টাব্দ) মুখারিককে সার্বক্ষণিক ভাবে দরবারে রাখতেন। খলিফা আল আমীন একদিন তার রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর কলা কৌশল প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন। অশ্বরোহী বাহিনীর বিভিন্ন কলাকৌশলের সঙ্গে যন্ত্র সংগীতের ব্যবহার থাকত।

www.amarboi.org

পাগলাটে খলিফা আল আমিন সংগীতজ্ঞ মুখারিককে নির্দেশ দিলেন যন্ত্র সংগীতের তালে তালে তাকেও সংগীত উপস্থাপন করতে হবে। অনুষ্ঠান চলেছিল সারারাত্র ব্যাপী এবং সমগ্র রাত্রিই মুখারিককে যন্ত্র সংগীতের সাথে সাথে কণ্ঠ সংগীত পরিবেশন করতে হয়।

আল আমিনের পরবর্তী খলিফা আল মামুনুর রশিদ (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ), আল মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৪২ খ্রীষ্টাব্দ)এবং আল ওয়াসিক(৮৪২-৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) এর খেলাফত কালে সংগীতজ্ঞ আবুল মাহান্না মুখারিক রাজ দরবারের অন্যতম প্রধান সংগীতজ্ঞ ছিলেন। আল ওয়াসিকের খেলাফত কালে তিনি ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে তাগরিবিদী তার "নুজুম আল জাহিরা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং তার সুযোগ্য পুত্র ইসহাক আল মাওসুলি বীনা যোগে যে সংগীত পরিবেশন করতেন– তাদের দুই জনকেই ম্লান করে দিতেন আবুল মাহান্না মুখারিক তার যন্ত্রবিহীন কণ্ঠ সংগীতে। (Henry George Farmer : A History of Arabic Music, page- ২২১)[৫১]।

মুখারিক ছিলেন সমকালীন প্রখ্যাত কবি আবুল আতাহি এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মৃত্যু শয্যায় তিনি মুখারিককে আহবান করেন তার (আবুল আতাহী) রচিত যে কবিতাগুলো মুখারিক সংগীতের সুর দিয়েছিলেন কবির অন্তিম মুহূর্তে গেয়ে শোনাতে। মধুর কণ্ঠে গীত কবিতার একটি চরণ ছিল "যখন আমার জীবন শেষ হয়ে আসবে, মেয়েদের দুঃখেরও সমাপ্তি ঘটবে। (কিতাবুল আগানী, ২১ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২০-৫৬)[৫২]।

আল্লাইয়াহ আল আসর : আল্লাইয়াহ আল আসর 'আবুল হাসান আলী' ইবন আবদুল্লাহ ইবন সায়িফ ছিলেন উমাইয়্যা বংশের একজন মুক্ত দাস। আল্লাইয়াহ ছিলেন সংগীতজ্ঞ সায়িফ এর পৌত্র। আল্লাইয়াহর পিতামহ সায়িফ ছিলেন ওয়ালিদ ইবনে উসমান ইবনে আফফানের সম সাময়িক। আল্লাইয়াহ সংগীত শিক্ষা লাভ করেন ইব্রাহিম আল মাওসুলি থেকে।

খলিফা হারুন আর রাশীদের রাজকীয় দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে তার (আল্লাইয়াহ এর) প্রথম আবির্ভাব। দরবারের বিধি লঙ্ঘনের জন্য তাকে একবার শাস্তি পেতে হয়েছিল।

খলিফা আল আমিন (৮০৯-৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ) আল্লাইয়াহকে খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু এবারও তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। খলিফা আল মামুন (৮১৩-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) আল্লাইয়াহর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আল্লাইয়াহর প্রচেষ্টা ও

www.amarboi.org

ওকালতির মাধ্যমেই সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলির পুত্র ইসহাক আল মাওসুলি আব্বাসীয় দরবারে প্রবেশ লাভ করেন।

শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহদীর নেতৃত্বে ফারসী সংগীত ধারা সুনির্দিষ্ট আকার ধারন এবং গোষ্ঠিগত রূপ লাভ করার পর আল্লাইয়াহ তার দলে যোগদান করেন। এর ফলে ইসহাক আল মাওসুলি এবং আল্লাইয়াহর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তারা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। শাহাজাদা ইব্রাহিম ইবনে আল মাহদীর মৃত্যুর পর ইসহাক আল মাওসুলির সঙ্গে আল্লাইয়াহর মত বিরোধ বিদূরিত হয়।

আরব সংগীতে পারস্য ধারার প্রবর্তনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অন্যতম ধরা হয় আল্লাইয়াহকে। (ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)[৫৩] এর ফলে আরব সংগীতের দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি সাধিত হয় বলেও অনেকের ধারনা। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) সময় আল্লাইয়াহ আল আসার আবুল হাসান আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন সায়িফ ইন্তেকাল করেন।

আল হাকাম-১ (৭৯৬-৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) : আন্দালুসিয়ায় আল হাকাম-১ এর আমলে ধর্মীয় বাধা নিষেধ শিথিল হয়। তার দৃষ্টি ভঙ্গি, চিন্তাধারা ও আচরণ ছিল দামেস্কী উমাইয়্যাদের অনুরূপ। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাধারা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান চর্চা এবং সংগীত চর্চায় ছিলেন উদার ও পৃষ্ঠপোষক। তার দরবারে সংগীতজ্ঞদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আল আব্বাস ইবন আল নাসাই, আলুন, জারকুন এবং ইয়াহুদী সংগীতজ্ঞ আল মানসুর। (Stanly Lane Poole : Moors in Spain, P-74)[৫৪]।

আব্বাস ইবনে নাসাই : আব্বাস ইবনে নাসাই ছিলেন আন্দালুসিয়ার খলিফা প্রথম হাকামের (৭৯৬-৮২২ খ্রী.) দরবারের সর্ব প্রধান সংগীতজ্ঞ। তার দায়িত্ব ছিল সুলতানের জন্য সংগীত রচনা করা এবং তাকে শ্রবণ করানো।

আল মানসুর : আল মানসুর ছিলেন একজন ইয়াহুদী সংগীতজ্ঞ। হাকাম-১ এর দরবারে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। জিরিয়াবকে কবজায় আনয়নের জন্য সুলতান আবদুর রহমানের দূত হিসাবে তিনিই গিয়েছিলেন। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫)[৫৫]।

'আলুন' এবং 'জারকুন' ও খলিফা আল আমীন : আন্দালুসিয়ায় জিরিয়াবের আবির্ভাব এর পূর্বে সে দেশের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন "আলুন" এবং "জারকুন"। জিরিয়াবের তুলনায় তাদের সংগীত মেধা ও প্রতিভা নিস্প্রভ হয়ে যায়। তারা ছিলেন সুলতান হাকাম -১ এর (৭৯৬-৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) সভা সংগীতজ্ঞ।

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞগণ খলিফা ও অমাত্যদের সমসঙ্গী হিসাবে আসন গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাদেরকে কখনো এক সঙ্গে মদ্য পান করতে দেখা যায় নি। খলিফা আল আমিন ছিলেন মদ্যপায়ী। কিন্তু তিনি কোন সংগীতজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে মদ্যপান করেননি।

সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ছিল। যন্ত্র সংগীতজ্ঞদের (আল-আতী) মর্যাদা ছিল কণ্ঠ সংগীতজ্ঞদের নিম্নে। তেমনি সংগীত বালিকাদের (কায়না) মর্যাদাও ছিল নিম্নতর। তাদের কেও কেও ছিল সংগীতজ্ঞদের সহকারী।

৭ম আব্বাসিয়া খলিফা আবদুল্লাহ্ আল মামুনুর রাশীদ (৮০৯-৮৩৩ খ্রী.)

৫ম খলিফা আবু জাফর হারুন আর রাশীদের মৃত্যুর পর খলিফা মনোনীত হন জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল আমিন (৮০৯-১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি তার পিতৃব্য ইব্রাহিম আল মাহদীকে দরবারে সংগীত উপস্থাপনার জন্য আহবান করেন। খলিফা আল আমীনের পতনের পর 'আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আল মামুন' তার রাজধানী মারভ নগরী থেকে সাম্রাজ্য শাসন করতেন। এ ব্যবস্থা ছিল ৮১৯ সাল পর্যন্ত ৬ বৎসর।

৭ম খলিফা আল মামুন সমগ্র সাম্রাজ্যের খলিফা পদে ছিলেন (৮১৩-৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ২০ বছর। কিন্তু, ৮১৯ পর্যন্ত তার রাজধানী ছিল মধ্যে এশিয়ার মারভ নগরীতে।

৮১৭ সালে আল আমীনের পরবর্তী খলিফা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে এক সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ হয়। ঐ সময় পিতৃব্য ইব্রাহিম ইবন আল মাহদীকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

এরই মধ্যে সিরিয়া, ইরাক এবং বাগদাদে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহ অতি সহজে খলিফা আল মামুন দমন করেন। বিশৃংখলার সময় খলিফা আল মামুনের বৈমাত্রিক পিতৃব্য সংগীতজ্ঞ শাহাজাদা ইব্রাহিম ইবনে মাহদীকে খলিফা ঘোষণা করায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। কারণ, তখনও সংগীতকে একটি নিম্ন স্তরের পেশা হিসাবে বিবেচনা করা হত।

মামুন অতি দ্রুত ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। তার সংগীতজ্ঞ পিতৃ ভ্রাতা ইব্রাহিম ইবনে আল মাহদী পলায়ন করেন। কিন্তু ধৃত হন। সংগীতজ্ঞ ও স্বল্পকালীন খলিফা ইব্রাহিম ইবনে আল মাহদী ভ্রাতুস্পুত্র খলিফা মামুনুর রশিদের নিকট জীবন ভিক্ষা চান। যা প্রদান করা হয়। এরপর ইব্রাহিম আল মাহদী পেশাগত সংগীতজ্ঞ হিসাবে জীবন যাপন করেন।

www.amarboi.org

রাজপুত্র ইব্রাহিম ইবনে আল মাহ্দী আবু ইসহাক : সংগীতজ্ঞ শাহজাদা ইব্রাহিম (৭৭৯-৮৩৯) ছিলেন খলিফা আল মাহ্দীর (৭৭৩-৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) পুত্র এবং খলিফা হারুন উর রশীদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। শাহজাদা ইব্রাহিমের মায়ের নাম ছিলে শিকলা। শাহজাদা ইব্রাহিমের জন্ম হয় বাগদাদে। শাহজাদা ইব্রাহিম রাজকীয় চারিত্রিকগুণ সম্পন্ন না হয়ে প্রকৃতিগতভাবে ছিলেন জ্ঞানের সন্ধানী, ভাষাবিদ, কবি, বৈজ্ঞানিক, হাদিস-শাস্ত্রবিদ, শিল্পগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তবে সংগীতে তার প্রতিভা জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর বিকশিত হয়েছিলো।

রাজপুত্র হলেও ছয় বছর বয়সেই শাহজাদা ইব্রাহিম ইবন মাহ্দী পিতৃহারা হন এবং রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেননি। একবার দুর্ভাগ্যক্রমে (খলিফা আল মামুনুর রাশীদের আমলে) তিনি খলিফা হিসাবেও ঘোষিত হয়েছিলেন। ইব্রাহিমের মাতা ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞা।

ছয় বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে ইব্রাহিমকে থাকতে হয় মাতৃ সান্নিধ্যে। তার বিমাতা মাকনুনাও ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞা। এই দুই মাহিলা তাদের পুত্র ইব্রাহিম ও তার বৈমাত্রেয় ভগ্নি উলাইয়াকে সংগীতে আগ্রহী করে তোলেন। সেজন্য এই দু'জনকে বিবেচনা করা হত আব্বাসিয়া পরিবারের দু'জন নষ্ট সন্তান হিসাবে। (Henry George Farmer, A History of Arabic Music, page- ১১৯)[৫৬]।

যদিও রাজ পরিবারের লোকদের সংগীতচর্চা বিবেচিত হত রুচিহীনতার পরিচায়ক, কিন্তু খলিফা হারুন আর রাশীদ অধিকতর দ্বীনদার হলেও ছিলেন তার পিতার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

বৈমাত্রীয় ভ্রাতা ও ভগ্নির সংগীত শিক্ষা ও চর্চায় তিনি বিরূপ অভিব্যক্তি কখনও প্রকাশ করেননি বরং তাদের সংগীত শিক্ষায় ছিলেন সন্তুষ্ট। তাদের সংগীত শ্রবণ করে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। তদুপরি হারুন অর রশীদ তাদেরকে রাজদরবারের সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে তার সম্মুখে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনে উৎসাহিত করতেন। (কিতাবুল আগানী, ৯ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১)[৫৭]।

সংগীতজ্ঞ শাহজাদা ইব্রাহিম ইবন আল মাহ্দী ছিলেন সংগীতে পারস্য ধারার অনুসারী। অন্যদিকে প্রধান সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলি ছিলেন সংগীতে আরব ধারার পক্ষপাতী। সাজা প্রাপ্ত হওয়ার কারনে মুতাছিম বিল্লাহর খেলাফত পর্যন্ত ইব্রাহিম আল মাহ্দীর অনুশ্রিত ধারাটির প্রভাব ছিল খলিফার দরবারে অধিকতর ।

www.amarboi.org

ইব্রাহিম আল মাহদীর দুই পুত্র 'ইউনুস' এবং 'হিব্রাত-আল্লাহ' তাদের পিতার সংগীত সাধনা সম্পর্কে ছিলেন আত্মমর্যাদাশীল। শাহজাদা ইউনুস পিতাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দী ইসহাক আল মাওসুলির থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহদীর সেরা সংগীত-শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছ এবং আমর ইবনে বান্না।

সংগীতজ্ঞ ইব্রাহীম আল-মাহদীর বৈশিষ্ট্য : ইব্রাহিম আল মাহদীর সংগীত প্রতিভার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও চমৎকার কণ্ঠ। তার আয়ত্বে ছিল বাদ্যযন্ত্রাদির অষ্টক ধ্বনির চাবি। আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানীর মতে পৃথিবীর অন্য কোন সংগীতজ্ঞের এ ধরনের বলিষ্ঠ এবং রাজকীয় সংগীত কণ্ঠ ছিল না।

সংগীত সাহিত্য, তথ্য এবং যন্ত্র সংগীতে ইব্রহিম আল মাহদীর ছিল অসাধারণ যোগ্যতা। তিনি মিজমার এবং বংশীবাদনায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।

কিতাব আল আগানীর লেখক আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর মতে সংগীতের নাগাম(ধ্বনি) ইকাত (রিদম) এবং তারযুক্ত যন্ত্র সংগীতের ব্যবহারে মানব জাতির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইব্রাহিম আল মাহদি। (কিতাবুল আগানী ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)[৫৮]।

সংগীতজ্ঞ কাজী মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছ ইবনে বুশক হুন্নার আবু জাফর: "মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছ ইবনে বুশক হুন্নার আবু জাফর" ছিলেন একজন বিদেশাগত সংগীতজ্ঞ। তার পরিবার "আবরাই" হতে ইরাকে আগমন করেন। মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছের পিতা বুশক হুন্না আবু জাফর ছিলেন সংগীতামোদী ব্যক্তিত্ব। পেশাগত ভাবে তিনি ছিলেন একজন কাজী। তার খানদানে সংগীত বালিকা প্রতিপালন করা হতো। (আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ২০ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩)[৫৯]।

প্রথমত মুহাম্মাদ ইবনে হারিছ নিজের মনের আনন্দে, নিজের তালে এবং সুরে গান গেয়ে পিতাকে আনন্দ দিতেন। পরবর্তীতে তিনি পেশাগত সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আর মাওসুলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার নিকট সংগীত বিদ্যার উৎকর্ষতা লাভ করেন।

শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহদী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিস– গির্জার প্রার্থনা সংগীতে ব্যবহৃত 'মিজাফা' সংগীত যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা লাভ করতেন। পরবর্তীতে ইব্রাহিম আল মাহদী থেকে উদ বা বীণা চর্চার উদ্বুদ্ধ হন।

www.amarboi.org

মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছ সংগীতে উৎসাহিত হলেও তার পেশাগত বিচারকের দায়িত্ব ত্যাগ করেননি। খলিফা মামুনের সময়ও তিনি কাজী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

খলিফা আল মামুনের বিরুদ্ধে (৮১৭-২৯ খ্রীষ্টাব্দ) বাগদাদে সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ হয় এবং সংগীতজ্ঞ শাহাজাদা ইব্রাহিম আল মাহ্দী স্বল্পকালীন খলিফা হিসাবে ঘোষিত হন। বিদ্রোহ দমনের পর ইব্রাহিম আল মাহ্দিকে কারাগারে রাখা হয় এবং তার পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল কাজী মুহাম্মাদ ইবনে হারিছের ওপর।

কাজী মুহাম্মাদ ইবনে হারিছ তার কয়েদি ইব্রাহিম আল মাহ্দী থেকে সংগীত শিক্ষা লাভ করতেন। খবর শুনে মামুন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এর পর খলিফা মামুন খবর পান যে, সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে হারিছ উমাইয়্যাদের প্রশংসা সংগীত গান।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে কাজী সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছের মৃত্যুদন্ড ঘোষিত হয়। ওয়াজির (মন্ত্রী) মুহাম্মাদ ইবনে বাজদাদ বহু অনুনয় বিনয় করে পাগলাটে সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আল হারিছের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হন। খলিফা মামুনের পর খলিফা মুতাছিম এবং আল ওয়াছিকের আমলেও মুহাম্মাদ ইবনে হারিছ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাকে আল ওয়াছিকের দরবারেও দেখা যেত। (কিতাবুল আগানী, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫১-৪)[৬০]।

ইসহাক আল মাওসুলি (৭৫৬-৮৫০ খ্রী.)

আবূ মুহাম্মাদ ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আল মাওসুলি হলো ইসহাক মাওসুলির পূর্ণ নাম। তার জন্ম আল রাইই নামক স্থানে ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু হয় ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ রাজ দরবারে প্রধান সংগীতজ্ঞ হিসাবে স্থান গ্রহণ করেন।

ইসহাক আল মাওসুলির স্বীয় পিতা ইব্রাহিম আল মাওসুলির সঙ্গে বাগদাদে আসেন। শিশু কাল থেকেই ইসহাক আল মাওসুলি শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনির্দেশনা লাভ করেন। হুসাইন ইবনে বসীর ছিলেন তার প্রধান শিক্ষক। পরবর্তীতে তিনি কুরআন শিক্ষা লাভ করার জন্য আল কিসাই এবং ফারাহ্ গমন করেন।

সংগীতজ্ঞ জালজাল থেকে ইসহাক আল মাওসুলি বীণা বাজানো শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে সংগীত শাস্ত্রের রিদম, মুড (ইকাত) শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি সংগীত শিক্ষার জন্য গমন করেন সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞা আতিকা বিনত সুধার নিকট। তার কাছ থেকেই তিনি সংগীতের বিভিন্ন কলাকৌশল

www.amarboi.org

শিক্ষা লাভ করেন।

সর্বশেষে ইসহাক আল মাওসুলি শিক্ষাবিদ আল আসমাই এবং আবূ বুইদা ইবন মুসান্না থেকে সংগীতের ইতিহাস এবং উন্নত কলাকৌশল এবং কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ইত্যাদি রস সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা শেষ এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন।

পিতা ইব্রাহিম আল মাওসুলির পরিচয় ইসহাক আল মা ও সমিলির জন্যে আব্বাসিয়া এবং বার্মাকিদের সাহচর্য্য লাভের সহায়ক হয়েছিল। দুই বংশের সেরা ব্যক্তিদের থেকেই তিনি সম্মান এবং আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেন।

প্রত্যেক খলিফাই তার পূর্বসূরী থেকে অধিকতর ইজ্জত ও সম্মান এবং আর্থিক সুবিধাদি ইসহাক আল মাওসুলির ওপর বর্ষণ করতেন। ইসহাক আল মাওসুলি শুধু মাত্র সংগীতজ্ঞই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভাষা বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, পন্ডিত ব্যক্তি।

খলিফা আল মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন ইসহাক আল মাওসুলির গুনমুগ্ধ। তিনি এক সময় বলেন যদি ইসহাক আল মাওসুলির সংগীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি না থাকত, আমি তাকে কাজী হিসাবে নিয়োগ করতাম। কারন, বর্তমানে যারা কাজী হিসাবে আছেন তাদের থেকে জ্ঞান, পান্ডিত্য, সততা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে তিনি শ্রেষ্ঠতর। সে যুগে সংগীতজ্ঞদের রাজকীয় সম্মান যতটুকুই থাকুক না কেন কাজী হওয়ার মত সম্মান ছিল না।

খলিফার দরবারে সংগীতজ্ঞদের উপর অবস্থান ছিল শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের। পরবর্তীকালে ইসহাক আল মাওসুলিকে আইনজ্ঞদের জন্য নির্ধারিত কৃষ্ণ বর্ণের জোব্বা পরিধানের অধিকার দেওয়া হয়। খলিফা আল মামুন শুক্রবারে জুম্মার নামাজের সময় ইসহাক আল মাওসুলিকে তার সহকারী হওয়ার সম্মান দিয়েছিলেন।

ইসহাক আল মাওসুলি সম্পর্কে খলিফা ওয়াসিক (৮৪২-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) বলেন ইসহাক আর মাওসুলি এখনো এমন কোন সংগীত পরিবেশন করেননি যা দ্বারা আমি সমৃদ্ধ না হয়েছি। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ রমজান মাসে ইসহাক আল মাওসুলি ইন্তেকাল করেন। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল তার মৃত্যুতে বলেন ইসহাক আল মাওসুলির মৃত্যুর সাথে খেলাফত বঞ্চিত হয়েছে একটি উজ্জল অলংকার এবং গৌরব থেকে।

বহুমুখী সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইসহাক আল মাওসুলি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম। ইসহাক আল মাওসুলি থেকে মধুরতর কণ্ঠ সুরের

www.amarboi.org

অধিকারী সমকালীন কয়েকজন সংগীতজ্ঞই ছিলেন। কিন্তু, সার্বিক বিবেচনায় সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইসহাক আল মাওসুলি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম।

যন্ত্র সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইসহাক আল মাওসুলির সমকক্ষ কেও ছিলেন না। সংগীত তত্ত্বে তিনি 'আল কিনদির' মত সংগীত চিন্তাবিদ না হলেও সংগীতের বহুমুখী এমন কি বিপরীতমুখী তত্ত্বকে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট এবং সমন্বয় ধর্মী স্তরে উন্নয়নে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইসহাক আল মাওসুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি গ্রীক(আওয়াইল) বা প্রাচীন পন্থীদের কোন তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। তবে তার পাঠাগারটি ছিল বাগদাদের সবচেয়ে সমৃদ্ধতম। বিশেষ করে আরবী ভাষা এবং অভিধানে তার লাইব্রেরী অপেক্ষা উন্নততর লাইব্রেরী সেকালে ছিল না বলা চলে।

'আল ওয়াররাক' রচিত 'কিতাব আল ফিহরীস্তে' ইসহাক আল মাওসুলি রচিত **৪০টির অধিক গ্রন্থের** উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে তাকে কবি, প্রাচীন বিদ্যা বিষয়ক, সংগীতজ্ঞ এবং সর্ববিদ্যা ও বিজ্ঞানে সর্ব মুখী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসহাক আল মাওসুলির রচিত পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ১. ইসহাক কর্তৃক গীত সংগীতাবলী, ২. সংগীতজ্ঞা আসমা আল মাইলার গল্প সমগ্র, ৩. মাবাদর গীত সংগীত সমগ্র ৪. হুন্নাইন আল হিরি এর গল্প সমগ্র, ৫. তুয়াইসের গল্প সমগ্র ৬. ইবন মিসজাহের গল্প সমগ্র, ৭. আল দালালের গল্প সমগ্র, ৮. ইবন আয়েশার গল্প সমগ্র, ৯. আল-আফজারের গল্প সংগ্রহ, ১০. আল ওয়াসিকের নির্বাচিত সংগীতাবলী, ১১. কিতাব আল রাফাস ওয়াল জাকান (নৃত্য সংক্রান্ত পুস্তক), ১২. কিতাব আল নাগাম ওয়াল ইকা(সংগীতের রিদম এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ), ১৩. আল হিজাজের সংগীত বালিকাদের ইতিহাস, ১৪. সংগীত বালিকাদের ইতিহাস, ১৫. মাবাদ এবং ইবন সুরাইজের ঘটনাবলী এবং তাদের সংগীত, ১৬. আল গারিদের ঘটনাবলী, ১৭. সংগীতের মহাগ্রন্থ, ইত্যাদি।

সংগীতের মহাগ্রন্থ শীর্ষক গ্রন্থটি খুবই জনপ্রিয়। তবে এই গ্রন্থের সবগুলো লেখা হয়ত ইসহাক আল মাওসুলির নয়। সমগ্র বইটির সংগ্রহে ছিলেন "সিনদি ইবনে আলী" নামে একজন পুস্তক বিক্রেতা এবং সম্পাদক। তবে প্রারম্ভ (রপখসা) ছিল ইসহাক আল মাওসুলির।

ইসহাক আল মাওসুলি নিজের লেখা থেকে যা সংকলন করেছিলেন। ইবন সিনদি ইবন আলী আরও অধিক লেখা তার সংকলনে যোগ করেছেন।

www.amarboi.org

সংগীত বিজ্ঞানী ইসহাক আল মাওসুলির জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন তার পুত্র হাম্মাদ এবং আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবন আলী মানসুর এবং আরও অনেকে। (ফিহরীসত, পৃষ্ঠা ১৪১ থেকে ৪৩)[৬০(ক)]।

বানু মুসা (মুসা বংশীয় তিনজন): খলিফা আল মামুন আর রাশীদ বাগদাদে স্থাপন করেন বায়তুল হিকমাহ – যা ছিল মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান বিজ্ঞান কেন্দ্র। মুসা ইবনে শাকিরের তিন পুত্র ছিলেন এই বায়তুল হিকমার প্রথম দিকের মধ্যমনি। তারা হলেন মুসা বংশীয় মুহাম্মাদ ইবনে মুসা, আহমাদ ইবনে মুসা, হাসান ইবনে মুসা। এই তিন জ্ঞানবীর বানু মুসা (মুসা বংশীয়) নামে খ্যাত ছিলেন।

বানু মুসা নামে খ্যাত মুসা বংশীয়দের জ্ঞান চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল জ্যোর্তির্বিদ্যা, জ্যামিতি, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ইত্যাদি। তারা সংগীতেও উৎসাহী ছিলেন। বানু মুসার সংগীত সংক্রান্ত জ্ঞান ও চর্চার বিষয়টি আল আলাত ইল্লাতি তোজামমীর বিনা ফাশিহা (স্বয়ংক্রিয় বাদ্যযন্ত্র এবং কিতাব আল উরপানুন যন্ত্র) গ্রন্থে বর্ণিত আছে। (আল মাসরিক, বৈরুত, ১৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৪)[৬১]।

বাগদাদে খলিফা আল মামুন স্থাপন করেন "বাইতুল হিকমাহ" নামে জ্ঞান মন্দির বিজ্ঞান কলেজ। বায়তুল হিকমাহ এর সংগীত সংক্রান্ত অবদানের বিষয়টি নিস্প্রভ। কারন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনই ছিল বায়তুল হিকমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

তাহির পরিবার: তাহির বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহান তাহির (৮২০খ্রীষ্টাব্দ)। তার বংশধরগণ আব্বাসিয়া খেলাফতের ছিলেন কর্ণদ্বার। এই বংশের কৃতি সন্তানেরা নিযুক্ত হতেন আব্বসীয়া বংশের মন্ত্রী, সেনা প্রধান, সুবেদার, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, বিভিন্ন পদের পুরধা ও অধ্যক্ষ। তারা সকলেই ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক এবং অনেকেই ছিলেন নিজেরাই খ্যাত নামা সংগীতজ্ঞ।

আবদুল্লাহ ইবন তাহির (মৃত্যু ৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) : আবদুল্লাহ ইবনে তাহির স্বয়ং ছিলেন একজন কৃতবিদ্ধ এবং কৃতকর্ম সংগীতজ্ঞ। তিনি তার রচিত সংগীত পেশ করতেন খলিফা আল মামুনের দরবার কক্ষে। তার দুই পুত্র ওবায়দুল্লাহ এবং মুহাম্মদ উভয়ই ছিলেন সংগীতে পারদর্শী। (আল মাসুদী, আখবার জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৮)[৬২]।

আল মামুন জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার। তার সময়েই 'মুতাজিলা' মূল্যবোধকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়।

www.amarboi.org

৮ম আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ
(৮৩৩-৪২ খ্রী.)

অষ্টম আব্বাসিয়া খলিফা আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংগীতের উদার পৃষ্ঠপোষক। আব্বাসিয়া খলিফা মুতাসিম (৮৩৩-৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে সংগীতজ্ঞ আবূ জাফর আহমাদ আল মাক্কী সংগীত পরিবেশন করে একদিন বিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আবু জাফর আহমাদ আল মাক্কী শুধুমাত্র সংগীত সংকলক বা সংগীতের তাত্ত্বিক-বিদ্যা বিশারদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বাস্তব গায়ক। তার সংগীত চর্চার উচ্চশিত প্রশংসা করেছেন সে যুগের অন্যতম সেরা সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলি।

সংগীতজ্ঞ আবূ জাফর আহমাদ আল মাক্কী (মৃত্যু ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) : আবূ জাফর আহমাদ আল মাক্কী ছিলেন আব্বাসিয়া যুগের অন্যতম সেরা সংগীতজ্ঞ। ইয়াহইয়া আল মাক্কীর স্বনামধন্য পুত্র। আবূ জাফর ইবনে আহমাদ আল মাক্কী ৮৬৪ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন সংগীত বিদ্যা (ঘিনা) এবং সংগীত ইতিহাস (রুওয়াত) সম্পর্কে আব্বাসিয়া দরবারের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

তার পিতার (ইয়াহ ইয়া আল মাক্কী) সংকলিত এবং রচিত "কিতাব আল আগানী" এর উন্নত ও সম্প্রসারিত সংগীত গ্রন্থ "কিতাব মুজাররাত ফিল আগানী" শীর্ষক সংগীত সংকলনের আহমাদ আল মাক্কী ছিলেন রচয়িতা ও সংকলক। এই সংকলনে সংগীতের সংখ্যা তদীয় পিতা ইয়াহইয়া আল মক্কী সংকলনের তিন হাজার সংগীত থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ হাজারে উন্নীত হয়েছিল।

আবূ জাফর আহমাদ আল মাক্কী প্রথমে খলিফা আল মামুনের (৮১৩-৩৩), খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৪২ খ্রী.) এবং আব্বাসিয়া খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৪; কিতাবুল আগনী, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২)[৬৩-৬৪]।

সংগীতজ্ঞ হিসেবে আবূ জাফর আহমাদ আল মাক্কী "জুনাইন আল মাক্কী" খেতাবে খ্যাত ছিলেন। বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ ইকদ আল ফরিদ গ্রন্থে তিনি "জুনাইন আল মাক্কী" নামে উল্লেখিত হয়েছেন। সে যুগে তিনজন সংগীতজ্ঞকে অত্যন্ত সুদক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হত। অপর দু'জন ছিলেন "আল হাসান

www.amarboi.org

আল মাসদুদ" এবং "দুবাইশ আহমদ"। আবু জাফর আহমদ আল-মাক্কী ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

খলিফা মুতাসিম গ্রীক ও বাইজানটাইন সভ্যতাকালে রচিত জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তকাবলী আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। বিখ্যাত আরব সংগীতজ্ঞ এবং দার্শনিক আল কিনদির প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আল কিনদির রচনাসমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং তা চলেছিল কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত।

আবদুল্লাহ ইবনে আবীল আলা : প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলির সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন সামাররা এর বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবন আবীল আলা। তার প্রতিভার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী রচিত কিতাবুল আগানীতে। (কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৪)[৬৫]।

হাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল মাওসুলি : হাম্মাদ ইবন ইসহাক আল মাওসুলির পিতা ইসহাক এবং পিতামহ ইব্রাহিম আল মাওসুলী ছিলেন মুসলিম ইতিহাসের দু'জন প্রধান সংগীত সম্রাট। তার সংগীতের ওস্তাদ ছিলেন পিতা ইসহাক মাওসুলি ছাড়াও সংগীত বিশেষজ্ঞ আবু ওবাইদা এবং আসমায়ী। পিতার নিকট তিনি শিক্ষা করেন উচ্চতর সংগীত বিজ্ঞান।

আল সুলী লিখেছেন যে, হাম্মাদ ইবন ইসহাক ছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ। পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সংগীতের জ্ঞান ও দক্ষতা। হাম্মাদ ইবন ইসহাক কবি ও সংগীতজ্ঞদের কয়েকটি জীবনী লিখেছিলেন। (আল-ওয়াররাক, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা ১৪২-৪৩)[৬৬]।

আহমাদ ইবন সাদাকী : আহমাদ ইবন সাদাকীর পিতা আবী সাদাকা এবং পিতামহ ছিলেন খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারের সংগীতজ্ঞ। আহমাদ ইবন সাদাকা নিজে ছিলেন খলিফা আল মামুনের (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১ খ্রী.) দরবারের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ।

তাম্বুরা বাদক হিসাবে আহমাদ ইবন সাদাকী এর খ্যাতি ছিল খুবই ব্যাপক। ফলে তিনি তাম্বুরী উপনামে অবিহিত হতেন। তিনি ছিলেন রমল, হেজাজ এবং মুখরী ছন্দের রচয়িতা ও বিখ্যাত গায়ক। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭- ৩৯)[৬৭]।

আবু আইয়ুব সোলাইমান আল মাদিনি : আবু আইয়ুব সোলাইমান ইবন আইয়ুব ইবন মুহাম্মাদ আল মাদিনী ছিলেন মক্কার অধিবাসী। "আল ফিহরিস্ত"

www.amarboi.org

খ্যাত ওয়াররাক এর মতে আবু আউয়ূব সোলাইমান আল মাদিনী ছিলেন প্রকৃতিগত ভাবে একজন সংগীতজ্ঞ। তিনি অর্জন করেছিলেন সংগীত বিজ্ঞানে পেশাগত শিক্ষা।

তদুপরি সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের ইতিহাস সংক্রান্ত তার বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ- ১. কিতাব আখবার আজ্জা আল মাইলা (আজ্জা আল মাইলার সংগীত কাহিনী); ২. কিতাব আল মিসজাহ (সংগীতজ্ঞ হিসাবে ইবন মিসজাহ সংক্রান্ত কিতাব), ৩. কিতাব কিয়্যান আল হিজাজ (আল হিজাজের সংগীত বালিকাদের ইতিহাস), ৪. কিতাব কিয়্যান মাক্কা (মক্কায় সংগীত বালিকাদের ইতিহাস)। ৫. কিতাব তাবাকাত আল মুগান্নীয়ান (তাবাকা বা স্তর অনুসারে সংগীতজ্ঞদের কাহিনী), ৬. কিতাব আল নাগম ওয়াল ইকা গ্রন্থ (সংগীতের সুর ধ্বনি এবং রিদম এর গ্রন্থ), ৭. কিতাব আল মুনাদ্দীমিন (খলিফাদের ঘনিষ্ট সহচর ও সংগীতজ্ঞদের গ্রন্থ), ৮. কিতাব আখবার ইবন আয়েশা (সংগীতজ্ঞ ইবন আয়েশা সংক্রান্ত গ্রন্থ), ৯. কিতাব আখাবার হুসাইন আল হিরী (হুনাইন আল হিরীর সংগীত কাহিনী), ১০. কিতাব ইবন সুরাইজ (ইবন সুরাইজের সংগীত কাহিনী), ১১. কিতাব আল গারিদ (সংগীতজ্ঞ গারিদের ইতিহাস)। (আল ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬)[৬৮]।

সংগীতজ্ঞ সোলইমান মাদিনী যাদের ওপর সংগীত রচনা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন সংগীত সম্রাট।

সংগীতজ্ঞ আল কিনদি (জন্ম ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ) : আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিনদি জন্ম গ্রহণ করেন বসরা নগরীতে এক আরব অভিজাত পরিবারে ৭৯০ সালে। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং আল মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) এর আমলে আল কিনদি খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। তিনি খলিফা মামুনের সময়কার মুতাজিলা আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

খলিফা আল মুওয়াক্কিলের আমলে (৮৪৭-৬১ খ্রী.) রক্ষণশীলদের মুতাজিলা বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। এর পরিনতিতে আল কিনদীর বিরাট লাইব্রেরীটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

আল কিনদিকে তার স্বদেশীগণ আরবদের দার্শনিক খ্যাতি প্রদান করে। কারণ, তিনিই সর্ব প্রথম যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে প্রাকৃতিক জগতের বিশ্লেষণ শুরু করেন।

www.amarboi.org

আল কিনদি ছিলেন একজন গ্রন্থ প্রণেতা। সংগীতের ওপর তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে ঃ-১. কিতাব রিসালা আল কুবরি ফি আলিফ (সংগীত সংক্রান্ত বিরাট রচনা), ২. কিতাব রিসালা ফি তারতীব আল নাগাম (সংগীত সংক্রান্ত বিশ্লেষণ গ্রন্থ), ৩. কিতাব রিসালা ফিল ইকা (রিদম বা ছন্দ সংক্রান্ত গ্রন্থ), ৪. কিতাব রিসালা ফিল মাদখাল ইলা সিনাত আল মিউসিকি (সংগীত কলা সংক্রান্ত পরিচিতি গ্রন্থ), ৫. কিতাব রিসালা ফি খুবর সিনাত আল আলিফ (সংগীত রচনা কৌশল সংক্রান্ত তথ্য), ৬. কিতাব রিসালা ফি আকবারা আস সিনাত আল মিউসিকি (সংগীত কলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী), ৭. মুক্তাছার আল মিউসিকি ফি আলিফ আল নাগাম ওয়া সানাত আল উদ (সংগীতের রচনা স্বর, বীণা কলা কৌশল সংক্রান্ত গ্রন্থ)।

৯ম আব্বাসিয়া খলিফা হারুন আল ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রী.)

আব্বাসিয়া বংশের সপ্তম খলিফা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আল মামুনের সময়ে যে যুক্তিবাদিতা ও ধর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞান চর্চার ধারা শুরু হয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে নবম আব্বাসিয়া খলিফা আবু জাফর হারুন আল ওয়াসিক বিল্লাহর আমলে। ৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সালে তার মৃত্যুতে আব্বাসিয়া আমলের স্বর্ণ যুগের বিরাট অধ্যায় এর সমাপ্তি ঘটে। Henry George Farmer এর মতে আব্বসীয়া সংস্কৃতির ও সভ্যতার তুলনায় সমকালীন ইউরোপ ছিল অজ্ঞতা এবং বারবারিজমে নিমজ্জিত। (Henry George Farmer: A History of Arabic Music, Page 97)[৬৯] খলিফার পুত্র হারুন ওয়াসিক এর দক্ষতা শুধু কণ্ঠ সংগীতে ছিলো না, তিনি ছিলেন সে কালের একজন সুদক্ষ যন্ত্র সংগীতবিদ।

জুনাম : জুনাম ছিলেন খলিফা হারুন উর রশীদ, আল মুতাছিম এবং আল ওয়াসিকের দরবারে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তার দক্ষতা ছিল মিজমার জাতীয় বংশী বাদক হিসাবে। ঐতিহাসিক আল হারীরীর ১৮তম মাকামাতে সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হিসাবে জুনামের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তিনি কয়েকটি নতুন ধরনের বাঁশী আবিষ্কার করেন এবং এ গুলো "নাই জুনাম" হিসাবে খ্যাত হয়।

আবুল হাসান ইবন তারখান : আবুল হাসান আলী ইবন হাসান ইবন

www.amarboi.org

তারখান ছিলেন একজন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও সংগীত সাহিত্যিক। তার পুস্তকগুলোর মধ্যে একটি হলো "কিতাব আখবার আল মুগান্নীয়্যিান আল তাম্বুরীয়্যান" (সংগীতজ্ঞ ও তাম্বুরা বিশেষজ্ঞদের কাহিনী)। (আল ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬)[৭০]।

জিরিয়াব আবুল হাসান আলী ইবনে নাফী : "জিরিয়াব" নামে খ্যাত আবুল হাসান আলী ইবনে নাফী ছিলেন আন্দালুসিয়ার (স্পেন) একজন অতি বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তার গাত্র বর্ণ ছিল কৃষ্ণ এবং কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর। কোকিলের ন্যায় কাল একটি পাখির নাম জিরিয়াব। আবুল হাসান আলী ছিলেন একজন কোকিল কণ্ঠ সংগীতজ্ঞ। তাই "জিরিয়াব" নামে তিনি সংগীত শাস্ত্রে খ্যাত হয়েছেন।

জিরিয়াব ছিলেন আব্বাসিয়া খলিফা আল মাহদীর (৭৭৫-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) একজন মুক্তদাস। তিনি ঐ যুগের সেরা সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলিকে উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করেন। খলিফা আল-মাহদীর স্বনাম ধন্য পুত্র হারুন আর রাশীদের সময়ে জিরিয়াব খলিফার দরবারে প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন। দেহগত ভাবে কৃষ্ণ বর্ণের হয়েও জিরিয়াব আরব গৌর বর্ণীয় দরবারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খলিফা তার সম্ভাব্য প্রতিভা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেন।

খলিফা হারুনের দরবারে জিরিয়াব যে সংগীতযন্ত্র ব্যবহার করেন– তা ছিল তার উস্তাদ ইসহাক আল মাওসুলি থেকে উন্নততর বীণা। এর মধ্যে তারের সংখ্যা ছিল প্রচলিত সংখ্যা থেকে একটি বেশী এবং উদ বীণা যন্ত্রটি ছিল একটু বড় আকারের।

ঐ বীণার দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তার ছিল সিংহের নাড়িবুড়ি এর উপাদানে তৈরী। এই নতুন বীণা যন্ত্রটি ব্যবহারের ওপর জিরিয়াব গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐ বীণার মান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। এতে ধারনা হয় যে, জিরিয়াবের ব্যবহৃত বীণাটি ছিল ইসহাক আল মাওসুলির বীণা হতে উন্নততর।

জিরিয়াবের প্রতি খলিফা হারুন আর রাশীদের অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং মনোযোগ দেখে তাঁর উস্তাদ ইসহাক আল মাওসুলি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন। তিনি খোলাখুলি তার শিক্ষার্থী শিষ্যকে বলেন যে, তিনি বাগদাদে খলিফার দরবারে কোন প্রতিযোগী সংগীতজ্ঞের অস্তিত্ব বরদাস্ত করবেন না।

www.amarboi.org

তাই তাকে উপদেশ দেন যেন অতি দ্রুত বাগদাদ ছেড়ে দূরে কোন রাজ দরবারে চলে যেতে।

জিরিয়াব বুঝতে পারলেন যে, ইসহাক আল মাওসুলির ন্যায় প্রভাবশালী সংগীতজ্ঞের ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু হয়ে তিনি তার সুনাম দূরের কথা – অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবেন না। তাই তিনি অতি দ্রুত এবং গোপনে বাগদাদ থেকে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় পলায়ন করেন। তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান এর আল্লাবিদ সুলতান জিয়াদাদুল্লাহ (৮১৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে জিরিয়াব শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসাবে আবির্ভূত হন।

সুলতান জিয়াদাদুল্লার দরবারে জিরিয়াব একদিন একটি সংগীত পেশ করেন। যার প্রথম চরণটি ছিল "আমার মা কাকের মত কাল, আমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ। "জিরিয়াব" নিজে ছিল কৃষ্ণ বর্ণ এবং তার মাতাও ছিল কৃষ্ণকায়া। তার দুর্ভাগ্যক্রমে জিয়াদাদুল্লার মাতাও ছিল অনুরূপ। সুলতান মনে করলেন যে, সুলতানের মাতাকে ব্যঙ্গ করে সংগীত রচনা করা হয়েছে।

সংগীতটি ছিল অত্যন্ত আবেগ প্রবণ এবং হৃদয় স্পর্শকারী। সুলতান জিয়াদাদুল্লাহ সংগীতজ্ঞ জিরিয়াবকে হত্যার নির্দেশ দিলেন না। তাকে চাবুকাঘাতের দন্ড দিয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলেন।

ভাগ্যের সন্ধানে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে জিরিয়াব আন্দালুসিয়ায় (স্পেন) দ্বিতীয় আবদুর রহমানের (খৃঃ ৮২২-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (ইবন আব্দ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯)[৭১]।

আল মাক্কারী উল্লেখ করেন যে, জিরিয়াব সুলতান প্রথম হাকামের-১ (৭৯৬-৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। খলিফা হাকাম-১ এর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী আব্দুর রহমান -২ তাকে সসম্মানে বহাল রাখেন।

শীঘ্রই জিরিয়াব আন্দালুসিয়ায় সকল সংগীতজ্ঞের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। সেখানে ইসহাক আল মাওসুলির মত তার কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না।

ঐতিহাসিক মাক্কারী উল্লেখ করেছেন যে সংগীতের সকল অঙ্গনে জিরিয়াবের দক্ষতা ছিল। তার স্মৃতি শক্তি ছিল অকল্পনীয়। সুর, তাল, লয়সহ এক হাজারেরও বেশী সংগীত তার মুখস্ত ছিল। জিরিয়াব বিশ্বাস করেতেন যে, গভীর রাত্রে জ্বীন তাকে সংগীত শিক্ষা দেয়।

নিদ্রা ও স্বপ্ন ভঙ্গের পর তিনি তার দু'জন সুযোগ্যা সংগীত বালিকা গাজ্জালন এবং হিন্দাকে আহবান করতেন– জ্বিন থেকে যে গান তিনি

www.amarboi.org

শিখেছেন– তা তাদেরকে শুনাতেন। ঐ গান তারা মুখস্ত করে নিত। (Henry George Farmer; পৃষ্ঠা ১৩০)[৭২]।

ইসহাক আল মাওসুলির মত জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু শাখায় জিরিয়াবের ছিল স্বাচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিজ্ঞানে ছিলেন অতি পারদর্শী।

আন্দালুসিয়ান সুলতান আবদুর রহমান - ২ (৮২২-৫২) ঃ

আন্দালুসিয়ান স্পেনীস সুলতান প্রথম হাকামের পর দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সুলতানাতে ধর্ম নিরপেক্ষ মুক্ত চিন্তাধারার পুনার্বিভাব ঘটে। তবে সংগীত চর্চা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা বাধাগ্রস্থ না হয়ে বরং বেগমান হয়। (Mehaelis Casiri, Biblitheca Arabic Hispana Escuria lensis Arab History and Escur Volume Page 34)[৭৩]।

কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আবদুর রহমান-২ অশ্বারোহনে নগরীর বাইরে গিয়ে জিরিয়াবকে অভ্যর্থনা জানান। (ইবনে খালদুন, Prolegomena, ii, Page ৩৬১)[৭৪]।

পরে অবশ্য সুলতান আবদুর রহমান-২ তাকে রাজ প্রসাদে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আরও পরে সংগীতজ্ঞের জন্য খলিফা আবদুর রহমান-২ একটি প্রকান্ড ভবন বরাদ্ধ করেন। জিরিয়াবের বাৎসরিক সম্মানী নির্ধারিত হয় **চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা**। প্রতি মুদ্রার নিম্নতম ওজন ছিল এক তোলা।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের দরবারের প্রধান সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব ছিলেন সুলতানের নিত্য সহচর এবং আহারের সঙ্গী।

ঐতিহাসিক আল মাক্কারী জিরিয়াব সম্পর্কে লিখেছেন যে, কখনও জিরিয়াবের পূর্বে অথবা পরে জিরিয়াবের পেশায় এমন কোন প্রতিভার আর্বিভাব হয় নি যিনি ছিলেন জিরিয়াব থেকে অধিকতর প্রশংসিত এবং প্রিয়। (Henry George Farmer ; পৃষ্ঠা ১৩০)[৭৫]।

জিরিয়াব বীণা বাজানোর জন্যে ঈগল পাখির নখর এবং হস্তিদন্তের প্লেকট্রাম ব্যবহার করতেন। (Al-Maqqari, The History of Mohamedan Dynasties in Spain. vol 2, page 116-21)[৭৬]।

সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব কণ্ঠ সংগীতের শিক্ষার্থীকে তার শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে যে পরীক্ষা নিতেন– তা ছিল অতি কঠোর। তিনি তাকে "মিশওয়ারা" নামক

www.amarboi.org

বিশেষ এক ধরনের আসনে বসাতেন এবং তাকে তার কণ্ঠ স্বরের গভীরতা ও দৈর্ঘের পরীক্ষা নিতেন।

যদি শিক্ষার্থীর কণ্ঠস্বর হত প্রত্যাশার তুলনায় দুর্বল, তাকে বলতেন তার পাগড়ী কোমরে শক্ত করে বাঁধতে এবং চিৎকার করতে। ধারণা করা হত এভাবে কণ্ঠস্বর এর উচ্চতা বা গভীরতা বৃদ্ধি করা যায়।

যদি শিক্ষার্থী তোতলাতেন, মুখ পরিপূর্ণভাবে খুলতে না পারতেন, অথবা দাঁতে দাঁত লাগাতে অভ্যস্থ হতেন– তখন তিনি তিন আঙ্গুল চওড়া এবং তিন ইঞ্জি লম্বা কাঠ মুখে দিয়ে রাখতে বলতেন– যাতে তার চোয়াল প্রসারিত হয়। তারপর তাকে সর্বোচ্চ স্বরে চীৎকার করার অভ্যাস করাতেন এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ ও গভীরতায় আওয়াজ করতে বলতেন যখন তার কণ্ঠস্বর, উচ্চনাদ ও বর্ধনশীল হত, তখনই তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতেন। যারা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্থ হতে পারবেন মনে করতেন তাদেরকেই নির্বাচন করতেন। (Al-Maqqari, Mohamedan Dynasties Volume 29, page 121)[৭৭]।

সংগীত বিজ্ঞানের জিরিয়াবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হলো কর্দোভা এর সংগীত কলেজ যা ছিল সংগীতের যাদুঘর। এই কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ গণ্য হতেন দেশের গৌরব হিসাবে। (Von Hammer, Literature of Arabs, Vol-iv, Page 727).[৭৮] জিরিয়াবের পুত্র কন্যাগণও ছিলেন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ।

সংগীতজ্ঞ জিরিয়াবের নেতৃত্বে একটি বিশিষ্ট সংগীতধারার সৃষ্টি হয়। মদিনা এবং অন্যান্য স্থান থেকে সংগীতজ্ঞগণ আন্দালুসিয়ায় আকর্ষিত হন এবং এই ধারা আন্দালুসিয়ার মুসলিমদের পতন ও করুন বিলুপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৮৫২ সালে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর আন্দালুসিয়ার মুসলিম রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয় এবং নাম মাত্র সুলতান কর্দোভায় রাজত্ব করেন।

জিরিয়াব পরিবার : জিরিয়াব পরিবারের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল হাসান আলী নাফি আন্দালুসিয়ান। জিরিয়াব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আলী ইবন ইবন নাফির ছিল ছয় পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্র কন্যাগণই ছিলেন সুযোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরসুরী। সকলেই সংগীত, কলা ও সংগীত শিল্পে ছিলেন দক্ষ কুশলী।

www.amarboi.org

তার পুত্রদের নাম (১) আবদ আল রহমান, (২) ওবাইদাল্লাহ, (৩) ইয়াহ্ইয়া, (৪) জাফর, (৫) মুহাম্মদ, (৬) আল কাসিম। কন্যা দুজন ছিল (৭) হামদুনা এবং (৮) উলাইইয়াহ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমান সুযোগ্য পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং ছিলেন বংশের গৌরব। তিনি তার নিজের এবং পরিবারের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন এবং অহংকারী।

অন্যদের সঙ্গে আলোচনাকালে ধারণা দিতে চাইতেন যে, তার সমকক্ষ কেও নেই। পুত্র মুহাম্মদ ছিলেন বড় কবি এবং কনিষ্ঠ পুত্র আল কাসিম ছিলেন পরিবারের সর্বোত্তম গায়ক। ওবায়দুল্লাহ ছিলেন সংগীত সংক্রান্ত সর্ববিদ্যা বিশারদ।

আবুল হাসান এর কন্যা হামদুনার বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল ওয়াজির হিসাম ইবনে আবদুল আজিজ এর সঙ্গে। তার ভগ্নি উলাইইয়াহও ছিলেন সংগীতজ্ঞা, তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নির মত নয়।

www.amarboi.org

আব্বাসিয়াদের অবক্ষয় যুগ

১০ম আব্বাসিয় খলিফা জাফর আল মুতাওয়াক্কিল, আবুল ফজল (৮৪৭-৬১ খ্রী.)

আব্বাসিয়া বংশের সপ্তম খলিফা আল মামুনের সময় উদার ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংগীতচর্চার যে ধারা শুরু হয়েছিল, তার প্রথম বিপরীতমুখী প্রবণতা শুরু হয় নবম খলিফা আল ওয়াসিকের পর দশম খলিফা আবুল ফজল জাফর আল মুতাওক্কিল'ল্লাহ্ সময় থেকে।

এটা ছিল পূর্ববর্তী কালের ধর্ম বিরোধী এবং গায়ের ইসলামী ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া। এ সময় সুন্নী মাজহাবের চতুর্থ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের চিন্তাধারার প্রভাব জনমনে প্রবল হয়।

সে যুগের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক এবং সংগীততত্ত্ববিদ ছিলেন আল কিনদি। তার বিরাট লাইব্রেরী বাজেয়াপ্ত করা হয়। চিকিৎসাবিদ বুখত ইউসুফ এর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাকে নির্বাসিত করা হয়।

বাগদাদে ধর্ম বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, খলিফার সংগীতপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল এবং তা তিনি গোপন রাখতেন না। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯১)[৭৯]।

খলিফার পুত্র আবূ ইসা আবদুল্লাহও ছিলেন অতি উচ্চমানের সংগীতজ্ঞ। তার রচিত তিন শত সংগীতের একটি সংকলনও প্রণয়ন করা হয়েছিল। (কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৪)[৮০]।

খলিফার প্রধান উজির মুহাম্মাদ ইবনে ফজল জারজারাই ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রখ্যাত সংগীত প্রতিভা। (ইবন টিকটাকা : আল-ফাখরী, পৃষ্ঠা ৪১৩)[৮১]।

খলিফা মুতাওয়াক্কিল সামারা নগরীতে তিনটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর জন্য সংগীত বাদ্যযন্ত্র, আনন্দ উৎসব এবং চিত্তোবিনোদনের সকল উপকরণের সংযোগ করা হয়েছিল। এই প্রাসাদ ছিল বাগদাদের হাম্বলী প্রভাব মুক্ত। এই প্রাসাদের নাম ছিল ১০ খলিফা জাফর আল মুতাওয়াক্কিল এর নামানু সারে জাফারিয়া।

জাফারিয়া প্রাসাদে খলিফার অনুগ্রহ ধন্য সংগীত প্রতিভাদের মধ্যে ছিলেন ঃ

১. ইসহাক আল মাওসুলি, ২. মুহাম্মাদ ইবনে হারিছ, ৩. আহমাদ ইবনে

www.amarboi.org

ইয়াহইয়া আল মাক্কী, ৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল রাক্কী, ৫. আমর ইবন বানা, ৬. আহমাদ ইবনে সাদাকা, ৭. আল হাসান আল মাসদুদ, ৮. আসাস আল আসওয়াদ, ৯. ইবনে আল মারকী।

জাফারীয়া প্রাসাদে মহিলা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেনঃ ১. উরাইব, ২. সারিইয়া, ৩. ফরিদা এবং ৪. খলিফার প্রিয় মাহবুবা।

সংগীতজ্ঞ হুনাইন ইবন ইসহাক আল ইবাদী আবু জায়েদ (৮০৯-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ): হুনাইন ইবন ইসহাক আল ইবাদী আবু জায়েদ ছিলেন আল হিরা অঞ্চলের ইবাদ নগরীর একজন খ্রিষ্টান অধিবাসী। ইবাদ নগরীতে হুনাইনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এই নগরীতে তার পিতা ছিলেন একজন ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে হুনাইন বাগদাদ গমন করেন এবং বিখ্যাত চিকিৎসক ইয়াহইয়া ইবন মাসাওয়াইহির শিষ্যত্ব লাভ করেন। তার শিক্ষা সমাপ্ত হয় এশিয়া মাইনরে। সেখানে তিনি গ্রীক ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন।

বাগদাদে ফিরে এসে হুনাইন বিজ্ঞান গবেষণাগার "বাইতুল হিকমায়" চাকুরী গ্রহণ করেন। বায়তুল হিকমার এই অংশটির মালিক ছিলেন বানু মুছা। অতঃপর তিনি নিযুক্ত হন খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে।

হুনাইনের প্রধান খ্যাতি ছিল গ্রীক ভাষায় রচিত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদীর সিরিয়ান এবং আরবী ভাষায় অনুবাদ। এমনও হতে পারে যে, আরবীতে প্রাপ্ত গ্রীক সংগীত সংক্রান্ত পুস্তকগুলো তারই অনুবাদে কৃত। এটা অবশ্যই নিশ্চিত যে, এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলী –যেমন De Animar এর অনুবাদ (কিতাব ফিল নাফস) এবং Historiya Animalium (কিতাব আল হাইয়্যান) এবং Galen's Divoce (কিতাব আল সাউথ) অনুবাদ হুনাইন আল ইসহাক কৃত।

সংগীতজ্ঞ আবু আলী আল হাসান তাম্বুরী : সংগীতজ্ঞ আবু আলী হাসান আল মাসুদ ছিলেন একজন উত্তম মানের তাম্বুরা বাদক এবং খ্যাতনামা সংগীত রচয়িতা ও গায়ক। তিনি ছিলেন বাগদাদের একজন কসাইর পুত্র এবং তিনজন খলিফার সংগীতজ্ঞ সভাসদ। খলিফাত্রয় হলেন আল ওয়াসিক (৭৪২-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খলিফা মুন্তাসির (৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ)। (কিতাবুল আগানী, ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬ -৫৮)[৮২]।

"ইকদ আল ফরিদ" গ্রন্থের রচিয়তা ইবন আবদ রাব্বীহি তাকে সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আবূ ঈছা ইবন মুতাওয়াক্কিলের রাজকীয় বাসভবনে একটি স্মরণীয় সংগীত অনুষ্ঠানে যোগ

www.amarboi.org

দেন। ঐ অনুষ্ঠানে তার সংগী সংগীতজ্ঞ ছিলেন আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আল মাক্কী, জুনাইন এবং দুবাইসের ন্যায় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞগণ। (ইবন আব্দ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯১)[৮৩]।

সংগীতজ্ঞ আবুল ওবাইছ ইবন হামদুন : আবুল ওবাইছ ইবনে হামদুন ছিলেন খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারের সংগীতজ্ঞ। তার ভ্রাতা আবুল আনবাস ইবন হামদুনও ছিলেন মুতাওয়াক্কিলের দরবারে সংগীত প্রতিভা। হামদুন পরিবারের সকলেই ছিলেন শাহাজাদা ইব্রাহিম ইবন আল মাহদী প্রবর্তিত ফার্সি রোমান্টিক সংগীত ধারার একনিষ্ঠ সমর্থক। (কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)[৮৪]।

সংগীতজ্ঞ আল হাসান ইবন আল মুসা আল নাসিবী : আল হাসান ইবন আল মুসা আল নাসিবী ছিলেন দুইটি বিখ্যাত সংগীত গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ দু'টি হল "কিতাব আল আগানী আলাল হুরুফ" (আরবী বর্ণনানুক্রমে সংগীত গ্রন্থ) এবং অপরটি হল "কিতাব মুজাররাদাদ আল মুগান্নীয়িন" (সংগীতজ্ঞদের নব কাহিনীর পুস্তক)।

প্রথম পুস্তকটি লেখা হয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) এর নির্দেশক্রমে। এই গ্রন্থে আরবী সংগীতগুলো সংকলন এমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে যা অতীতে করা হয়নি– ইসহাক আল মাওসুলি কর্তৃক অথবা আমর ইবন বানা কর্তৃক। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থে সংগীতজ্ঞদের নাম, পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্য উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞতার যুগ আইয়্যামে জাহিলিয়া থেকে ইসলামী যুগের নারী, পুরুষ সংগীতজ্ঞদের সংগীতের উল্লেখ এই পুস্তকে করা হয়। এটা ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক সংকলন। (ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫)[৮৫]।

স্বল্প খ্যাত কয়েকজন সংগীতজ্ঞ : আব্বাসিয়া যুগের অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঃ- (১) আমির ইবন মুরবাহ। (কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫,৩৬)[৮৬] (২) আবুল আনবাস ইবন হামদুন। (কিতাবুল আগানী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬২)[৮৭] (৩) আবুল উবাইস ইবন হামদুন। (কিতাবুল আগানী, ১৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৮-১৯)[৮৮] (৪) আবুল ফজল রাদাদ। (কিতাবুল আগানী, ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২)[৮৯] (৫) আথাথ আল আসওয়াদ। (কিতাবুল আগানী, ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০)[৯০] (৬) ইবন আল মারকী। (কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০-২১)[৯১]।

www.amarboi.org

উপরোক্ত সংগীতজ্ঞদের সকলেই ছিলেন খলিফা মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১) এর দরবারে সংগীতজ্ঞ। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারের একজন অমাত্য ইব্রাহিম ইবন মুতাব্বির উপরে উল্লেখিত সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৪-২৭)[৯২]।

১১তম আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল মুনতাসির বিল্লাহ, আবু জাফর (৮৬১-৬২ খ্রী.)

১১তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুনতাছির এর রাজত্ব ছিল মাত্র এক বছর। তিনি ছিলেন নিজে কবি, সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত গুণগ্রাহী। তার রচিত সংগীতের সংকলন ও আলোচনায় কিতাবুল আগানীতে একটি অধ্যায় নিবেদিত হয়েছে। (কিতাবুল আগানী খন্ড ৮ম পৃষ্ঠা ১৭৫-৮)[৯৩]।

খলিফা আল মুনতাসিরের প্রিয় সভা কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন বুনান ইবনে আমর আল হারিছ। তিনি খলিফা রচিত সংগীত গাইতেন। তার আর একজন প্রিয় সংগীত বিশারদ ছিলেন আল হাসান আল মাসদুদ। তার সংগীতজ্ঞদের বর্ণনা রয়েছে "সুরুজ আল জাহাব" কিতাবে। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭)[৯৪]।

সংগীতজ্ঞ বুনান ইবন আমর ইবন হারিছ : আব্বাসিয়া খলিফা মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খলিফা আল মুনতাসির (৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারের সেরা সংগীতজ্ঞ ছিলেন বুনান ইবন আমর ইবন হারিছ। খলিফা মুন্তসির বিল্লাহ (৮৬১-২ খ্রীষ্টাব্দ) সমকালীন খেলাফতে বুনান ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদার আসীন। (আল মাসুদী, আখবায় আল জামান, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪)[৯৫]।

"আবদুল্লাহ ইবনে আল আব্বাস ইবন আল ফজল ইবন আল রাব্বিহী" ছিলেন কয়েকজন আব্বাসিয়া খলিফার দরবারে কবি, সংগীত রচয়িতা, সুরদাতা, স্বরলিপি লেখক এবং গায়ক। তিনি ছিলেন খলিফা হারুন আর রাশীদের আমল থেকে (৭৮৬-৮১৩ খ্রী.) খলিফা আল মুনতাসিরের খেলাফত পর্যন্ত (৮৬১-৬২ খ্রী.) আব্বাসিয়া খলিফার দরবারের গায়ক। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলির একজন অনুরক্ত ভক্ত। (কিতাবুল আগানী, ১৭তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২১-৪১)[৯৬]।

ঐতিহ্য নীতিমালা ছিল কর্দোভায় : আন্দালুসিয়া প্রদেশসমূহের রাজধানী কর্দোভার অনুকরণীয় ছিল বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতি ও সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা। মুহাম্মদ-১ (৮৫২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ), আল মান্দির(৮৮৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

www.amarboi.org

এবং আবদাল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখের শাসন কালে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা উৎসাহিত হত। খলিফা আবদাল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রী.) ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সংগীতের প্রতি উদাসীন।

আন্দালুসিয়ার প্রাদেশিক শাসকগণ যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কর্দোভার আনুগত্য ঘোষণা করতেন, এ আনুগত্য ছিল নাম মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের শিল্প, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা কর্দোভার থেকেও বেশী ছিল।

সেভিল : প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যে সেভিলে রাজ্যের শাসক ইব্রাহিম আল হাজ্জাজ এর (মৃত্যু ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) শাসন ছিল শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানে আন্দালুসিয়ার বিস্ময়।

তিনি বাগদাদ এবং আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগীতজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিকদেরকে আমন্ত্রণ জানাতেন। সেভিলের সংস্কৃতি জগতের মধ্যমনি ছিলেন কামার। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭)[৯৭]।

কাজলূনার আমীর ওবাইদুল্লাহ ইবনে উমাইয়্যা সংগীতবিদ, বাদক ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য খ্যাত ছিলেন।

সংগীতজ্ঞ আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবী মানসুর (মৃত্যু ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) : আলী ইবন ইয়াহ ইয়া ইবন মানসুর বিখ্যাত ছিলেন সংগীতজ্ঞ, কবি, আবৃতিকারক এবং গল্প বর্ণনাকারী হিসাবে। এ সমস্ত বিদ্যা অর্জনে তার শিক্ষক ছিলেন ইসহাক আল মাওসুলি।

আলী ইবন ইয়াহইয়া প্রথম জীবনে ইরানের পারস্য প্রদেশের সুবেদার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবন ইব্রাহিম আল মুসাবির এর দরবারের সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আব্বাসিয়া খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে প্রধান সংগীতজ্ঞ নিযুক্ত হন এবং খলিফার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। তিনি পঞ্চদশতম আব্বাসিয়া খলিফা মুতামিদ (৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত খলিফাদের নিত্য সহচরের পদ অলংকৃত করেন।

ফিহরিস্তের বর্ণনা মতে আলী ইবন ইয়াহইয়া খলিফাদের সিংহাসনের এত নিকটে বসতেন যে, খলিফাগণ তাদের হাস্য রসাত্মক বাক্য তার সাথে বিনিময় করতেন এবং গোপন তথ্যের অংশীদারিত্ব দান করতেন।

ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকানের মতে আলী ইবন ইয়াহইয়ার সমস্ত শক্তি ও আনুকূল্যের উৎস ছিল তার ঘিনা বা সংগীত প্রতিভা। এই প্রতিভা তিনি অর্জন করেছিলেন ইসহাক আল মাওসুলি থেকে। যার সঙ্গে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরিচয়।

www.amarboi.org

আলী ইবন ইয়াহইয়ার রচিত পুস্তক গুলোর মধ্যে আছে ঃ- ১. কিতাব আল সুয়ারা আল কুদামা ওয়াল ইসলামীয়াত (প্রাচীন এবং ইসলামী যুগের কবিদের গ্রন্থ), ২. কিতাব আল আখবার ইসহাক ইবন ইব্রাহিম (ইসহাক ইবন ইব্রাহিম মাওসুলির গল্পসমূহ)।

আলী ইবনে ইয়াহইয়ার দুই পুত্র ইয়াহইয়া ইবন আলী এবং হারুন ইবন আলী ছিলেন প্রখ্যাত গ্রন্থকার। (ওয়াফায়াত আল আয়ান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৬)[৯৮]।

১২তম আব্বাসিয়া খলিফা আহমাদ আল মুসতাঈন বিল্লাহ, আবুল আব্বাস (৮৬২- ৬৬ খ্রী.)

দ্বাদশ আব্বাসিয়া খলিফা আল মুসতাইন এর সংগীতের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। যেমন ছিল তার অনুগত গভর্ণর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন তাহিরের (মৃত্যু ৭৬৮)। একদিন আবুল আব্বাস আল মাক্কী এক সংগীতানুষ্ঠানের পূর্বে তার প্রিয় সংগীত সম্পর্কে খলিফাকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জবাবে বলেন সর্বোত্তম সংগীত হলো চার তারের বীণা যোগে গীত সংগীত, যদি গায়কের কণ্ঠ হয় উত্তম মানের। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭)[৯৯]।

সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া : মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবন আবী মানসুর ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, বাগমী এবং প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞদের মধ্যমনি। তার রচিত একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ হলো "কিতাব আখবার আল সুয়ারা" কবিদের মহা ইতিহাস। (ফিহরিস্ত পৃষ্ঠা-১৪৩)[১০০] সেকালে সংগীত গায়কগণ ছিলেন মূলতঃ কবি।

সংগীতজ্ঞ কুস্তা ইবনে লুকা আল বালবাকী (মৃত্যু ৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) : কুস্তা ইবন লুকা আল আল-বাকী ছিলেন সিরিয়ার বালবাক এলাকার একজন খ্রিষ্টান সংগীতজ্ঞ। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, অংক শাস্ত্রবিদ, জ্যামিতিবিদ, হিসাববিদ এবং সর্বোপরি একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ।

কুস্তা ইবন লুকা তার প্রতিভার একাংশ নিয়োজিত করেন গ্রীক ভাষায় রচিত মৌলিক পুস্তকের আরবী অনুবাদে। এই অনুবাদগুলোর চাহিদা তৎকালীন বাগদাদে ছিল খুবই তীব্র ।

www.amarboi.org

কুস্তা ইবন লুকা অতি সহজেই খলিফা আল মুস্তাইন (৮৬২-৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) এর অধীনে চাকুরী পেয়ে যান। খলিফা মুক্তাদিরের (৯০৭-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকালেও তিনি বাগদাদে জ্ঞান সাধনা করেন।

"কাসিরি" কর্তৃক কুস্তা ইবন লুকা এর অনুদিত (গ্রীক ভাষা হতে) কিতাব আল কারস্তুন (লৌহ ও ষ্টীল শিল্প সংক্রান্ত পুস্তক) এর উল্লেখ করেন। সংগীত সংক্রান্ত তার কোন পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তিনি তার সময় বাস্তব গ্রীক সংগীত শিক্ষাদানে মূল্যবান অবদান রাখেন। (ইবন আল কিফতি, পৃষ্ঠা ২৬২)[১০১]।

হামদুন ইবন ইসমাইল : হামদুন বংশীয়গণ ছিলেন খলিফাদের ঘনিষ্ট এবং প্রিয় সহচর। "হামদুন ইবন ইসমাইল ইবন দাউদ আল কাতিব" ছিলেন সংগীতজ্ঞ মুখারিকের শিষ্য। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মহিলা সংগীতজ্ঞ সারিইয়ার ভক্ত এবং প্রশংসাকারী।

হামদুন ইবন ইসমাইলের তিন পুত্র ছিলেন আব্বাসিয়া দরবারের প্রখ্যাত অমাত্য। তারা সংগীত এবং সাহিত্য প্রতিভার জন্য খ্যাত ছিলেন।

আহমাদ ইবন হামদুন ছিলেন ঐতিহাসিক এবং গল্প লেখক। তার একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক ছিল "কিতাব আল নুদামা আল জুলাসা" (খলিফাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও সহযোগীদের গ্রন্থ)। (আল-ওয়াররাক, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪)[১০২]।

১৩তম আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ মুতাজ্জ বিল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ (৮৬৬-৮৬৯ খ্রী.)

খলিফা আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল মুতাজ্জ ছিলেন নিজেই একজন সংগীতজ্ঞ এবং কবি। কিতাবুল আগানীতে তার অনেক গুলো সংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)[১০৩]

খলিফার পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন অতি উত্তম মানের সংগীতজ্ঞ। তিনি খলিফা আল ওয়াসিকের দরবারে সংগীতচর্চা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। (কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪০; ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭)[১০৪]।

নাসওয়ান নামে একজন সংগীতজ্ঞ– আবদাল্লাহ ইবন আল মুতাজ্জ এর গৃহ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। (কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩)[১০৫]।

সংগীতজ্ঞ ইবন আল কাউসার : ইবন আল কাউসার আবুল ফজল সুলাইমান ইবন আলী ছিলেন জাহজা আল বার্মাকি কর্তৃক প্রসংশিত অন্যতম

www.amarboi.org

তাম্বুরা-বাদক ও সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন খলিফা আল মুতাজ্জের (৮৬৬-৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) একজন সংগীতজ্ঞ সহচর।

খলিফা মুতাজ্জ নিজেই ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ। কথিত আছে যে সংগীতজ্ঞ আল কাউসার যখনই দরবারে কোন সংগীত পেশ করতেন, আব্বাসিয়া খলিফা মুতাজ্জ মুগ্ধ হয়ে তা শ্রবণ করতেন এবং সংগীতজ্ঞ ইবন আল কাউসারকে **একশত স্বর্ণমুদ্রা** পুরষ্কার দিতেন।

খলিফা আল মুতাজ্জের দরবারে তার প্রিয় সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন "বুনান ইবন আল হারিছ" এবং তানবুরা বিশেষজ্ঞ "সুলাইমান ইবন কওসার"।

মহিলা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে তার প্রিয় ছিলেন সারিয়াইয়াহ জাহাই। ১৩তম আব্বাসিয়া খলিফার পুত্র আবদুল্লাহ সংগীতজ্ঞা সারিয়াইয়ার ওপর একটি পুস্তক রচনা করেন এবং "কিতাব আল বাদী" শীর্ষক একটি কাব্য সমালোচনামুলক গ্রন্থ রচনা করেন। এ ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থ ছিল সেকালে বিরল। (কিতাবুল আগানী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৯)[১০৬]।

১৪তম ন্যায়নিষ্ঠ আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল মুহতাদী বিল্লাহ, আবু ইসহাক (৮৬৯-৭০ খ্রী.)

চতুর্দশ আব্বাসিয়া খলিফা আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল মুহতাদী ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক খলিফা আল ওয়াসিকের ধর্মপরায়ন পুত্র। এক বছরের মধ্যেই তিনি নিহত হন। তিনি ছিলেন পিতার ব্যতিক্রম এবং উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় উমারের অনুরূপ। স্বাভাবিক ভাবে তিনি ছিলেন সভাসদ এবং ক্ষমতাসীনদের বিপরীত ধর্মী।

আব্বাসিয়া খলিফা আল মুহতাদী এর সময় ধর্ম বিরোধী ক্রিয়াকর্মের নিষেধাজ্ঞা একটির পর একটি জারি হতে থাকে। খলিফা মনোনীত হওয়ার পরেই আল মুহতাদী যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, তার মধ্যে ছিল সকল সংগীত চর্চার উপরে নিষেধাজ্ঞা। (Ibn Tiktaka Al-Fakhri, P- 427)[১০৭]।

সকল সংগীতজ্ঞ ও সংগীত বালিকাদের দরবার থেকে বহিষ্কার, মদ ও জুয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। রাজকীয় পশু সংরক্ষণ আগারে রক্ষিত বন্য হিংস্র প্রাণীগুলো হত্যা এবং রাজকীয় কুকুরগুলোকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাজদরবারের সকল বিলাসীতা বর্জন করা হয়। (W. Muir, Caliphate, P-539)[১০৮] তবে এক বছরের মধ্যে শহীদ হওয়ার কারনে তার জারিকৃত

www.amarboi.org

নিষেধাজ্ঞা খুব কমই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

সংগীতজ্ঞ মানসুর ইবন তালহা ইবন তাহির : মানসুর ইবন তালহা ইবন তাহির ছিলেন ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ এর পিতৃব্য পুত্র। তিনি ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত বিশারদ। তার রচিত কিতাব মিউসিক ফিল মিউসিকি, (সংগীতের সহযোগী পুস্তক) আল কিনদী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। (আল-ওয়াররাক : ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১১৭)[১০৯]।

সংগীতজ্ঞ সাবীত আল কুররা (৮৩৬-৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) : সাবিত আল কুররা আবুল হাসান ছিলেন মেসোপটেমিয়া (ইরাক) এর হাররান অঞ্চলের অধিবাসী। সাবিত আল কুররা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী এবং কঠোর পরিশ্রমী জ্ঞান বিজ্ঞান সেবক। অঙ্ক শাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং সংগীতের প্রতি ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ। তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষনায়ই তিনি অধিকতর আনন্দ পেতেন।

সাবিত ইবন কুররা আবুল হাসান ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ এবং বাস্তববাদী। এ কারণে তাকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। বাগদাদ ত্যাগ করে কাফারটুথা নামক স্থানে তিনি বসবাস শুরু করেন।

সাবিত ইবন কুররা কাফারটুথাতে মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবন সাকির নামক এক বিজ্ঞ জনের সঙ্গ লাভ করেন। তিনি তাকে পুনরায় বাগদাদে এনে খলিফার সঙ্গে মিলিয়ে দেন।

খলিফা তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও সাধনার সুযোগ করে দেন। কালক্রমে সাবিত ইবনে কুররা আবুল হাসান সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদে উন্নীত হন। তিনি জ্যামিতির মধ্যে বীজগনিত অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে তার অবদান ছিল।

সংগীত বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে সাবিত ইবনে কুররার বড় অবদান হলোঃ- ১. কিতাব ফি ইলম আল মিউসিকি। (সংগীত বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ), ২. মাকালা ফিল মিউসিকি (সংগীত সংক্রান্ত সবিশদ বক্তব্য),

৩. কিতাব আল মিউসিকি (সংগীত গ্রন্থ), ৪. কিতাব ফি সালাত আল জামার (নিঃশ্বাস বায়ু নিষ্কাষণ সংক্রান্ত সংগীত যন্ত্রাদি)। (K Henry George Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments, অধ্যায়-৩) ১০৯(ক)।

সাবিত ইবন কুররা রচিত কিতাব ফিল মিউসিকি শীর্ষক পনেরটি অধ্যায়ের একটি পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন সংগীত বিজ্ঞানী হাজী খলিফা। সাবিত ইবন কুররা রচিত পুস্তক গুলোর কদর ও মর্যাদা সমকালীন যুগে যথেষ্ট ছিল।

www.amarboi.org

(কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)[১১০]।

সংগীতজ্ঞ আমর ইবন মুহাম্মাদ (মৃত্যু ৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) : আমর ইবনে বানা ওয়া মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে রশিদ ছিলেন- ইউসুফ ইবনে উমার সাকাফী নামক অভিজাত আমাত্য পরিবারের একজন মুক্ত দাস বংশোদ্ভূত।

তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন এবং কাতিব বা সেক্রেটারীর কাজ করতেন।

তার মায়ের নাম বানা বিনত তুরাওহ্ ছিলেন সালামা আল ওয়াসিফের কাতিব, ব্যক্তিগত সহকারী। মায়ের সন্তান হিসাবে আমর ইবনে মুহাম্মাদের নাম হয় আমর ইবনে বানা। (Henry George Farmer, Arabic Music, পৃষ্ঠা ১৫৭)[১১১]।

আমর ইবন বানা ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলি এবং শাহজাদা ইব্রাহীম আল মাহাদীর শিক্ষার্থী সাগ্রেদ। আমর ইবনে বানার রাজদরবারী সংগীতজ্ঞের জীবন শুরু হয় খলিফা মামুনের রাজত্ব কালে (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

পরবর্তী খলিফা মুতাসিমের (৮৩৩-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) শাসন কালে আমর ইবন বানা ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে তিনি খলিফার প্রিয় সঙ্গী ও সভাসদে পরিণত হয়ে যান (৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

আমর ইবনে বানা তার উস্তাদ শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহ্দীর প্রিয়ভাজন হিসাবে আব্বাসিয়া আমলে সংগীত চর্চার কল্পনা বিলাসী ও রোমান্টিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন তাহির আয়োজিত কোন এক সংগীত অনুষ্ঠানে আমর ইবন বানা প্রথম পুরস্কার পান। অনেকে বলেন যে, তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন শাহজাদা ইব্রাহিমের পৃষ্ঠপোষকতায়।

আমর ইবন বানা কবি ও গায়ক ছিলেন উচ্চ মানের। কিন্তু সংগীত যন্ত্রবিদ হিসাবে তত খ্যাতি তার ছিল না। সে যুগে একজন সংগীতজ্ঞকে শুধু গায়ক হলেই চলতো না। তাকে হতে হত সংগীত রচয়িতা এবং উন্নত মানের সংগীত যন্ত্র বাদক।

তৃতীয় গুনটিতে আমর ইবন বানার কিছুটা কমতি ছিল। তবে তিনি ছিলেন একজন বিদুষী ব্যক্তি। তার রচিত সংগীত গ্রন্থ "কিতাব মুজাররা আল আগানী" অতি মূল্যবান। সংগীতের এ গ্রন্থটি তার সংগীত প্রতিভার পরিচায়ক। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary)[১১২] তার মৃত্যু ছিল অতিব করুণ। কুষ্ঠ রোগে তিনি শামারা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। (Ibn Khallikan, পূর্বোক্ত, খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৪১৪)[১১৩]।

www.amarboi.org

১৫তম আব্বাসিয়া খলিফা আহমাদ আল মুতামিদ আলা বিল্লাহ আবুল আব্বাস (৮৭০-৯২ খ্রী.)

খলিফা আবুল আব্বাস আহমাদ আল মুতামিদ আলা বিল্লাহ ছিলেন স্বয়ং একজন সংগীতজ্ঞ। তার পূর্বসূরী আল মুহতাদী কর্তৃক বিতাড়িত সকল সংগীতজ্ঞ, সংগীতজ্ঞা এবং সংগীত বিশেষজ্ঞদেরকে তিনি প্রাসাদে ফিরিয়ে আনেন।

সংগীতের আসর বসত মামুনের নির্মিত প্রাসাদে– যার নাম দেওয়া হয় কাছরে হাসানী (সুন্দর প্রাসাদ)। (ইয়াকুত ইরশাদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮০৬-৯)[১১৪]

খলিফার প্রিয় এবং প্রাসাদে নবাগত সংগীত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবন ইয়াহইহা আল মাক্কী।

সংগীতজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবন ইয়াহইয়া আল মাক্কী : মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল মাক্কীর পরিবারটি ছিল একটি সংগীতজ্ঞ পরিবার। তার পিতা এবং পিতামহ ছিলেন খলিফা আল মুতামিদের (৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারের সংগীতজ্ঞ। তার সুযোগ্য শিষ্যগণের শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন সমধিক খ্যাত।

সংগীতজ্ঞ ইবনে খুরদাবীহ (মৃত্যু ৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) : ভূগোল তত্ত্ববিদ এবং সংগীত রচয়িতা আবুল কাশিম ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন খুরদাদবিহ এর প্রতি খলিফা আল মুতামিদ আল মুতামিদ তার পৃষ্ঠপোষকতা বর্ষণ করেন। ইবন খুরদাদবিহ খলিফাকে সংগীতের পূর্বকালীন ইতিহাস শোনাতেন।

এই ইতিহাস ছিল বিশেষ করে আরব ও পারসিয়ান সংগীত ইতিহাস। এই বর্ণনার মধ্যে থেকেই আরব এবং পারস্য সংগীতের অনেক ইতিকথা আমাদের কাছে এসেছে। (মাসুদী, আল আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯)[১১৫]।

আবুল কাশিম ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন খুরদাদবীহ ছিলেন একজন Persian (পারসীয়ান) কবি, সংগীতজ্ঞ, ঐতিহাসিক। তার পিতামহ ছিলেন একজন জাদুকর এবং ইসলাম গ্রহণকারী। তার পিতা খুরদাদবীহ ছিলেন তাবারীস্তানের সুবেদার। কিন্তু উবায়দুল্লাহ বিদ্যা-শিক্ষা লাভ করেন বাগদাদে। তিনি ইসহাক আল মাওসুলির তত্ত্বাবধানে সংগীত এবং কাব্য, নাটক, ইত্যাদি রসসাহিত্য বিদ্যা অর্জন করেন।

ইবন খুরদাদবীহ ইরাকে ডাক বিভাগের প্রধান ছিলেন। ৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে

www.amarboi.org

৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর তিনি বাস করতেন সামাররা নগরীতে। ঐ সময়ে তিনি তার বিখ্যাত "কিতাব আল নাসালিক ওয়াল মামালিক" গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ছিল রাজবংশ এবং রাজবংশের উৎস সম্পর্কে। ইবন খুরদাদবীহ পরবর্তীতে খলিফা মুতামিদের (৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) অতি ঘনিষ্ঠ সহচর বন্ধুতে উন্নীত হন।

ইবন খুরদাদবীহ খলিফা মুতামিদের সম্মুখে সংগীত শাস্ত্র সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন। এই বক্তব্যের মধ্যে আরবদের সংগীত সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকতো। (আল মাসুদী)[১১৬]।

ইবন খুরদাদবীহ রচিত অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে আছে ঃ- ১.কিতাব আদাব আল সামা (সংগীত বিজ্ঞানের নীতিমালা ও দৃষ্টি)। ২. কিতাব আল লাহও ওয়াল মালাহী (সংগীতের ভিন্নমুখীতা ও সংগীত যন্ত্র)। ৩. কিতাব আল নুদামা ওয়াল জুলাসা (ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহযোগীদের পুস্তক) ইত্যাদি।

এই বইগুলোর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব বর্তমানে আছে এবং তা আছে আলেকজান্দ্রীয়া এর হাবিব আফান্দী আল জাইয়্যাত লাইব্রেরীতে। (হাজ্জী খলিফা, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০৯)[১১৭]।

সংগীতজ্ঞ আবুল কাশিম আব্বাস ইবন ফিরনাস (মৃত্যু ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) : আবুল কাশিম ইবন ফিরনাস ছিলেন একজন কবি, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক। আবুল আব্বাস আহমাদ আল মুতামিদ আল্লাবিল্লাহ (৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) এর আমলে ইবন ফিরনাস এর ইন্তেকাল হয় ৮৮৮ সালে। (আল মাক্কারী, The History of the Mohamedan Dynasties in Spain, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৬, London ১৮৪০-৩)[১১৮]

আব্বাস ইবন ফিরনাস বাগদাদ থেকে আন্দালুসিয়ায় গমন করেন এবং আন্দালুশিয়ার সংগীত শিক্ষকদের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি আল খালী কর্তৃক প্রবর্তিত ছন্দ বিজ্ঞানের প্রচলনকারী ছিলেন আন্দালুসিয়ায়। (পুর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৮)[১১৯]।

সংগীতজ্ঞা সারিইয়া তখনও সংগীত অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করতেন। (আগানী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৩)[১২০] খলিফা মুতামিদ নির্দেশ দেন যে, সংগীতজ্ঞা উরাইবের প্রাপ্ত সংগীতগুলো সংগ্রহ করতে হবে। (আগানী ১৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬)[১২১] ইবন ফিরগস "খাফিফ থাকিল" ছন্দে রচিত সংগীত কিতাবুল আগানীতে স্থান পেয়েছে। (আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬)[১২২]।

খলিফা মুতাম -এর দরবারের একজন মহিলা সংগীতজ্ঞ সে যুগের নৃত্য

www.amarboi.org

এবং নৃত্যের ছন্দে বিভিন্ন দিক খলিফার সম্মুখে বর্ণনা করতেন। যা থেকে সে কালে নৃত্যের কলাকৌশল সম্পর্কে ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০০)[১২৩]।

আবু হাসিসা : সংগীতজ্ঞ আবু হাসীসার মূল নাম ছিল আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন উমাইয়্যা। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত রচয়িতা এবং সুর দাতা। তার প্রদত্ত নতুন সুরের বর্ণনা আছে কিতাবুল আগানীতে। (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩; ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২; ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)[১২৪]।

আবু হাসীসার দুটি উন্নত মানের সংগীত গ্রন্থ ছিল "কিতাব আল মুগান্নী আল মাজিদ"– মর্যাদার অধিকারী সংগীতর কিতাব এবং "কিতাব আখবার আল তাম্বুরিয়্যাইন" (তাম্বুবুরা বাদকদের গীত ও সংগীত)। (আল-ওয়াররক, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫)[১২৫]

তার সংগীত শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন "জাহজা আল বার্মাকি"। (আল-ওয়াররক ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫)[১২৬]

আবু হাসীসার সংগীত জীবন শুরু হয় খলিফা আল মামুনের দরবারে (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শেষ হয় খলিফা মুতামিদের আমলে (৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ)।

আমর আল মাইদানী : প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ আমর আল মাইদানী ছিলেন একজন তাম্বুরীবাদক ও শিল্পী। তার জন্ম বাগদাদে। সে যুগের সেরা সংগীতজ্ঞ জাওজা আল বার্মাকির মতে সমকালীন শ্রেষ্ঠ তাম্বুরাবাদক সংগীতজ্ঞ ছিলেন আবু হাসীসা এবং আলী হাসান আলী মাসুদী। তবে, জাওজা আল বার্মাকি মনে করেন আমর আল মাইদানী ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। (ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)[১২৭]।

মিশরে তুলনিদ শাসন : নবম শতাব্দীতে মিশরের শাসন কর্তৃত্ব ছিল তুলনিদের হাতে। তাদের কর্তৃত্বাধীনে মিসর, পরিণত হয় শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত চর্চার কেন্দ্রে। তুলনীদ শাসন কর্তা খুমারা ওয়াইহয়ের কন্যার শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হয় খলিফা আল মুতামিদ বিল্লাহর (৮৭০-৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্গে। এ অনুষ্ঠানে ব্যয় হয় দশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। সুলতান খুমারা ওয়াইহ ছিলেন সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতজ্ঞাদের পৃষ্ঠপোষক।

ছবি টাঙ্গানো ইসলামে নিষিদ্ধ ছিল, মিশরীয় তবু তুলনীদ রাজ প্রসাদে শুধু সংগীতজ্ঞ নয়, সংগীতজ্ঞাদের ছবিও দেয়ালে আটকিয়ে রাখা হত।

তুলনীদদের পরে মিশরের শাসন কর্তৃত্ব আসে ইখশীদদের হাতে। তারাও

www.amarboi.org

ছিল সংগীত ও নৃত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক। সংগীতচর্চার পৃষ্ঠপোষকিত শুধুমাত্র সুবাদার আবুল মিসকাফুর এর প্রাসাদেই হত না, জনসাধারণও ছিল সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের উৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষক।

ঐতিহাসিক আল মাসুদী ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফুস্তাত ভ্রমণ করেন। তিনি এক গণসংগীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চার দিকেই ছিল নাঁচ গানের মহোৎসব।

১৬তম আব্বাসিয়া খলিফা আহমাদ আল মুতাদ্দিদ বিল্লাহ, আবুল আব্বাস (৮৯২-৯০২ খ্রী.)

ষোড়শতম আববাসী খলিফা আবুল আব্বাস আহমাদ আল মুতাদ্দিদ ছিলেন অত্যন্ত গোড়াপন্থী এবং অন্ধ বিশ্বাসী। কিন্তু, তিনি সংগীত এবং জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে। তবে তিনি দর্শন চর্চার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বিরূপ। তার কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মধুর। সংগীতে ছিল তার দুর্বলতা ও মাধকতা। (আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬)[১২৮]।

সংগীতজ্ঞ ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন তাহির ছিলেন খলিফা আবুল আব্বাস-এর প্রিয় ভাজন ও সমভাবাপন্ন সহচর। আবদুল্লাহ ইবন তাহির ছিলেন সে যুগের "কিতাব ফীল নাগাম" শীর্ষক সংগীত গ্রন্থ রচয়িতা। (আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫)[১২৯]।

খলিফা আল মুতাদ্দিদ বিল্লাহ জন সম্মুখে উমাইয়্যাদের প্রসংশাসূচক কোন বর্ণনার প্রতি সহনশীল ছিলেন না। কিন্তু সর্বশেষ উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের রচিত একটি সংগীত ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রবণ করেও তিনি ক্লান্ত হতেন না– যখন এই গানটি গীত হত– তার প্রিয় সংগীতজ্ঞ আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবিল আলার কণ্ঠে। (আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৮)[১৩০]।

অন্য দিকে আল সারাকসির মত জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র দার্শনিক এবং সংগীত তত্ত্ববিদকে খলিফা মুতালিদ বিল্লাহ রাজনৈতিক কারনে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯)[১৩১]।

সংগীতজ্ঞ আহমাদ ইবন আবদাল্লাহ ইবন আবুল আলা : সংগীতজ্ঞ আবদুল্লাহ আবুল আলার পুত্র আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন আবীল আলা ছিলেন আব্বসিয়া খলিফা আল মুতাদ্দিদ (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারের একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তিনি দু'জন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের শিক্ষার্থী ও অনুরাগী

www.amarboi.org

ছিলেন। এই দু'জন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন মুখারীক এবং আল্লা ইয়াহ। (কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৪)[১৩২]।

সংগীত শাস্ত্রবিদ ইয়াহইয়া ইবন আলী ইবন ইয়াহইয়া (৮৫৬-৯১২) : ইয়াহইয়া ইবন আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবী মানসুর ছিলেন খলিফা মুতাদ্দিদ (৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) এর ভ্রাতা আল মুয়াফফাকের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় সহচর। ইয়াহইয়া ছিলেন মুতাজিলা দলীয় একজন মেটাফিজিশিয়ান, উত্তম মানের কবি এবং প্রতিভাবান সংগীত বিশেষজ্ঞ। তিনি গ্রীক ভাষা জানতেন এবং গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংগে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

ইয়াহ্ইয়া ইবন আলী খলিফা আল মুতাদ্দিদ (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খলিফা আল মুক্তাফি (৯০২-৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে যে সমস্ত কবিতা আবৃতি করতেন, তা সংগ্রহ করেছিলেন ঐতিহাসিক আল মাসুদী। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৬ ,২২২, ২৩৮)[১৩৩] ইয়াহইয়া ইবন আলী রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে– ১. কিতাব আল বাহির (আলো জলমল পুস্তক)।

এই পুস্তকটি ছিল বর্ণ শংকর বা বিভিন্ন জাতীয় জগত বিখ্যাত কবিদের উপাখ্যান। ইয়াহইয়া ইবন আলী রচিত অপর পুস্তকটি ছিল ঃ- ২. কিতাব আল নাগাম (সংগীতে ধ্বনি সংক্রান্ত পুস্তক)। (আল-মুবাররাদ, কামিল, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭)[১৩৪]। দ্বিতীয় বইটির উল্লেখ কিতাব আল আগানী শীর্ষক মৌলিক বইটিতেও আছে।

সংগীতজ্ঞ ইবন আবদ রাব্বিহি ৮৬০-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ

"আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদ রাব্বিহী" (৮৬০-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত "ইকদ আল ফরিদ" খ্যাত সংগীতজ্ঞ ও ঐতিহাসিক।

দশম শতাব্দীতে "ইবন আবদ রাব্বিহী" রচিত গ্রন্থ "ইকদ আল ফরিদ" এ লোক সংগীতের সমর্থনে তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সংগীত শ্রবণ যে পাপ নয়, তা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন তিনি। (ইকদ আল-ফরিদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৬)[১৩৫]।

এগার শতাব্দির শেষ দিকে মুরাবিদগণ যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তারা সংগীতকে নিষিদ্ধ বলতেন এবং আবু হামিদ আল গাজ্জালী রচিত "ইয়াহ ইয়া উলুমুদ্দীন" পুস্তকটিও তারা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

www.amarboi.org

ইবন আবদ রাব্বিহী রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হলো "ইকদ আল ফরিদ" (অনুপম কণ্ঠ হার)। এই গ্রন্থটিতে আছে ২৫টি অধ্যায়। প্রত্যেকটি অধ্যায় নামকরণ করা হয়েছে একটি মূল্যবান পাথরের নামে। 'অনুপম কণ্ঠ হার' ২৫টি মূল্যবান পাথরের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই পুস্তকটির একটি অধ্যায় হলো কিতাব আল ইয়াকুতাত আল সানিয়া। এই অধ্যায়টিতে সংগীতের স্বরগ্রামের মিল এবং অমিলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আরো আলোচিত হয়েছে সংগীত সংক্রান্ত বহুবিদ বিষয়। যেমন সংগীতের জন্ম, ইতিহাস, সংগীতজ্ঞদের জীবনী, এবং সংগীত শ্রবণের বৈধতা এবং অবৈধতা।

এই পুস্তকটির কয়েকটি সংকলন বুলাক এবং কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে বুলাক থেকে ১২৯৩ হিজরীতে এবং কায়রো থেকে ১৩০৩ হিজরীতে।

সংগীতজ্ঞ আহমাদ আল সারাখসী (হত্যা ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান আল সারাখসী ছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ এবং কিনদির প্রিয় শিক্ষার্থী। আল কিনদীর প্রিয় শত শত বা হাজার হাজার শিক্ষার্থী ছিলেন। আহমাদ আল সারাখসীর একটি উপনাম ছিল তিলমিজ আল কিনদী অর্থাৎ আল কিনদীর প্রিয় ছাত্র।

তার উস্তাদ আল কিনদীর মতে সারাখসীও ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ। জ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যে দিকে সারাখসী উদাসীন ছিলেন। বিজ্ঞানের সর্ব ক্ষেত্রে– তথা পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, সংগীত, ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিল তার সচ্ছন্দ আনাগোনা।

সংগীতের তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপরে তার পুস্তক হলো ঃ- ১. কিতাব আল মাদখাল ইলা ইলম মিউসিকি (সংগীত বিজ্ঞানের উপক্রমনিকা), ২. কিতাব আল মিউসিকির আল কাবির (সংগীতের বৃহৎ গ্রন্থ)। ৩. কিতাব আল মিউসিকি আল সাগীর (সংগীতের ওপর অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রন্থ)।

যারা সংগীতের ইতিহাস এবং তাত্ত্বিক ইতিহাস এবং তাত্ত্বিক বিষয় চর্চা করেন– তাদের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা সংগীতের অনুশীলন বা প্রয়োগিক দিকের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগী। এই বিষয়ে আহমাদ সারাখসী ছিলেন ব্যতিক্রম।

কিতাবুল আগানীতে সংগীতের ব্যবহারিক ও বাস্তব দিকসমূহে যে সমস্ত

www.amarboi.org

গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে- (১) "কিতাব আল লাহও ওয়াল মালাহী ফিল ঘিনা ওয়াল মুগান্নীয়্যিান" (সংগীত এবং সংগীতজ্ঞদের আনন্দ ও সংগীত বহির্ভূত ভিন্ন মুখী বিষয়সমূহ)। (২) "কিতাব নুজহাত আল মুফাক্কীর সাহী ফিল মুগান্নীয়ান ওয়াল ঘিনা ওয়াল মালাহী" (সংগীত এবং সংগীত যন্ত্র সম্পর্কে হত বুদ্ধি জাত সংগীত বহির্ভূত গ্রন্থ)। (৪) কিতাব আল দালালাত আল আসরার আল ঘিনা (সংগীতের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা মূলক পুস্তক)। (আল ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯, ২৬১; ইবন সাবিহ উসাইবীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৪; আল মাসুদী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯; কিতাবুল আগানী, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬)[১৩৬-৩৯]।

আহমাদ আল সারাখসীর জন্ম খুরাসানের সারাখস গ্রামে। তিনি আব্বাসিয়া রাজপুত্র আল মুয়াফফাকের পুত্রের গৃহ শিক্ষক হিসাবে বাগদাদে আসেন। পরবর্তীতে আল মুয়াফফাক আল মুতাদ্দিদ এর ভিন্ন উচ্চারণে মুতাজ্জিদ খলিফা নির্বাচিত হন (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ)।

খলিফা আল মুতাদ্দিদ তার পুত্রের গৃহ শিক্ষক সারাখসীকে একজন অমাত্য ও দরবার সংগীতজ্ঞ হিসাবে পদোন্নতি দান করেন। পরবর্তীতে তাকে বাগদাদের পন্য দ্রব্যের (ওজন এবং দাম) নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন।

আল সারাখসী স্বীয় গুণাবলীর কারনে খলিফা মুতাদ্দিদের অন্তরঙ্গ বুন্ধুত্বের স্তরে উন্নীত হন। খলিফা তার অনেক ব্যক্তিগত গোপন কথা আহমাদ সারাখসীকে বলতেন। তার নিকট খলিফা হৃদয়ের দ্বার অবারিত করে দিতেন। এটাই হয়েছিল তার জীবনের জন্য কাল স্বরূপ।

খলিফা মুতাদ্দিদ প্রিয় বন্ধুকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করেন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। তাকে গ্রেফতার করা হয় ৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। তিন বছরেও এক কালীন বন্ধুর প্রতি খলিফার ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ তার মৃত্যু দন্ড কার্যকরী করা হয়।

সংগীতজ্ঞ আবুল ফারাজ আলী আল ইস্পাহানী
(৮৯৭-৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

আবুল ফারাজ আলী ইবনে আল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আল কুরাইশী এর জন্ম ইস্পাহানে ৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। জন্ম ইস্পাহানে হলেও তিনি ছিলেন একজন আরব। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন সর্বশেষ উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান।

www.amarboi.org

আবুল ফারাজ আল আলী ইস্পাহানী শিক্ষা লাভ করেন বাগদাদে। হামদানী বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বসতি স্থাপন করেন আলেপ্পো নগরীতে। তিনি ছিলেন একজন পরিব্রাজক, জ্ঞানপিপাসু এবং সংগীত সাধক। আবুল ফারাজ আলী ইস্পাহানী এর একটি নেশা ছিল কবিতা এবং সংগীত সংগ্রহ করা।

আলী ইস্পাহানী সম্পর্কে আল তানুখী (মৃত্যু ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) বলেছেন? আমার জীবনে আমি এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিনি যিনি আবুল ফারাজ আলী ইস্পাহানী থেকে বেশী কবিতা, গান ও সংগীত মুখস্ত জানতেন বা সংগ্রহ করেছেন। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা 249)[১৪০]।

আলী আল ইস্পাহানী যখন আলেপ্পো নগরীতে বাস করতেন, সেখানে তিনি রচনা করেন বিখ্যাত "কিতাব আল আগানী" (সংগীতের গ্রন্থ)। আরবদের সাহিত্য কর্মের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ হলো বিখ্যাত কিতাব আল আগানী। (C. Huart, Arab Literature, পৃষ্ঠা 185)[১৪১]।

একুশ খন্ডে প্রণীত আরব সংগীতের ইতিহাস "কিতাব আল আগানী" আরবের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এই কাজটি করতে আলী আল ইস্পাহানীর সারাটি জীবন লেগে যায়। এই পুস্তকের তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজন ছিল অমানুষিক শ্রমশীলতা এবং ধৈর্য্য। সংগীতের ওপর এমন গবেষণা কর্ম সম্মুখে রাখা হলে মাথা স্বাভাবিক ভাবে প্রণেতার উদ্দেশ্যে নত হয়ে আসে।

অজ্ঞতার যুগ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরব সমাজ জীবনের বহুবিদ ক্ষেত্রে একটি বিরাট সংগ্রহ হলো এই গ্রন্থটি।

ইবন খালদুন এর মতে "কিতাব আল আগানী" হলো আরবদের "দিওয়ান" বা মহাতথ্যশালা। আর এই বইটি হলো রস-সাহিত্যের গবেষকদের সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য পুস্তক।

হামদানী সুলতান সাইফ আল দাওলা এই গ্রন্থটির জন্য গ্রন্থ প্রণেতা আবুল ফারাজ আলী ইস্পাহানীকে দিয়েছিলেন মাত্র এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। আন্দালুসিয়ার সুলতান দ্বিতীয় আল হাকাম অর্পণ করেছিলেন আরও এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। (Henry George Farmer: History of the Arabian Music, পৃষ্ঠা- 164)[১৪২]।

এই বিরাট গবেষণা কর্মটি বুলাক প্রেস থেকে বিশ ভলিউমে মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। একবিংশ খন্ড প্রকাশিত হয় Leiden Press থেকে ১৮৮৮

www.amarboi.org

সালে।

কায়রো থেকে (১৯০৫-৬)সালেও একটি উন্নততর এবং শুদ্ধতর সংস্করণ বের হয় আহমাদ আল শানকিতি এর সম্পাদনায় (সারী সংস্করণ)।

অতঃপর মুহাম্মাদ আবদ আল জাওয়াজ আল আসমা প্রকাশ করেছেন "তাসহীহ কিতাব আল আগানী" ১৯১৬ সালে কায়রো থেকে। এই বইটির French and Latin অনুবাদ হয়েছে।

আবুল ফারাজ আলী আল ইস্পাহানী এর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ঃ- (১) কিতাব আল কিয়ান(সংগীত বালিকাদের ইতিহাস)। (২) কিতাব আল ইশা আল সাওয়াইর (দাসী মহিলা কবিদের গ্রন্থ)। (৩) কিতাব আল মুজ্জাররাত আল আগানী (নির্বাচিত সংগীতের পুস্তক)। (৪) কিতাব আল গিলমান আল মুগাল্লীম (দাস গায়কদের ইতিহাস)। (৫) কিতাব আল আখবার জাহজা আল বার্মাকী (জাহজা আল বার্মকীর গল্প গ্রন্থ)। এবং (৬) কিতাব আল হানাত (সরাইখানার গ্রন্থ)।

১৭তম আব্বাসিয়া খলিফা আলী আল মুকতাফি বিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ (৯০২-৯০৭ খ্রী.)

সপ্তদশ আব্বাসিয়া খলিফা আবু মুহাম্মদ আলী আল মুখতাফি (৯০২-০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন পূর্ববর্তী খলিফা আল মুতাদ্দিদের পুত্র। তিনি ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক।

তার দু'জন প্রিয় সংগীত তাত্ত্বিক এবং সভাষদ ছিলেন ওয়াইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে তাহির এবং ইয়াহইয়া ইবনে আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবনে আবী মানসুর। (আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)[১৪৩]

ঐ সময় বাগদাদ হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনে **জাকারিয়া আল রাজী**। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীত তাত্ত্বিক এবং বিশেষজ্ঞ।

সংগীতজ্ঞ দুনিয়া (৮২৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) : দুনিয়া (৮২৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন খলিফা আল মুকতাফির উস্তাদ। তার রচিত "ধাম্ম আল মালাহী" অর্থাৎ সংগীত যন্ত্রের নিষিদ্ধতা শীর্ষক গ্রন্থে তার একটি যুক্তি ছিল যে– সকল অপকর্মের গুরু সংগীতে এবং শেষ মদ্যপানে। (Hazi Khalifa Manuscript, Number 5824)[১৪৪]।

এই পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর সংগীতের পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। কোন পক্ষই জয়লাভ করতে পারেনি।

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ ইবন আল দুব্বী আবু তায়্যিব (মৃত্যু ৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) : আবু তায়্যিব মুহাম্মদ ইবন আল মুকাদ্দল ইবন সালামা ইবন আল দুব্বী ছিলেন বাদগাদের একজন শাফীঈ মাজাহাবের শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ এবং আরবী ভাষাবিজ্ঞানী। তার শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত ইবন আল আরাবী। ইবন আরাবী ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও ভাষা বিজ্ঞানী ইবন আল দুব্বীর শীষ্য।

ইবনে আল দুব্বীর পুস্তকসমূহের মধ্যে আছে "কিতাব আল উদ ওয়াল মালাহি" (বীণা এবং অন্যান্য সংগীত যন্ত্রের পুস্তক)। এই পুস্তকের একটি কপির সন্ধান কায়রোতে পাওয়া গেছে। (Ibn Khallikan: Biographical Dictionary, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১০; হিলাল, ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৪)[১৪৫-৪৬]।

সংগীতজ্ঞ এবং শাস্ত্রবিদ ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (মৃত্যু ৯১২) : ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির ছিলেন আব্বাসিয়া খলিফা মুতাদ্দিদের (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খলিফা আল মুকতাফি (৯০২-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) এর ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহচর। তিনি ছিলেন পুলিশ গার্ড বাহিনী প্রধান। কিতাবুল আগানীতে ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সংগীতের দার্শনিক। (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৬)[১৪৭]।

সংগীত দার্শনিক বলতে শুধু সংগীত বিশেষজ্ঞই বুঝানো হত না, সংগীত দার্শনিককে হতে হত সংগীতের শাস্ত্রবিদ, যুক্তিতর্কবিদ, চিকিৎসক এবং অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ছিলেন সমকালীন তাত্ত্বিক এবং প্রস্তাব অনুশীলনকারী সংগীতজ্ঞদের শীর্ষ স্থানীয়। (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)[১৪৮]।

সংগীত সংক্রান্ত তার উলেখযোগ্য পুস্তক ছিল "কিতাব ফীল নাগাম ওয়া ইলাল আল আগানী আল মুসাম্মা" (সংগীত কৌশল এবং সংগীত গোষ্ঠী সংক্রান্ত পুস্তক)।

ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ সমকালীন এবং প্রাচীন সংগীত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মুতাজ এবং হামদুন বংশীয় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সংগীত বিষয়ে মত বিনিময় করতেন। (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)[১৪৯]।

খলিফা আল মুকতাফির মৃত্যুর পর শাহজাদা আবদুল্লাহ ইবন মুতাদকে সিংহাসনে বসানো হয় ৯০৮ সালে। কিন্তু একই দিনে আল মুক্তাদিরের সমর্থকগণ তাকে হত্যা করেন।

www.amarboi.org

১৮তম আব্বাসিয়া জাফর আল মুকতাদির বিল্লাহ, আবুল ফজল (৯০৭-৯৩২ খ্রী)

আব্বাসিয়া খলিফা আল মুকতাদিরের (৯০৭-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে যে সমস্ত সংগীতজ্ঞ অলংকৃত করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন– (১)জাহাঙ্গীর বার্মাকী, (২) ইব্রাহিম ইবন আবুল উবাইদ, (৩) সংগীতজ্ঞা সালিফা, (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২)[১৫০] (৪) কানিজ, (৫) আল কাসিম ইবন জুরপুর, (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২, ৩২)[১৫১] (৬) ইব্রাহিম ইবন আল কাসিম ইবন জুরজুর, (কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪)[১৫২] এবং (৭) ওয়াসিব আল জামীর প্রমুখ। (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩২)[১৫৩]।

খলিফা আল মুকতাদির বিল্লাহ ছিলেন দরবারের মহিলা এবং প্রিয়ভাজনদের পৃষ্ঠপোষক, ইন্দ্রিয় পরায়ন। প্রশাসনের প্রতি উদাসীন। এই খলিফার নিত্যসঙ্গী ছিল সংগীতজ্ঞগণ এবং সংগীত বালিকাবৃন্দ। (W. Muir The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall, Edited by T.H. Weir, Edinburgh,1915, Page 566)[১৫৪]।

সংগীতজ্ঞ জাহজা আল বার্মাকি : সংগীতজ্ঞ আবুল হাসান আহমাদ ইবন জাফর ইবন মুছা ইবন খালিদ ইবন জাহজা আল বার্মাকি(৮৩৯-৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন ছিল জাহজা আল বার্মাকির পূর্ণ নাম। তিনি ছিলেন একজন কবি, গায়ক, সংগীত যন্ত্র বাদক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। (আল-ওয়াররক, ফিহরিস্ত)[১৫৫]।

খতিব আল বাগদাদীর মতে জাহজা আল বার্মাকি (৮৩৯- ৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) তার যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ। তাম্বুর সংগীত যন্ত্র প্রশিক্ষণে তার সুযোগ্য প্রশিক্ষক ছিলেন আবূ হাসীসা। জাহজা আল বার্মাকি, শুধু সংগীতজ্ঞই ছিলেন না, সংগীতের ওপর গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি।

জাহজা আল বার্মাকি রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে কিতাব আল তাম্বুরীয়্যিন (তাম্বুরা বাদকদের গ্রন্থ) এবং কিতাব আল নাদিম (নৃত্যপ্রিয় সংগীতের বাহিনী)। বিখ্যাত কিতাব আল আগানীর প্রণেতা আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী তার (জাহজা এর) পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬১)[১৫৬]।

জাহজা আল বার্মাকি সভা কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন খলিফা মুতাদ্দিদ (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং খলিফা আল মুকতাদির (৯০৮-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এর। আরবী জাহজা শব্দটির অর্থ হলো তেরা চোখ। তার নামের সঙ্গে জাহজা বা তেরা শব্দটি যোগ করে দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মুতাজ্জ বিল্লাহ।

www.amarboi.org

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আল জাকারিয়া আল রাজী (মৃত্যু ৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ) জাকারিয়া আল রাজী জন্ম গ্রহণ করেন আল রাই নামক স্থানে। আবু দাউদ ইবন জুলজুল এর মতে আল রাজী ছিলেন বাস্তব সংগীতজ্ঞ। তিনি যৌবনে ব্যাপক সংগীত চর্চা করতেন। উদ বীণা ছিল তার অতি প্রিয় সংগীত যন্ত্র।

বিশ বছর বয়সের দিকে আবু বাকর মুহাম্মদ ইবন আল জাকারিয়া আল রাজী বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে বাগদাদে আসেন। এ সময় তিনি খলিফা **মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রীষ্টাব্দ)** এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক আলী ইবন সহল ইবন রাব্বান এর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। অতি শীঘ্রই তিনি বাগদাদের সেরা চিকিৎসকে উন্নীত হন এবং বাগদাদে হসপিটালের পরিচালক ও প্রধান চিকিৎসকের দায়িত্ব পান।

জাকারিয়া আল রাজী ছিলেন তাঁর যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বাধিক মৌলিক চিকিৎসক। কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত তার রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ ইউরোপিয় চিকিৎসকদের জন্য ছিল প্রধান মৌলিক Reference and Text গ্রন্থ।

সর্বশেষে জাকারিয়া আল রাজী বাগদাদ ত্যাগ করে সামানি রাজন আল মানসুর ইবন ইসহাকের দরবারে চলে যান। সেখানে জাকারিয়া আল রাজী তার প্রধান মেডিকেল গ্রন্থ– মানসুরী সামানী রাজন আল মানসুরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। (ইবনে আবী উসাইবাহ, তাবাকাত আল আতিব্বা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯)[১৫৭]।

বিখ্যাত চিকিৎসা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ল্যাকলার্ক (Leclerc) তার সংগীত সংক্রান্ত একটি মহাগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। (Leclere: History dela Medicine Arabic, Volume 1, page 353) [১৫৮]।

ইবন আবী উসাইবীয়া উল্লেখ করেছেন জাকারিয়া আল রাজীর সংগীত সংক্রান্ত একটি বিরাট পুস্তকের রচয়িতা। গ্রন্থটি হলো "কিতাব ফি জুমাল আল মিউসিকি" (সংগীত সংক্রান্ত বিষয়ের সামারী পুস্তক)।

আল মাসুদী : আবুল হাসান আলী ইবন হোসাইন ইবন আলী আল মাসুদীর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন হেজাজের অধিবাসী। মাসুদ এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ ছিলেন আল্লাহর রাসুলের সাহাবী ও সঙ্গী।

আবুল হাসান আলী আল মাসুদী জন্মগ্রহণ করেন বাগদাদে। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষ ভাগে তার জন্ম। আল মাসুদীর জন্মগত একটি নেশা ছিল-দেশ ভ্রমন। বাগদাদ ত্যাগ করে তিনি পারস্য ভ্রমন করেন। সেকালে ভ্রমন এত সহজ এবং আনন্দ দায়ক পেশা ছিল না।

দেশ ভ্রমনকারীদেরকে পথের রাহা খরচ বাবদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। তাদেরকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। চোর ডাকাতের হামলা হলে পাশে দাড়াবার

www.amarboi.org

মত আত্মীয় স্বজন পাওয়া যায় না। ভ্রমনের নেশা খোরেরাই সুদীর্ঘ ভ্রমনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগী হতো।

৯১২ সালে দেখা যায় ইরান ও আফগানিস্থান অতিক্রম করে আল মাসুদী ভারতের মুলতানে পৌছে গেছেন। তিন বছর সফর শেষে তাকে দেখা যায় ইরানের ফার্সে, (পারস্যে) এবং কিরমানে। মুলতান ও পাঞ্জাব ভ্রমণ করে পরিব্রাজক মাসুদী এর ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

তিনি পুনরায় ইরান থেকে ভারতে আসেন। দাক্ষিণাত্যে ও শ্রীলংকা সফর শেষে তিনি সমুদ্র পথে মাদাগাস্কারে যান। তথা হতে আরবের উমানে।

খুব সম্ভব আল মাসুদী ঐ সফর কালে মালয় উপদ্বীপ এবং চীনও সফর করেন।

ঐতিহাসিক আবুল হাসান আলী মাসুদীর বৃহত্তম ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থ ছিল "আকবার জামান" অর্থাৎ মহাকালের ইতিহাস। এই ইতিহাসটি ছিল বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে ৯৪৭ সাল পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস। এই ইতিহাসটি রচিত হয়েছে ত্রিশ খন্ডে। (Henry George Farmer, Arabic Music-165-66; Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, Page-165) [১৫৯-৬০]।

মানব জাতির ইতিহাস সংকলনে আল মাসুদীর মেধার সঙ্গে যে শ্রমের সন্নিবেশ ঘটেছে, তা মানব ইতিহাসে নজীর বিহীন। এই মহা ইতিহাসের ত্রিশটি খন্ডের মাত্র একটি খন্ড সংরক্ষিত হয়েছে ভিয়েনা নগরীতে।

মুসলিম বিশ্বের কোথাও মূল গ্রন্থের একটি অথবা শত পৃষ্ঠাও সংরক্ষিত হয়নি। আবুল হাসান আলী আল মাসুদী রচিত দুটি গ্রন্থঃ -১. সুরুজ আল জাহাব এবং ২. কিতাব আল আওসাত। দুটি গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে।

"সুরুজ আল জাহাব" হলো বিখ্যাত "আকবর আল জামান" এর কিছু কিছু অংশ। কিতাব আল আওসাত হলো আকবার আল জামানের সংক্ষিপ্ত সার সংক্রান্ত। সুরুজ আল জাহাব এর অর্থ হলো সোনালী চারণ ভূমি। এই গ্রন্থের একটি অংশ নিবেদিত হয়েছে আরবদের সংগ্রীতের ওপর।

এর কিছু অংশ আল মাসুদী নিয়েছেন ইবন খুরদাবীহ (মৃত্যু ৯১২ খ্রীস্টাব্দে) হতে। এই অংশটি ফারসী ভাষায় ১৮৬১-৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আল মাসুদী রচিত সুরুজ আল জাহাব গ্রন্থে (সোনালী চারণ ভূমি)। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার অন্যান্য গ্রন্থে তিনি বিস্তারিত ভাবে সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আলোচিত বিষয়ের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের সংগীত যন্ত্র (মালাহী) নৃত্য, সংগীত, রিদম, তুরাক, তুকা, সংগীতের নাগাম বা পুর্স, তান, লয়, স্বরলিপি, ইত্যাদি।

www.amarboi.org

তার সংগীত রচনার মধ্যে শুধু আরব সংগীত নয়, অন্যান্য দেশের সংগীত যেমন- গ্রীক সংগীত, বাইজানটাইন সংগীত, সিরিয়ান গীত, নেবাসিয়ান সংগীত, পারস্য, সিন্ধু এবং ভারতীয় সংগীতের তথ্যাদি ছিল।

আল মাসুদী তার রচিত "কিতাব আল জুলাফে" হৃদয়ের উপরে সংগীতের সুরের প্রভাবের বিষয় আলোচনা করেছেন। সংগীত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক ক্রম বিকাশ (মুনাসাবাদ আল নাগাম লিল আওতার) ইত্যাদিও আলোচনা করেছেন।

আল মাসুদী তার আখবার আল জামান এবং কিতাব আল আওসাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগীতের অনুষ্ঠান এর বিভিন্ন দিক এবং সংগীত যন্ত্রেরও বর্ণনা দিয়েছেন। (আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২২) [১৬১]।

আল মাসুদীর ত্রিশ খন্ডের "আখবার আল জামান" এর এক খন্ডের ফরাসি ভাষায় অনুবাদ- Les d'or ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে প্যারিস নগরী হতে, নয় খন্ডে, ১৮৬১-৭৭ সালে।

আল মাসুদীকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের কয়েকজনের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাদের মধ্যে আছেন- আল তারাবী এবং ইবন আল আছির। ইবন খালদুন এর মতে আল মাসুদী ছিলেন ঐতিহাসিকদের ইমাম (Prairies D'or).

১৯তম আব্বাসিয়া খলিফা মুতাসিম কাহির বিল্লাহ (৯৩৩-৯৩৩) খ্রীঃ

সপ্তদশ আব্বাসিয়া খলিফা মুকতাফি বিল্লাহ এর মৃত্যুর পর তার ত্রয়োদশ বর্ষীয় ভ্রাতা আবুল ফজল জাফরকে খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ উপাধি দিয়ে আব্বাসী খেলাফতের মসনদে বসানো হয়। খলিফা মুকতাফি বিল্লাহ ২৫ বছর খেলাফতে আসীন ছিলেন। তিনি খেলাফতের কাজে ছিলেন উদাসীন এবং আমোদ প্রমোদ, সংগীত চর্চা ইত্যাদিতে মগ্ন থাকতেন।

৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ষোড়শ আব্বাসিয়া খলিফা মুতাজিদ বিল্লাহর অপর পুত্র মানসুর মুহাম্মাদকে "কাহির বিল্লাহ" খেতাব দিয়ে খেলাফতের দায়িত্বে আসীন করা হয়। কিন্তু ২ বছরের মধ্যে তাকে তুর্কী উমরাহগণ অন্ধ করে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করে। এ সময় খেলাফতের অভিভাবক বা রক্ষক ছিলেন তুর্কী আমীর ও সেনাপতিগণ।

www.amarboi.org

খলিফা কাহির বিল্লাহ এবং তার উত্তরসূরী তিনজন খলিফা ছিলেন অতি স্বল্পকালীন এবং যোগ্যতাহীন। বিংশতিতম খলিফা আল রাজী বিল্লাহ্ ভিন্ন বাকী তিনজন খেলাফত থেকে অপসারিত হন এবং তাদেরকে অন্ধ করে দেয়া হয়। আল রাজী ছিলেন অপেক্ষাকৃত যোগ্য খলিফা ছিলেন। তিনি শুক্রবারে খুতবা দিতেন এবং তার রচিত কবিতা ও সংগীত সংরক্ষিত হয়েছে। (Ibn Tiktaka: Fakhri, History of Muslim Dynesties, P-484) [১৬২]।

খলিফা আল কাহির মসনদ রক্ষণার্থে ধর্ম পরায়নদের ভান করতেন। তিনি মদ, সংগীতজ্ঞ ও মহিলা সংগীতজ্ঞা ও মুখান্নাসুন বা মহিলা পারিষদ নিষিদ্ধ করেন। এদেরকে গ্রেফতার করে বসরা এবং কুফায় প্রেরণ করা হয়। দরবারে সংগীত চর্চা নিষিদ্ধ হলেও তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন সংগীত প্রিয় এবং পছন্দনীয় সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক। (Amedroz and DS Margoliouth: The Eclipse of Abbasid Caliphate, Volume 1, P-269)[১৬৩]।

আবদুর রহমান -৩ (৯১২-৫১ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ কর্দোভার সুলতান আবদুর রহমান (তৃতীয়) স্থানীয় প্রশাসকদের ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মজবুত করেন। তার সময়টি ছিল আন্দালুসিয়ার ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ Dozy : History Des Musul, Vol 3, page 90)। তিনিই সর্বপ্রথম কর্দোভার শাসকদের মধ্যে খলিফা উপাধি ধারণ করেন।

"ইকদ আল ফরিদ" গ্রন্থের রচয়িতা "ইবন আবদ রাব্বীহি" ছিলেন তৃতীয় আবদুর রহমানের সভারত্ন। Stanley Lane Poole কর্দোভা সম্পর্কে লিখেন "নগর হর্ম্যরাজীর সৌন্দর্য, জীবন যাত্রার মার্জিত মান, জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও চর্চা অধিবাসীদের সাফল্য ও অর্জন,- কোন দিকেই বাইজানটিয়াম ছাড়া কোন নগরী কর্দোভার সাথে তুলনীয় হতে পারে না। (Stanley Lane Poole: The Moors in Spain, P-129, 139) [১৬৪]।

২০তম আব্বাসিয়া খলিফা মুহাম্মাদ আল রাজী বিল্লাহ, আবুল আব্বাস (৯৩৪-৪০ খ্রী.)

কাহির বিল্লাহ এর অপসারণের পর তুর্কী সেনাপতিগণ মুকতাদির বিল্লাহর পুত্র আবুল আব্বাস মুহাম্মাদকে "রাজি বিল্লাহ" উপাধি দিয়ে খেলাফতে আসীন করেন। এ সময় বসরার গর্ভনর মুহাম্মাদ বিন রাইক ছিলেন খলিফার অভিভাবক। খলিফা রাজি বিল্লাহ ছিলেন খলিফা উপাধির নামমাত্র অধিকারী।

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ কুরাইশ আল জাররাহী : আব্বাসিয়া যুগের একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন কুরাইশ আল জাররাহী। তিনি কুরাইশ আল মুগান্নী (মৃত্যু ৯৩৬) নামেও সমকালীন সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতামোদীদের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি শুধু সংগীতজ্ঞ নন, সংগীতের ঐতিহাসিকও ছিলেন।

তার রচিত সংগীত সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ হল "কিতাব সিনায়াত আল গিনা ওয়া আখবার আল মুগান্নীয়্যিন" এর অর্থ সংগীত কলা এবং সংগীতজ্ঞদের কাহিনী। এই পুস্তকটিতে যে সংগীতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা বর্ণনানুক্রমে দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি তিনি সম্পন্ন করতে পারেন নি। কিন্তু যা সম্পন্ন করেছিলেন, তা ছিল এক হাজার ফলিও। (আল-ওয়াররক : কিতাব আল-ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬)[১৬৫]।

সাইদ ইবনে ইউসুফ (৮৯২-৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) : সাইদ ইবনে ইউসুফ ছিলেন একজন ইয়াহুদী। তার জন্ম মিশরে। তিনি ফিলিস্তিনে আসেন ৯১৫ সালে। কারাইতিয়াদের সঙ্গে ছিল তার জ্ঞান যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ ছিলেন ব্যানমেইর।

৯২৮ সালে সাইদ ইবন ইউসুফ আল ইরাকের শূরা একাডেমির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তখন থেকে তিনি সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত গবেষণায় লিপ্ত হন। তার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো- "কিতাব আল আমানাত ওয়াল তিকাদাত" (দার্শনিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের গ্রন্থ)। এই গ্রন্থটি জুদাহ বেন তিব্বন (মৃত্যু ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক হিবরু ভাষায় অনুদিত হয়। এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে সংগীত চর্চার এবং আরব সংগীতের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান ও বিজ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।

২১তম আব্বাসিয়া খলিফা আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল মুত্তাকি বিল্লাহ (৯৪০-৪৪ খ্রী.)

৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজী বিল্লাহর মৃত্যুর পর মুকতাদির বিল্লাহর অপর পুত্র আবূ ইসহাক ইব্রাহিমকে "মুত্তাকি বিল্লাহ" খেতাব দিয়ে খেলাফতের আসনে বসানো হয়। খলিফার অভিভাবক তুর্কী সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনে রাইক অন্য সেনাপতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুতুল খলিফা মুত্তাকি বিল্লাহ মাওসুলে পালিয়ে যান।

হামদানী বংশীয় তুর্কী সেনাপতি নাসির উদ্দৌলাহ খলিফার হেফাজতকারী মুহাম্মাদ ইবনে রাইককে পরাজিত করে মুত্তাকি বিল্লাহকে বাগদাদে আনয়ন করেন এবং তাদের অভিভাকত্বে খেলাফতে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন।

www.amarboi.org

একবিংশতিম আব্বাসিয়া খলিফা আবু ইসহাক ইব্রাহিম মুত্তাকি বিল্লাহ এর আমরের সংগীত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন সুবিখ্যাত আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ)।

আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

আবূ নাসর মুহাম্মাদ ইবন তারখান আল ফারাবীর জন্ম ট্রানসক্সিয়ানা এর ফারাব নামক স্থানে। এ কারণে তিনি ফারাবী নামে খ্যাত হন। মূলতঃ তিনি ছিলেন তুর্কি গোত্রভুক্ত। বাগদাদে এবং হাররানে তিনি ঐ যুগের দক্ষ জ্ঞানযোগীদের শীষ্যত্ব লাভ করেন। বাগদাদে তার শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক আবূ বিশার মাত্তা ইবন ইউনুস। অতঃপর তিনি হাররানে চলে যান। সেখানে তার শিক্ষক ছিলেন ইউহাননা ইবন খাল্লিকান। এ সময়ে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা আরবদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে।

যদিও আল ফারাবী ছিলেন গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সংগীতেও ছিলেন তিনি অসাধারণ সফল। (S.M. Tegor, Universal History of Music, page 101)[১৬৬] আল ফারাবীর প্রিয় সংগীত যন্ত্র ছিল উদ বীণা। (আবুল ফীদা: Annales Muslem)[১৬৬(১)]।

সংগীতে আল ফারাবীর দক্ষতা ও সুনাম বহু দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হামদানী সুলতান সাইফ আল দাওলা আল ফারাবীকে হামদানী রাজধানী আলেপ্পো নগরীতে স্থায়ী ভাবে বসবাসের আহ্বান জানান। তাকে কেন্দ্র করে ঐ সময় আলেপ্পোতে জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার বিল্পব সাধিত হয়। তার ভক্ত এবং শিষ্যদের মধ্যে তার প্রতি আকর্ষণের একটি কারন ছিল সংগীত চর্চা। তার সংগীতের জলসা অনুষ্ঠিত হত নগরীর উপকণ্ঠে সমৃদ্ধ বাগানে।

ফারাবী এর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলো ছিল দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্কশাস্ত্র, নীতিজ্ঞান (Ethics) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সংগীত। তার বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আরব দার্শনিক এবং খ্যাত ছিলেন দ্বিতীয় এরিষ্টটল হিসাবে। (আল-ওয়াররক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা-২৬৩; এম. কাসিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯)[১৬৭-১৬৮]।

আল ফারাবী রচিত সংগীত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে ঃ- ১. কিতাব আল মিউসিকি আল কাবীর (সংগীতের ওপর মহাগ্রন্থ)। ২. কিলাম ফিল মিউসিকা (সংগীতের ষ্টাইল)। ৩. কিতাব ফি ইহসা আল-ইকা (রিদমের শ্রেণী বিন্যাস

গ্রন্থ)। ৪. কিতাব ফিল নোকরা মুদাফ ইলা আল ইকা (রিদম সম্পর্কে সম্পূরক জ্ঞাতব্য বিষয়)। (Steins Chneider, Al- Farabi, p- 79)[১৬৯] সংগীতের ওপর তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র কিতাব আল মিউসিকি আল কাবির সংরক্ষিত হয়েছে মাদ্রিদ, Leiden, মিলান এর প্রাচীন গ্রান্থাগারে। অন্য গ্রন্থাগুলোর অংশ বিশেষ বিভিন্ন ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। (Henry George Farmer : Arabian Influence on Musical Theory p- 1516)[১৭০]।

আল ফারাবী তার রচিত কিতাব আল মিউসিকি আল কাবীর এর দ্বিতীয় খন্ড প্রণয়ন করেন— যা বর্তমানে অবলুপ্ত। পাশ্চাত্য এবং কনসটানটিনোপোল (Constantinopole) এর প্রাচীন গ্রন্থাগারের বহু পান্ডুলিপিতে আল ফারবী রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়। (Toderini : Volume 1, p- 248-52)[১৭১]।

আল ফারাবীর সংগীত সংক্রান্ত অন্যান্য গন্থের মধ্যে আছে "কিতাব ফি ইহসা আল উলুম (বিজ্ঞান সমূহের শ্রেণী বিভাগ)। এই গ্রন্থটি ল্যাটিন, হিব্রু ভাষায় একাধিক বার অনূদিত হয়েছে। কিতাব আল আদওয়ারও আল ফারাবীর রচনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। (হিলাল, ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৪)[১৭২]।

সংগীতজ্ঞ হারুন ইবন আলী ইবন হারুন : সংগীতজ্ঞ হারুন ইবন আলী ইবন হারুন ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবী মানসুর নামীয় পঞ্চ পুরুষ ছিলেন বিদুষী পন্ডিত, কবি, গায়ক, সুবক্তা এবং সুর সংগীতজ্ঞ।

তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ হলো "কিতাব মুখতার ফিল আগানী" (র্নিবাচিত সংগীত ও পুস্তক)। (আল-ওয়াররক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪)[১৭৩]।

২২তম আব্বাসিয়া খলিফা আবদুল্লাহ আল মুসতাকফি বিল্লাহ, আবুল কাশিম (৯৪৪-৪৬ খ্রী.)

তুর্জন নামে একজন তুর্কী সেনাপতি বাগদাদ দখল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ২২তম খলিফা মুসতাবফি তার দখলে নেন। এই সুযোগে খলিফা মুসতাকফি সেনাপতি তুর্জনের আধিপত্য থেকে পলায়ন করে রাক্কা নামক স্থানে চলে যান।

সেনাপতি তুর্জন খলিফা মুসতাকফিকে পুনঃ দখল করে অন্ধ করে দেয় এবং খলিফা মুসতাকফি এর ভ্রাতা আবুল কাশেম আবদুল্লাকে "মুস্তাকফি বিল্লাহ" উপাধি দিয়ে ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে খেলাফতে আসীন করেন।

আলী ইবন হারুন ইবন আলী (৮৯০-৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ আলী ইবন হারুন ইবন আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবন মানসুর ছিলেন ইয়াহ ইয়া ইবন আলী ইয়াহ ইয়া এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ছিলেন কবি, আবৃতিকারক, বিদুষী, হাস্য রসিক,

www.amarboi.org

ম্যাটাফি জিশিয়ান, ধর্মীয় লেখক এবং সংগীতজ্ঞ। তদুপরি তিনি ছিলেন কয়েকজন খলিফার নিত্য সহচর।

তিনি ছিলেন মনমুগ্ধকর সংগীতজ্ঞ। তার রচিত সংগীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে "কিতাব রিসালা ফিল-কারক বাইন ইব্রাহিম ইবনা আল মাহাদী ওয়া ইসহাক আল মাওসুলি ফিল ঘিনা" (প্রতিদ্বন্দ্বী সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাহাদী এবং ইসহাক আল মাওসুলির মৌলিক পার্থক্য সংক্রান্ত)। (আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত পৃষ্ঠা ১৪৪)[১৭৪]।

আলী ইবন হারুন রচিত কবিতাসমূহ সংগীতের ছন্দে গীত হলে তা হত মন মুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৩)[১৭৫]।

www.amarboi.org

আব্বাসিয়াদের পতনের যুগ
২৩তম আব্বাসিয়া খলিফা
আবুল কাশিম ফজল আল মুতিঈ বিল্লাহ
(৯৪৬-৭৪ খ্রী.)

দ্বা-বিংশতি আব্বাসিয়া খলিফা আল মুসতাকফি বিল্লাহ তার অভিভাবক এবং রক্ষক তুর্কী বুওয়াইড সুলতান মুইজুদ্দৌলা কর্তৃক অপসারিত হন। খলিফার চক্ষু উৎপাটন করে অষ্টদশ খলিফা মুকতাদির বিল্লার পুত্র আবুল কাশিম আল ফজলকে আল মুতিঈ বিল্লাহ উপাধি দিয়ে বাগদাদে খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করে। ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৯৭৪ সাল পর্যন্ত খলিফা পদে থাকার সৌভাগ্যবান হন।

বুওয়াইহিডস : বুওয়াইহিডসগণ হলেন ইরানের একটি শিয়া সেক্‌ট। তাদের মূল বাসস্থান পারস্যের দাইলাম। ফার্স বা পারস্য হলো ইরানের একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের অধিবাসীদের বলা হয় ফার্সি বা ফার্সিয়ান। ইরানে শিয়া প্রভাব সুন্নীদের থেকে বেশী।

আব্বাসিয়াদের ক্ষমতার ভৌগলিক ভিত্তি ছিলো খুরাসান এবং ইরান। বুওয়াইহিডসগণ আব্বাসিয়া সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে এবং শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে। বাগদাদের খেলাফতে বুওয়াইহিডসের প্রভাব ছিল ৯৪৫ সাল থেকে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

বুওয়াইহিডসগণ ইরানের "দাইলাম" থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ইরাক আযম, কিরমান, ফার্‌স্ দখল করার পর তারা বাগদাদও দখল করে নেয় এবং তাদের আশ্রিত আব্বাসিয়া খলিফাদের নামে মূলত বুওয়াইহিডসরাই ১০৫ বছর শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

বুরওয়াইহিডসদের প্রভাবকালে তাঁদের আওতাধীনে খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন চারজন। তারা হলেন (১) খলিফা আল মুতি (৯৪৬-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ), (২) খলিফা আল তাই (৯৭৪-৯১ খ্রীষ্টাব্দ), (৩) খলিফা আল কাদির (৯৯১-১০৩১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং (৪) খলিফা আল কাইম (১০৩১-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

বুওয়াইহিডসদের আগে খলিফার পেছনের শক্তি ছিল তুর্কি সেনাবাহিনী। তারাই মূলত প্রভাবিত করত আব্বাসিয়া বংশের পরবর্তী খলিফা কে হবে ? ব্যক্তিকেন্দ্রীক রাজবংশের রাজার মৃত্যুর পর রাজা হয় রাজার পুত্র অথবা ভ্রাতা।

www.amarboi.org

আব্বাসিয়া বংশের খলিফার মৃত্যুর পর পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা আব্বাসিয়া বংশের কোন যোগ্য ব্যক্তি খলিফা হতেন– যাকে অন্যেরা খলিফা হিসাবে মেনে নিত।

বুওয়াইহিডস, সেলজুজি, তুর্কি বা খুরাসানি আমলে খলিফাদের ক্ষমতা ছিল নামমাত্র, কিন্তু খলিফার বিলাসবহুল প্রাসাদে ব্যয় সীমিত ছিল না। এর ফলে সংগীতের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা করতে খলিফাদেরক অর্থের অভাব হত না।

মিশরের ইখশিদীদ বংশ : মিশরের ইখশিদীদ বংশ রাজত্ব করে প্রায় ত্রিশ বছর (৯৩৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ফাতিমী বংশীদের নেতৃত্বে মুসলিমদের এক দল উত্তর আফ্রিকার ইখশিদীদেরকে পরাজিত করে তিউনিসিয়া দখল করেন। তিউনিসে মুসলিম রাজধানী ছিল মাহদীয়ায়।

মাহদীয়া থেকে ফাতিমীয়গণ রাজধানী সরিয়ে নেয় মিশরের আল কাহিরাহ বা বর্তমান কায়রোতে। এই শহরটির তৎকালীন নাম ছিল ফুসতাত। মিশরের ফাতিমীয়গণ খলিফা উপাধি ধারন করেন এবং অনুসারীদের আনুগত্য প্রাপ্ত হন।

মিশরে ফাতিমিহ্ খেলাফত : উত্তর আফ্রিকায় হযরত আলী বংশীয়দের প্রভাব আরব মুলক থেকে কিছুটা বেশী ছিল। যেমন আছে বর্তমান ইরানে। হযরত আলী বংশীয়গণ উমাইয়্যা এবং আব্বাসিয়াদের রোষের লক্ষ্য বস্তু ছিলেন। সকল মুসলিমেরই হযরত আলী (রাঃ) এর স্ত্রী এবং রাসুলের কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর বংশধরদের প্রতি স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল গভীরতর। এ জন্য সকল ক্ষমতাধরই তাদেরকে শত্রুতা এবং হিংসার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। হযরত আলীর খেলাফত ছিল মাত্র ৫ বছর।

শত্রুতা এবং প্রতিহিংসার কারনে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বংশধরগণ ক্ষমতায় না থাকতে পারলেও সাধারন মুসলিমদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রাণডালা ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

অষ্টাদশ আব্বাসিয়া খলিফা আল মুকতাদির বিল্লাহ (৯০৭-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এর রাজত্বকালে আফ্রিকায় ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে উবাইদুল্লাহ আল মাহদি ফাতেমী রাজত্ব শুরু করেন। তারপর ফাতেমী বংশীয় খলিফা ছিলেন আল কায়িমু আমরুল্লাহ (৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) এবং মানসুর বিল্লাহ(৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

মিশরে ফাতিমীয় খলিফা আল মুইজ (৯৫২-৬৫খ্রীষ্টাব্দ) : আব্বাসিয়া খলিফা মুতিঈ বিল্লাহর খেলাফত কালে মিশরে ফাতিমীয় বংশের চতুর্থ খলিফা ছিলেন আল মুইজ (৯৫৩-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)। আল মুইজ ছিলেন একজন সুযোগ্য

www.amarboi.org

খলিফা এবং উচ্চ শিক্ষিত। দর্শন ও বিজ্ঞানে তার বেশ পান্ডিত্য ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি করতেন। খলিফার পুত্র তামিম ছিলেন একজন কবি ও সংগীতজ্ঞ। পিতা পুত্র উভয়েরই সংগীতের প্রতি আগ্রহ ও দুর্বলতা ছিল। তারা সংগীত চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪)[১৭৬]।

তার রাজত্বকালে ফাতেমীয় রাজ্যের বিস্তার ঘটে সিরিয়া ও হিজাজে। তিনি সিসিলি দ্বীপ জয় করেন। কারামতিয়াদেরকে পর্যুদস্ত করেন।

আল হাকাম-২ (৯৬১-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) : আব্বাসিয় খলিফা মুতঈ বিল্লাহর সমসাময়িক (৯৪৬-৭৪ খ্রী.) আন্দালুসিয়ার খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের পর সিংহাসনে আরোহন করেন ২য় আল হাকাম (৯৬১-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় আল হাকাম ছিলেন অতি উচ্চ স্তরের শিক্ষানুরাগী এবং জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক।

গ্রন্থের প্রতি ছিল তার চুম্বকের মত আকর্ষণ। তিনি গ্রন্থদূত প্রেরণ করেন বাগদাদ, কায়রো, ও দামেস্ক, এবং অন্যান্য নগরসমূহে।

তার গ্রন্থদূতেরা দেশ বিদেশ থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করে ছয় লক্ষ পুস্তকের বিরাট গ্রন্থশালা গড়ে তুলেছিলেন। (কাসিরী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা–৩৮)[১৭৭]।

২য় আল হাকাম সংগীতের 'মহাভারত' কিতাবুল আগানীর গ্রন্থকার আবুল ফারাজ ইস্পাহনীর নিকট উপহার পাঠিয়েছিলেন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। (আল মাক্কারী ঃ Mohammedan Dynastics, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯)[১৭৮]।

বুওয়াইডিস সেনাপতি মুইজদৌল্লাহ খেলাফতের মসনদে আসীন করেন খলিফা মুক্তাদির পুত্র মুতিঈ বিল্লাহকে (৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)। খলিফা ৭ বছর থাকার পর খলিফা মুতিঈ বিল্লাহ পক্ষাঘাত গ্রস্থ রোগে আক্রান্ত হয়ে তার পুত্র আবূ বকর আব্দুল করিমের পক্ষে খেলাফত ত্যাগ করেন।

ইখওয়ান আল সাফা (পবিত্র ভ্রাত্রি সংঘ) : ইখওয়ান শব্দের অর্থ একাধিক ভ্রাতা। সাফা অর্থ পরিস্কার এবং পবিত্র। ইখওয়ান আল সাফা ছিল দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের (৯৬১ খ্রী.) বসরা কেন্দ্রিক কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী গুণীদের একটি গোষ্ঠী বা দল। এ দলের নেতা ছিলেন যায়েদ ইবন রিফাহ্।

তৎকালে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগীত এর সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে। সংগীতের স্বর, গ্রাম, সুর, তাল, লয়, ইত্যাদির মধ্যে হিসাব আছে। হিসাবে ভুল হলে সংগীতের আবেদনই নষ্ট হয়ে যায়।

ইখওয়ানুস সাফা এর পবিত্র ভ্রাতৃবৃন্দ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে

www.amarboi.org

বসরার আমীর ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় আকর্ষিত হয়েছিলেন। বিশ্বাস, ঈমান, আকীদা, আখলাক, স্বভাব, চরিত্রে ও মানবীয় গুণে তারা ছিলো বহু গুণ সম্পন্ন। তাদের চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য লোকজন তাদের গোষ্ঠির সঙ্গে সাফা বা পবিত্র শব্দটি যোগ করে দিয়েছিলেন।

ইখওয়ান আর সাফার পঞ্চ রত্ন ছিলেন– ১. আবু সুলাইমান মুহাম্মাদ ইবন মুশীর আল বায়ুস্তি ২. আবুল হাসান আলী ইবনে হারুন আল জানজানী। ৩. আবু আহমাদ আল মিহরাজজানী ৪. আল আওকী ৫. জায়েদ ইবনে রিফাহ।

এই পাচ জনের দুইজন ছিলো ইরানী, একজন প্যালেষ্টানিয়ান, দুইজন আরব। এরা বসরা কেন্দ্রিক হলেও মূলত বসরার অধিবাসী ছিলেন না। তারা বসরায় এসে গোষ্ঠি বা জোটভুক্ত হয়েছিলেন।

২৪তম আব্বাসিয়া খলিফা আবদুল কারীম আত-তাঈ বিল্লাহ (৯৭৪-৯১ খ্রী.)

মুইজদ্দৌলার (৩৫৬ হিজরী) পুত্র বখতিয়ার ইজ্জদ্দৌলার অভিভাবকত্বে যুবরাজ আবূ বকর আব্দুল করীম আত তাঈ বিল্লাহ খলিফা মনোনিত হন। সুদীর্ঘ ১৭ বছর খেলাফতের অধিষ্ঠিত থাকার পর ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে অভিভাবক এবং তুর্কী আমীর আবূ নজর বাহাদ্দৌলা কর্তৃক খলিফা তাঈ বিল্লাহ অপসারিত হন।

বিজ্ঞানী আবূ আবদাল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল খাওয়ারিজম। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ ছিলেন **খাওয়ারিজমের** অধিবাসী। তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো মাকাতিহ আল উলুম (বিজ্ঞানের চাবিকাঠি)। চাবি বলতে তিনি বিশ্বকোষকে বুঝিয়েছিলেন। এই বিশ্ব কোষটি প্রণয়ন করা হয়েছিল ৯৭৬ এবং ৯৯১ এর মধ্যে।

উদ্দেশ্য ছিল সাসানীয় সুলতান ২য় নুহের (৯৭৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) উজির আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ আল উতবিকে উপহার দেওয়া। এই বিশ্বকোষটি প্রথমত দুই খন্ডে (মাকালাতে) বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি ছিল দেশীয় বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় খন্ডটি ছিল বিদেশী বিজ্ঞান সম্পর্কে।

এই খন্ডগুলো বিভিন্ন আবওয়াবে (অর্থ দরজাসমূহে) বিভক্ত। এই বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খন্ডের সপ্তম অধ্যায়টি ছিল মিউসিকি বা সংগীত সম্পর্কে।

এই সংগীত গ্রন্থটি ছিল সংগীতের একটি অভিধান। এর মধ্যে শব্দের অর্থ ছাড়া সংগীত সংক্রান্ত শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং উচচারণের শাব্দিক বর্ণনা করা হয়েছে। (Van Vloten, Liber Maatih al Ulum (Leiden, 1895);

www.amarboi.org

R. A. Nicholson, Literary History of Arabs, page 370)[১৭৯-১৮০]।

আবুল ওয়াফা আল-বুজজানি (খ্রীস্টাব্দ ঃ ৯৪০-৯৮) : আবুল ওয়াফা আল-বুজজানি ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব অংক শাস্ত্রবিদ। জন্ম তার খুরাসানে। জ্ঞান চর্চা করতেন বাগদাদে। Spherical Trigonometry এবং অংক শাস্ত্রের অন্যান্য দিকে তার মৌলিক অবদান আছে। তার বহু গ্রন্থের অস্তিত্ব বহু কাল ছিল।

কিন্তু, ইউক্লিড এর ওপর তার তাফসীর গ্রন্থ এবং সংগীতের ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ 'মুখতাছার ফি ফান আল ইকা' পুস্তকটির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু উল্লেখ আছে আল আকদানী (মৃত্যু ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত ইরশাদ ইলাল আল কাছীদ গ্রন্থে। সংগীত সংক্রান্ত বিষয়ে আল ফারাবীহ, ইবন সিনা, সাদী আল-দিন, আব্দ আল মুমিন এবং সাবিদ ইবনে কুররার তথ্য আছে (Biblio-theka Indica, 1849, পৃষ্ঠা ৯৩)[১৮১] ফিহরিসত গ্রন্থে আবুল ওয়াফা আল বুজ্‌জানি এর উল্লেখ আছে।

ইজ্জা আল দাওলা (৯৬৭-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) : বুওয়াইহিদ সুলতান ইজ্জা আল দাওলা (৯৬৭-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে একটি ধারণা ছিল যে তিনি সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক এবং সভার বিদুসকদের পেছনে অধিক অর্থ ব্যয় করতেন। (Amedroz and Margoliouth, The Eclipse of the Abbaside Calliphate, Volume 2, page 234)[১৮২]।

বুওইয়াহিডস সুলতান অদুদ আদ দাওলা (৯৭৭-৮২ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। (Amedroz and Margolioth, The Eclipse of the Abbaside Calliphate, Volume 3, page 41, 64)[১৮৩]।

সুলতান অদুদ আদ দাওলাহ একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন যা "আদুদি হাসপাতাল" নামে খ্যাত ছিল। এই হাসপাতালটি তিনশত বছর পর্যন্ত উত্তম মানে চলেছিল।

খলিফা আল আজিজ (৯৭৫-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) : মিশরের ফাতিমীয় খলিফা আল মুইজের পরে খলিফা হন আল আজিজ। তার সময়ে সিরিয়া বিজয় সমাপ্ত হয় এবং ইরাকের অংশ বিশেষ ফাতেমীয় খলিফাদের আয়ত্বাধীনে আসে। অর্থাৎ ফোরাত নদী থেকে আরম্ভ করে আটলান্টিক পর্যন্ত ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফার দরবারে ঝাঁকজমক ও গৌরবের খ্যাতি কোন কোন ক্ষেত্রে আব্বাসিয়াদের সৌরভও অতিক্রম করে। খলিফা আল আজীজ আল আজহার কলেজটি সম্প্রসারিত করেন। (Stanley Lane Pool, A History)[১৮৪]

www.amarboi.org

খলিফা আল আজিজ সংগীত চর্চার পৃষ্ঠোপোষকতা করেন।

হিশাম-২ (৯৭৬-১০০৯ খ্রীষ্টাব্দ) : কর্দোভার উমাইয়্যা খলিফা হিশাম-২ এর মন্ত্রী আবুল মানসুর ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য ও সাহসী। তিনি আক্রমনকারী খ্রীষ্টানদের অভিযান স্তব্ধ করেছিলেন। কিন্তু গোঁড়া ধর্ম তত্ত্ববিদদের সঙ্গে বিতর্কে ও ফতোয়ায় এঁটে উঠেন নি। ঐ সময় জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন এবং বিজ্ঞানের বহু পুস্তক গোঁড়াপন্থীরা নষ্ট করে দেয়।

মন্ত্রী আবুল মানসুরের (১০০২ খ্রীষ্টাব্দে) মৃত্যুর পর দুর্বল খলিফা হিশাম পাভ ও বার্বার সেনা প্রধানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সেনা প্রধানগণ ত্রিশ বছরের কম সময়ের মধ্যে নয় জন খলিফাকে কর্দোভার মসনদে স্থাপন করেন। কাওকে একাধিক বার।

২৫তম আব্বাসিয়া খলিফা আবুল আব্বাস আহমাদ আল কাদীর বিল্লাহ (৯৯১-১০৩১ খ্রী.)

খলিফা তাঈ বিল্লার অপসারণের পর তার ভ্রাতা আবুল আব্বাস আহমাদকে "আল কাদির বিল্লাহ" উপাধি দিয়ে খলিফার আসনে বসানো হয় (৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ)। ব্যক্তি হিসাবে কাদির বিল্লাহ একজন উচচ মানের খলিফা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং মু'তাঝিলা বিরোধী। তিনি খেলাফতের প্রতি জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

খলিফা কাদির বিল্লাহ ৮৭ বছর বয়সে ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সংগীত চর্চা, ইত্যাদি বিষয়ে তার খেলাফত ছিল অতি উজ্জ্বল।

ফিহরিস্ত রচয়িতা ওয়াররাক আল বাগদাদী (মৃ. ৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) : আবুল ফারাজ মোহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে আবি ইয়াকুব আল নাদিম আল ওয়াররাক বাগদাদী ছিলেন "ফিহরিসত" নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি রচয়ীতা। বইটির পূর্ণ নাম "কিতাব আল ফিহরিসত মিত আনমের কুনজেন্ট হিরাউজ"। বইটি দুই ভলিয়মে ১৮৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর লিপসিক(Leipsic) থেকে প্রকাশিত হয়।

ওয়াররাক ছিলেন একজন লেখক, পুস্তক বিক্রেতা এবং পুস্তক নকলকারী (ওয়াররাক)। তার মৃত্যু হয় বাগদাদে (মৃত্যু ৯৯৬ খ্রীস্টাব্দে)। তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইসহাক মাউসুলীর আত্মীয়।

www.amarboi.org

ফিহ্‌রিসত : ফিহ্‌রিস্‌ত বইটি সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয় এই গ্রন্থটি হলো আরব এবং অন্যান্য সকল জাতির রচিত সকল গ্রন্থের তালিকা। এই গ্রন্থগুলি একটি বিষয়ে নয় বরং জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে। এতে আছে লেখকদের সম্পর্কে তথ্য, তাদের বংশ কাহিনী, জন্ম তারিখ, জীবন কাহিনী, মৃত্যু তারিখ, বাসস্থান, কোন বিষয়ের বইটি, দোষ, গুণ এবং আলোচিত বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মন্তব্য।

বইটির রচনা শেষ হয় ৩৭৭ হিজরীতে (৯২৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। বইটিতে আছে ১০টি মাকালাত বা Chapter। বহু হুনুন বা Section.

এই বই-এর তিনটি Chapter এ নিবন্ধিত হয়েছে সংগীত এবং সংগীতজ্ঞদের ইতিহাস। এই সংগীতজ্ঞগণ শুধু আরবের নয়, গ্রীক সাম্রাজ্যেরও।

এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় Section এ স্থান পেয়েছে সংগীত তথ্যবিদদের রচিত পুস্তকের বিষয় বস্তু। (আল-ওয়ার্‌রাক, কিতাব আল-ফিহরিসত, পৃষ্ঠা-১৪০-৫৬)[১৮৫] অন্যান্য বিষয়ের সংগে সপ্তম Chapter এর প্রথম Section এ আছে সংগীতজ্ঞদের পরিচয় কাহিনী, তাদের পুস্তকের তালিকা, অনুবাদের বর্ণনা, বিষয়বস্তু মন্তব্য ইত্যাদি। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮-৬২পর্যন্ত)[১৮৬] এই গ্রন্থের সপ্তম Chapter এর দ্বিতীয় Section এ সংগীত তথ্যবিদদের তথ্য স্থান পেয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫)[১৮৭]।

ফিহ্‌রিস্‌তে উল্লেখিত সংগীতের ওপর লিখিত শত শত পুস্তকের মধ্যে বর্তমানে এক ডজন পুস্তকেরও অস্তিত্ব নাই। (Henry George Farmer: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২১৬)[১৮৮]।

ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)

আবু আলী আল হুসাইন ইবন আবদাল্লাহ ইবনে সিনা বুখারা সুন্নিকটে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইবনে সিনার শিক্ষা শুরু ও সমাপ্ত হয় বুখারাতে। সতের বছর বয়সে তিনি সামানীয় নুহ-২ (৯৭৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) এর চিকিৎসক নিযুক্ত হন বুখারাতে। এই সুবাদে তিনি সামানীদ শাসক নুহের গ্রন্থাগারে প্রবেশের সুযোগ পান। তার গ্রন্থাগারে বহু গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক ছিল।

www.amarboi.org

আঠার বছর বয়সেই ইবন সিনা সর্ববিদ্যাবিশারদ হিসাবে খ্যাত হন। বাইশ বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু ঘটে। এটা ছিল এই যুবক বৈজ্ঞানিকের পক্ষে জ্ঞানের সন্ধানে ঘর ছাড়ার একটি সুযোগ।

পরবর্তীতে তিনি আল রাই নামক ঐতিহাসিক স্থানে বসবাসের ইচছা ব্যক্ত করেন। ঐ স্থানের আমীর ছিলেন মাজ আদ-দৌলা।

ইবনে সিনা পরে হামাদানের শাসক শামসুদ্দৌলা এর (৯৯৯-১০২১ খ্রীষ্টাব্দ) অধীনে চাকুরী নেন। শামসুদ্দৌলা তার জ্ঞানবত্তার পরিচয় পেয়ে তাকে উজির হিসাবে নিয়োগ করেন।

ঐ সময় ইবনে সিনা বহু সংখ্যক গ্রন্থ লিখে ফেলেন। তখন ছিল তার গুণগ্রাহী অসংখ্য শিক্ষার্থী। তা সত্ত্বেও তিনি গায়ক ও যন্ত্র সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে রজনী যাপনের সময় পেতেন।

হামাদান : সুলতান শামস দাওলা (৯৯৭-১০২১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীত তত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিকদের পৃষ্ঠপোষক। **ইবনে সিনা** গবেষণা করতেন তারই পৃষ্টপোষকতায়। তিনি ছিলেন হামাদানের শাসক। হামাদানের সুলতানগণ কিছু সময়ের জন্যে বাগদাদ নগরীও তাদের কর্তৃত্বে আনেন। তারা দেশীয় শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

সংগীত, গবেষক ও সাহিত্যিক ফারাবী এবং সংগীতের ইতিহাসবিদ **"আবু আল ফারাজ আল ইস্পাহানী"** এবং আল মাসুদী তাদের থেকে পূর্ণ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন।

যখন সামাউদ্দৌলাহ (১০২১ খ্রীষ্টাব্দ) বুখারার আমীর নিযুক্ত হোন, ইবনে সিনা স্বীয় দায়িত্বে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। ফলে তিনি ইস্পাহানে পালিয়ে যান এবং আলাউদ্দৌলার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সেখানে জীবনের শেষ যুগ কাটান। (Ibn Khallikan: Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪০)[১৮৯]

এখানে ইবন সিনা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংগীতের ওপর পুস্তক লিখেন। ইবন আল কিফতী লিখেছেন যে, এই পুস্তকে সংগীতের ওপর প্রাচীন গ্রীকদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ওপরেও তিনি ইঙ্গিত করেন। (Mechaelis Casiri, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭১)[১৯০]।

ইবনে সীনা রচিত "কানুন ফিত-তীব" ঔষধের নীতিকথা তৎকালীন বিশ্বের চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হত। বিজ্ঞান ও দর্শনেও তার প্রভূত অবদান ছিল।

ইবনে সিনার তিনটি গ্রন্থে সংগীতের ওপর বিস্তারিত আলোচনা আছে।

www.amarboi.org

সংগীতের ওপর তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ্ হলো শিফা। এই পুস্তকটি প্রথম তেহরানে মুদ্রিত হয় ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ। তার "নাজাত" শীর্ষক গ্রন্থেও সংগীত বিজ্ঞান সংক্রান্ত "ইলম আল মিওসুকি" নামক একটি অধ্যায় আছে। এটিই লিখেছেন তিনি অঙ্ক বিজ্ঞানের (উলুম রিয়াদীয়া) অধ্যায়ের শেষে।

"ইবনে সিনা" কোন্ স্বরগ্রাম বা সুর- দিবসের কোন্ সময়ে প্রকৃষ্ঠ, তা উল্লেখ করেছেন। তার মতে সুবে কাজিব এর সময় রাহাবী মোড বা সুর এবং সুবেহ সাদিকের সময় হুসাইন সুর, সূর্য উদয়ের সময় রাস্ত সুর এবং পূর্বাহ্নে দুহা বা যোহরের সময় বুসালিক সুর, মধ্য দিবসের (নিসফ নাহার) সময় জানকুলা সুর, যোহরের সময় উশশাক সুর এবং তারপর পরে হিজাজ সুর ইত্যাদি সময়োপযোগী।

আসরের সময় ইরাক সুর, সমাপ্তি বা গুরুত্বের সময় ইস্পাহান সুর, মাগরিবের সময় নাওয়া সুর, এশার সময় বুজুক সুর এবং নিদ্রার সময় মুখালিফ বা জিরাফ কান্ড সুর যথাযথ প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন। (British Museun Manuscript Folio- ২৩৬১, ফলিও ২০০১, ২৩৬১)[১৯১]।

ইবনে আবী উশাইবী লিখেছেন যে, ইবনে সিনা সংগীত কলার ভূমিকা "মাধ্খাল ইলা সিনাত আল মিউসুকি" শীর্ষক একটি গ্রন্থ্ রচনা করেছেন।

এটি "নাজাত" গ্রন্থ্ থেকে ভিন্ন। ইবনে সিনার "রিসালা ফি তাকাসিম আল হিকমাহ" এবং অনুরূপ গ্রন্থ্সমূহে সংগীতের ওপর রচনা আছে। Direction of Science (বিজ্ঞানের বিভাগ সংক্রান্ত পুস্তক)। ইবনে সিনা সুবিখ্যাত হয়ে আছেন আল শায়খ আল রাইছ শিক্ষকগণের প্রধান খ্যাতিতে। আরব এবং ফার্সি সংগীত তথ্য শাস্ত্রে তার গভীর প্রভাবের বিষয়টি বহু শতাব্দি থেকে খ্যাত হয়ে আছে।

সংগীতজ্ঞ ইবনে আল হাইথাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)

ইবনে আল হাইথামের পূর্ণ নাম হল – আবুল আলী আল হাসান ইবন আল হাসান ইবন আল হাইথাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। আরব সভ্যতায় অঙ্কশাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যায় যে অবদান ছিল- তার উজ্জলতম নক্ষত্র ছিল ইবনে আল হাইথাম। ইবন আল হাইথামের জম্ম বসরায়।

এ অঞ্চলে ইবন আল-হাইথাম উজিরের পদ অলংকৃত করেছিলেন। দিক দিগন্ত ব্যাপী তার খ্যাতি শুনে মিশরী ফাতমী খলিফা আল হাকিম তাকে ফাতমী রাজদরবারে আহবান করেন।

সেখানে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় তাকে দেওয়া হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাজ – যে

www.amarboi.org

কাজের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র উপযুক্ত ছিলেন না। এটা ছিল অনেকটা ধারালো ছুরি দিয়ে শাল বৃক্ষ কাটার দায়িত্বের অনুরূপ। এ কাজে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

অনুরূপ দায়িত্বহীনতার জন্য আল সারাখসিকে, খলিফা আল মুতাসিমের (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) হাতে জীবন হারাতে হয়েছিল।

এ ইতিহাস ইবনে হাইসামের হয়ত জানা ছিল। তাই জীবন রক্ষার জন্য তাকে খলিফা আল হাকিমের মৃত্যু (১০২১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত আত্মগোপান করে থাকতে হয়েছিল। খলিফার মৃত্যুর পর আত্মপ্রকাশ করে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

ইবনে আবী ওয়াইবী তার ২১০টি গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তার যে পুস্তকটি পরবর্তী বংশধরদের নিকট আসতে পারে নি – তাহলো "রিসালা ফি তাতহীরাত আল লুহুন আল মিউসিকি ফীল নিউফ্স আল হাওয়াওয়ানীয়া অর্থ্যাৎ প্রাণীদের আত্মার ওপর সংগীতের স্বরগ্রামের প্রভাব"।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে জীবজন্তুর এর ওপর সংগীতের প্রভাব বা বাদ্যযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা খুব বেশী হয়ত হয়নি। হলেও সেরূপ গ্রন্থ দেখা যায় না। এ প্রেক্ষাপটে ইবনে হাইথাম মানব জীবনে সংগীতের প্রভাব এর ওপর গ্রন্থ রচনা করেন নি– এটা অকল্পনীয়।

এই জ্ঞান যোগী ইবন হাইথাম ইউক্লিডের বিজ্ঞান চর্চার ওপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার পরবর্তী বংশধরগণ শুধুমাত্র গ্রন্থ দুইটির নাম সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু গ্রন্থ দুইটি আজ অস্তিত্বহীন।

ইবনে হাইসাম রচিত এই গ্রন্থ দুইটি ছিল "শারহ কানুন ইউক্লিডস"। ইউক্লিডের নিয়ম নীতি মানার ওপর তফসির 'ব্যাখ্যা' বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়টি হলো "শারাহ আল আর মিউসিকি লি ইউক্লিডিস" (ইউক্লিডের নীতি মালার ঐক্যতান)।

সংগীতজ্ঞ আল মাগরিবি (৯৮১-১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ) : আল মাগরিবি নিজেকে পারস্য দেশীয় সংগীত সম্রাট বাহরাম গুলের (৪৩০-৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) বংশধর বলে দাবী করতেন। তিনি ফাতিমীয় খলিফা আল হাকিম এবং বাগদাদে বুয়াইহিদ আমির বাহউদ্দৌলার অধীনে উচচ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরবর্তীতে আল মাগরিবি ছিলেন মাওসুলে উকাইলিদ সুলতানের উজির এবং বুয়াইহিদদের আমলে মুশারিরফ উদ্দৌলার উজির। তিনি ছিলেন "কিতাবুল আগানী" সংগীত গ্রন্থ রচয়িতা। (Ibn Khallikan: Biographical

www.amarboi.org

Dictionary, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০; Hazi Khalifa Kasf, Al Zunun, Leipzic, London, ১৮৩৫-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৭)[১৯২-১৯৩]।

সংগীতজ্ঞ ইবন ইউনুছ (মৃত্যু ১০০৯খ্রীষ্টাব্দ) : আবুল হাসান আলী ইবনে আবি ছায়িদ আব্দুর রহমান ইবনে ইউনুছ ছিলেন ফাতিমী খলিফা আল হাকিম (৯৯৬-১০২১খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে জ্যোর্তিবিদ এবং অঙ্ক শাস্ত্রবিদ। Trigonometry তে তার বিরাট অবদান আছে। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৫)[১৯৪]।

ইবনে ইউনুছ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও গায়ক। সংগীত সংক্রান্ত তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো আল উকুদ ওয়াল সুউদ ফি আওছাফ আল উদ (বিনার স্তুতি ও তার সুবিধাসমূহ)। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০)[১৯৫]।

মাসলাম আল মাদ্রিদি ঃ আবুল কাশিম মাছলামা ইবনে আহমাদ আল মাজরীদি (মৃঃ ১০০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন মাদ্রিদের অধিবাসী। ইংরেজী মাদ্রিদ শব্দটি আরবীতে লেখা হয়, মাজরীদি। তিনি ছিলেন একজন অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ ও বৈজ্ঞানিক। তার রচনাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি খলিফা মামুনের সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মোহাম্মাদ ইবনে মুসা আল খারিজীমি এর জ্যোর্তিবিদ্যা সংক্রান্ত ট্যাবল সংশোধন করেছিলেন। তার রচিত "ইখাওয়ান আল সাফা" এর রাসায়েলে সংগীত সম্পর্কীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে – যা আন্দালুসে চর্চা করা হয়।

বুওয়াইহিডস সুলতান বাহা আল দাওলা (৯৮৯-১০১২ খ্রীষ্টাব্দ) এর সময়েও সংগীত/পৃষ্ঠপোষকতা হারায়নি। সুলতানের উজির ফাখর উল মুলক ছিলেন সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত সংগ্রাহক আল মাগরিবীর পৃষ্ঠপোষক।

বাহা আল দাওলার আমলে তার ওয়াজির সাবুর ইবন আরদাশী "খারক একাডেমী" নামে একটি শিক্ষা ও গবেষণা একাডেমী স্থাপন করেন। এই সংস্থার লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল দশ হাজার চার শত। (Margoliouth : Letters of Abul Ali, Volume-20)[১৯৬]।

সুলতান মুশারিফ আল দাওলা (১০২০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ) উজির নিযুক্ত করেন সংগীত সংগ্রাহক আল মাগরিবিকে। সুলতান মুওয়াইদিদ দাওলা (৯৭৬-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) ইস্পাহানে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। এতে পুস্তক সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। এর মধ্যে সংগীত সংক্রান্ত পুস্তকও ছিল শত শত।

www.amarboi.org

স্পেন এবং এশিয়া খন্ডের খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞবৃন্দ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সিরাজী (মৃত্যু ১০০০): আন্দালুসিয়ার তুলনায় মধ্য এশিয়া ভূখন্ডে সংগীত চর্চা ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক মুনাজ্জীম সিরাজ নগরে ১০০০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন যুগের অন্যতম বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। (মিনহাজ-ই-সিরাজ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা– ১৫৩)[১৯৭।]

সংগীতজ্ঞ কামাল আল জামাল : সংগীতজ্ঞ কবি ও সভাকবি কামাল আল জামাল ছিলেন সেলজুকি বংশের সঙ্গীতের অনুরাগী ও সংগীত পৃষ্ঠপোষক সুলতান মানজার (১১১৭-৫৮খ্রীষ্টাব্দ) এর প্রধান সভাকবি। সংগীতজ্ঞ কামাল আল জামাল এর খ্যাতি ছিল সমগ্র আববাসিয়া সাম্রাজ্যে। সুলতান মানজারকে কিভাবে কামাল আল জামাল তাঁর উদ বীণা বাজিয়ে মন্ত্র মুগ্ধ করে ফেলতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ। (Ibn Khallikan: Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪০১)[১৯৮।]

খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত মুসলিম স্পেন : সর্বশেষ উমাইয়্যা খলিফার পতনের পর মুসলিম স্পেন দেশের সেনাপতি ও ক্ষমতালোভীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন সম্রান্ত পরিবার নিজ নিজ এলাকায় তাদের নিজস্ব বংশের রাজত্ব স্থাপন করেন। এ ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে দমন করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার মত কোন বীর বা মহান শাসকের আবির্ভাব স্পেনে হয়নি। তাই অধিকাংশই তাদের নিজস্ব অঞ্চলে নৃত্য, গীত, ভোগ বিলাস, স্তুতি প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হত। তাদের অহমিকাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংগীত, নাটক, সংগীতজ্ঞ, নাট্যকার, গায়ক ও রস সাহিত্যবিদদের অভাব হয়নি।

আন্দালুসিয়া বা মুসলিম স্পেনের সংগীত ও আন্দালুসিয়ানদের পৃষ্ঠপোষক আঞ্চলিক রাজবংশ গুলোর মধ্যে প্রধান ছিলেন ১. মালাগা প্রদেশে হাম্মুদীদগণ (১০১৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) ২. আল জেসিরা প্রদেশে হামুদিদগণ (১০৩৯-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ), সেভিল প্রদেশে আব্বাদীদগণ (১০২৩-৯১ খ্রীষ্টাব্দ), গ্রানাডায় খায়রীদ বংশ (১০১২-৯০ খ্রীষ্টাব্দ), কর্দোভায় যাহওয়ারিদ বংশ (১০৩১-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ), টলেডু অঞ্চলে দুলনোদিদ বংশ (১০৩৫-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ), ভেলেন্সীয়া প্রদেশে আয়িরীদ বংশ (১০২১-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ), সারাগোষা অঞ্চলে টুজিবিদ পরিবার, হাদীদ অঞ্চলে জুদিদ পরিবার (১০৩৯-১১৪১ খ্রীষ্টাব্দ), দেনিয়া অঞ্চলে মুজাহিদ বংশ (১০১৭-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)। স্পেনের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় আমাত্যগণ নিজস্ব

www.amarboi.org

রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় হয়েছে এবং ছোট ছোট রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা, সংগীত ও নৃত্যের প্রতিযোগীতা কাব্যের সাধনা স্তিমিত হয়নি বরং উৎসাহিত হয়েছিল। (Stanley Lane Poole : The Moors in Spain, P-176)[১৯৯]।

খলিফা আল হাকিম, আন্দালুসিয়া (৯৯৬-১০২১) : খলিফা আল হাকিম অপ্রাপ্ত বয়সে তার স্লাভ উস্তাদ বারজাউন এর নেতৃত্বে মুসলিম স্পেন-এ খলিফার পদে আসীন হোন। মন্ত্রী বারজাউন সংগীতজ্ঞদের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ছিলেন। বলা হয় যে তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক খলিফা অপেক্ষা সংগীতজ্ঞদের দিকে মনোযোগ বেশী দিতেন। (S. Lane Pool, A History of Egypt in the Middle Ages, London, ১৯০১, পৃষ্ঠা- ১২৫)[২০০]।

শীঘ্রই বারজাউন শত্রুদের হাতে নিহত হন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক আল হাকিম বার্জাউনের সংগীতজ্ঞদের অতি উৎসাহে অত্যন্ত বিতৃষ্ণ ছিলেন। তিনি প্রথম দিকে সংগীত চর্চার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। (Ibn Khallikan: Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫১)[২০১] কাল ক্রমে সংগীতের প্রতি তার বিতৃষ্ণা এবং অবজ্ঞা দূর হয়।

ঐতিহাসিক ও সংগীত সংগ্রাহক মুসাব্বীহি খলিফার অনুগ্রহভাজন হন। তিনি বৈজ্ঞানিক ইবন আল হাইসামের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আল হাইসাম শুধু বৈজ্ঞানিক এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংগীত বিশেষজ্ঞ এবং সংগীততত্ত্ববিদ। তবে, খলিফা হাকিম সংগীত চর্চা অপেক্ষা সংগীত তত্ত্বের প্রতি অধিকতর সহনশীল ছিলেন।

খলিফা আল হাকিম মিশর ও সিরিয়ার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, এবং অবজারবেটরি স্থাপন করেন। কায়রোতে দারুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠিত হয় ১০০৫ সালে।

স্পেনীয় খলিফা আল জাহির (১০২০ -৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) : স্পেন খলিফা আল জাহির ছিলেন তার রক্ষণশীল পিতা আল হাকিমের বিপরীত পন্থী। আল-জাহির সংগীত, নৃত্যকলা, মালাহী বা নিষিদ্ধ চিত্তবিনোদনে আগ্রহী ছিলেন। খলিফা আল জাহির সংগীতের অত্যন্ত মজবুত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সংগীত পৃষ্ঠপোষকতায় অকল্পনীয় অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি নারী সংগীতজ্ঞদের প্রতি ছিলেন দয়াপ্রবণ ও মহানহৃদয়। (আল মাক্কারী, Mawaiz wal Itibar ; Al-

www.amarboi.org

Maqqari, আল মাওয়ারিজ ওয়া ইতিবার, পৃষ্ঠা- ৩৫৫)[২০২-৩]।

সংগীত চর্চাকারী এবং নৃত্য কলাবিদদের প্রতি খলিফা আল জাহির এর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল দৃষ্টিকটুভাবে উদার। (S. Lane, Poole: The Moors in Spain, পৃষ্ঠা- ১৩৬)[২০৪]।

কর্দোভা রাজ্য : সেভিল প্রদেশের আবাদিগণ কিছু কালের জন্য কর্দোভার সিংহাসন অলংকিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক আল সাকান্দীক দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করেছেন যে, সেভিলের আবাদীগণ (Settlers) যখন কর্দোভায় তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা সংগীত এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় হামদানীদের থেকেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছিলেন। (আল মাক্কারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬)[২০৫]।

কর্দোভার উমাইয়্যা খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় মুহাম্মদ আল মাহদী (১০০৯-১০১০ খ্রী.) ছিলেন একজন রংগীলা সম্রাট। তার প্রাসাদে ছিল ১০০ জন বীনা বাদকী (ঈদাম) এবং সম সংখ্যক বংশী বাদক(মোজামির) ছিল। (Dozy, Histoire Des Musulmans, Espagne, Third volume, P- 284)[২০৬]।

সেভিল : সেভিল আগে পরে দীর্ঘ সময় ছিল শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত ও বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। (আল মাক্কারী, Mohammedan Dynasties, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৫)[২০৭]।

সারাগোষা : সারাগোষা রাজ্যটিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র, সংগীতের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক আবুল ফজল হাসদাই ছিল এ রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংকশাস্ত্রবিদ এবং সংগীত তত্ত্ববিদ।

মালাগা : স্পেনের মালাগা এবং আল জেসিরাস প্রদেশে ছিল হাম্মুদীদ বংশের রাজত্ব। মালাগা প্রদেশ পর্যটনের পর পর্যটক আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ইয়ামাতী প্রত্যয়ন করেছেন যে, ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালাগা প্রদেশ সফর করেন। তিনি উদ (বীণা), তাম্বুর, মিজমার (বংশী) প্রভৃতি এবং আরও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ বিভিন্ন দিক থেকে শুনতে পেতেন। যাতে মনে হত সব দিকে বসেছে আনন্দ মেলা। (আল মাক্কারীঃ History of Moh. Dynasty in Spain, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪)[২০৮]।

পরিব্রাজক আল শকানদী (মৃত্যু ১২৩১) উল্লেখ করেছেন যে, ওবেলা শহরটি ছিল সংগীত ও নৃত্যের জন্য বিখ্যাত। শহরের নৃত্য বালিকাদের সুনাম স্পেনের বাইরেও প্রচারিত ছিল। (Haqiqat Al Arffrah (Cairo Edition) পৃষ্ঠা- ১২৭, আল মাক্কারী ঃ History of Mohammedan Dynasties in

www.amarboi.org

Spain, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪)[২০৯]।

খলিফা হিশাম-৩/ (১০২৭-৩১ খ্রীষ্টাব্দ) : তৃতীয় হিশাম ছিল কর্দোভা কেন্দ্রিক আন্দালুসিয়ার সর্বশেষ এবং ২৩ তম উমাইয়্যা খলিফা। তারপর কর্দোভা রাজতন্ত্র থেকে সাধারনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

২৬তম আব্বাসিয়া আবদুল্লাহ আবু জাফর আব্বাসিয়া খলিফা আল কাইম বি আমরুল্লাহ (১০৩১-৭৫ খ্রী.)

কাদির বিল্লাহর ইন্তেকালের পর তার পুত্র আবু জাফর আবদুল্লাহ খলিফা মনোনিত হন "আল কাইম বি আমরুল্লাহ" খেতাবে।

খলিফা মুস্তাকফির (১০২৪-২৭ খ্রীষ্টাব্দ) কন্যা ওয়াল্লাদা ছিলেন একজন কবি ও বিখ্যাত সংগীতজ্ঞা।

আবুল হাকাম উমর আল কারমানী (মৃত্যু ১০৬৬) : আবুল হাকাম আল উমর আল কারমানীর জন্ম কর্ডোবায় এবং মৃত্যু সারাগোসাতে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ, চিকিৎসক এবং সংগীতজ্ঞ। তিনি ইখওয়ান আল সাফা রচিত সংগীত সংক্রান্ত রাসাইল পুস্তকসমূহ জনপ্রিয় করনে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। (ইবনে আবী উসাইবিয়া, ইউন আল আনবা ফি তাবাকাত আল আতিব্বা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪০)[২১০]।

আল হুসাইন ইবন জাইলা : আবুল মানসুর আল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন ওমর ইবন জাইলা (মৃত্যু ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) সালে ছিলেন ইবনে সিনার একজন অতি বিশিষ্ট সাগরীদ। (ইবন আবু উসাইবীয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯)[২১১] তার রচিত সংগীত সংক্রান্ত পুস্তকটির নাম "কিতাব আল কাফী ফিল মিউসিকি" সংগীতের পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত পুস্তক।

ইবনে সিনা এবং আল হুসাইন ইবন জায়লা এর আটটি সংগীতের রিদম এবং স্বরগ্রাম অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এটা উল্লেখ করেছেন আল কিনদী এবং আল ফারাবী।

ওকাইলীদ সুলতানগণের আমলে সংগীত সংগ্রাহক মাগরিবী ছিলেন তাদের উজির। ওকাইলিদগণ (৯৬৬-১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন মৌসুল কেন্দ্রিক, হামদানীয়াদিদের রাজ্য দখল করে রাখেন বেশ কিছুকাল।

মিশরীয় খলিফা আল মুস্তানছির(১০৩৬-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) : মিশরীয় খলিফা মুস্তানছির এর রাজত্বকালে পারস্য দেশীয় পর্যটক নাসির খসরু মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি ফাতিমি খলিফাদের জাকজমকপূর্ণ গৌরবগাথা বর্ণনা করেন।

www.amarboi.org

সামরিক সংগীতের প্রশংসা করেন। (Nasir Khasrau, Safar Nama (Paris, 1881), পৃষ্ঠা- ৪৩,৪৬,৪৭)[২১২]

ফাতিমী খলিফাদের মধ্যে আল মুস্তানছির এর সময় রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। ঐতিহাসিক মাকরিজি রাজ কোষাগারের সম্পদের যা বর্ণনা করেছেন, তা হাজার এক রজনীর ঐশ্বর্য্য কাহিনীরই প্রতিফলন। তার সরকারী লাইব্রেরীতে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। (S. Lane Poole: The Moors in Spain, পৃষ্ঠা- ২৪০)[২১৩]।

কোন কোন বর্ণনায় গ্রন্থের সংখ্যা বিশ লক্ষ বলা হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সময় বহু গ্রন্থ ধ্বংস হয়ে যায়। সুলতান সালাহউদ্দিন যখন ১১৭১ সালে মিশর জয় করেন, তখন এই লাইব্রেরীতে এক লক্ষ বিশ হাজার গ্রন্থ ছিল।

খলিফা আল মুস্তানছির ছিলেন পরিপূর্ণভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন সংগীত ও নৃত্য কলার একজন অকল্পনীয় পৃষ্ঠপোষক। তিনি একজন সংগীত বালিকার সংগীত শ্রবণ করে তাকে আরদে তাব্বালা নামে একটি বিরাট এষ্টেট উপহার দেন। (S. Lane, Poole: The Moors in Spain, পৃষ্ঠা-১৩৯; আল মাখরিজি, আল মাওয়াইজ, পৃষ্ঠা-৩৩৮)[২১৪]।

আল মুস্তানছিরের মন্ত্রী আল ইয়াহজুরির বাসভবনে নৃত্য বালিকাদের পেইনটিং শোভা পেত। তার বিলাসীতা ও আমোদ প্রমোদের বহু বাহিনী বিভিন্ন বর্ণনায় স্থান পেয়েছে।

২৭তম আব্বাসিয়া আবুল কাশেম আবদুল্লাহ খলিফা আল মুকতাদি বি আমরুল্লাহ, (১০৭৫-৯৪ খ্রী.)

সংগীতজ্ঞ ইবন নাকীয়া : খলিফা কাইম বি আমরুল্লাহ এর ইন্তেকালের পর তার পৌত্র আবুল কাশিম আব্দুল্লাহ মুকতাদি বি আমরুল্লাহ উপাধি ধারণ করে ১৯ বছর বয়সে খেলাফতের মসনদে আরোহন করেন। তৎকালীন গতানুগতিক শাসনকর্তাদের তুলনায় কম বয়সী মুকতাদি বিল্লাহ ছিলেন যোগ্যতর শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ণ ও দৃঢ় চেতা। তবে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে শাসন করার কোন ক্ষমতাই খলিফার ছিল না।

বাগদাদের একজন কবি এবং বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আবুল কাশিম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ খ্যাত ছিলেন ইবনে নাকিয়া নামে (১০২০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ)। তার প্রিয় সংগীত যন্ত্র ছিল মিজহার (উন্নত স্তরের বাশী)।

www.amarboi.org

ইবন নাকীয়ার অবদান ছিল একুশ খন্ডে রচিত আবুল ফারাজী আল ইস্পাহানীর রচিত "কিতাব আল আগানী"র একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করা। (হাজী খলিফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭)[২১৫]।

আন্দালুসিয়ায় একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির অবক্ষয়ের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। খ্রিষ্টানগণ আন্দালুসিয়ার বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করা শুরু করে। ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রিষ্টানগণ টলোডা দখল করে নেয়।

আন্দালুসিয়ার মুসলিমগণ তখন উত্তর আফ্রিকার মুরাবিদ শাসকদের নিকট সাহয্যের আবেদন চেয়ে পাঠান। জিব্রালটার অতিক্রম করে আফ্রিকার মুরাবিদ নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আন্দালুসিয়ায় প্রবেশ করেন। বিভিন্ন স্থানে মুরাবিদ বাহিনী প্রতিহত হয়। সর্বশেষ বাচাজোস নামক স্থানের নিকটে জাল্লাকা নামক স্থানে খ্রিষ্টান বাহিনী মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়।

মুরাবিদগণ খ্রীষ্টান বাহিনী তাড়িয়ে দেওয়ার পর আন্দালুসিয়া ত্যাগ করে আসে নি। বরং টলেডো কেন্দ্রীক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোও উত্তর আফ্রিকার মরক্কো সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে।

মরক্কোর শাসক এবং সেনাবাহিনী আন্দালুসিয়াদের ন্যায় উদার মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন না। তাদের ওপর আলেম, উলামা ও ফকিহদের প্রভাব ছিল প্রচন্ড। কবি ও সংগীতজ্ঞদেরকে তারা ক্ষতিকর বলে মনে করত।

মরক্কোর মুরাবিদ ফকিহগণ এত বেশী রক্ষণশীল ছিলেন যে, ইমাম আবূ হামেদ আল গাজ্জালীর ইহইয়াহ আল উলুম আলদীন গ্রন্থটিও তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে এটাই চিত্র নয়।

স্পেনে তখন দার্শনিক চিন্তাবিদ হিসাবে খ্যাত ছিলেন ইবনে বাজ্জাহ। তিনি পাশ্চাত্য জগতে 'আবেনপেইস' নামে খ্যাত। ইবনে বাজ্জাহ ছিলেন একজন সংগীত প্রেমিক এবং সংগীত তত্ত্ববিদ। তার ওপর কোন হামলা আসেনি।

মুরাবিদ শাসকগণ সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও তারা সংগীত চর্চাকারীদের শাস্তি দেন নি অথবা পেশাগত সংগীত বালিকাদের পেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নি।

সারাগোসা রাজ্যের মুরাবিদা মীর ইবন তিফালাবিত সংগীত চর্চার প্রতি সহনশীল ছিলেন। (ইবনে খালদুন Prolegomemus, Historicus, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৬-২৭)[২১৬]।

সংগীতজ্ঞ আবদুল ওয়াহাব আল হুসাইন ইবন জাফর আল হাজীব :

www.amarboi.org

আব্দুল ওয়াহাব আল হুসাইন ছিলেন আন্দালুশিয়ায় সংগীতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। দি হিস্ট্রী অফ দি মহামেডান ডাইনেষ্টিজ ইন স্পেন এর লেখক আল মাক্কারীর মূল্যায়ণে মধুর সংগীত 'গিনার' ক্ষেত্রে আবদুল ওয়াহাব ছিলেন অনুপম। তিনি ছিলেন জ্ঞান বিতরণে আনন্দঘন। যার কাব্য ছিল উত্তম মানের। প্রকাশ ভঙ্গি ছিল অনবদ্য। বীণা সঙ্গত কারণে তিনি ছিলেন মানব জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়।

সংগীতের বিভিন্ন তরীকায় (তারা এবং নুহুল ছন্দে) আবদুল ওয়াহহাব ছিলেন অদ্বিতীয়)। এরূপ উচছ্বসিত প্রশংসা বাক্যের মাধ্যমে তার সংগীত জ্ঞান সাধনা এবং চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

তার খ্যাতি এমন ছিল যে, প্রাচ্য থেকে যারা আন্দালুসিয়ায় আসতেন, তাদের তীর্থ স্থান ছিল আবদুল ওয়াহাব ভবন। তার বংশধরগণের মধ্যে ছিল প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৫১৭)[২১৭]।

সংগীতজ্ঞ আবুল হাসান ইবনে হাসান ইবনে ইবনে আল হাসীব : আবুল হাসান ইবনে হাযীব ছিলেন আন্দালুসিয়ায় সংগীতজ্ঞদের মধ্যে অনন্য। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭)[২১৮]।

সংগীতজ্ঞ ইয়াহ ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ আল বাহ্জাবী : ইয়াহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ, সংগীত রচয়িতা এবং পেশাগত ভাবে চিকিৎসক। তার বৈশিষ্ট্য ছিল জাজল ছন্দের সংগীত রচনা। (Ribera La Musica de Las Cantigas, Page-72)[২১৯]।

সংগীতজ্ঞ আবুল হুসাইন ইবনে আল হামারা : আবুল হুসাইন ইবনে আল হামারা ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ। তিনি ছন্দ, পদ্য, সংগীত রচনায় ছিলেন গ্রানাডায় সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ বীণা (উদ) বাদক। তিনি একটি বিশেষ ধরনের বিণা আবিষ্কারক ছিলেন। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৫১৭)[২২০]।

সংগীতজ্ঞ আল মামুন টলেডো : টলোডোতে কর্দোভা সাম্রাজ্য বিভক্তির পর টলেডো প্রদেশের রাজত্ব আসে জলনুনিদ বংশের হাতে। এ রাজ্যের আমীর ইয়াহ্ইয়াহ আল মামুন (মৃত্যু ১০৭৪) সর্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। অঙ্ক শাস্ত্রের ওপর তার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। এখানে ল্যাটিন ভাষায় আরও অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক অনুদিত হয়ে ইরাকের বিভিন্ন নগরীতে প্রেরিত হত। (Haskins, Studies in Mediaeval Science, Page 12-13)[২২১]।

সংগীতজ্ঞ আবুল হুসেন ইবনে আবি জাফর আল ওয়াকসী : টলেডোতে আর্বিভাব ঘটে আন্দালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ আবুল হুসাইন ইবন আবী জাফর

www.amarboi.org

আল ওয়াকসী এর। শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে টলেডোর এত সমৃদ্ধি ঘটেছিল যে, কোন বস্তুর মান নির্ধারনের জন্য উপমা হত জুলননিদদের মত। (Dozy, History, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫)[২২২]।

আবুল হুসেন আল ওয়াকসীর পিতা ছিলেন টলেডো রাজ্যের একজন উজির। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে– প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আল্লাহর অলৌকিক এক ব্যক্তি। সংগীতে তার রুচি ছিল উচচ স্তরের। তার সংগীত ছিল উচচাংঙ্গের । তার কণ্ঠস্বর ছিল এমন মধুর যা মদ্যপায়ীর নিকট মদ্য থেকেও তা ছিল আকর্ষণীয়। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫১৫)[২২৩]।

কর্দোভা : আল মুতামিদ(১০৬৮-৯১ খ্রীষ্টাব্দ) কর্দোভার সর্বশেষ আবাদী শাসক। তিনি তার সময়ে কর্দোভাকে করেছিলেন– কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞান চর্চাকারীদের কেন্দ্র স্থল। (আল মাক্কারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০১)[২২৪]।

সংগীতজ্ঞ ইসহাক ইবনে শিমান : ইসহাক ইবনে শিমান ছিলেন জ্ঞান যোগী ইবনে বাজ্জার বন্ধু, সংগীত রচয়িতা ও গায়ক। তিনি ছিলেন কর্দোভার একজন ইয়াহুদী। (Ribera La Musica de Las Cantigas, Page-72)[২২৫]।

সুলতান আল মুতামিদ নিজেই ছিলেন একজন গায়ক এবং উত্তম মানের বীণা বাদক। সুলতান মুতামিদের পুত্র ওবায়দুল্লাহ রশীদও ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনা, সংগীতজ্ঞ, কবি ও সাহিত্যিক। তার প্রিয় সংগীত যন্ত্র ছিল উদ (বীণা), মিজহার (বাঁশী)। (Dozy, (১৮৪২-৫২) ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৪, ৮২২)[২২৬]।

সংগীতে মুহাম্মদ সুলতান এর সীমাহীন পৃষ্ঠপোষকতায় গণবিদ্রোহের উপক্রম হয়েছিল। (আল মাক্কারীঃ Mohamedan Dynasties, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪)[২২৭]।

আবুল ফজল হাসদাই : আবুল ফজল হাসদাই ইবনে ইউসুফ ছিলেন আন্দালুসিয়ার সারাগোসা প্রদেশের অধিবাসী। ধর্মগত ভাবে তিনি ছিলেন একজন ইয়াহুদী।

তার জন্ম মৃত্যুর সাল জানা যায় না। তবে ১০৬৬ সালে তিনি ছিলেন একজন যুবক। শিক্ষা দীক্ষায় তিনি ছিলেন অঙ্ক শাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ্যাবিদ, কবি, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ। তবে সংগীত বিদ্যায় ছিল তার বিশেষ দক্ষতা। (ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০)[২২৮]।

www.amarboi.org

২৮তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুসতাজহীর বিল্লাহ, আবুল আহমাদ (১০৯৪- ১১১৮ খ্রী.)

আব্বাসিয় খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ এর ইন্তেকালের পর তার ১৬ বছর বয়সী পুত্র আবুল আব্বাস আহমাদকে মুসতাজহীর বিল্লাহ উপাধি দিয়ে আব্বাসিয়া খেলাফতের মসনদে উত্থাপন করা হয়। তিনি তার পূবসূরীদের ন্যায়ই নাম মাত্র খলিফা হিসেবে খেলাফত ধরে রাখেন।

তার খেলাফতকালেই পুরাধমে ক্রুসেডের যুদ্ধ ১০৯৭ সনে শুরু হয়। ২৫ বছর ব্যাপী খলিফা পদে থাকার পর খলিফা মুসতাজহীর ইন্তেকাল করেন।

মিশরের নবম ফাতিমীয়া খলিফা আল মুস্তালি সংগীত চর্চা ও বিভিন্ন প্রকার আমোদ প্রমোদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

বুওয়াইহিডসের পরে আব্বাসিয়া খলিফাদের উপরে সেলজুকি (১০৫৫-১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তারে পরে খাওরিজমশাহীদের (১১৮৪-১২৩১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বুওয়াইহিডস এর ন্যায় সেলজুকি এবং খাওরিজিমীগণও ছিলেন ইরানিয়ান।

আবূ হামীদ আল গাজ্জালী (রাঃ) সংগীতের প্রতি আবু হামিদ আল গাজ্জালীর (মৃত্যু-১১১১ খ্রীষ্টাব্দ) সহানুভূতি রক্ষণশীলদের চিন্তাধারাকে সহনশীল করেছিল। সুফী দরবেশদের মধ্যে সংগীত হাসানাতের আঙ্গিকে অনুপ্রবেশ করে।

যে যে এলাকায় হাম্বলীর মাজহাবের প্রভাব বেশী ছিল, যেমন ইরাকে, সেখানে সংগীতের পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা খুবই সক্রিয় এবং গতিশীল ছিল। সংগীত বিরোধীগণ কণ্ঠসংগীতের প্রতি কিছুটা সহনশীল হলেও তাদের মধ্যে যন্ত্র সংগীতের বিরোধীতা ছিল অধিকতর প্রবল।

ইরাকে হাম্বলীদের প্রভাব বাড়ার সাথে সাথেই সংগীতের পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা গভীরতর হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্বের (পক্ষে ও বিপক্ষে) অবতারণা হতে থাকে।

জনগণের চাহিদার প্রেক্ষাপটে হানাফি ফিকাহবিদ “মারগীনানী” তাঁর “হিদাইয়া” গ্রন্থ এবং শাফীঈ ফিকহবিদ “আল মাওয়ার্দী” (মৃত্যু ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাদের শরীয়াহ ভিত্তিক আলোচনা উপস্থিত করেন। তবে সকল

www.amarboi.org

ক্ষেত্রেই দার্শনিক আল গাজ্জালীর বক্তব্যই চূড়ান্ত ধরা হত।

ইমাম আবু হামীদ গাজ্জালী ছিলেন বাগদাদ এবং নিশাপুরের নিজামীয়া কলেজের প্রধান। "ইয়াহ ইয়া আল উলুমুদ্দীন" গ্রন্থে তিনি সংগীত সম্পর্কে যা বলেছেন, তাই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই শেষ কথা হিসাবে বিবেচিত হত।

আবূ হামীদ আল গাজ্জালীর ভ্রাতা আবুল ফুতুহ মাবাদ আলা দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল তুসী ছিলেন বাগদাদ নিজামীয়া কলেজের অধ্যক্ষ। তিনিও ছিলেন সংগীতের এ যুগের একজন কড়া সমর্থক। (W. Ahl wardt Verj)[২২৯] এটা সুস্পষ্ট হয় তার রচিত "কিতাব ফি ওয়ারিক আল আসমা" গ্রন্থ হতে।

সেলজুকি শাসন : বুওয়াইহিডসদের শতাব্দী ব্যাপী শাসনের পরে বাগদাদের খেলাফতের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন সেলজুকি আমীর এবং সুলতানগণ। তারা বুখারায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং খুরাসন, তাবরীস্থান থেকে গজনবীদেরকে বিতাড়িত করেন।

১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা ইরাকে আযম জয় করেন। বাগদাদ দখল করেন। সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্বে ছিল। তারা ছিলেন সুন্নী মুসলিম যেমন ছিলেন আব্বসীয়াগণ। তারা বাগদাদের খলিফাদেরকে অধিকতর সম্মান করতেন এবং খলিফার মাধ্যমে তাদের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা বদল হত।

সেলজুকিদের প্রভাবাধীন বাগদাদী খলিফাগণ ছিলেন যথাক্রমে–সেলজুক প্রভাবাধীন বাগদাদী খেলাফত ২৬ তম খলিফা আল কাইম বি আমর উল্লাহ (১০৩১ -৭৫ খ্রীষ্টাব্দ), ২৭. আল মুক্তাদী বি আমর উল্লাহ (১০৭৫-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ), ২৮. আল মুস্তাজই বিল্লাহ (১০৯৪-১১১৮ খ্রীষ্টাব্দ), ২৯. আল মুস্তারশীদ (১১১৮-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ), ৩০. আল রশিদ বি আমর উল্লাহ (১১৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), ৩১. আল মুক্তাফী লী আমর উল্লাহ (১১৩৬-৬০ খ্রীষ্টাব্দ), ৩২. আল মুস্তানজীদ বিল্লাহ (১১৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ), ৩৩. আল মুস্তাজ ই আমর উল্লাহ (১১৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ)।

মালিক শাহ সেলজুকি : সেলজুকি সুলতানগণ তাদের আয়ত্তাধীন আব্বাসিয়া সম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রধান সেলজুকিগণ নিয়ন্ত্রণ করতেন খুরাসান (১০৩৭-১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দ), ইরাক। অন্যেদের

www.amarboi.org

কর্তৃত্বাধীনে ছিল কিরামান, এশিয়া, মাইনর এবং সিরিয়া।

প্রধান সেলজুকিগণ বাস করতেন বাগদাদ এবং নিশাপুরে। সেলজুকিগণ শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় খলিফাদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

উমর খাইয়ামের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন মালিক শাহ সেলজুকি। মালিক শাহের উজির ছিলেন বিখ্যাত নিজামুল মুল্ক। বাগদাদে এবং নিশাপুরে প্রতিষ্ঠা করেন নিজামীয়া কলেজ।

ইরাকী সেলজুকি সুলতান মাহমুদ (১১১৭-৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন সংগীততত্ত্ববীদ এবং বিজ্ঞানী আবুল হাকাম বাহিলীর পৃষ্ঠপোষক।

সংগীত বিশেষজ্ঞ ফখরুদ্দীন আল রাজী ছিলেন খাওয়ারিজম সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সংগীত চর্চাকারী ও তাত্ত্বিক।

অপর সংগীত বিশেষজ্ঞ আবুল হাকাম ছিলেন মেসাপোটামিয়া এবং সিরিয়ার সুলতান জেঙ্গীদ শাহের দরবারের সংগীতজ্ঞ ও সংগীত বিশেষজ্ঞ।

বেলায়েব ভাগতিজিনিদ সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন সংগীত তাত্ত্বিক এবং বিশেষজ্ঞ ইবনে মানাহ।

ইয়াহমানের নাজাহিদ বংশীয় সুলতান সাইদ আল আওয়াশ (১০৮০-৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (Kay : "Yaman , Its Early Mediaeval History", P- 84, 108, 116)[২৩০]।

ইরানের সামানিদ সুলতানদের ন্যায় আফগানিস্থানের গজনবী সুলতানগণ ও শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চা ও সংগীতচর্চার উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (Kay: Yaman, Its Early Mediaeval History)[২৩১]।

গজনবীদের পরে ক্ষমতায় আসেন ঘোরি সুলতানগণ। সংগীত তত্ত্ববিদ আবদাল মুমিন ইবন শাফিউদ্দীন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন আফগানিস্থানের ঘোরি সুলতানদের।

৩৪তম আব্বাসিয় খলিফা আল নাসির লি দ্বীনিল্লাহ (১১৮০-১২২৫) সেলজুকি তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে খাওয়ারীজম শাহের তত্ত্বাবধানে আসেন। পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন আল নাসিরের পুত্র ৩৫তম খলিফা আল জাহির বি আমর উল্লাহ (১২২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং পৌত্র ৩৬তম খলিফা আল মুস্তানসির বিল্লাহ (১২২৬-৪২ খ্রীষ্টাব্দ)।

এদের সময় ছিল স্বাভাবিকভাবে শান্ত। তার ফলে শিক্ষা ও সংগীত চর্চার বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। (W. Muir : Caliphate, P- 587)[২৩২]।

www.amarboi.org

মুস্তানসিরঃ বিখ্যাত আল মুস্তানছিরীয়াহ কলেজ স্থাপিত হয় বাগদাদে। এর লাইব্রেরীর জন্য আশি হাজার পুস্তক সে কালে সংগৃহীত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগীত চর্চাও পৃষ্ঠপোষকতা– এ সময় লাভ করেছিল।

২৯তম আব্বাসিয়া আল ফজল আবু মানসুর খলিফা আল মুসতারশিদ বিল্লাহ (১১১৮-৩৪ খ্রী.)

খলিফা আল আমির (১১০১-১১৩১ খ্রীষ্টাব্দ) : খলিফা মুসতাজহীর বিল্লাহ এর ২৫ বছর খেলাফত শেষে ইন্তেকালের পর তার পুত্র আবূ মানসুর আল ফজল মুসতারশিদ বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মিশরে দশম ফাতিমীয়া খলিফা 'আল আমির' গান বাজনা ও সংগীত চর্চায় তার পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সংগীত রচয়িতা ও সংগীততত্ত্ববিদ ছিলেন আবুল সালাত উমাইয়্যা। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

তার সময়ে ফাতিমী খেলাফতের পতনের ধারা শুরু হয়। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন ইউরোপের ক্রুসেডারগণ দখল করে নেন।

সংগীতজ্ঞ আবুল সালাত উমাইয়্যা (১০৬৮-১১৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) : তার পূর্ণ নাম ছিল উমাইয়্যা ইবন আবদুল আজিজ ইবন আবুল সালাত। তিনি আন্দালুসিয়ার জেনিয়া শহরে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১০৯৬ সালে মিশরে চলে যান। ফাতেমী খলিফাদের যুগে তিনি উচচ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এক পর্যায়ে কারারুদ্ধ হন।

১১১২ সালে তিনি মাহদীয়াতে চলে যান এবং জায়রী রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দর্শন, সাহিত্য এবং প্রাচীন ইতিহাসে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। (Ibn Khallikan: Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২৮-৩১)[২৩৩]।

সংগীত ও ইতিহাসবিদ ইবন আবী উসাইবিয়ার মতে আবুল সালাত সংগীত বিজ্ঞানে পারদর্শীতা লাভ করেন। উদ বীণা বাজাতে তিনি ছিলেন অতি সুদক্ষ। (ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২-৬২)। তার রচিত "রিসালা ফিল মিউসিকি" সংগীত সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থ আরবী ভাষা থেকে হিবরু ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। উত্তর আফ্রিকার সংগীত চর্চায় তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (Wolf, Bibliography, Hibrew, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩১)[২৩৪]।

সংগীতজ্ঞ ইবন বাজ্জাহ (মৃত্যু, ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ সংগীত বিজ্ঞানী ইবন বাজ্জাহ আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আল সাইহ এর জন্ম

www.amarboi.org

সারাগোসাতে। তিনি ছিলেন সারাগোসা নগরীর একজন চিকিৎসক।

মুসলিমদের অবক্ষয়ের যুগে ১১১৮ সালে খ্রীষ্টানদের নিকট মুসলিমদের সারাগোসাতে পতন ঘটে। তখন তিনি সেভিলে চলে যান। তথা হতে যান মরক্কো এর ফেজ নগরীতে। সেখানে স্বীয় প্রতিভা বলে তিনি মুরাবী রাজ দরবারে উজির নিযুক্ত হন। শত্রুরা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

ইবন বাজ্জাই ছিলেন একজন মহা পন্ডিত। চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি শাস্ত্রে তার রচিত চব্বিশটির বেশী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। উপরোক্ত শাস্ত্রগুলোতে পান্ডিত্য ছাড়াও তিনি ছিলেন সংগীত বিজ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ এবং দক্ষ "উদ" বীণা বাদক। তার সংগীত সংক্রান্ত প্রজ্ঞার তথ্য পাওয়া যায় ইবন আবী উসাইবিয়া রচিত গ্রন্থে। (ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২)[২৩৫]।

ইবনে খালদুন এর মতে ইবনে বাজ্জার সংগীতের "তালহীন" ছিল সুবিখ্যাত। (Ibn Khaldun, Prolegomenus, Historycus of Ibn KhaLdun, Paris, ১৮৬২-৬৮ পৃষ্ঠা খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৩)[২৩৬]।

ইবন সাইদ আল মাগরেবী (মৃত্যু ১২৭৪) লিখেছেন যে, ইবনে বাজ্জার নামে সংগীতের বহু জনপ্রিয় সুর (Melody) ছিল। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫)[২৩৭]।

ইবনে সাইদ আল মাগরেবীর মতে সংগীতে প্রাচ্য দেশে আর ফারাবী এর যে সুখ্যাতি ছিল পাশ্চাত্য দেশে সে রূপ খ্যাতি ছিল ইবনে বাজ্জার। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫)[২৩৮] দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, ইবনে বাজ্জার রচিত কোন সংগীত গ্রন্থ সুরক্ষিত হয়নি।

ইরাকী সেলজুকি সুলতান মাহমুদ (১১১৭-৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন সংগীত-তত্ত্ববীদ এবং বিজ্ঞানে আবুল হাকাম বাহিলীর পৃষ্ঠপোষক।

৩০তম আব্বাসিয়া খলিফা আবু জাফর মানসুর আবু রাশিদ বিল্লাহ (১১৩৪-৩৫ খ্রি.)

সেলজুক সুলতান মাসুদ এর হস্তে খলিফা মুসতারশীদ বিল্লাহ বন্দী ও নিহত হওয়ার পর তার পুত্র আবু জাফর মানসুর রাশিদ বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে বাগদাদী আব্বাসিয়া খলিফা মনোনীত হন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তিনি নিহত হন।

www.amarboi.org

আন্দালুসিয়ায় মুরাহবিদ (বারবার) শাসন : দ্বাদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে উত্তর আফ্রিকায় এবং আন্দালুসিয়ায় মুরাবিদদের অবক্ষয় শুরু হয়। মুয়াহহিদ নামে নতুন এক রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে।

১১৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুয়াহবিদদের হাতে আফ্রিকার মরক্কো এবং আন্দালুসিয়ায় মুরাহবিদদের পতন ঘটে। মুয়াহহিদগণ প্রায় এক শত বছর পর্যন্ত আফ্রিকার মরক্কো এবং আন্দালুসিয়ায় শাসন করেন।

ইউরোপিয়ানদের নিকট মরক্কো, তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়ার মুসলিমগণ "বারবার" জাতি নামে পরিচিত। আরবগণ তাদেরকে "বারবার" জাতি বলত। তারা আরবদেরই একটি অংশ ছিল। যদিও তাদের মধ্যে আরবদের মত জাত্বাভিমান ছিল না।

মুয়াহবিদ : মুয়াহবিদ এবং মুরাহহিদ দুই জাতিই ছিল বারবার জাতির অন্তর্ভুক্ত। মুরাবিদগণ ছিলেন রক্ষণশীল এবং গোড়া মুসলিম। মুয়াহহিদগণ ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদার এবং সহনশীল। তারা সংগীত ও নৃত্য কলার প্রতি ততটুকু খর্গহস্ত ছিলেন না। (Nicholson : Literary History of the Arabs, পৃষ্ঠা-432; Abd al Wahid, Al-Marrakushi : The History of the Almohades, Edited by R. Dozy, London-1881, পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৭০-৭৫)[২৩৯-৪০]।

মুয়াহহিদদের সময়ে মুসলিম ইতিহাসের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদদের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ১. ইবনে রুশদ (আবি রুশদ) ২. ইবনে তোফায়েল ৩. মুছা ইবনে মাইমুন ৪. ইবনে শাবীন।

তাদের ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত চিন্তার প্রতি মুয়াহহিদগণও সকল ক্ষেত্রে সহনশীল ছিলেন না। তার ফলে তাদেরকে শাস্তিরও সম্মুখীন হতে হয়।

মূয়াহহিদগণের শত বছরের প্রান্তে অবক্ষয় দেখা যায়। তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মরক্কো। ১২২৮ সালে তিউনিসিয়ার হাবশীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৩০ সালে খ্রিষ্টানগণ মুয়াহহিদদেরকে পরাজিত করে আন্দালুসিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১২৬৯ সালে মরক্কোর মারিনিদগণ মরক্কো থেকে মুয়াহহিদদেরকে উৎখাত করে।

খলিফা আল হাফিজ (১১৩১-৪৯) : মিশরে একাদশ ফাতিমিয় খলিফা আল হাফিজ ছিলেন জ্যোর্তিবিদ্যায় বিশ্বাসী। তার শাসন কালে ছিল নিরূপদ্রব। যদিও তিনি অন্যদের তুলনায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন। তিনি জনগণের জীবন

www.amarboi.org

যাত্রার প্রতি উদাসীন ছিলেন। জনগণও ছিল তার প্রতি উদাসীন।

আবুল হাকাম বাহিলী : আবুল হাকাম ওবাইদুল্লাহ ইবন মুজাফফর ইবন আবদুল্লাহ আল বাহিলী (১০৯৩-১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) আন্দালুসিয়ার আলমিরা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে তিনি ছিলেন ইয়ামেনী। আবুল হাকাম ছিলেন বহু জ্ঞান বিজ্ঞানে পন্ডিত। বাগদাদে তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন।

পরবর্তীতে তিনি ইরাকের সেলজুকি সুলতান মাহমুদ (১১১৭-৩১ খ্রীষ্টাব্দ) এর এক সেনা হসপিটালের চিকিৎসক ছিলেন।

এই সুলতান মাহমুদ ভারত বিজেতা আফগানী সুলতান মাহমুদ (মৃত্যু ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) অপেক্ষা ভিন্ন। সর্বশেষে তিনি দামেস্কে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তার বিচরণ। পদার্থ বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য ও সংগীতে ছিলেন তিনি মহাজ্ঞানী।

আল মাক্কারী বর্ণনা করেন যে, আবুল হাকাম দর্শন, বিজ্ঞান ও ঔষধ বিজ্ঞানে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বীণা বাজাতে পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও হাস্যরসিকতায় ছিলেন খ্যাতিমান। (আল মাক্কারী, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪৮)[২৪১]।

বীণা ছিল আবুল হাকাম বাহিলীর অতি প্রিয় বাদ্যযন্ত্র (ইবন আবী উসাইবীয়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪)। তার সংগীত প্রতিভা ও কাব্য প্রতিভা ছিল সম-স্তরের। (Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮২)[২৪২]।

৩১তম আব্বাসিয়া খলিফা আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল মুকতাফি বিল্লাহ আমরুল্লাহ (১১৩৫-৬০ খ্রী.)

ত্রিশতম আব্বাসীয় খলিফা আবূ জাফর রাশীদ বিল্লাহ ভুল বুঝাবুঝির কারনে এক বছরের মধ্যে অপসারিত হন। তার অপসারণের পর প্রাক্তন ২৮তম খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ এর পুত্র আবু আব্দুল্লাহকে মুকতাফি লি আমর উল্লাহ উপাধি দিয়ে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খলিফার হৃত ক্ষমতা ও গৌরব অনেকটুকু পুনরুদ্ধার করেন।

সেভিল : দ্বাদশ শতাব্দীতে আন্দালুসিয়ার সেভিলের কাজী **আবু বাকর ইবন আল আরাবী** (মৃত্যু ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীতের আইনসঙ্গতায় বিশ্বাস করতেন। সেভিলের আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল ইসবিলী (মৃত্যু

www.amarboi.org

১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রণেতা ছিলেন "কিতাব আল সামী ওয়া আখরুন্থ" (সংগীত শ্রবণ ও প্রসাঙ্গিক বিষয়ের পুস্তক) এর।

মুহাম্মাদ ইবন হাদ্দাদ : মুহাম্মাদ ইবনে হাদ্দাদের পূর্ণ নাম ছিল আবু আবদাল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাদ্দাদ (মৃত্যু ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন আন্দালুসিয়ার অধিবাসী। তিনি ছিলেন Musises Disciplina (সংগীতের নির্দেনাবলী) শীর্ষক পুস্তকের রচয়িতা। (Mecheclis Casiri, Chapter- ii, Page-73)[২৪৩]।

কামাল আল দ্বীন ইবনে মানাহ (জন্ম, ১১৫৬) : কামাল আল আলা-দ্বীন ইবনে মানাহ এর নাম মতান্তরে আবুল ফাতহ মুসা ইবন ইউনুস ইবন মুহাম্মদ ইবন মানাহ। তার জন্ম ইরাকের মৌসুলে। তিনি বাগাদাদের নিজামিয়া কলেজে ছিলেন একজন অতি মেধাবী এবং কৃতি শিক্ষার্থী। জন্মস্থান মাওসুলে ফিরে গিয়ে তিনি শিক্ষা পেশা গ্রহণ করে কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ইবনে খাল্লিকান এর মতে কামাল আল দীন ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রবিদ, পদার্থবিদ্যাবিদ, জ্যোতির্বিদ, শঙ্কু (কনিকস) জ্যামিতিবিদ এবং সংগীতজ্ঞ। উপরে বর্ণিত কোন একটি বিদ্যায় তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না। (Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭)[২৪৪]।

ইয়াহইয়া ইবন আল খুদুজ আল মুরসি : ইয়াহইয়া ইবনে খুদুজ ছিলেন মুরসিয়ার অধিবাসী। তিনি আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানীর ন্যায় এবং একই ধরনের "কিতাব আল আগানী" শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫)[২৪৫]।

খলিফা আল জাফির (১১৪৯-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) : মিশরের দ্বাদশ ফাতিমীয় খলিফা আল জাফির অন্যদের তুলনায় সংগীত চর্চার প্রতি ছিলেন অতিরিক্ত উৎসাহী। রাজনীতিতে এবং যুদ্ধ বিগ্রহে তার উৎসাহ ছিল খুবই কম।

সেলজুকি সুলতান সানজার(১১১৭-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীতের একজন অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার দরবারের সংগীতজ্ঞ কামাল আল জামালের খাতি ছিল সমগ্র আব্বাসিয়া সাম্রাজ্যে।

৩২তম আব্বাসিয়া খলিফা আবুল মুজাফফার ইউসুফ আল মুসতানজিদ বিল্লাহ (১১৬০-১১৭০ খ্রী.)

আব্বাসিয়া বংশের ৩১তম খলিফা মুকতাফির এর ইন্তেকালের পর তার পুত্র আবুল মুজাফফর ইউসুফ মুসতানজিদ বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে আব্বাসিয়া

www.amarboi.org

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবন আসির এর মতে মুসতানজিদ ছিলেন প্রজারঞ্জক, উদার, গুণবান খলিফা। তার সময়ে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। তিনি সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় এবং উৎপীড়নমূলক বিধি এবং কর বিলোপ করেন।

খলিফা আল ফায়েজ (১১৫৪-৬০ খ্রীষ্টাব্দ) : মিশরের ত্রয়োদশ ফাতিমীয় খলিফা আল ফায়েজ এর খেলাফতের কাল ছিল অনুল্লেখযোগ্য ও গতানুগতিক।

খলিফা আল আদিদ (১১৬০-৭১ খ্রীষ্টাব্দ) : মিশরের চতুর্দশ ফাতিমীয় খলিফা আল ফায়েজ এবং আদিদ এর সময় ফাতেমী খেলাফতের শক্তি নিঃশেষ হয়ে তা দ্রুত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচিছল।

সংগীতজ্ঞ ইবন রুশদ (১১২৬-৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) : আবুল ওয়ালিদ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন রুশদ ছিলেন আন্দালুসিয়ার অন্যতম বিশ্বজয়ী মহামনীষী। তিনি ছিলেন দার্শনিক, কবি, সংগীতজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক। সংগীত সংক্রান্ত তার গ্রন্থটি ছিল শারহ আল সামা আল তাবলী। (Ibn Abi Usaibia-ii, P-75; Al- Maqqari, Mohammedan Dynasties, Vol-1, Append, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) : ১১৬৯ সালে আইউবী বংশীয় সেনাপতি সালাহউদ্দীন আইউবী এবং তার সহকারী সেনাপতি শীরকুহ রাজধানী আল কাহেরায় প্রবেশ করেন। দু' বছর পর ১১৭১ সালে সর্বশেষ ফাতেমীয় খলিফা আল আদিদ ইন্তেকাল করেন।

এ সময় পরবর্তী কোন খলিফা নির্বাচণের মত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি। আইউবীয় বংশের সেনাপতি সালাহউদ্দীন আইউরী পরবর্তী খলিফা হওয়া নিয়তির বিধান হিসাবে সকলে ধরে নিয়েছিলেন।

ফাতেমীয় খলিফাগণ রাজ্য বিজয়ের তেমন কোন ইতিহাস বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেননি। খলিফার প্রতি আনুগত্য জনগণের অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই রাজ্যে তেমন কোন বিশৃংখলা দেখা দেয়নি। ফাতেমী খলিফাদের সময় জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা ও সভ্যতায় অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুরূপ "দার আল হিকমাহ" বা বিজ্ঞান গবেষণা ভবন তারা তৈরী করেছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ হওয়ার কারনেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী যেমন ইবনাল হাইথাম ইবন রিদুয়াম এবং ইসহাক ইসরাইলের আবির্ভাব ফাতেমীয় খেলাফত যুগেই হয়েছিল।

www.amarboi.org

ফাতেমীয় খলিফাগণ শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় মূল্যবান অবদান রাখেন। স্থাপত্য শিল্প এবং কৃষি ও কুটির শিল্প ইত্যাদি এ আমলে তুলনামূলক ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল অনেক বেশী।

সংগীতজ্ঞ আবুল মাজিদ মুহম্মাদ ইবনে আবুল হাকাম (মৃত্যু, ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দ): আবুল মাজিদ মুহাম্মাদ ছিলেন আবুল হাকাম বাহিলীর সুযোগ্য পুত্র। তিনি ছিলেন সুদক্ষ চিকিৎসক, অঙ্ক শাস্ত্রবিদ, Astrologer এবং সংগীতজ্ঞ। দামেস্কে তিনি ছিলেন গাজী নুর উদ্দীন জঙ্গি আতাবেগ এর হাসপাতালের দায়িত্বে (১১৪৬-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে)।

ইবন আবী উসাইবিয়ার মতে আবুল মজিদ মুহাম্মাদ ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভা। সংগীত বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় ছিল তার আনাগোনা। উদ, বীণা, জমর, বংশী এবং অন্যান্য সংগীত যন্ত্র তিনি অনায়েশে বাজাতে পারতেন।

গিনা সংগীত, মিউসিকি সংগীত, ইকাত বা রিদম, গীত, উরগণ, ইত্যাদিতে তিনি ত্রুটিহীন পান্ডিত্যে উন্নীত হন। (ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৫)[২৪৮]।

৩৩তম আব্বাসিয়া খলিফা আবু মুহাম্মাদ হাসান আল মুসতাইজ বি আমরুল্লাহ (১১৭০-১১৮০খ্রী.)

৩২তম আব্বাসিয়া খলিফা মুনতানজিদ এর ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র আবু মুহাম্মদ হাসান আল মুসতাইজ বি আমরুল্লাহ উপাধি ধারণ করে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব পুরুষদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তবে তাদের দুনিয়াদারী ক্ষমতা ছিল নিঃশেষের পথে।

ইবনে নাক্কাস আল বাগদাদী (মৃত্যু, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) : এ যুগে আবুল হাসান আলী ইবনে আল নাক্কাস বাগদাদী ছিলেন একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং সংগীত বিজ্ঞানবিদ। তিনি গাজী নুর আল দিন জঙ্গি আতাবাগ (১১৪৬-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দামেস্কের নুরী হাসপাতালেরও চিকিৎসক ছিলেন। তার প্রখ্যাত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন আবু জাকারিয়া আল বায়াসী এবং আহমাদ ইবন আল হাজীব। (ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬২-১৮১)[২৪৯] দামেস্কের সংগীতজ্ঞদের তিনি ছিলেন মধ্যমনি।

www.amarboi.org

মিশরে আইয়ুবী রাজবংশ (১১৭১-১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) : মিশরের ফাতেমী বংশের রাজত্বকালে খুতবার মধ্যে আব্বাসিয় খলিফার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা হত না। মিশরীয় আইয়ুবীদের রাজতন্ত্রের শুরুতেই আব্বাসিয়া খলিফাদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা দেয়া হয়। এর ফলে বাগদাদের খলিফা আইয়ূবী বংশের নেতা সালাহউদ্দিন আইয়ূবীকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা দেন এবং মিশরে আনুষ্ঠানিকভাবে আইয়ূবী বংশের সুলতানাত শুরু হয়।

আইয়ুবী সুলতানগণ ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য প্রদেশেও তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকেন। ক্রমশঃ মেসাপোটামিয়া, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ট্রিপোলী, লিবিয়া, ইয়ামান, তাদের অধীনে আসে। আইয়ূবী বংশের অথবা তাদের অনুমোদিত বংশ বা পরিবার ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অংশে শাসনভার গ্রহন করে। আইয়ূবী সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশে তাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

আইয়ূবীদের অনুগত রাজবংশ মেসাপোটিয়ায় নিম্নবর্ণিত অঞ্চলে সমূহে তাদের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করে ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেমন ১. মেসোপটেমিয়া ইরাক (১২০০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ), ২. দামেস্ক (১১৮৬-১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ), ৩. আলেপ্পো (১১৮৬-১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ), ৪. হামা (১১৭৮-১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দ), ৫. হিমস (১১৭৮-১২৬২ খ্রীষ্টাব্দ), ৬. ইয়ামান (১১৭৩-১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

উপরোক্ত সময়ে সব দেশেই আইয়ুবী আমলে সংগীত ও শিল্পকলার চর্চা এবং বিকাশ উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটে। সুলতান সালাউদ্দীন (১১৭১-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)এবং তার পরবর্তী আইয়ূবী সুলতান আল আজিজ (১১৯৩-৯৮) ছিলেন শিল্পকলা ও সংগীতের মহা পৃষ্ঠপোষক।

আইয়ুবীদের রাজত্বকালে সে কালের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি "মুসা ইবনে মাইমুন" ছিলেন সালহউদ্দীনের রাজ দরবারে পারিষদ। বৈজ্ঞানিক এবং সংগীত তত্ত্ববিদ আবু জাকারিয়া আল বাইয়াসী এবং আবু নাসের ইবনে মাতরান সুলতান সালাউদ্দীনের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন।

অন্যান্য শাসকদের মধ্যে যারা সংগীতের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুলতান আদিল(১১৯৯-১২১৮ খ্রীষ্টাব্দ), সুলতান আল কামিল(১২১৮-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), সুলতান আল সালীহ(১২৪০-৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাদের সম্পর্কে প্রত্যয়ন করেছেন ইবনে খাল্লিকান, ইবনে আছির এবং বাহাউদ্দীন জুহাইরা। (S. Lane Poole : History of Moors, P-240)[২৫০]।

www.amarboi.org

৩৪. আব্বাসিয়া খলিফা আল নাসির লী দীন আল্লাহ, আবুল আব্বাস আহমাদ (১১৮০-১২২৫ খ্রী.)

আব্বাসিয়া খলিফা আবুল আব্বাস আহমাদ আল নাসির লী দীন আল্লাহ (১১৮০-১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) তার খেলাফতের মর্যাদা অতীতের স্মৃতি সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। (W. Muir: The Caliphate, P-587)[২৫১] তিনি তখন ছিলেন সালজুকি সুলতানদের জোয়ালের নীচে। তিনি খাওয়ারিজম এর শাহকে আহ্বান করেন তাকে সেলজুকি সুলতানদের প্রভাব মুক্ত করার জন্য। কিন্তু এভাবে তিনি খাওয়ারিজম শাহের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন।

যাহোক আল নাসিরের পরবর্তী তিন খলিফা আল জাহির (১২২৫-২৬) এবং আল মুস্তানছির (১২২৬-৪২) ছিলেন খলিফা আল নাসিরেরই পুত্র এবং পৌত্র। খলিফা নাসিরের সময় (১১৮০-১২২৫ খ্রী.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা হয়।

বাগদাদে বিখ্যাত মুস্তানছিরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় খলিফা মুস্তানছিরের আমলে (১২২৬-৪২)। তার সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা চলতে থাকে এবং মুস্তানছিরিয়া কলেজের লাইব্রেরীতে দেশ বিদেশ থেকে আশি হাজার এর বেশী পুস্তক সংগ্রহ করা হয়। (W. Muir : The Caliphate p-589)[২৫২]।

আবু নাসর আসাদ (মৃত্যু, ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দ) : আবু নসর আসাদ ইবনে আল ইয়াহ ইবন জিরজিজ আল মাতরান এর জন্ম দামেস্কের এক খ্রিষ্টান পরিবারে। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। বাগদাদে তিনি ছিলেন ইবন আল নাক্কাসের শিক্ষার্থী।

যখন তিনি গাজী সুলতান সালাউদ্দীনের চাকুরীতে ছিলেন, তিনি দশ হাজার গ্রন্থের একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। (ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫)[২৫৩]।

আবু নাসর আসাদ ছিলেন বহু চিকিৎসা গ্রন্থের প্রণেতা। তার সংগীত গবেষণা গ্রন্থ রিসালাত আল আদুয়ার ছিল সংগীতের বিভিন্ন মোড বা তাল সংক্রান্ত পুস্তক। (Ahl wardt Verz, No. 5535, পৃষ্ঠা-25)[২৫৪]।

সেভিল : সেভিল রাজ্যের রাজ দরবারের কবি আব্দুল জব্বার ইবনে হামাদী ছিলেন সিসিলিয়ান বংশদ্ভুত একজন আরব। তিনি ছিলেন জনগণের প্রিয় সংগীতজ্ঞ।

www.amarboi.org

একজন আবাদি শাসক ভ্রমনকালে তার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কিতাবুল আগানী অবশ্যই রাখতেন। (হাজী খলিফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৭)[২৫৫]।

ঐতিহাসিক আল সাকান্দী লিখেছেন যে, সেভিল রাজ্য ছিল সংগীত যন্ত্র উৎপাদনের মূলকেন্দ্র। এখানকার তৈরী সংগীতযন্ত্র বিদেশে রপ্তানী হত।

ইবনে রুশদ (মৃত্যু ১১৯৮) প্রত্যয়ন করেছেন যে, সেভিল ছিল সংগীতযন্ত্র উৎপাদনের এক মহাকেন্দ্র। (আল মাক্কারী ঃ Moh. Dynasties ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪২)[২৫৬]।

সংগীতজ্ঞ আবু জাকারিয়া ইয়াহ ইয়া আল বায়াসী ঃ আবু জাকারিয়ার জন্ম আন্দালুসিয়ায়। তার কর্মজীবন কাটে মিশর ও সিরিয়ায়। জ্ঞান বিজ্ঞানে ও পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং সংগীতজ্ঞ। আইয়ুবী সুলতান গাজী সালাহউদ্দীনের দরবারে (১১৭১-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক।

আবূ জাকারিয়া ইয়াহইয়া বায়াসীর সংগীত শিক্ষক ছিলেন ইবন আল নাক্কাস। ইবনে আবু উসাইবিয়া লিখেছেন যে, তার শিক্ষার্থী আবু জাকারিয়া কয়েকটি বহুমুখী সংগীত যন্ত্র তৈরী করে দেন উস্তাদ ইবনে নাক্কাসীর জন্য। আবু জাকারিয়া ছিলেন একজন হান্দাশা বা ইঞ্জিনিয়ার এবং জ্যামিতিকবিদ্যা বিশারদ।

আবূ জাকারিয়া বীণা বাজাতে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি উরগান নামক একটি সংগীত যন্ত্রও তৈরী করান– যা অর্গান নামে পরবর্তীতে প্রচলিত হয়। (ইবন উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬২)[২৫৭]।

৩৫. আব্বাসিয়া খলিফা আবূ নাসির মুহাম্মাদ আজ-জাহির বি আমর উল্লাহ (১২২৫-২৬ খ্রী.)

ইবন আবী উসাইবিয়াঃ ইবন আবী উসাইবিয়ার পূর্ণ নাম হলো "মুয়াফফাক আল দীন আবুল আনবাস ইবন আবী উসাইবিয়া" (১২০২-১২৭০ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি ছিলেন সংগীত সংক্রান্ত ঐতিহাসিক। তার জন্ম দামেস্কে। তিনি পেশাগত ভাবে ছিলেন একজন চিকিৎসক। মেডিকেল শিক্ষা গ্রহন করেছেন **কায়রোতে অবস্থিত নাসীরি হসপিটালে। তিনি ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতে পৃষ্ঠপোষক।**

সুলতান সালাহউদ্দিন কর্তৃক কায়রো নগরীতে স্থাপিত অন্য একটি হাসপাতালের তিনি ছিলেন প্রধান। পরবর্তীতে তিনি নিযুক্ত হন মারকহাদের আমীর (গভর্নর)।

www.amarboi.org

ইজ্জ আলাদিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত ইবনে আবী উসাইবিয়ার মূল বইটির নাম ইউউন (Uyun) আল আনবা। এটি ছিল চিকিৎসার ইতিহাস নয় – চিকিৎসকদের ইতিহাস। কোন ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানতে হলে এই পুস্তকটি আলোচনা করতে হয়।

সংগীতজ্ঞ ইবন আল কিফতি : ইবন আল কিফতির পূর্ণ নাম ছিল "আবুল হাসান আলী ইবন ইউসুফ আল কিফতি" (১১৭২-১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তার জন্ম মিশরের কিফত শহরে। কিফতের প্রাচীন নাম ছিল ক্ফট্স্ বা কফট। যদিও তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন কায়রোতে, সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত হয় সিরিয়ায় একজন প্রাদেশিক সুবেদর হিসাবে আলোপ্পাতে। (ইয়াকুদ, ইরশাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭)[২৫৮]

যদিও আল কিফতি ছিলেন একজন প্রশাসক, তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তার রচিত সংগীত সংক্রান্ত গ্রন্থটির নাম ("কিতাব ইখবার আল উলামা" (উলামাদের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক))[২৫৯]

"কিতাব ইখবার আল উলামা" (উলামাদের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক)। এই পুস্তকটি ছিল সংগীত সংক্রান্ত আলেম অর্থাৎ সংগীতজ্ঞদের ইতিহাস। সংগীতজ্ঞদের নাম ও ইতিহাস জানতে হলে এই বইটি সহায়ক গ্রন্থ।

সংগীতজ্ঞ আলাম আল দীন কায়সার (১১৭৮-১২৫১ খ্রী.) : আলাম আল দীন কায়সার ইবন আবুল কাশেম মিশরের আল সুন্নাত নামক স্থানে জন্ম গ্রহন করেন এবং দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। ইবনে খাল্লিক্কানের মতে সকল অঙ্ক সংক্রান্ত বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন মহাযুগ প্রতিভা। তার শিক্ষক ছিলেন কামাল আল দীন ইবনে মানাহ। এই ছাত্র শিক্ষক জোড় সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে ।

উস্তাদ কামাল আল দীন তার শিক্ষার্থী আলাম আল দীনকে জিজ্ঞাসা করেন– তুমি কোন্ বিজ্ঞান নিয়ে তোমার শিক্ষা শুরু করতে চাও। শিক্ষার্থী জানালেন সংগীততত্ত্ব নিয়ে। কামাল আল দীন বলেন– এটা তো খুব ভাল কথা। বহু বছর পর্যন্ত কেও আমার নিকট এ বিষয়ে শিক্ষা নেয় নি। তোমার মত শিক্ষার্থী পেলে সংগীত শাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নবায়ন করা যাবে।

শিক্ষার্থী আলাম আল দীন তখন সংগীত সম্বন্ধে পড়াশুনা শুবু করলেন। ক্রমশ অন্যান্য বিজ্ঞানের দিকে চলে গেলেন। ছয় মাসে চল্লিশটি বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করলেন।

আলাম আল দীন কায়সার পরে বলেন– এই বিষয়গুলো আমার আগেই জানা ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল– আমাকে কামাল আল দীন ইবনে মানাহ এর

www.amarboi.org

সাগ্রেদ হিসাবে পরিচয় দেয়া। আমার বিদ্যা যাই হোক না কেন– আমি একজন জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত ছিলাম না। কামাল আল দীনের শিক্ষার্থী হিসাবে পরিচয় দিলে জ্ঞানীদের মধ্যে আমার ইজ্জত বাড়বে।

হাসান আল দীন বলেছেন যে, আলম আল দীন সংগীত শাস্ত্রে কামাল আল দীনের অধীনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হন। (আবুল ফিদাহ, Akhbarul Bashar, Analectes and Music, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭৯, ৫২৯)[২৬০]।

৩৬তম আব্বাসিয়া খলিফা আবু জাফর মানসুর আল মুসতানসির বি আমর উল্লাহ (১২২৬-৪২ খ্রী.)

আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-রাকুতী : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল রাকুতি ছিলেন আন্দালুসিয়ার ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন মনীষী। তার জন্ম আন্দালুসিয়ার মুরসিয়াতে। খ্রিষ্টানগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুরসিয়া দখল করে। পর্তুগীজরাজ তাকে মুরসিয়াতে রেখে দেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। তিনি গ্রানাডায় মৃত্যু বরণ করেন। (Mechaclies Casiri : Biblothecs Arabicco History, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮১-৮২)[২৬১] আবু বাকর আল রাফতী ছিলেন চিকিৎসাবিদ, অঙ্ক শাস্ত্রবিদ এবং সংগীত শাস্ত্রবিদ।

ইবন শাবীন (মৃত্যু, ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) : আবু মুহাম্মাদ আবদ আল হক ইবনে ইব্রাহিম ইবন মুহাম্মদ আল ইশবিলী ইবনে শাবীন ছিলেন মুর্সিয়ার অধিবাসী। মক্কায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার একটি বিখ্যাত পুস্তক ছিল "কিতাব আল আজবিব আন আল আসুলা (অর্থাৎ প্রশ্ন ও জবাবের কিতাব)।

এই কিতাবটি তিনি লিখেছিলেন মুয়াইহিদ সুলতান আবদুল ওয়াহিদ আল রাশিদ (১২৩২-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) এর নির্দেশে। তাকে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফেডারিক কতকগুলো প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলেন। ঐ প্রশ্নগুলোর জবাবে এ পুস্তকটি লিখিত। (আল কুতুবী ফুয়াত আল ওয়াফায়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭)[২৬২]।

ইবনে শাবীল ছিলেন "কিতাব আল আদওয়ার আল মানসুব" (সংগীতের বিভিন্ন সুর সংক্রান্ত পুস্তক) এর রচয়িতা।

জিরাব আল দাওলা : সংগীতজ্ঞ জিরাব আল দাওলা ছিলেন মূলত প্রখ্যাত আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনে আল্লাইয়াহ শাজজী এর পুত্র।

www.amarboi.org

তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ তাম্বুরাবাদক ও সংগীতজ্ঞ। তিনি তাম্বুরাবিদ এবং সংগীতজ্ঞ হিসাবে যতটুকু খ্যাতিমান ছিলেন এর চেয়ে বেশী ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে আছেন একটি হাস্য রসাত্মক পুস্তক এর রচয়িতা হিসাবে। পুস্তকটির নাম "কিতাব তারবিহ্ আল আরওয়াহ মিফতাহ আল সুরুর আল আফরাহ" (ভুত দূরকারী এবং আনন্দ খুশীর চাবি)। (আল-ওয়ারবাক ঃ কিতাব আল ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩)[২৬৩]।

৩৭তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুস্তাসিম বি আমরুল্লাহ, আবু আহমাদ আবদুল্লাহ (১২৪২-৫৮ খ্রী.)

খলিফা আল মুস্তাসিম বি আমরুল্লাহ ছিলেন আব্বাসিয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা (১২৪২-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তার সময়ে খেলাফতের মর্যাদা কিছুটা পুনরুদ্ধার করা হয়। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা, জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং পুস্তক সংগ্রহ নেশা গ্রস্ত ব্যক্তি। তার সময়ে খেলাফতের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসে, প্রদীপ নিভার পূর্বে যেমন হঠাৎ করে জ্বলে উঠে।

খলিফা শুধু শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তিনি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা সংগীত চর্চা করে কাটাতেন। (ইবন টিকটাকা : আল ফাখরী, পৃষ্ঠা-৫৭১)[২৬৪] আরব ইতিহাসের অন্যতম সেরা সংগীতজ্ঞ শফিউদ্দীন আবদুল মুমিন ছিলেন খলিফার প্রধান সংগীত উপদেষ্টা।

শুরুতে তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন খাওয়ারিজমের শাহ্ নামে খ্যাত অধিপতি। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মুঘল আশ্বারোহী বাহিনীর অধিকর্তা চেংগিস খান খাওয়ারিজম শাহের সম্রাজ্যের পূর্বাংশ দখল করে নেন। ১২৩১ সালে চেংগিস খার পুত্র উগদাই খান সর্বশেষ খাওয়ারিজম শাহকে হত্যা করে রাজধানী খিভা দখল করেন।

১২৫৬ সালে চেংগিস খার পৌত্র হালাকু খা অক্সাস (Oxus) নদী অতিক্রম করে ঝড়ের তান্ডব ঘটিয়ে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ১২৫৮ সালে রাজনৈতিক প্রতারনার মাধ্যমে বিনা যুদ্ধে বাগদাদ দখল করে এবং ৫০৮ বছরের আব্বাসিয়া রাজত্বের অবসান ঘটান।

বাগদাদ তখনো ছিল এশিয়ার বৃহত্তম নগরী। হালাকু খার সৈন্যগণ শুধু লুটপাট ও হত্যা করে সন্তুষ্ট ছিল না, তাদের নির্দেশে সমগ্র বাগদাদ নগরীতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। নগরী ধ্বংসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থানে বাগদাদের নাম লেখা হয়।

www.amarboi.org

ইবনে খালদুন এর মতে বিশ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় পনের লক্ষকেই হালাকু বাহিনী হত্যা করে। তাদের মধ্যে খলিফা ও তার পরিবারবর্গও বাদ পড়েনি। প্রাসাদ, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোতে লুটপাটের পর অগ্নি সংযোগ করা হয়।

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, গবেষক, ইমাম নির্বিশেষে লোকজনকে হত্যা করা হয়। শত শত বছরের সযত্ন প্রায়াসে যে লক্ষ লক্ষ পুস্তক নগরীর ছত্রিশটি লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা ধ্বংস করা হয় অগ্নি সংযোগে অথবা টাইগ্রিস নদীর পানিতে।

Professor E. G Browne লিখেছেন মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে আহরিত যে সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল কল্পনার অতীত এবং ভাষায় প্রকাশের অনুপোযোগী। লক্ষ লক্ষ অমূল্য পুস্তক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়।

শুধু তাই নয়, হাজার হাজার বিদগ্ধ জ্ঞানীদেরকে হত্যা করা হয়। অন্যদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এ পরিনতিতে মৌলিক গবেষণা ও পান্ডিত্যের যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যে ধারা আরবী সাহিত্যের প্রতিফলিত হয়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়। সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় আব্বসীয়া খেলাফত। (E. G Browne, Literary History Persia, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৩)[২৬৫]।

আবু জাফর নাসির আল দীন আল তুসী (১২০১- ৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) : আবু জাফর নাসির আল দীন তুসী খোরাসানের তুস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, অঙ্ক শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ। চেংগিস খানের বংশধর হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় বৈজ্ঞানিক নাসির উদ্দীন আল তুসী বাগদাদে ছিলেন। তিনি হালাকু খানের জ্যোতিষী নিযুক্ত হন। হালাকু খান তাকে বিভিন্ন অভিযানে নিয়ে যেতেন এবং ফলাফল যুদ্ধের আগেই জানতে চাইতেন। ভুল হলে প্রাণনাশের ভয় ছিল।

সে কালে বাগদাদের প্রায় বাড়ীতে লাইব্রেরী থাকত। বসবাসের জন্য যতটুকু জায়গা দরকার ছিল লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজন ছিল আরো বেশী জায়গা।

বহু পুস্তক ছিল চামড়া, কাপড় এবং নল খাগড়ার তৈরী মোটা কাগজে লিখিত। হালাকু খানকে বলা হয় যে, জ্ঞান চর্চায় ছিল মুসলিমদের সমৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যের মূল কারণ। এ তথ্য অবহিত হয়ে হালাকু খান নির্দেশ দেন প্রতিটি বাড়ির লাইব্রেরীতে আগুন লাগিয়ে দিতে। চামড়া, কাঠ ইত্যাদি পুড়তে সময়

www.amarboi.org

লাগে। বাগদাদ শহর কোন এক পর্যায়ে ধুম্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়। হালাকু খান কারন জানতে চান।

বলা হয় লাইব্রেরীতে আগুন দেওয়ার ফলেই তা হয়েছে। তখন হুকুম হয় – লাইব্রেরীর বইগুলো ফুরাত নদীতে ফেলে দিতে। এতে ফুরাত নদীর পানি কালো হয়ে যায়। কারোও কারোও মতে ফুয়াতের প্রবাহই শ্লথ হয়ে যায়।

হালাকু খানের জ্যোতিষী পুস্তকের এই বহ্নি উৎসব থেকে যে সমস্ত পুস্তক রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তা দিয়ে তার একটি বিরাট লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। বাগদাদ, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া হতে সংগ্রহীত গ্রন্থের সংখ্যা দাড়ায় ৪ লক্ষে। (Bar Habraeus; Historia Orientalis, পৃষ্ঠা- ৩৫৮)[২৬৬]।

নাসীর উদ্দীন তুসী ছিলেন অঙ্ক শাস্ত্রবিদ এবং সংগীত শাস্ত্রবিদ। সংগীতের ওপর তার পুস্তকটি ছিল "ইলম আল মিউসিকি" (সংগীত বিজ্ঞান)।

তুর্কিদের মতে নাসির আল দীন তুসী ছিলেন "মাহতার দুদুখ" নামক এক প্রকার বাঁশির আবিষ্কারক ও প্রবর্তক।

নাসির আল দীন তুসীর সবচেয়ে বিখ্যাত শিক্ষার্থী ছিলেন কুতুব আল দীন সিরাজী (১২৩৬-১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ)। তার সংগীত সংক্রান্ত পুস্তক "দুররাত আল তাজ" ছিল সংগীততত্ত্বের ওপর একটি পর্যায় ক্রমিক মৌলিক গবেষণা কর্ম।

শাফী আল দীন আবদাল মুমিন : শাফী আল দীন আবদাল মুমিন ইবন ইউসুফ ইবন ফাকীর আল উরমানী আল বাগদাদী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগাদদে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা ছিলেন আজার বাইজান প্রদেশের উর্মিয়ার অধিবাসী। তিনি সর্বশেষ আব্বাসিয়া খলিফা আল মুস্তাসিম (১২৪৩-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) এর প্রধান সভা কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন খলিফার একজন Caligraphist এবং গ্রন্থগারিক। (Al Fakhri, Historia Des, Dynasties Mosulman's per Ibn Tiktaka , Paris, 1910)[২৬৭]।

দার্শনিক শাফী আল দীন আল মুমিনের মতে প্রত্যেক মোড বা সূরের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আছে। হৃদয়ের ওপর তা বিভিন্ন রূপ। তার মতে উসসাক, আবূ সালীক, নাওয়া সুর সাহসিকতা ও সরলতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাস্ত, নওরুজ, ইরাক, ইস্পাহান সুর বা মোড অত্যন্ত মন মুগ্ধকরভাবে আত্মা ও শ্রোতাকে প্রশান্ত এবং আনন্দিত করে। বুজুরক স্বরগ্রাম, রাহাবী, জিরাফ, কান্ড, জানকুলা, হুসাইনী, হিজাজ, ইত্যাদি স্বরগ্রাম দুঃখ, হতাশা, নিস্তেজতা প্রভাবিত করে। (কিতাব আল আদুওয়ার, ১৪ তম খন্ড)[২৬৮]

www.amarboi.org

শাফী উদ্দীন এর বার্ষিক পেনশন ছিল বার্ষিক ৫০০০ স্বর্ণ মুদ্রা। হালাকু খানের ১২৫৮ সালে বাগদাদ দখলের সময় শাফী আল দীন বাগদাদে ছিলেন। তিনি কোন প্রকারে হালাকু খানের সম্মুখে উদ বীণাটি সঙ্গে নিয়ে হাজির হওয়ার সুযোগ পান। তিনি বীণা বাজিয়ে এবং সংগীত পরিবেশন করে হালাকু খানকে এত মুগ্ধ করেন যে, হালাকু খান শাফী আল দীনের জীবন, তার পরিবার এবং সম্পদ সংক্রান্ত ক্ষমা ঘোষণা করেন। (হাজী খলিফা, হাবীব আল সিয়ার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬১, ৪১৩)[২৬৯]

হালাকু খানের চাকুরীতে যোগদানের পর তার বার্ষিক বেতন দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রায় বর্ধিত করা হয়। শাফী আল দীন হালাকু খানের মুঘল উজির এবং সাহেব দেওয়ান শামস আল দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মদ আল জুওয়াইনি এর সন্তানদের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন।

পরে তিনি তার ভ্রাতা আতা মালিক এর অধীনে বাগাদদের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।

শাফী আল দ্বীনের এর দুই শিষ্য বাহা আল দীন মুহাম্মাদ (১২৪০-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শরাফ আর দীন হারুন (মৃত্যু ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন তার গুণগ্রাহী এবং পৃষ্ঠপোষক। মুগল উজির শামস আল দ্বীন মুহাম্মাদ জুয়াইনির পুত্র বাহ আল দ্বীন ছিলেন সংগীত, দর্শন এবং অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সমকালীন জ্ঞানীদের বহু উর্ধ্বে।

উজিরের অপর পুত্র শারাফ আল দ্বীন ছিলেন একজন বিদুষী ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তার রচিত কবিতার একটি দিওয়ান গ্রন্থ বৃর্টিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। (D'Ohsson, Histoire des Mongols, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১-১২)[২৭০]।

উজির শামস আল দীন তার প্রতি ছিলেন খুবই অনুগ্রহ পরায়ন। উজিরের দ্বিতীয় পুত্র শরাফ আল দীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল সাইফ আল দীন রচিত ২য় রিসালাত আর শারাফীয়া (শারাফীয়ান গবেষণা গ্রন্থ)।

শফী আল দ্বীন এর শিষ্য বাহা আল দ্বীন মুহাম্মদ ইরাক এবং ইরাকের আযমের সুবেদার নিযুক্ত হন ১২৬৫ সালে। তিনি তার শিক্ষক শাফী আল দ্বীনকে সাথে নিয়ে যান। বাহা আল দ্বীনের মৃত্যুর হয় ১২৭৯ সালে এবং উজির আল জুয়াইনির পরিবারের ক্ষমতা চ্যুতি ঘটে ১২৮৪ সালে।

এর পর শাফী আল দ্বীনের জীবনে দুঃখ দুদর্শা নেমে আসে। তিনশ স্বর্ণ মুদ্রা ঋণের দায়ে তাকে কারাগারে যেতে হয়। তার সুদিনে তিনি স্বহস্তে অর্থ

www.amarboi.org

ব্যয় করতেন। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ফল ফলাদি এবং সুগন্ধি বিতরণের জন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি সেকালে ব্যয় করেন চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা।

শাফী আল দীনের সংগীত সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি ছিল পরবর্তী কয়েক শতাব্দিতে সংগীত শিক্ষার টেক্সট বুক। অথচ তাকে ঋণের দায়ে কারাগারে মৃত্যু বরণ করতে হয়। (সারাফ আল দ্বীন, তাওয়ারিখ জাহান, গুশা ১৮)[২৭১]।

শাফী আল দীন ছিলেন একজন সংস্কৃতি মনা উন্নত রুচিসম্মত মনীষী। মির্জা মুহাম্মাদের মতে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সংগীত এবং হস্তলেখা শিল্প ক্যালিগ্রাফিতে।

ইবনে তাবারী এর মতে খলিফা হারুন অর রশীদের অনুগ্রহ ধন্য সংগীতজ্ঞ ইসহাক আর মাওসুলির পরেই শাফী আল দ্বীনের স্থান এবং ক্যালিগ্রাফিতে তিনি ছিলেন ইয়াকুত এবং ইবন মুকলার সমপর্যায়ে।

শাফী আল দ্বীন কয়েকটি সংগীত যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন। একটি ছিল উন্নতমানের বীণা মুগনী। এটা তিনি আবিস্কার করে ছিলেন ইস্পাহানে থাকা কালে। তার আবিষ্কৃত আর একটি সংগীত যন্ত্র ছিল নুজহা। এটা বংশীয় সংগীত পরিবেশনের সময় ব্যবহার হত।

সংগীত তত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানের ওপর শাফী আল দীনের দুটি গ্রন্থ ছিল ১. কিতাব আল আদুয়ার (সংগীতের সুর সংক্রান্ত পুস্তক) ২. রিসালাত আল শারাফীয়াহ (শারাফীয়ান গবেষণা গ্রন্থ)। প্রথম গ্রন্থটি ১২৫২ সালে প্রণীত হয় এবং সংগীতের টেক্সট বুক হিসাবে গণ্য হত। এই গ্রন্থটির উপরে বহু ভাষ্য গ্রন্থ (সুরুহ) রচিত হয়েছে এবং তিনটি বৃটিশ মিউজিয়ামে এখনও সংগ্রহীত আছে (Guwajni Tarik Zahan Gushali, British Musium OR 136, OR ২৩৬১, হাজী খালিফা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬১)[২৭২]।

রিসালাত শারাফিয়াটি বহুল প্রচলিত। কারণ, এর একটি রিজিউমে প্রকাশ করেছেন Baron Carrade Vaux। এই রিজিউমটি লেখা হয়েছিল ১২৬৭ সালে।

শাফী আল দীনের আর একটি গবেষণা গ্রন্থ ছিল "ফি উলুম আল আরদ ওয়াল কুয়ালীফি ওয়াল বাদী"। এটি ছিল Prosdy, Rhyme and Rhetory সংক্রান্ত পুস্তক। (Groves Dictionary of Music, Third Edition, 4th Volume, P- 498)[২৭৩]।

শাফী আল দীন প্রখ্যাত ছিলেন Systematist Theory এর আবিষ্কারিক ও প্রবক্তা হিসাবে (Henry George Farmer: A History of Arabian

www.amarboi.org

Music, P- 129)।

আলী ইবনে মুসা আল মাগরীবি : আলী ইবন মুসা আল মাগরীবি খ্যাত হয়েছেন ইবন সাইদ (১২১৪-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) নামে। (Brockelmann, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৩-৩১৬; ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ২৮৫)[২৭৪-২৭৫]।

সংগীত সম্পর্কীয় এ যুগের আর একজন ইরাকী সংগীতজ্ঞ ছিলেন আবদুল লতিফ আল বাগদাদী (মৃত্যু ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। তার রচিত পুস্তকটির নাম "কিতাব আল সামাহ"। (Ahl wardt Verj, No 5536)[২৭৬]।

সংগীতের সংগতি এবং অসংগতি সম্পর্কে লিখেছেন তৎকালীন দামেস্কের নুবীয়া কলেজের হানাফী অধ্যাপক তাজ আল দীন আল সারখাদী (মৃত্যু ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তার পুস্তকটির নাম তাসনিফ আল সামা (সংগীত শ্রবণের তিরস্কার)।

অপর একজন শাফেয়ী মুফতি আব্দুর রহমান ইবন ইব্রাহিম আল ফিরকাহ (মৃত্যু ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ) লিখেছেন একটি পুস্তক, যার নাম "কাসফ আল গীনা ফি হাল আল সামা" (সংগীত শ্রবণের সমস্যার সমাধানের পর্দা উম্মোচন)। (Ahlwardt Verj, No. 5536)[২৭৭]।

আইয়ূবীদের শাসন শেষ হয় তুরান শাহের (১২৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সময়। ঐ সময় তুর্কি মামলুকগণ আইয়ূবী সুলতানাতের অবসানে ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। আইয়ূবীদের শাসন কালে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল।

আব্বাসিয়া রাজত্বের শেষ দিকে বহু রাজনৈতিক বিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু সুলতান সালাউদ্দীন, সেভিলের আল কাজাহ, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ শিল্প, সাহিত্যে, বিজ্ঞান ও সংগীতের উৎকর্ষে মূল্যবান অবদান রাখেন।

আব্বাসিয়া রাজত্বের অবক্ষয়ের সঙ্গে সংগীত চর্চার সোনালী দিনের অবসানের কোন পরিণতিমূলক সম্পর্ক ছিল না। রাজনৈতিক পরিবর্তন যাই হোক না কেন মুসলিম বিশ্বে তৎকালে সংগীতচর্চা সামাজিক ও সংস্কৃতির অবিচেছদ্য অঙ্গ ছিল, যদিও রক্ষণশীল মুসলিমগণ কখনও সংগীতের প্রতি উৎসাহী ছিলেন না।

আব্বাসিয়া যুগের সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম আল মাওসুলি, তৎপুত্র ইসহাক আল মাওসুলি, ইবনে জামী– এরা ছিলেন উমাইয়্যা যুগের ইবনে আয়েশা, ইবনে সুরাইজ, মাবাদ, মালিক এর সমপর্যায়ের।

উমাইয়্যা যুগের সংগীতজ্ঞদের রাজ দরবারে প্রবেশ পাওয়ার জন্য তাদের

www.amarboi.org

যোগ্যতাই ছিল বড় কথা। কিন্তু আব্বাসিয়া যুগের সংগীত এবং সংগীত যন্ত্রের উপরে কারো দক্ষতা রাজ দরবারের সংগীতজ্ঞের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। তাদের সংগীত প্রতিভা ছাড়াও অন্যান্য গুণাবলীর দরকার ছিল। তা হলো – পরিচয়, যোগযোগ, দাবা খেলার দক্ষতা, কিচছা কাহিনী বলার নৈপুণ্য, ইত্যাদি। তদুপরি প্রয়োজন ছিল লেখক এবং কবি হওয়া। কবি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উমাইয়্যা যুগেও ছিল। (Henry George Farmer, A History of Arabian Music, পৃষ্ঠা-১৫৭)[২৭৮]।

গ্রানাডার নাসরিদ বংশ : উত্তর আফ্রিকায় মুয়াহ্হিদ শাসকগণ আন্দালুসিয়া, স্পেন হতে বিতাড়িত হলে আন্দালুসিয়ার সকল মুসলিমদের পক্ষে দেশ ছেড়ে আফ্রিকায় আসা সম্ভব হয়নি। যারা ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে রাজী হয়নি, তাদের অনেককেই শাহাদাতের সরাবের পেয়ালা পান করতে হয়।

অবশিষ্ট মুসলিমদের কেও কেও গ্রানাডায় আশ্রয় গ্রহন করেন। এই সময় গ্রানাডায় ক্ষমতায় ছিলেন নাসরিদ বংশ (১২৩২-১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ)। খৃষ্টানদের চাপের মুখে গ্রানাডার নাসরিদ বংশীয় রাজগণ ইসলামের নিভু নিভু প্রদীপ পাহারা দিতেছিলেন।

আব্বাসিয়া যুগে মহিলা সংগীত শিল্পী
(৭৫০-১২৫৮খ্রী.)

আব্বাসিয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল-মানসূর (৭৫৪-৭ খ্রীঃ) ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস সাফফাহ (৭৫০-৫৪ খ্রীঃ) ভ্রাতা। আল-মানসূর ছিলেন অতি উত্তম মানের শাসক। প্রতিভাবান আল-মানসূর আব্বাসিয়া খেলাফতকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। আব্বাসী খেলাফতের অবসান ঘটে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এ বংশের ৩৭ জন খলিফা খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন।

সংগীত ও শিল্প কলায় আগ্রহ থাকলেও আল-মানসূর সংগীতকলাকে মূল্যমান সময়ের অপচয় মনে করতেন। মহিলাদের সংগীতচর্চার দিকে আব্বাসিয়দের বিতৃষ্ণা না থাকলেও উদাসীনতা ছিল বলা যায়।

বাসবাস : ইয়াহইয়া ইবনে নাফিস ছিলেন মদীনার একজন অভিজাত সংস্কৃতি-মনা ব্যক্তিত্ব। তার বাসভবনে সংগীতের আসর বসত। সংগীতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ইয়াহইয়া ইবনে নাফিসের খ্যাতি ছিল। মহিলা সংগীতজ্ঞা

www.amarboi.org

বাসবাস ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে নাফিসের দাসী সংগীত বালিকা।

ইয়াহইয়া ইবনে নাফিসের বাস ভবনে সংগীতজ্ঞ "আবদুল্লাহ ইবনে মুসা" সংগীত বালিকা "বাসবাস" এর গীত সংগীত শ্রবণ করে অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুসা অতঃপর "বাসবাস" এর জন্য সংগীত রচনা শুরু করেন। এই সংগীত গুলো দ্বিতীয় আব্বাসিয়া খলিফা আল মানসুরকে (৭৫৪-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এত বেশী মুগ্ধ করে যে তিনি ঐ সংগীত সমূহ কণ্ঠস্থ করে ফেলেন।

আল-মানসুরের পরবর্তী এবং তৃতীয় আব্বাসিয়া খলিফা আল মাহদী (৭৭৫-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) যুবরাজ থাকাকালে "বাসবাস" এর সংগীত চাতুর্য্য ও সংগীত কুশলতার খবর পেয়ে ইয়াহইয়া আল নাফিস থেকে বাসবাসকে **সতর হাজার স্বর্ণ মুদ্রায়** ক্রয় করে নেন। মদীনায় থাককালে তার সৌন্দর্য্য উল্লেখ করে কবিগণ কবিতা রচনা করতেন। (কিতাবুল আগানী ১৩ খন্ড, পৃষ্টা ১১৪; Nihayat Al Arab,Volume 5, P.- 70)[২৭৯-৮০]।

আল মুনাজ্জিম এর সংগীত পরিবার : আল মুনাজ্জিম এর পরিবারে বহু খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ, কবি, ঐতিহাসিক এবং সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের অনেকেই ছিলেন খলিফাদের ও অন্যদের প্রিয় এবং অন্যদের ইর্ষান্বিত সংগীত সহচর। আব্বাসিয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল মানসুর (৭৫৪-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এর মুক্ত দাস ছিলেন সংগীতজ্ঞ ইয়াহইয়া ইবন আবী মানসুর। ইয়াহইয়া ইবন আবি মানসূর ছিলেন খলিফা মামুনের (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) অত্যন্ত অনুগত এবং অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তিনি ৮৩১ সালে ইন্তেকাল করেন। তার দুই পুত্র মুহাম্মাদ এবং আলী উভয়ই ছিলেন সংগীত বিশেষজ্ঞ।

সুলতান আবদুর রহমান-১ (৭৫৬-৮৮) : এশিয়া ভূখন্ডে উমাইয়্যা খেলাফতের সমাপ্তি ঘটে ৭৫০ সালে। তৎপূর্বেই মুসলিম বাহিনী সমগ্র উত্তর আফ্রিকা করতলগত করে দুঃসাহসী তারিকের নেতৃত্বে জিব্রালটাল প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে পৌছে যায়। তিন বছরের মধ্যে ৭১৩ সালে পিরিনিজ পর্বত পর্যন্ত মুসলিম পদানত হয়। উমাইয়্যা রাজধানী দামেস্ক (সিরিয়া) হতে থেকে স্পেনে গভর্ণর নিযুক্ত করা হত।

আব্বাসিয়াদের হত্যাযজ্ঞ থেকে আত্মরক্ষা করে মাত্র একজন উমাইয়্যা যুবরাজ আব্দুর রহমান কোন প্রকারে আন্দালুসিয়ায় পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন। তখনো আন্দালুসিয়ায় উমাইয়্যাদের হাজার হাজার সমর্থক ছিল। তারা আবদুর রহমানকে কেন্দ্র করে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করে। এক বছরের

www.amarboi.org

মধ্যেই প্রথম আবদুর রহমান এর বিজয় বাহিনী কর্দোভায় প্রবশে করে। তখন থেকে প্রথম আবদুর রহমান নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন (৭৫৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে ক্ষমতাসীন ছিলেন দ্বিতীয় আব্বাসিয়া খলিফা আবূ জাফর আবদুল্লাহ আল মানসূর (৭৫৪-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

সংগীতজ্ঞা আফজা : সংগীতজ্ঞা আফজা ছিলেন আন্দালুসিয়ার সুলতান প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) এর পছন্দনীয় সংগীত বালিকা। তাকে প্রাচ্যভূমি থেকে ক্রয় করে আনা হয়। সংগীতজ্ঞা হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। (Al- Maqqari, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- 97-8)[281]।

যদিও বাগদাদ কেন্দ্রীক আব্বাসিয়া শাসন থেকে ভিন্নতর একটি বিকল্প উমাইয়্যা খেলাফতের ধারা আন্দোলুসিয়ায় শুরু হয়, তৃতীয় আব্দুর রহমান এর পূর্ব পযর্ন্ত আন্দালুসিয়ার উমাইয়্যা শাসকগণ নিজেদেরকে খলিফা বলে দাবী করতেন না।

আন্দালুসিয়ায় উমাইয়্যা সুলতানদের ইতিহাস নতুন ভাবে লেখা শুরু হয়। আব্বাসিয়াগণ তাদেরকে ইউরোপে ধাওয়া করেনি। এটা ছিল আব্বাসিয়াদের উদারতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়।

নতুন রাজ্য সংঘটিত করতে আবদুর রহমানকে (৭৫৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তা সত্ত্বেও সংগীতের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। তার সংগীত বালিকা আফজা এবং তার বীণা (উদ) সংগীত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে ।

Stanley Lane Poole এর ভাষায় যখন সমগ্র ইউরোপ ছিল বর্বরোচিত অজ্ঞতা ও সংঘাতে নিমজ্জিত, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার উজ্জল আলো পাশ্চত্যের সম্মুখে জ্বল জ্বল করছিল আন্দালুসিয়ায়– যা ছিল মধ্য যুগের অবিশ্বাস্য বিস্ময়। (Stanley Lane Poole : Moors in Spain, P- 43)[২৮২]।

আব্বাসিয়া খলিফা হারুনুর রাশীদের যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৭৮৬-৮০৯ খ্রী.)

দাত আল খাল (সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠার্থী) : সংগীতজ্ঞা দাত আল খালকে ক্রয় করেন খলিফা হারুন অর রশীদ। তাৎক্ষনিক ক্রয় মূল্য ছিল সত্তর হাজার রৌপ্য মুদ্রা। খলিফা হারুন অর রশীদ উক্ত দাসীকে নিজের আনন্দ বা খিদমতের জন্য

www.amarboi.org

ক্রয় করেন নি। খলিফার একজন অতি অনুগত খাদেম ছিল হাম্মা ওয়াইহী।

খলিফা তাঁর খাদেম হাম্মা ওয়াইহীকে স্ত্রী হিসাবে উপহারের জন্য সুন্দরী দাত আল খালকে ক্রয় করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দাত আল খাল খলিফা হারুনুর রশিদের প্রাসাদে ফিরে আসেন। দাত আল খাল ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট সংগীতজ্ঞা।

সংগীতজ্ঞা ইনান : সংগীতজ্ঞা ইনান ছিলেন আল নাতিফী নামে এক অভিজাত ব্যক্তির খাদিমা। তিনি কবিতা রচনা করতেন। তার রচিত কবিতা একদিন খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে আবৃতি করে শোনানো হয়। ইনানের রচিত কবিতা শ্রবনে খলিফা মুগ্ধ হন। তার খোজ খবর নেন। খলিফা ইচছা করলেন তাকে মুক্ত করে দিতে।

মহিলা কবি ইনানের মালিক নাতিফী সংগীত বালিকা ইনান এর মুক্তির জন্য চড়া দাম চাইলেন। খলিফা হারুন অর রশিদ **চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রায়** তাকে মুক্ত করে দেন। প্রতিটি স্বর্ণ মুদ্রার নিম্নতম ওজন ছিল এক তোলা।

সংগীতজ্ঞা দানানীর (সম্পদ) : সংগীতজ্ঞা দানানীর উপনাম ছিল আল বার্মাকীয়া। তিনি ছিলেন মদীনার এক ব্যক্তির দাসী বালিকা। মালিক তাকে বিক্রয় করে দেন আব্বাসিয়া যুগের ধনাঢ্য ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন খালিদ আল বার্মাকি এর নিকট।

ইয়াহইয়া অবশ্যই তার সংগীত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে মুক্ত করে দেন। দানানী ছিলেন একজন সুশিক্ষিতা সংগীত প্রতিভা এবং কবি।

দানানীর সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহিম আল মাওসুলি, তার পুত্র ইসহাক আল মাওসুলি, ইবনে জামী, ফুলাইহ ও বাদল প্রমুখ কালজয়ী সংগীতজ্ঞ বৃন্দ।

খলিফা হারুন অর রশিদের দরবারে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) সংগীত পেশ করতেন সংগীতজ্ঞা দানানীর। তার রচিত একটি সংগীতের পুস্তক ছিল। এই পুস্তকটির নাম "কিতাব মুজাররাদ আল আগানী" অর্থাৎ নির্বাচিত সংগীত গ্রন্থ। (Al-Nuairi, Nihaiyat Al Arab, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯০)[২৮৩] আব্বাসিয়া দরবারের সংগীতজ্ঞ আকিল তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই যুক্তিতে যে, আকিল ছিলেন একজন দ্বিতীয় মানের সংগীতজ্ঞ।

সংগীতজ্ঞা আতিকা বিনতা সুহদা : আতিকা বিনতা সুহদা ছিলেন সংগীতজ্ঞা সুহদার কন্যা। মাতা সুহদা ছিলেন উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারের সংগীতজ্ঞা। সুহদার মত কন্যা

www.amarboi.org

আতিকাও ছিলেন অতি উন্নতমানের গায়িকা। সংগীত শাস্ত্রবিদ ইয়াহইয়া ইবন আলী এর মতে আতিকা বিনতা সুহদা ছিলেন সংগীত জগতের অন্যতম উজ্জল নক্ষত্র।

খলিফা হারুন আর রাশীদের দরবারে সংগীতজ্ঞা হিসাবে আতিকা বিনত সুহদার ছিল বিশেষ মর্যাদা। তার শিক্ষার্থী শিষ্যদের মধ্যে ছিল সুবিখ্যাত ইসহাক আল মাওসুলি এবং মুখারিক। (কিতাবুল আগানী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮)[২৮৪]।

সংগীতজ্ঞা আল আমিন বাদল : সংগীতজ্ঞা বাদলের আবির্ভাব হয়েছিল খলিফা হারুন অর রশীদের পুত্র এবং ষষ্ঠ আব্বাসিয়া আল আমিনের দরবারে এবং তার খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল আল মুসতাছিম পর্যন্ত (৫৩৩-৪২ খ্রীষ্টাব্দ)।

বাদল শব্দের অর্থ উপহার। বাদলের পিতৃ ভূমি ছিল মদীনায় এবং মদিনা ছিল তার সংগীত সাধনার বিকাশ স্থান। আব্বাসিয়া শাহজাদা "জাহজা ইবনে খলিফা আল হাদী" তাকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

শাহাজাদা আল আমিন তার সংগীত শ্রবণ করে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং পিতৃব্য পুত্র জাহজাকে অনুরাধ করেন বাদলকে আল আমিন ইবন হারুন এর নিকট বিক্রয় করে দেওয়ার জন্য। শাহজাদা জাহজা জবাব দেন যে সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাতগণ দাস দাসী বিক্রয় করে না।

পরবর্তীতে অবশ্য আল আমিন তাকে পেয়েছিলেন। বাদল ছিলেন অত্যন্ত উন্নতমানের সংগীত শিল্পী। তার সংগীত শিক্ষক ছিলেন ফুলাইহ ইবন আবিল আওরাহ ।

বাদলের ছিল অসাধারন স্মৃতিশক্তি। প্রায় ত্রিশ হাজার সংগীত তার ভান্ডারে সংগৃহীত ছিল। সংগীত সাহিত্য এবং কলায় তার জ্ঞান এবং পারদর্শিতা এত বেশী ছিল যে, ইসহাক আল মাওসুলির মত শতাব্দী খ্যাত তারকাও লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হয়ে যেতেন।

সংগীতের ঐতিহাসিক আবু হাসীস বণর্না করেছেন যে, সংগীতজ্ঞা বাদল ১২ হাজার সংগীতের একটি গানের সংকলন "কিতাবুল আগানী" রচনা করেছিলেন। এটা করেছিলেন আলী ইবনে হিশামের জন্য।

আলী ইবনে হিশাম তাকে এ কাজের জন্য দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়েছিলেন। এই অর্থ ছিল অতি সামান্য। তবে বাদল ছিলেন অন্যতম ধনাঢ্য মহিলা। (Nihaiyat Al Arab, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯০)[২৮৫]

তিনি মৃত্যুকালে রেখে যান বিপুল সম্পদ এবং তার শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন দানামী ও মুতাইন আল হাসীমিয়া। (কিতাবুল আগানী ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১-৩৮)[২৮৬]।

www.amarboi.org

খলিফা মামুন আর রাশীদের যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮১৩-৮৩৩ খ্রীঃ)

উরাইব (মৃত্যু ৮৪১) : সংগীতজ্ঞা উরাইব ছিলেন পঞ্চম আব্বাসীয়া খলিফা হারুন আর রাশীদের নৌ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন ইসমাইল এর দাসী বালিকা। কালক্রমে তিনি হয়েছিলেন কবি, লেখক, সংগীতজ্ঞা এবং সংস্কৃতিমনা মহিলা।

এক সময় একজন প্রেমিকের সাথে তিনি পলায়ন করেন। এ সময় তিনি তার প্রেমিক সাথীসহ বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করতেন বিশেষ করে মরুদ্যানে। এক পর্যায়ে ধৃত হন এবং তার প্রাক্তন প্রভু এবং নৌ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল এর নিকট ফিরে আসতে বাধ্য হন।

অতঃপর সংগীতজ্ঞা উরাইবকে নিয়ে আসেন হারুন অর রশিদের পুত্র আল আমিন (৮০৯-১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। খলিফা আল-আমিনের মৃত্যুর পর উরাইবকে তার প্রাক্তন প্রভুর নিকট ফেরত পাঠানো হয়। এবারও তিনি একজন নতুন প্রেমিকের সাথে পালিয়ে যান। এ প্রেমিক অবশ্য তাকে বিয়ে করেন।

উরাইব এর সংগীত প্রতিভার খবর পেয়ে খলিফা আল মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাকে খলিফার দরবারে নিয়ে আসেন এবং তার প্রতিভার সম্মানজনক স্বীকৃতি দেন। এ সুযোগ পেয়ে দাসী বালিকা উরাইব এর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

আব্বাসিয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত বিশেষজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলি বলেছেন যে, উরাইব থেকে উত্তম কোন উদ বীণা বাদকের পরিচয় তিনি পান নি এবং তার থেকে শালীন ও সংস্কৃতমনা কোন নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। উরাইব ছিলেন একজন রূপসী মহিলা। সংগীতজ্ঞা হিসাবে উরাইবের তুলনা হয় উমাইয়্যা যুগের আজ্জা আল মাইলা এবং জামিলার সঙ্গে।

বলা হয় যে উরাইব এর একুশ হাজারেও বেশী মেলোডি বা সুর ধ্বনি কণ্ঠস্থ ছিল। উরাইব সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি ছিলেন হিজাজের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহিলা সংগীতজ্ঞা। তারযুক্ত বাদ্য যন্ত্র (আওতার) এবং সংগীতের সুরে (নাগাম নোট) তিনি ছিলেন হেজাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত কলা কুশল বিশেষজ্ঞা।

আব্বাসিয়া খলিফা মুতাসিমের আমলেও (৮৩৩- ৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ) উরাইব সংগীতামোদীদেরকে মুগ্ধ করতেন তার দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং কণ্ঠস্বরের মাধুর্য

www.amarboi.org

দ্বারা। উরাইব এর ইন্তেকাল হয় ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে। খলিফা মুতাসিম(৮৭০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) উরাইব গীত সংগীত সংগ্রহের নির্দেশ নামা জারি করেন। (Al-Nuwairi, Nihayat Al-Arab, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯২; কিতাবুল আগানী ১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫-৯১)[২৮৭-৮৮]।

উবাইদা তামবুরিয়া : সংগীতজ্ঞা উবাইদা কর্তৃক তামবুরা বাজানো সম্পর্কে খলিফা মামুন আর রশীদের দরবারের সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল মাওসুলি বলেছেন যে, উবাইদা থেকে উত্তম তামবুরা বাজাতে পারে বলে যদি কেউ দাবী করে সে একজন মিথ্যা গোলযোগকারী।

ইয়াহইয়া বার্মাকি ছিলেন তামবুরা বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক। তার মতে উবাইদা ছিল অতি উত্তম মানের সংগীতজ্ঞা এবং ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

উবাইদা এর তামবুরা শিক্ষক ছিলেন আল খুবাইদী আল তামবুরী নামে খ্যাত একজন বিখ্যাত শিল্পী। তিনি থাকতেন উবাইদার পিতৃভবনে। পিতার মৃত্যুর পর উবাইদা প্রকাশ্যভাবে তামবুরা সংগীত চর্চা শুরু করেন এবং পেশাগত শিল্পী হিসাবে আবির্ভূত হন।

অতঃপর "আলী ইবনে ফরাজ জাহয" নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাকে বিবাহ করেন। তাদের একটি কন্যা সন্তানও জন্ম গ্রহন করে। বিবাহ বিচেছদের পর তিনি হামজা ইবনে মালিক নামে এক সংগীতজ্ঞের বাসভবনে আশ্রয় গ্রহন করেন। আশ্রয় দাতা নিজেই ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ এবং মিজাফাহ বাদক এবং প্রার্থনা সংগীত গায়ক।

যন্ত্র সংগীত বাদক হিসাবে উবাইদা এর প্রতিভা ছিল সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তামবুরা বাদক ছিলেন "মাসদুদ" নামে একজন প্রখ্যাত যন্ত্র সংগীত শিল্পী। একই অনুষ্ঠানে উবাইদা এবং মাসদুদ আমন্ত্রিত হন।

তামবুরা বাজাতে আসতে বলা হলে "মাসদুদ" তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন– এই বলে যে উবাইদার ন্যায় তামবুরা সাম্রাজ্ঞীর সম্মুখে কোন উপস্থাপনার যোগ্যতা তার নেই।

তামবুরা বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক "জাহজা আল বার্মাকি" এক সময় উবাইদা এর তামবুরা হাতে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তামবুরাটির গাড়ের নিচে

www.amarboi.org

লেখা ছিল "প্রেমের ক্ষেত্রে কোন মানুষ আনুগত্যহীনতা ব্যতীত যে কোন অত্যাচার সহ্য করতে পারে"। ঐ তামবুরাটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন জাফর ইবনে আল মামুন। বলা হত যে, উবাইদার ভালবাসা ছিল তার সংগীত এবং সংগীত যন্ত্রের সঙ্গে। (কিতাবুল আগানী, ১৯খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৪-৩৭)[২৮৯]।

মুনিসা : সংগীতজ্ঞা মুনিসা ছিলেন আব্বাসিয়া খলিফা মামুন আর রশিদ (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এর একজন সংগীত বালিকা। মামুনের ইন্তেকাল এর পর তার মালিকানা আসে মুহাম্মদ ইবন তাহিরের অধিকারে। আল মাসুদীর মতে মুনিসা ছিল খলিফা আল মাহদী (৭৭৫-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) এর একজন দাসী সংগীতজ্ঞা।

আল মাসুদীর গ্রন্থ "সুরুজ আল জাহাব" এর মধ্যে তার সংগীত এবং ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু ঘটনার বর্ণনা আছে। (আল মাসুদী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৭-৯৩)[২৯০] উক্ত কিতাবে তার রচিত কয়েকটি সংগীতেরও বর্ণনা আছে।

খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ্ -এর যুগের মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮৩৩-৪২ খ্রীঃ)

ফাজাল : সংগীত বালিকা ফাজাল ছিলেন বাগদাদের খলিফা হারুন অর রশিদের কন্যার একজন খাদিমা। তিনি এক জায়গায় থেকে তৃপ্ত ছিলেন না। বাগদাদ থেকে কোন উপলক্ষে চলে যান মদীনাতে। মদীনা থেকে সঙ্গী আলাম সহ পাড়ি দেন আফ্রিকা এবং তথা থেকে আন্দালুসিয়ায়।

স্বীয় প্রতিভা গুনে তিনি আন্দালুসিয়ার রাজা দ্বিতীয় আবদুর রহমানের (৮২২-৫২ খ্রী.) দরবারে নিজের জন্য সম্মান জনক অবস্থান করে নেন। (Al-Maqqari, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৬)[২৯১] আন্দালুসিয়ায় খলিফা দ্বিতীয় আবদুর রহমানের খেলাফত কালে বাগদাদে খলিফা ছিলেন আল মামুন, মুতাসিম, ওয়াসিক ও মুতাওয়াক্কিল।

সারিইয়া এবং ইব্রাহীম ইবন মাহদী : সংগীতজ্ঞা সারিইয়া ছিলেন অভিজাত কুরাইশ গোত্রের কন্যা। তার মাতা ছিলেন কুরাইশদের বানু জোহরা শাখার দুহিতা এবং পিতা ছিলেন বানু সামা ইবনে লুআই গোত্রীয়।

যদিও সারিইয়া ছিলেন কুরাইশ গোত্রের– তার মাতা তাকে বিক্রয়ের জন্য নিলামে তোলেন। ইচছা হয়ত ছিল ক্রেতা পছন্দমত হলে বিক্রয় করবেন এবং তা না হলে নয়।

www.amarboi.org

সারিইয়ার সৌভাগ্য ক্রমে ক্রেতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন আব্বাসিয়া শাহজাদা এবং মামুনের পিতৃব্য ইব্রাহিম ইবনে আল মাহাদী। ইব্রাহিম ইবন আল মাহদী ছিলো তৃতীয় আব্বাসিয়া খলিফা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল মাহদীর পুত্র।

শাহজাদা ইব্রাহিম নিজেই ছিলেন একজন সেরা সংগীতজ্ঞ। তিনি সারিয়ার জন্য সেরা সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সুখ্যাত রাইখ। শিক্ষা সমাপ্তির পর শাহজাদা ইব্রাহিম সারিইয়াকে উপহার হিসাবে অর্পণ করেন স্বীয় কন্যা মাইমুমের নিকট।

পরবর্তীতে শাহজাদা ইব্রাহিম আল মাহদী তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেন এবং বিবাহ করেন। শাহাজাদা ইব্রাহিমের এ আচরণে অষ্টম আব্বাসিয়া খলিফা আল মুতাসিম (৮৩৩ -৪২ খ্রীষ্টাব্দে) অত্যন্ত বিরক্ত হন। শাহাজাদা ইব্রাহিমের যুক্তি ছিল যে, সারিইয়া হলো কুরাইশ গোত্রের বালিকা।

শাহজাদা ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর সারিইয়্যা মুতাসিম পরিবারে চলে আসেন এবং খলিফাদের দরাবরে একজন সম্মানীত পারিষদ ছিলেন।

সংগীতজ্ঞ মুহাম্মদ ইবনে হারিছকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সংগীত সাধনার শাহজাদা ইব্রাহিম এবং সারিইয়্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে ছিলেন ? মুহাম্মদ ইবনে হারিছ সারিইয়্যার পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন।

সংগীতজ্ঞা সারিইয়া এর বহু নারী পুরুষ শিক্ষার্থী ছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন ফারিদা। (আল-নওয়াইর, নিহায়ত আল-আরাব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০)[২৯২]।

খলিফা মুতাসিমের যুগে সংগীতজ্ঞা

মুতাইম হাসিমিয়া : মুতাইম হাসিমিয়া ছিলেন বসরা নগরীর একজন মুক্ত নারী। বসরা নগরীতে তিনি তার সারাটি জীবন কাটান। সংগীতে তার উস্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ইব্রাহিম আল মাওসুলি এবং তার পুত্র ইসহাক আল মাওসুলি, সংগীতজ্ঞা বাদল প্রমুখ। তিনি শুধু মাত্র প্রখ্যাত সংগীত সাধিকাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি।

আলী ইবনে হিশাম তাকে ক্রয় করে নেন এবং তারা পুত্র কন্যার জনক-জননী হন। মুতাইম হাসিমিয়া সপ্তম আব্বাসিয়া খলিফা আল মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং অষ্টম খলিফা মুতাসিমের (৮৩৩-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে সংগীত পরিবেশন করতেন। (কিতাবুল আগানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১-৩৮)[২৯৩]।

www.amarboi.org

খলিফা ওয়াসিক এবং কালাম আল সালিহিইয়া : কালাম আল সালিহিইয়া ছিলেন সালিহ ইবনে আবদুল ওয়াহেব এর মজলিসের একজন সংগীতজ্ঞা। তাকে ধরা হয় একজন ধুর্ত এবং সংগীত সাধক হিসাবে। কালাম আল সালিহিইয়াকে নবম আব্বাসিয়া খলিফা আল ওয়াসিক (৮৪২-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) **দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রায়** ক্রয় করেন। (কিতাবুল আগানী, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৫-১৮০)[২৯৪]।

আন্দালুসিয়ার আবদুর রহমান-২ এর যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮২২-৮৫২খ্রী.)

আল- কালাম : সংগীতজ্ঞা আল কালাম ছিলেন আন্দালুসিয়া রাজা দ্বিতীয় আবদুর রহমানের (৮২২-৫২ খ্রীঃ) দরবারের একজন বিদুষিণী। তিনি খলিফা আবদুর রহমানের দরবারে আনীত হন একজন সংগীত বালিকা হিসাবে বিসকেয়ান অঞ্চল থেকে। সংগীতজ্ঞা কালাম ছিলেন ইতিহাসবিদ। রাজ দরবারে ইতিহাস বর্ণনা কারী, কাব্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক উত্তম মানের লেখিকা, সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞা ছিলেন আল কালাম। (Al- Maqqari, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২২৫)[২৯৫]।

মুসাবিহ : মুসাবিহ ছিলেন আন্দালুসিয়ার অভিজাত ব্যক্তি আবু হাফস ওমর ইবন কালহীলের সংগীত বালিকা। সংগীতজ্ঞা হিসাবে তিনি জাতীয় খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম জীবনে তার শিক্ষক ছিলেন সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব। (Al-Maqqari, Analectes, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৯০)[২৯৬] সংগীতে তার উৎকর্ষতার খ্যাতি দেশ বিদেশে বিস্তৃত হয়।

ইকদ আল ফরিদের রচয়িতা "ইবন আবদ রাব্বীহি" সংগীতজ্ঞা মুসাবিহ এর উদ্দেশ্যে ও সম্মানে কবিতা রচনা করেছেন।

মুতা : মুতা ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত সম্রাট জিরিয়াবের শিষ্যা। আন্দালুসিয়ার সুলতান ২য় আবদুর রহমান মুতার সংগীতে এত বেশী মুগ্ধ ও বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন যে, জিরিয়াব তাকে সুলতানের জন্য উৎসর্গ করেন। (Al- Maqqari, Analectes, খন্ড ২য় পৃষ্ঠা-৯০)[২৯৭]।

তারাব : কোন একজন ধনাঢ্য বণিক সংগীত বালিকা তারাবকে আন্দলুসিয়ার শাহজাদা মান্দিরের খেদমতে পেশ করেছিলেন। আল মান্দির ছিলেন খলিফা ২য় আব্দুর রহমানের পুত্র। তিনি উপহার দাতা বণিককে তারাবের বিণিময়ে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বকশিশ দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

তারাব ছিলেন একজন উত্তম মানের সংগীতজ্ঞা। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯১)[২৯৮] আন্দালুসিয়ায়ও সংগীতজ্ঞদের সাথে সাথে বহু মহিলা সংগীতজ্ঞারও আবির্ভাব ঘটে ছিল।

খলিফা ওয়াসিক-মুতাওয়াক্কিল এর যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞ

ফরিদা : এক বিখ্যাত মহিলা সংগীতজ্ঞা ফরিদা ছিলেন সংগীতজ্ঞ আমর ইবন বানার সংগীত বালিকা। গৃহকর্তা আমর ইবনে বানার তত্ত্বাধানে ফরিদা অত্যন্ত উন্নতমানের মহিলা সংগীতজ্ঞে উন্নীত হন।

কালক্রমে তিনি খলিফা আল ওয়াসিকের (৮৪২-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)দরবারে আনীত হন। তিনি খলিফা ওয়াসিক থেকে খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারে শ্রোতাদের প্রশংসা ভাজন সংগীতজ্ঞা ছিলেন।

ফরিদার সংগীত শিক্ষক ছিলেন বিদুষী সংগীতজ্ঞ সারিয়্যা। সংগীতজ্ঞা ফরিদা ছিলেন আবাব্বাসিয়া খলিফাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞা ইসহাক আল মাওসুলির একজন ভক্ত এবং প্রশংসাকারী। ইসহাক আল মাওসুলির কোনরূপ সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। (কিতাবুল আগানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩-৬)[২৯৯]।

বুনান : সংগীতজ্ঞা বুনান ছিলেন খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের দরবারের (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) একজন মহিলা সংগীতজ্ঞা। (কিতাবুল আগানী, ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯)[৩০০]।

খলিফা আল-মুতাজ্জিবিল্লাহ্ এর যুগ (৮৬৬-৬৯ খ্রীঃ)

জিরিয়াব : মহিলা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞা "জিরিয়াব"। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আল মুতাজের দরবারেরও একজন সংগীতজ্ঞা। (কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৪২-৪৩)[৩০১]।

বাজীয়া : খলিফা প্রথম মুহাম্মাদের (৮৫২-৮৬) এর পুত্র উসমানের সুপ্রিয় সংগীত বালিকা ছিলেন বাজীয়া। (ইবন আল কুতিয়য়া, পৃষ্ঠা-৮০)[৩০২]।

খলিফা মুতামিদ বিল্লাহ্ এর যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা (৮৭০-৯২ খ্রীঃ)

কামার : সেভিল এবং কারমুনার আমীর ইব্রাহিম ইবনে আল হাজ্জাজ

www.amarboi.org

(মৃত্যু ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারের বিখ্যাত মহিলা সংগীতজ্ঞা ছিলেন কামার। ইব্রাহিম ইবন আল হাজ্জাজ কামারকে ক্রয় করেছিলেন হিজাজের আবু মুহাম্মাদ আল উদরী থেকে।

আবূ মুহাম্মাদ উদরী ছিলেন হিজাজের একজন ব্যাকরণবিদ। সংগীতজ্ঞা কামারের খ্যাতি ছিল সংগীত রচয়িতা, স্বরলিপি আলহান প্রণেতা হিসাবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বাকপটু এবং সুবক্তা। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯২)[৩০৩]।

সাজী : সংগীতজ্ঞা সাজী ছিলেন উবাইদাল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহিরের পারিবারিক সংগীতজ্ঞা। তিনি খলিফা মুতাদ্দিদ (৮৯২-৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) এর দরবারেও সংগীত পরিবেশন করতেন।

সালিফা : মহিলা সংগীতজ্ঞা সালিফা ছিলেন খলিফা মুক্তাদিরের (৯০৮-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারের একজন সংগীতজ্ঞা। (কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২)[৩০৪]।

উনস আল কুলুব : প্রখ্যাত খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের জাকজমকপূর্ণ জহিরা প্রাসাদের আকর্ষণীয় আলোর ছটা ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত সংগীত বালিকা উনুস আল কুলুব। (আল মাক্কারী, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪০৬)[৩০৫]।

বিশারা আল জামির : বিশারা আল জামির খ্যাত ছিলেন বংশীবাদক হিসাবে। তাকে বলা হত প্রাচ্যের সেরা বংশী বাদক। আন্দালুসিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ আবদাল ওয়াহাব আল হুসাইন ইবন জাফর আল হাজিক তার বংশী শুনে আপ্লুত হতেন। (আল মাক্কারী, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৯)[৩০৬]।

নুজহা আল ওহাবীয়া : মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞা ছিলেন নুজহা আল ওহাবীয়া। (ইবন আল আব্বার, তাকমিলা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৫)[৩০৭]।

উম্মে আবিল জাইস : ইয়ামেনের সুলতান আবুল মানসুর ইবনে ফাতিকের (১১০৯-২৩ খ্রীষ্টাব্দ) একজন স্বনামধন্য সভা কবি ও সংগীতজ্ঞা ছিলেন উম্মে আবীল জাইস। (Kay H. C., Yaman, Its early Medieaval History, পৃষ্ঠা-৯৮)[৩০৮] আল মানসুর ছিলেন নাজাহীদ বংশীয় সুলতান।

ওয়ার্দা : ইয়ামেনের নাজাহিদ বংশীয় উজির উসমান আল নুজীর এর একজন বিখ্যাত ও ইতিহাসে উল্লেযোগ্য দাসী সংগীত বালিকা ছিলেন "ওয়ার্দা"। (H. C. Kay Yaman, Its early Medieval History, পুর্বোক্ত,

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা-১০৪-১১১)[৩০৯]।

আল কাছীর ওয়াল্লাহদা বিনত আল মুসতাকফি : সংগীতজ্ঞা ওয়াল্লাহদা ছিলেন তার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, সংগীত রচয়িতা ও সংগীত গায়িকা। তিনি ছিলেন আন্দালুসিয়ান খলিফা আল মুসতাকফি (১০২৪-২৭ খ্রীষ্টাব্দ) এর কন্যা। তার গৃহ ছিল শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগীত প্রেমিকদের মিলন তীর্থ।

এই তীর্থেই তিনি প্রেমে পড়েছিলেন সমকালীন কবি ইবনে জাইদুনের সঙ্গে। তার প্রেম কাহিনী আন্দালুসিয়ান ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। সংগীতজ্ঞা হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচচমানের। সংগীতের ইতিহাসে তিনি উচচকিত হন খলিফা হারুন অর রশীদের বৈমাত্রীয় ভগ্নি এবং আব্বাসিয়া যুগে সংগীতজ্ঞা শাহজাদী উলাইয়ার সঙ্গে। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৫)[৩১০]।

হিন্দ (১১৫২ খ্রীষ্টাব্দ) : সংগীতজ্ঞা হিনদ ছিলেন আন্দালুসিয়ার একজন প্রখ্যাত অমাত্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তির দাসী বালিকা। আবূ মুহাম্মাদ আল আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আল মাতাবী ছিলেন তার মালিক। আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ স্বীয় গুনে মানব ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু স্বীয় দাসী বালিকার মালিক হওয়ার গুণে তিনি আজ ইতিহাসে উল্লেখ্য। হিনদ ছিলেন একজন উচচমানের সংগীতজ্ঞ এবং "উদ" বীণা বাদক।

বিখ্যাত কবি আবু আমীর ইবনে ইয়ান্নাফ (মৃত্যু ১১৫২ খ্রীষ্টাব্দ) হিনদের সম্মানার্থে রচিত কবিতায় একটি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তা হল- হিনদের নাগামাত বা সংগীত ধ্বনি এবং থাকিল আওয়াল ছন্দে তার বীণা স্বর শ্রবণের ইচ্ছা। (আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৩৪)[৩১১]।

আব্বাসিয়া যুগে সোনালী অধ্যায়ে রাজ দরবারের অন্যান্য সংগীতজ্ঞগণ ছিলেন ১. হাসানা ২. দামাম ৩. দুফাক ৪. সাম্‌বা ৫. রাইক ৬. কুমারিকা প্রমুখ। তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে কিতাবুল আগানী এবং অন্যান্য সংগীত গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে মহিলা সংগীতজ্ঞা
(৮৪৭-৮৬১ খ্রীঃ)

মাহবুবা : সংগীতজ্ঞা মাহবুবা এর জন্ম বসরাতে। তাকে ক্রয় করে নেন তাইফের একজন উত্তম ব্যক্তি। তিনি তার দাসী বালিকার মধ্যে সংগীত

www.amarboi.org

প্রতিভার লক্ষণ দেখে কন্যাবৎ প্রতিপালন করেন এবং তার জন্য গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ শিক্ষার মধ্যে সংগীত এবং বীণা প্রশিক্ষণও ছিল। মাহবুবা ছিলেন একজন অতি উন্নত মানের কবি।

আবদুল্লাহ ইবন তাহের ছিলেন খলিফা **মুতাওয়াক্কিলের** একজন প্রিয় সভাসদ। তিনি মাহবুবাকে অতি উচচ মূল্যে ক্রয় করে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) খেদমতে পেশ করেন।

খলিফা মাহবুবার বিবিধ গুনাবলীতে অতি মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে যান। তিনি মাহবুবার বিচেছদ সহ্য করতে পারতেন না এবং তাকে না পেলে শোকে অধীর হয়ে যেতেন। এই গুণবতী কবি সংগীতজ্ঞা সকলের প্রিয় হয়ে যেতেন বলে তিনি মাহবুবা নামে খ্যাত হন। তার মুল নামটি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকান্ডের পর মাহবুবা স্থানান্তরিত হন তাৎকালীন **উজির ওয়াসিক আল তুর্কির** কর্তৃত্বে। তাকে যখন মন্ত্রী ওয়াসিফ আল তুর্কির সন্মুখে আনা হয়, তখনোও তার পরিধানে ছিল তার প্রাক্তন প্রভু খলিফা মুতাওয়াক্কিলের হত্যা জনিত শোক বস্ত্র।

সংগীতজ্ঞরা সাধারনত জীবিত প্রভুর চিত্ত বিনোদন করে থাকে। মৃত্যুর পর শোক করে না। কিন্তু মাহবুবার আচরণে ব্যতিক্রম দেখে মন্ত্রী মহোদয় বিস্মিত হলেন।

মন্ত্রী ওয়াসিফ আল তুর্কি মাহবুবাকে নির্দেশ দিলেন সংগীত পরিবেশন করতে। সংগীতজ্ঞ মাহবুবা একটি বীণায় হাতে নিলেন। তার প্রাক্তন প্রভু খলিফা মুতাওয়াক্কিলের স্মরণে কয়েকটি করুন শোক সংগীত পেশ করেন।

মন্ত্রী ওয়াসিফ আল তুর্কি তার দাসী বালিকা তারই সন্মুখে আর একজনের জন্য শোক প্রকাশ করবে– এরূপ বেয়াদবি হজম করার মত ব্যক্তি ছিলেন না। মন্ত্রী ওয়াসিফ সংগীতজ্ঞা মাহবুবাকে কারারুদ্ধের নির্দেশ দিলেন।

পরবর্তীতে তাকে একজন তুর্কি সেনাপতি বুঘ এর সুপারিশে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সামারা নগরী ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং শোক গ্রস্থা মাহবুবা বাগদাদ ত্যাগ করে চলে যান এবং কোথায় কিভাবে ইন্তেকাল করেন সে খবর অজানা থেকে যায়। (আবুল হাসান আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী : আল মাসুদী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮১-৬)[৩১২]।

www.amarboi.org

আব্বাসিয়াদের পতনের যুগে খলিফাদের ইতিহাস চর্চা ও রচনা ব্যাহত হয়। কোন জাতি বা ব্যক্তির উত্থানের সময় সংগীত চর্চার জন্য কাল ক্ষেপন করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। রাজা বাদশা এবং আমীর ওমরাহদের অধঃপতনের যুগে তাদের সময় ক্ষেপন হয় মদ্যপান, ভোগবিলাস, নৃত্য কলা, সংগীত ইত্যাদিতে।

আব্বাসিয়াদের পতনের যুগে সংগীত চর্চা বৃদ্ধি পেলেও সে যুগের ইতিহাস কমই লেখা হয়েছে। তাই সংগীতজ্ঞ, সংগীতসাধক ও সংগীত গ্রন্থের উল্লেখ কমই হয়েছে। পতনের যুগে সংগীত চর্চার কেন্দ্র রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থাকে না। বরং প্রত্যন্ত অঞ্চলের সভ্রান্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায়– তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে।

মুসলিমদের পতনের যুগে সুন্নি মাজহাবত্রয়– মালেকী, হানাফী ও শাফেয়ী অপেক্ষা চতুর্থ হাম্বালী মাজহাবের প্রভাবই ছিল বেশী। সুন্নিদের মধ্যে হানাফীগণ ছিলেন সবচাইতে উদার এবং হাম্বালী (রঃ) ছিলেন সবচেয়ে কড়া পন্থী। পরবর্তীতে হানাফীগণ হয়ে পড়েন সবচেয়ে গোড়া ও রক্ষণশীল। আমরা আমাদের দৃষ্টি পীর, বুজুর্গ, ওয়ালী, কামেল, হুজুর কেবলা, শাহান শাহে শরীয়ত-তরীকত, মারেফাত সাইয়্যেদুল আওলীয়া অতিক্রম করে সাহাবা কিরাম পর্যন্ত পৌছতে পারি না। হাদীস, কুরআন, সাইয়েদুল মুরসালীন (সাঃ) তো অনেক দূরের ব্যাপার।

আব্বাসীয়াদের পতনের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান এর কেন্দ্র অল্প কালের জন্য আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। স্পেনে মুসলিমদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জাহানে এলম চর্চার জাহাজ গুলোর সাগরডুবি হয় এবং জ্ঞান চর্চার মাজার সৃষ্টি হয়। এই মাজারগুলো হতে অতীতের সুঘ্রান নির্গত হয়। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো বিচছুরিত হয় না। সার্বিক অন্ধকারের মধ্য হতে কিছু কিছু আলোকছটা নির্গত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে।

www.amarboi.org

আব্বাসিয়া যুগে সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র

১. J. Owen, The Skeptics in the Italian Renaissance, London, ১৮৯৩, চ.- ৬৫.

২. Henry George Farmer : A History of Arabic Music, Luzac and Company, London, 1929, P.- 101.

৩. ইখওয়ান আল সাফা, বোম্বে সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৭, ৯২, ১০১।

৪. আল-নুওয়াইরি : নিহাইয়াাত আল-আরাব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৩-২২।

৫. E. G. Browne: A Literary Histroy of Persia from the Earliest times till Firdousi, Vol- 1, London, ১৯০২, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬।

৬. Henry George Farmer : A History of Arabian Music, পৃষ্ঠা ১৪৫।

৭. Al-Maqqari, The History of Mohammedan Dynasties in Spain, 1g খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০, ১১৭-৮।

৮. Zakariyyah Al-Qazwini : Athar al Bilad, পৃষ্ঠা- ৩৬৪।

৯. Henry George Farmer : A History of Arabic Music, P.- 215.

১০. আবুল হাসান আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২১-২২।

১১. নাদিম আল-ওয়াররাক বাগদাদী, কিতাব আল ফিহরিষ্ট, পৃষ্ঠা- ৪৩।

১২. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৯৪।

১৩. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫০।

১৪. আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা -৯।

১৫. আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী ঃ কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩, ৬৬,

১৬. আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪।

১৭. আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭-১০।

১৮. আবুল ফারাজ আল- ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯।

১৯. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১।

২০. কিতাবুল আগানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮-১০১।

২১. আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪।

২২. কিতাবুল আগানী, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৮-৮০।

২৩. আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮।

২৪. আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯।

২৫. কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২।

২৬. আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯।

২৭. Al-Wardt: Abu Nuwas, পৃ. ১০১ ; H. G. Farmer, A History of Arabic Music, পৃ. ১১৬।

২৮. আব্দুল্লাহ ইবন আবদ রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮।

২৯. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১।

৩০. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, Vol 1, P.- ২১,

৩১. আবুল হাসান আল মাসুদী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮।

www.amarboi.org

৩২. W. H. Machathen সম্পাদিত আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭. ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

৩৩. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১।

৩৪. ইবন আবদুন রচিত ইতিহাস, ভাষ্যকার- ইবনে বদরুন, সম্পাদনায়, R. P. A. Dozy, Leyden, ১৮৪৬, পৃষ্ঠা ২৭২।

৩৫. আল গুজুলী, মাতালী আল-বুদুর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪১।

৩৬. কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২-১৫।

৩৭. কিতাবুল আগানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩-৭৫।

৩৮. Henry George Farmer t A History of Arabic Music, P.-১১৮.

৩৯. কিতাবুল আগানী, ১৭ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩।

৪০. কিতাবুল আগানী, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৫।

৪১. Henry George Farmer, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩০।

৪২. ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৮।

৪৩. কিতাবুল আগানী, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯-২২।

৪৪. আল মাসুদী, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪২-৪৭।

৪৫. Henry George Farmer, A History of Arabic Music, P.- ৬২।

৪৬. ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯০।

৪৭. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮।

৪৮. কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭,৪৯. কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬-২৪।

৫০. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০।

৫১. Henry George Farmer : A History of Arabic Music, P.- ২২১।

৫২. কিতাবুল আগানী, ২১ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২০-৫৬।

৫৩. ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৮।

৫৪. Stanly Lane Poole : Moors in Spain, P.- 74.

৫৫. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৫।

৫৬. Henry George Farmer, A History of Arabic Music, P.- ১১৯।

৫৭. কিতাবুল আগানী, ৯ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১।

৫৮. কিতাবুল আগানী ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪।

৫৯. আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ২০ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৩।

৬০. কিতাবুল আগানী, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫১-৪।

৬১. আল মাসরিক, সাময়িকী সংকলন, বৈরুত, ১৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৪।

৬২. আবুল হাসান আল মাসুদী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭-৮।

৬৩. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪।

৬৪. কিতাবুল আগানী, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২।

৬৫. কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪।

৬৬. আল-ওয়াররাক, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২-৪৩।

৬৭. কিতাবুল আগানী, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৭- ৩৯।

৬৮. আল ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৬।

৬৯. Henry George Farmer : A History of Arabic Music, P.- ৯৭।

৭০. আল ওয়াররাক : ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৬।

www.amarboi.org

৭১. ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৯।
৭২. Henry George Farmer ; পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩০।
৭৩. Mechaelis Casiri, Biblitheca Arabic Hispana, Madrid, 1770, P.- 34.
৭৪. ইবনে খালদুন, Prolegomens- ii, Historiqucs (Muqaddiam), P.- 361.
৭৫. Henry George Farmer : Arabic Music, পৃষ্ঠা- ১৩০।
৭৬. Al-Maqqari, The History of Mohamedan Dynasties in Spain. vol 2, P-116-21.
৭৭. Al-Maqqari, Mohammedan Dynasties, Volume 29, P.-121.
৭৮. Von Hammer, Literature of Arabs, Vol iv, P.- 727.
৭৯. আল মাসুদী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯১।
৮০. কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪।
৮১. ইবন টিকটাকা, আল-ফাখরী, পৃষ্ঠা- ৪১৩।
৮২. কিতাবুল আগানী, ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৫৬ -৫৮।
৮৩. ইবন আব্দু রাব্বিহী, ইকদ আল ফরিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯১।
৮৪. কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫।
৮৫. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫।
৮৬. কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫, ৩৬।
৮৭. কিতাবুল আগানী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬২।
৮৮. কিতাবুল আগানী, ১৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৮-১৯।
৮৯. আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২।
৯০. কিতাবুল আগানী, ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০।
৯১. কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০-২১।
৯২. কিতাবুল আগানী, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪-২৭।
৯৩. কিতাবুল আগানী খন্ড ৮ম পৃষ্ঠা- ১৭৫-৮।
৯৪. আল মাসুদী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৭।
৯৫. আল মাসুদী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৪।
৯৬. কিতাবুল আগানী, ১৭তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২১-৪১।
৯৭. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭।
৯৮. ইবন খাল্লিকান, de slane অনুদিত ওয়াফায়াত আল আয়ান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০৬।
৯৯. আল মাসুদী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।
১০০. আল-ওয়াররক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৩।
১০১. আবুল হাসান ইবন আল কিফতি, তারিখ আল-হাকামা, পৃষ্ঠা- ২৬২।
১০২. আল-ওয়াররাক, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪।
১০৩. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৮।
১০৪. কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৪০; ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭।
১০৫. কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৩।
১০৬. কিতাবুল আগানী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৯।
১০৭. Ibn Tiqtaka, Al-Fakhri : History of Muslim Dynasties, Paris, P.- 427.
১০৮. W. Muir, Caliphate, P.-539.
১০৯. আল-ওয়াররাক বাগদাদী, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১১৭।

www.amarboi.org

১০৯ (ক) Henry George Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments, অধ্যায়-৩।
১১০. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪।
১১১. Henry George Farmer, A History of Arabic Music, পৃষ্ঠা- ১৫৭।
১১২. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary.
১১৩. Ibn Khallikan , পূর্বোক্ত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪১৪।
১১৪. ইয়াকুদ, ইরশাদ, আল-আবির (মুজান আল উদাবা) ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮০৬-৯।
১১৫. আল-আখবার জামান, আবুল হাসান আল-মাসুদী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৮-৮৯।
১১৬. আল মাসুদী, আখবার আল-জামান।
১১৭. হাজ্জী খলিফা, কাশফ আল-জুনুন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০৯।
১১৮. আল মাক্কারী, The History of the Mohamedan Dynasties in Spain, ২য় খন্ড, London, ১৮৪০-৩.
১১৯. আল-মাক্কারী, পূর্বোক্ত।
১২০. আগানী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৩।
১২১. আগানী ১৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৬।
১২২. আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৬।
১২৩. আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০০।
১২৪. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩; ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২; ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪।
১২৫. আল-ওয়াররাক, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫।
১২৬. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫।
১২৭. কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৬-৬৭।
১২৮. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৬।
১২৯. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৫।
১৩০. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৮।
১৩১. আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৯,
১৩২. কিতাবুল আগানী, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪।
১৩৩. আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০৬ ,২২২, ২৩৮,
১৩৪. আল-মুবাররাদ, কামিল, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৭।
১৩৫. ইবন রাব্বিহী, ইকদ আল-ফরিদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা- ১৭৬।
১৩৬. আল ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৯, ২৬১।
১৩৭. ইবন সাবিহ উসাইবীয়া, উয়ুন আল আনবা ফি আবাকাত আল আতিব্বা, ১ম খন্ড,পৃষ্ঠা- ২১৪।
১৩৮. আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ১৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৯।
১৩৯. আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৬।
১৪০. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৯।
১৪১. C. Huart, Arab Literature, পৃষ্ঠা- ১৮৫।
১৪২. Henry George Farmer : History of the Arabian Music, পৃষ্ঠা- ১৬৪।
১৪৩. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪।
১৪৪. Hazi Khalifa Manuscript, Number- 5824.
১৪৫. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬১০।
১৪৬. হিলাল, আল-সাবি, কিতাব আল-উজারা, ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১৪।

www.amarboi.org

১৪৭. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৬।
১৪৮. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪,
১৪৯. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪।
১৫০. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২।
১৫১. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২, ৩২।
১৫২. কিতাবুল আগানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪।
১৫৩. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২।
১৫৪. W. Muir The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall, Edited by T.H. Weir, Edinburgh,1915, P.- 566.
১৫৫. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত।
১৫৬. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬১।
১৫৭. ইবনে আবী উসাইবাহ, তাবাকাত আল আতিব্বা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৯।
১৫৮. L. Leclerc : History de la Medicine Arabe, Volume 1, P.- 353.
১৫৯. Henry George Farmer, A History of Arabic Music, পৃ. ১৬৫-৬৬।
১৬০. Ibn Khallikan; Biographical Dictionary, P.- 165.
১৬১. আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২২।
১৬২. Ibn Tiqtaka, Al-Fakhri : History of Muslim Dynasties, P.- 484.
১৬৩. S. Lane Poole, The Eclipse of Abbasid Caliphate, Volume 1, P.- 269.
১৬৪. Stanly Lane Poole : The Moors in Spain, Page 129, 139.
১৬৫. আল-ওয়াররক : কিতাব আল-ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৬।
১৬৬. S.M. Tegor, Universal History of Music, P. 101,
১৬৬ (১). আবুল ফীদা মৃত-১৩৩১ খ্রী. :আখবারুল বাসার History of Mankind), Annales Muslem.
১৬৭. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ২৬৩।
১৬৮. মিকাইলিস কাসিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৯।
১৬৯. Steinschneider, Al- Farabi, P- 79,
১৭০. Henry George Farmer : Arabian Influence on Musical Theory, P.- 1516.
১৭১. Toderini : Volume 1, Page 248-52.
১৭২. হিলাল আল-সাবি, কিতাবুল উজারা, ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১৪।
১৭৩. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪।
১৭৪. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪।
১৭৫. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৩।
১৭৬. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৯৪।
১৭৭. মিকাইলিস কাসিরী, পূর্বোক্ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮।
১৭৮. আল মাক্কারী ঃ Moh. Dynasties, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৯।
১৭৯. Van Vloten, Liber Maatih al Ulum (Leyden, 1895).
১৮০. R. A. Nicholson, Literary History of Arabs, P- 370.
১৮১. Bibliotheka Indica, 1849, পৃষ্ঠা- ৯৩।

www.amarboi.org

১৮২. Amedroz and Margoliouth. The Eclipse of the Abbaside Calliphate, Volume 2, P.- 234.
১৮৩. Amedroz and Margoliouth, The Eclipse of the Abbaside Calliphate, Volume 3, P.- 41, 64.
১৮৪. S. Lane Pool, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1901, পৃ. ১২৫।
১৮৫. কিতাব আল-ফিহরিসত, ১৪০-৫৬।
১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৮-৬২পর্যন্ত।
১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬৫।
১৮৮. Henry George Farmer : A History of Arabic Music, পৃষ্ঠা- ২১৬।
১৮৯. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪০।
১৯০. Casiri, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭১।
১৯১. British Museum Manuscript Folio- 2361, ফলিও ২০০১, ২৩৬১।
১৯৩. Hazi Khalifa, Kasf Al Zunun, Leipzic, London, ১৮৩৫-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭।
১৯২. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫০।
১৯৩. Hazi Khalifa, Kasf Al Zunun, Leipzic, London, ১৮৩৫-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭।
১৯৪. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৫।
১৯৫. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫০।
১৯৬. Margoliouth, Letters of Abul Ali, Volume- ২০।
১৯৭. মিনহাজ ই সিরাজ, তাবাকাত নাসিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৩।
১৯৮. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪০১।
১৯৯. Stanley Lane Poole, The Moors in Spain, P.- 176.
২০০. S. Lane Pool, A History of Egypt in the Middle Ages, London, ১৯০১, পৃষ্ঠা- ১২৫।
২০১. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫১।
২০২. আল মাক্কারী, Al-Mawaiz-wal Itibar.
২০৩. আল-মাক্কারী, আল মাওয়াজ ওয়াল-ইতিবার, পৃষ্ঠা- ৩৫৫।
২০৪. S. Lane, Poole The Moors in Spain, পৃষ্ঠা- ১৩৬।
২০৫. আল মাক্কারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬।
২০৬. Dozy, Histoire Des Musulmans, d'Espagne, 3rd volume, P.-284.
২০৭. আল মাক্কারী, History of Mohammedan Dynasties, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৫।
২০৮. আল মাক্কারী ঃ History of Mohammedan Dynasties in Spain, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪।
২০৯. আল মাক্কারী ঃ History of Mohammedan Dynasties in Spain, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪, Haqiqat Al Arffrah (Cairo Edition) পৃষ্ঠা- ১২৭।
২১০. ইবনে আবী উসাইবিয়া, পুর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪০।
২১১. ইবন আবু উসাইবীয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯।

www.amarboi.org

২১২. Nasir Khasrau, Safar Nama (Paris, 1881), পৃষ্ঠা- ৪৩,৪৬,৪৭।
২১৩. S. Lane Poole, The Moors in Spain, পৃষ্ঠা- ২৪০।
২১৪. S. Lane, Poole, The Moors in Spain, পৃষ্ঠা- ১৩৯;
২১৫. হাজী খলিফা, কাশফ আল-জুনুন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৭।
২১৬. ইবনে খালদুন, Prolegomenes (Moqaddima), ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪২৬-২৭।
২১৭. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১৭।
২১৮. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১৭।
২১৯. Ribera, La Musica de Las Cantigas, P.-72.
২২০. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১৭।
২২১. Haskins, Studies in Mediaeval Science, P.- 12-13.
২২২. R. P. A. Dozy, History of Musalmans in Spain, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৫৫।
২২৩. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১৫।
২২৪. আল মাক্কারী, ২য় খন্ড, পৃ :৩০১।
২২৫. Ribera La Musica de Las Cantigas, P.- 72.
২২৬. R. P. A. Dozy, পূর্বোক্ত, (১৮৪২-৫২) ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯৪, ৮২২।
২২৭. আল মাক্কারী ঃ Mohamedan Dynasties, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৫৪।
২২৮. ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০।
২২৯. W. Ahlwardt Verj, No. 5505. Edited the divans of the Six Arabic Poets, London-1870.
২৩০. Kay : "Yaman , Its Early Mediaeval History", P.- 84, 108, 116.
২৩১. Kay : Yaman, Its Early Mediaeval History.
২৩২. W. Muir : Caliphate, P.- 587.
২৩৩. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২৮-৩১।
২৩৪. Wolf, Bibliography Hibrew, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩১।
২৩৫. ইবন আবী উসাইবিয়া, উয়ুন আন আলবা ফি তাবাকাত আল-আতিব্বা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২।
২৩৬. Ibn Khaldun, Prolegomenes, Historycus of Ibn Khadun, Paris, ১৮৬২-৬৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৩।
২৩৭. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫।
২৩৮. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৫।
২৩৯. Reynold N. Nicholson : Literary History of the Arabs, পৃষ্ঠা- ৪৩২।
২৪০. পৃষ্ঠা-১৫৯, ১৭০-৭৫. Abdul Wahid Al-Marrakushi, The History of Almohades,
২৪১. আল মাক্কারী, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪৮।
২৪২. Ibn Khallikan : Biographical Dictionary, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮২।
২৪৩. Mechaelis Casiri, Bibliotheca Arabic History- ii, P.- ৭৩,
২৪৪. Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭।
২৪৫. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২৫।
২৪৬. Ibn Abi Usaibia- ii, P.- 75.
২৪৭. Al- Maqqari, Mohammedan Dynasties, Vol 1, Append, 'A', iv.

www.amarboi.org

২৪৮. ইবন আবী উসাইবিয়া, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৫।
২৪৯. ইবন আবী উসাইবিয়া, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬২-১৮১।
২৫০. S. Lane Poole, History of Moors, P.- 240।
২৫১. W. Muir, The Caliphate, P.- 587.
২৫২. W. Muir, The Caliphate Page Its Rise, Decline, Fall, P.-589.
২৫৩. ইবন আবী উসাইবিয়া, উয়ুন আল আনকা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৫।
২৫৪. W. Ahl wardt, The Dovans of Six Ancient Arabic Poets, Verz, 5535, পৃষ্ঠা- ২৫।
২৫৫. হাজী খলিফা, কাশফ আল জুনুন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৭।
২৫৬. আল মাক্কারী ঃ Mohammedan Dynasties, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪২।
২৫৭. ইবন আবি উসাইবিয়া, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬২।
২৫৮. ইয়াকুদ, ইরশাদ, আল-আরিব (Mujan al Udaba), ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭৭।
২৫৯. ইবন আল কিফতি, কিতাব ইখবার আল উলামা" (উলামাদের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক)।
২৬০. আবুল ফিদাহ (আখবারুল বাসার), Analectes and Musici, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭৯, ৫২৯।
২৬১. Machaelis Casiri, Bibliothecs, Arabic History, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮১-৮২।
২৬২. আল কুতুবী, ফুয়াত আল ওয়াফায়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।
২৬৩. আল-ওয়াররাক বাগদাদী, ফিহরীস্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৩।
২৬৪. Ibn At-Tiktaka, আল ফাখরী, পৃষ্ঠা- ৫৭১।
২৬৫. E. G. Browne, Literary History Persia, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৬৩।
২৬৬. Bar Habraeus; Historia Orientalis, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।
২৬৭. Ibn At-Tiktata, Al-Fakhri, (History of Muslim Dynestics), Historia Des, Dynasties Mosulman's, Paris, 1910।
২৬৮. কিতাব আল আদুওয়ার, ১৪তম খন্ড।
২৬৯. হাজী খলিফা, হাবীব আল সিয়ার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬১, ৪১৩।
২৭০. D'Ohsson, Histoire des Mongols, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১-১২।
২৭১. সারাফ আল দ্বীন, তাওয়ারিখ জাহান, গুশা ১৮।
২৭২. Tarik Zahan Gushali.
২৭৩. Groves Dictionary of Music, Third Edition, 4th Volume, page 498.
২৭৪. Brocklmann, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৬ ।
২৭৫. আল-ওয়াররাক, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ২৮৫।
২৭৬. Ahl wardt Verj, No 5536.
২৭৭. Ahlwardt Verj, No 5536.
২৭৮. Henry George Farmer, A History of Arabic Music, পৃষ্ঠা ১৫৭।
২৭৯. কিতাবুল আগানী, ১৩ খন্ড, পৃষ্টা ১১৪।
২৮০. Nihayat Al Arab,Volume 5, P.- 70.
২৮১. Al- Maqqari, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭-৮।
২৮২. Stanley Lane Poole :Moors in Spain, P.- 43.

www.amarboi.org

২৮৩. Nihaiyat Al Arab, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯০।

২৮৪. কিতাবুল আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮।

২৮৫. Al-Nuwairi, Nihaiyat Al-Arab, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯০।

২৮৬. কিতাবুল আগানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১-৩৮।

২৮৭. Al-Nuwairi, Nihayat Al-Arab ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯২।

২৮৮. কিতাবুল আগানী, ১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৫-৯১।

২৮৯. কিতাবুল আগানী, ১৯খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৪-৩৭।

২৯০. আল মাসুদী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮৭-৯৩।

২৯১. Al- Maqqari, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৬।

২৯২. নিহায়ত আল-আরাব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮০।

২৯৩. কিতাবুল আগানী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১-৩৮।

২৯৪. কিতাবুল আগানী, ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৫-১৮০।

২৯৫. Al- Maqqari, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২৫।

২৯৬. Al- Maqqari, Analectes, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৯০।

২৯৭. Al- Maqqari, Analectes, খন্ড ২য় পৃষ্ঠা- ৯০।

২৯৮. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯১।

২৯৯. কিতাবুল আগানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৩-৬।

৩০০. কিতাবুল আগানী, ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৯।

৩০১. কিতাবুল আগানী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৪২-৪৩।

৩০২. ইবন আল কুতিয়য়া, পৃষ্ঠা- ৮০।

৩০৩. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯২।

৩০৪. কিতাবুল আগানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২।

৩০৫. আল মাক্কারী, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৬।

৩০৬. আল মাক্কারী, Analectes, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৯।

৩০৭. ইবন আল আব্বার, তাকমিলা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭৪৫।

৩০৮. Kay H. C. Yaman, Its early Medieaval History, পৃষ্ঠা- ৯৮।

৩০৯. H. C. Kay Yaman, Its early Medieval History পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৪-১১১।

৩১০. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৬৫।

৩১১. আল মাক্কারী, Analectes, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৩৪।

৩১২. আবুল হাসান আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী, আল মাসুদী, আখবার আল জামান, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৮১-৬।

www.amarboi.org

চতুর্থ অংশ
উপ-মহাদেশীয় যুগ
সুলতানি আমল

মুসলিম ভারতে সংগীত চর্চা

ভারতীয় হিন্দুদের নিকট সংগীত ছিল ধর্মের অঙ্গ। পূজার মধ্যে সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে পূজা করলে দেব-দেবী সন্তুষ্ট হন। পূজা এবং আরাধনার মধ্যেও সংগীত এবং সংগীত যন্ত্রের ব্যবহার আছে।

মুসলিমদের নিকট সংগীত দুনিয়াদারী আনন্দ বিনোদনের একটি অংশ। সুর অল্প মাত্রায় হলে ভাল। যে সুর চিত্ত-বিনোদনের মধ্যে সীমিত না থেকে মনকে পাগল করে তোলে, প্রেমিকাকে ঘর ছাড়া করে, তা ইসলামে নিষিদ্ধ।

ধর্ম নয়, নিছক চিত্তবিনোদন ও আনন্দের উপকরণ হলো সংগীত। সংগীত আধ্যাতিক নয় বরং জাগতিক, সেকুলার, ধর্ম নিরপেক্ষ। তবে ধর্মীয় অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিলাস, রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগীত মুসলিম সমাজে ও অন্তপুরে প্রবেশ করে।

উমাইয়্যা, আব্বাসিয়া যুগে এবং আন্দালুসীয়ায় (মুসলিম স্পেন) সঙ্গীতের অপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছিল। মুসলিম শাসনাধীনে ভারতে সংগীত-চর্চার উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে বাগদাদ কেন্দ্রীক আব্বাসিয়া শাসন কালের মতো নয়। দিল্লীর সম্রাট এবং প্রাদেশিক রাজ্যসমূহের সুলতানগণ সঙ্গীতের পৃষ্টপোষকতা করতেন। মুসলিমগণ ছিলেন এই উপমহাদেশে পারস্য সঙ্গীতের উত্তরাধিকারী।

আব্বাসিয় আমলে সংগীত-চর্চার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাগদাদে সংগীত শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং সেখান থেকে ছাত্রদের ডিগ্রী দানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। আল-কিন্দী, ইবনে সিনা, আল-ফারাবীর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক এবং পন্ডিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন।

সূফী দরবেশগণ যখন বিনা অস্ত্রে ধর্ম প্রচার করতে ভারত উপমহাদেশে আসেন, তাঁরা তাদের সাথে সংগীত নিয়ে আসেন নি। মদীনার ইসলামে সংগীত অত্যন্ত সীমিত এবং দুর্বল ছিল। উমাইয়্যা যুগে আরব সংগীত স্বাস্থ্যবান হয়। আব্বাসিয়দের যুগে এই স্বাস্থ্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে ধর্ম

www.amarboi.org

বিশেষজ্ঞ উলামা কিরামের প্রতিকূল অবস্থান ও বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে শাসনকর্তাদেরকে সচেতন থাকতে হতো। উপমহাদেশে রাজ দরবারে সংগীত চর্চা তেমন প্রতিকূল অবস্থার মুখামুখী হতে হয়নি।

যখন আরবগণ ধর্ম প্রচার ছেড়ে দিয়ে রাজা, রাজ্য সংহতকরণ, শাসনকর্ম ও রাজ্য জয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেন, সংগীত তাদের কাঁধে ভর করে। আরব ভাষাভাষি অঞ্চল অতিক্রম করে যখন ইসলাম- ইরান, মধ্য এশিয়া ও স্পেনে চলে যায়, সংগীত তাদের কণ্ঠ থেকে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনের থেকে বেশি হয়ে জীবনকে গ্রাস করে।

খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু ভুরি ভোজনে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। বিবাহ ও যৌনতা প্রয়োজন– স্বাস্থ্য, আনন্দ ও বংশ বৃদ্ধির জন্য। অতিরিক্ত যৌনতা সর্ব অবস্থায়ই অকল্যাণকর। মুসলিমগণ রাজা বাদশাহদের অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে যখন ভারতে প্রবেশ করে, তাদের সঙ্গে সঙ্গীতের ভূতও তাদের মাথায় চড়ে ভারতে আসে।

তুগলক রাজত্বের শেষভাগে রাজন্যদের মধ্যে সংগীত-চর্চায় প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎসাহ দেখা যায়। দিল্লীর পরবর্তী বাদশাহগণও সঙ্গীতের পৃষ্টপোষকতা করতেন। সিকান্দার লোদী গোড়া মুসলিম হলেও সংগীত-চর্চা উৎসাহিত করতেন।

মুসলিম রাজন্যবর্গ ভারতে প্রচলিত সংগীতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নি। বরং, ইরান, মধ্য এশিয়া হতে যা কিছু আনয়ন করা সম্ভব, তা এনে ভারতীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। সংগীতের নতুন রাগ পদ্ধতি ধারা সমৃদ্ধ করেছেন। নতুন নতুন সংগীত যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

ইন্দো মুসলিম ভারতে সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন হয়েছিল মুঘল আমলে। তবে এর প্রারম্ভ ছিল ভারতে মুসলিম বিজয় শুরু হতে। তা সত্ত্বেও এটা বেশি বলা হবে না যে, উপ-মহাদেশে ইন্দো মুসলিম সঙ্গীতের সর্বোত্তম চর্চা, বিকাশ এবং প্রচার হয়েছিল পঞ্চদশ এবং ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দ শতাব্দিতে।

আরবদেশে সঙ্গীতের সঙ্গে দাফ বা ঢোল ব্যবহার হত। কিন্তু দামেস্ক ও বাগদাদে বহু সংগীত যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ে সংগীত কলা।

আরব ও পারস্য ঐতিহ্য নিয়ে যখন মুসলিমগণ ভারতে প্রবেশ করে– তাদের সঙ্গে ঢোল, নাকাড়া, দাফ ছাড়াও সংগীত যন্ত্র হিসাবে রোবাব, তাম্বুরা,

www.amarboi.org

মাহরুদ (সরোদ) কানুন (ডেলসাইমার), চাং (Herp), উদ, নাই (বাঁশি), ইত্যাদি ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে তখন প্রচলিত সংগীত যন্ত্র ছিল বীণা, সারিন্দা, মাগুদী, বাগশ্রী, ইত্যাদি।

মুসলিমগণ সংগীতকে, বিশেষ করে যন্ত্র সংগীতকে রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। প্রতি ঘন্টার শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কারাগারে ও অন্যান্য সংস্থায় বেল বাজানো হয়। মুসলিমগণ সতর্কতার প্রতীক হিসাবে কয়েক ঘন্টা পর পর দিবারাত্রির নির্ধারিত সময়ে নহবত খানা হতে যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে রাজকীয় ক্ষমতার অথবা সরকারী দপ্তরে যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে অন্যদেরকে সতর্ক করে দিতেন।

সংগীতের উস্তাদ আমীর খসরু

মধ্য যুগে ভারত উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন উস্তাদ আমীর খসরু। তিনি শুধু সংগীতজ্ঞই ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি এবং গদ্য লেখক। তার কবিতা ও সংগীত রচনা ছিল ফার্সি এবং হিন্দি ভাষায়। লেখক হিসাবে আমীর খসরু-এর ছদ্ম নাম ছিল তুতী-এ-হিন্দ।

আমীর খসরু-এর হিন্দী রচনা সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন এবং আরও রচনা করে ছিলেন পাহালীস (ধাঁ-ধাঁ, হেয়ালী) এবং দোহা শ্লোক যার কিছু কিছু আধুনিক কাল পর্যন্ত পৌছেছে।

আমীর খসরু ছিলেন দিল্লীর এগারজন শাসকের সমকালীন ব্যক্তিত্ব এবং সাতজন সুলতানের দরবারের সংগীতজ্ঞ ও কবি। আমীর খসরু ছিলেন দিল্লীর অন্যতম পরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সভা কবি এবং দরবারের প্রধান সংগীতজ্ঞ।

ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির (১২৯৬-১৩১৬) সময়ে ভারতে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে সৃসংহত হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ এলাকা এবং হিন্দু রাজ্যগুলো মুসলিম শাসনে আসে। হিন্দু রাজ দরবারে সংগীতজ্ঞগণ কর্মহারা হয়ে দিল্লী আগ্রা অভিমুখী হন। মুসলিম দিল্লী তাদেরকে নিরাশ করেনি বরং সাদরে বরণ করে নেয়।

আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ নায়ক গোপালের সঙ্গে আমীর খসরুর সংগীত মোকাবেলা হয়। দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ

www.amarboi.org

সংগীতজ্ঞ তেলিঙ্গনা রাজ্যের নায়ক গোপালের পালকি বহন করত ১২ শত ভক্ত শিষ্য।

আমীর খসরুকে সেতার বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কর্তাও ধরা হয়। সংগীতজ্ঞ হিসাবে আমীর খসরুর প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তার সম্পর্কে কোন কল্পিত কিছু বর্ণনা করা হলেও তার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারো হত না। আমীর খসরু ভারতীয়, ইরানী, আরবী সঙ্গীতের এমনভাবে সমন্বয় করেছেন যা উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক সংগীত হিসাবে পরিচিত হয়।

আমীর খসরু এর বংশ পরিচয় : আমীর খসরুর জন্ম উত্তর প্রদেশের ইহাত জেলার পাতিয়াতলীতে (১২৫৩-৫৪ খ্রীঃ)। তার পিতা আমীর সাইফুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন মধ্য এশিয়ার 'লা চীন হাজারা গোত্রীয় ও তুর্কি বংশদ্ভুত'। মোঙ্গঁল আক্রমণের সময় উস্তাদ আমীর খসরুর পিতা ভারতে এসে দাস রাজবংশের সুলতান ইলতুত মিসের অধীনে পাতিয়ালা রাজ্যে জায়গিরদারি লাভ করেন।

নিজামুদ্দীন (রা.) এর শিষ্য : সংগীত সম্রাট আমীর খসরু ছিলেন ভারত বিখ্যাত ওয়ালী দরবেশ হযরত নিজাম উদ্দীন-এর অনুগত শিষ্য। দিল্লীর ওয়ালী আল্লাহ্ নিজামুদ্দীন ছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সুধী সাধক। হযরত নিজাম উদ্দীন তার প্রিয় সংগীতজ্ঞ আমীর খসরুকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি অসিয়ত করে যান যে তার প্রিয় শিষ্য আমীর খসরুকে তারই সমাধির পাশে যেন দাফন করা হয়। সংগীত সম্রাট এবং সুফী সম্রাট এর এরূপ সহনশীলতা উপমহাদেশের ইতিহাসে বিরল।

উত্তরাধিকার : আমীর খসরু একই সঙ্গে তুর্কি, ইরানী এবং ভারতীয় সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। আমীর খসরু ছিলেন শুধু ভারতীয় এবং গ্রীক সংগীত ধারা নয় বরং পারস্য, আরব সংগীত-কলা ও সাধনার উত্তরাধিকারী।

তৎকালে ভারতীয় সংগীত ছিল গ্রীক সংস্কৃতি ও সংগীত প্রভাবিত। কিন্তু ভারতীয় মুসলিমদের সংগীত চর্চা ছিল ইরানীয়ান এবং আরব সংগীত প্রভাবিত। ভারতে গ্রীক সঙ্গীতের প্রভাব শুরু হয় আলেকজান্ডারের ভারত বিজয়ের সময় থেকে।

সেতু বন্ধন আমীর খসরু : ভারতের প্রাথমিক যুগের সংগীতজ্ঞের মধ্যমণি ছিলেন কবি আমীর খসরু। তিনি ভারতীয় এবং পারস্য কবিতা, কাব্য এবং সঙ্গীতে সমপারদর্শী ছিলেন। পারস্য সঙ্গীতের 'পরদা' এবং ভারতীয় 'রাগ'

www.amarboi.org

সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি ভারত, আরব এবং পারস্যের সাংস্কৃতিক সেতু ছিলেন। আমীর খসরু ভারতীয় এবং পারস্য সঙ্গীতের মিলনে এক নতুন সংগীত প্রকরণের সৃষ্টি করেছিলেন। দু'টি পৃথক সংগীত ধারার সমন্বয় সাধিত হয় আমীর খসরুর প্রতিভায়।

ভারতীয় এবং পারস্য ধারার সমন্বয় সম্পর্কে আমীর খসরুর অবদান ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে রচিত 'চিশতীয়া বিহিশতীয়া' গ্রন্থে লেখা হয়েছে– "নীল এবং হরিদ্রা বর্ণের সমন্বয়ে যেমন মরক বর্ণের সৃষ্টি হয়, আমীর খসরু তেমনি আল্লাহ্‌র কৃপায় এবং তার সৃজনী শক্তির প্রভায় দু'টি আলাদা সংগীত প্রকরণের সমন্বয়ে যে নয়া সংগীত প্রকরণ সৃষ্টি করেছেন তা ছিলো নতুন এবং অপরূপ"।

আমীর খসরু ও তানসেন : আকবরের দরবারে সংগীতজ্ঞ মিয়া মির্জা তানসেন সম্পর্কে ভারত বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মনীষী আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে তানসেনের মত সংগীতজ্ঞ ভারতে হাজার বছরের মধ্যেও একজন জন্ম গ্রহণ করেনি।

আবুল ফজল সংগীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। সংগীত বিশ্লেষক ও সমালোচক এবং মূল্যায়নকারীদের দৃষ্টিতে আমীর খসরু ছিলেন মিয়া তানসেন থেকে শ্রেষ্ঠতর। তাদের মূল্যায়নে মিয়া তানসেন ছিলেন "গান্দর্ভ" স্তরের সংগীতজ্ঞ এবং আমীর খসরু ছিলেন "নায়ক" স্তরের। নায়কগণ গান্দর্ভদের অপেক্ষা উচ্চ স্তরের সংগীতজ্ঞ।

কাওয়ালী : আমীর খসরু গীত একটি বিশেষ ষ্টাইলের সংগীতকে বলা হত 'কাউল'। এটা ছিল দু'ই ভাষায় রচিত সংগীত যেমন– ফার্সি ও হিন্দি। কাউল সংগীত গাওয়া হত সুফী দরবেশদের মাহফিলে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। হযরত নিজাম উদ্দীনের খানকায় আমীর খসরু সাধারণত কাওয়ালী গজল গাইতেন। এটা ছিল সহজ, বোধগম্য এবং জনপ্রিয়। কাওয়ালী শব্দটি এসেছে আরবী কাওল বা কাউলুন শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো কথা, বাক্য। বহু বচনে শব্দটি হয় কাওয়ালী।

খেয়াল : খেয়াল সংগীত উপমহাদেশে এখনও অতি প্রিয় এবং পরিচিত। খেয়ালের পূর্বে ভারতে পরিচিত সংগীত ধারা ছিল ধ্রুপদ। আমীর খসরুর অন্যতম অবদান হলো মুসলিম সংগীত ধারাকে উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে অন্তর্ভুক্তকরণ। আমীর খসরু কর্তৃক বহু সংগীত ধারা বর্তমানে ক্ল্যাসিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরাজ করছে।

www.amarboi.org

তারানা : তারানা সংগীত ষ্টাইল আমীর খসরুর নিজস্ব আবিষ্কার। এটা হলো এক প্রকার শ্রুতিমধুর এবং দ্রুত গীত সংগীত। এই সঙ্গীতের শব্দ তরঙ্গ শ্রোতাকে আকর্ষণ করে–যদিও শব্দগুলো হয় অর্থহীন।

আমীর খসরু পারস্য এবং ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে কয়েকটি নতুন 'তান' 'লয়' সৃষ্টি করেন। ডক্টর ওয়াহিদ মীর্যা আমীর খসরুর জীবনী এবং রচনা গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমীর খসরু শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি গায়ক হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ঘড়ির শব্দের অনুরূপ সঙ্গীতের তান সৃষ্টি করেন।

ভারতীয় এবং পারস্যের পারস্পরিক সুরের মিশ্রণে আমীর খসরু 'সূতর' এবং অপর কয়েকটি ছন্দ আবিষ্কার করেন। দাক্ষিণাত্যের সেরা সংগীতজ্ঞ নায়ক গোপালকে তিনি সংগীত প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেন।

আমীর খসরুর রচনা থেকে দেখা যায় পারস্য সঙ্গীতের ১২ 'পরদা', এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়সমূহে তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল। তিনি সংগীত প্রতিযোগিতায় বিশেষ উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করতেন। অনেক নিম্নমানের সংগীতজ্ঞের সঙ্গেঁ সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে "আমীর খসরুর সঙ্গেঁ সংগীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়, তৃতীয় হওয়ার সম্মান" জুনিয়র সংগীতজ্ঞদেরকে দিতেন।

সংগীতজ্ঞ হিসাবে আমীর খসরু ছিলেন তার যুগে অপ্রতিদ্বন্দী। তিনি ছিলেন সংগীত রচয়িতা, সংগীত তত্ত্ববিদ, সংগীত শিক্ষক এবং গায়ক। গানের বহু সংখ্যক নতুন রাগ, তাল, সুর আমীর খসরু আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন বেশ কয়েকটি সংগীত যন্ত্রেরও আবিষ্কারক এবং বাস্তব সংগীতবিদ।

আমীর খসরু কর্তৃক আবিষ্কৃত নব রাগ গুলোর মধ্যে ছিল– (১) সাহগাড়ী, (২) ইয়ামানী, (৩) ইসশাক, (৪) মুয়াফিক, (৫) গানাম, (৬) জিলাফ, (৭) ফারগানা, (৮) সারপর্দা, (৯) শিরুদাসত, (১০) রাগ অথবা তাল।

আমীর খসরু কর্তৃক প্রবর্তিত সঙ্গীতের নতুন তালগুলোর মধ্যে ছিল– (১) সাওয়ারী, (২) ফিরুদাস্ত, (৩) পাহলোয়ান, (৪) জাট, (৫) পুস্তু, (৬) কাওয়ালী, (৭) আড়াবৌতালী, (৮) জালদ তিতালা, (৯) জুমড়া, (১০) সুলকাকতা ইত্যাদি। (করম ঈমাম খান, মাদান-ই-মিউসিকি)[১]।

বিশেষ ধরণের আরবী, ফার্সি এবং ভারতীয় সংগীত ছাড়াও বিবিধ সংগীত কলায় আমীর খসরু শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সঙ্গীতের যে যে ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ছিল তা হলো– কাওল, কলবানা, নাকশ, নিগার, গোল, হাওয়া, তেরানা, সাহিলা, ইত্যাদি।

www.amarboi.org

তাল : আমীর খসরু নতুন নতুন তাল সৃষ্টি করতেন। তার গীত ১৭টি তাল বহু কাল প্রচলিত ছিল। বহু তাল তিনি সৃষ্টি করেন, আরবি ফার্সি সংগীত ধারা হতে। এগুলোর মধ্যে আছে খামসাহ, ফিরুদাসত, জাত, সাওয়ারী, পুসতুয়ারা, চওতালা, জুমরা, সুল-ফাখতা।

নতুন রাগ-রাগিণী আবিষ্কার : বিশুদ্ধ আরবি ফার্সী, গ্রীক এবং ভারতীয় সংগীত ধারা ছাড়াও আমীর খসরু বহু নতুন রাগ এবং মিশ্রিত রাগ সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে ছিল (১) ঘারা, (২) ঘানাম, (৩) মুজির, (৪) সানাম, (৫) সাজগারী, (৬) জানগুলাহ, (৭) খেয়াল, (৮) আহমান, (৯) গজল, (১০) বাখরেজ, (১১) প্রভার্থ, (১২) নিগার, (১৩) বাসিখ, (১৪) সাহানা, (১৫) সুবিলা, প্রভৃতি সংগীত প্রকরণ ইত্যাদি।

সংগীতযন্ত্র : আমীর খসরু ছিলেন শুধুমাত্র সঙ্গীতের নতুন নতুন স্বর, সুর ও তালের আবিষ্কারক নন। তিনি বহু সংগীত যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তবে যন্ত্র অপেক্ষা সঙ্গীতের নতুন ষ্টাইল, টেকনিক, তাল, রাগ, মেলোডি, ইত্যাদিতে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

সিতার, তবলা, রতবাব, দোলক, ইত্যাদির আবিষ্কারক হিসাবে গণ্য করা হয় আমীর খসরুকে। তবলা, রুবাব, দোলক জাতীয় যন্ত্র আরব দেশেও প্রচলিত ছিল।

প্রফেসর রেনাডে 'হিন্দুস্থানী সংগীত'[২] গ্রন্থে লিখেছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিমগণ দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে দেবগিরির রাজত্বের অবসান ঘটান। সংগীত এবং সংস্কৃতির ওপর এ বিজয়ের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দেবগিরি পর্যন্ত উত্তর ভারতে পারস্য সংগীত ধারার প্রভাব পড়ে। দাক্ষিণাত্যের সংগীত সাধনা চিরাচরিত ধারায় চলতে থাকে। উত্তর ভারতে যে নতুন সংগীতধারার সৃষ্টি হয় আমীর খসরু ছিলেন তার পথ প্রদর্শক।

আমীর খসরু ও নায়ক গোপাল

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন এককালে তেলিংগনা রাজ্যের সংগীতজ্ঞ "নায়ক গোপাল"। কথিত আছে যে বার শত শিষ্য নায়ক গোপালের পালকী পর্যায়ক্রমে বহন করতেন। তিনি গঙ্গা স্নানের জন্য উত্তর ভারতের থানেশ্বর রাজ্যে অবস্থিত মহাভারত খ্যাত কুরু ক্ষেত্রে আসেন।

"নায়ক গোপালের" উত্তর ভারতে আগমনের খবর পেয়ে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী নায়ক গোপালকে দিল্লীর রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান।

www.amarboi.org

দিল্লীর রাজ দরবারে নায়ক গোপাল প্রায় ১০ দিন তাঁর সংগীত বিদ্যার প্রদর্শনী করেন। কথিত আছে যে, নায়ক গোপালের ভ্রমণকালীন জাঁকজমক দর্শনে– দরবারের সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু প্রথম দিকে সংগীত নায়ক গোপালের মুখোমুখি হতে সাহস করেন নি।

সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, মির্জা ফকির উল্লাহ তাঁর "রাগ দর্পণে" উল্লেখ করেন যে আমীর খসরু সংগীত সম্রাট "নায়ক গোপালের" প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহ বশতঃ দরবারে তাঁর নিজস্ব আসনে উপবেশন না করে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর সিংহাসনের পেছনে বসেন এবং বলা যায় লুকিয়েছিলেন।

নায়ক গোপাল পর পর সাত দিন দিল্লীর আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে তাঁর সংগীত চাতুর্য্য ও মাধুর্য প্রদর্শন করেন।

নায়ক গোপালের সংগীত প্রদর্শনীর অষ্টম দিনে আমীর খসরু তার দুই শিষ্য "সামাত" ও "নিয়াজকে" সঙ্গে নিয়ে নায়ক গোপালের সম্মুখীন হন। নায়ক গোপাল আমীর খসরুকে তাঁর সংগীত কলা প্রদর্শনের অনুরোধ করেন।

আমীর খসরু নায়ক গোপালকে শ্রদ্ধা, সম্ভম জানিয়ে প্রথমে নায়ক গোপালকে তাঁর সংগীত অন্য দিনের ন্যায় পেশ করতে অনুরোধ করেন। প্রতিটি সংগীত শেষে নায়ক গোপালের গীত সংগীত আমীর খসরু পুনঃ আবৃতি করার অনুমোদন নায়ক গোপাল থেকে কামনা করেন।

পরে দেখা গেল তার নিজস্ব তাল, লয়, সুর ও ষ্টাইলে নায়ক গোপাল যে সংগীতই পেশ করেন না কেন– আমীর খসরু সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে একই স্টাইলের সুরে এবং তানে নায়ক গোপালের সংগীত গেয়ে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে আমীর খসরু দিল্লীর দরবারে সংগীতজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী করেন।

আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে সংগীত প্রদর্শনীতে নায়ক গোপাল "গীত" 'তিলানা' সঙ্গীতের বিকল্প হিসেবে আমীর খসরু পেশ করেন "বাসিত" সংগীত।

নায়ক গোপালের 'মান' সঙ্গীতের জবাবে আলাউদ্দীন খিলজী পেশ করেন ফার্সি প্রভাবিত 'নাকশ' সংগীত। নায়ক গোপাল এর "আলাপ" সঙ্গীতের জবাবে আমীর খসরু গান 'নিগার' সংগীত। সাহিলা সঙ্গীতের জবাবে আমীর খসরু পেশ করেন 'তারানা' সংগীত। নায়ক গোপালের চান্দ সঙ্গীতের জবাবে আমীর খসরু পরিবেশন করেন "বাসিত" সংগীত।

উক্ত সংগীত মজলিসে আমীর খসরু এর উপস্থাপনা দরবারের মধ্যে বিস্ময়, হর্ষ, চমকের স্রোত প্রবাহিত করে। শ্রোত্রীবর্গের আনন্দ উল্লাসে দরবারে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়।

www.amarboi.org

অতঃপর সংগীতামোদীদেরকে শান্ত করার জন্য আমীর খসরু সরচিত কোমল ও করুণ সংগীত পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠান আমীর খসরুকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

জৌন পুরের সার্কী বংশের সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা

জৌনপুরের সার্কী বংশের সুলতানদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সংগীতজ্ঞ, ধর্ম তথ্যবিদ, আইনজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। এই বংশের ইব্রাহীম শাহ সার্কীর (১৪০১-১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ) আমল থেকে জৌনপুর বিখ্যাত হয় ভারতের 'সিরাজ' নগরী হিসাবে। এ যুগে কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদীন এবং গোয়ালিওয়ের কিরাত সিংহ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ধন্য হয়েছিলেন।

ইব্রাহীম শাহ সার্কী : আল্লাহাবাদের নিকটে কারা নামক স্থানের একজন সার্কীয় বংশীয় আমাত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টায় "সংগীত শিরমনি" নামে একটি গ্রন্থ সংকলিত হয়। এই গ্রন্থটি সুলতান ইব্রাহীম শাহ সার্কীর উদ্দেশ্য নিবেদিত হয় (১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইব্রাহীম শাহ সার্কী ছিলেন সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী এর পূর্ব পুরুষ। সংগীত চর্চার এবং পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্য সুলতান হুসেইন শাহ সার্কী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহ সার্কী (১৪০১-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) এর নির্দেশে ও উদ্যোগে তৎকালীন ভারতীয় সঙ্গীতের একটি সংকলন করা হয়েছিল। এইটি পরিচিত ছিল "সংগীত শিরমনি" নামে। ইব্রাহীম শাহ সার্কীর পৌত্র সুলতান হোসাইন শাহ সার্কী (১৪৫৮-১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ) শুধু সঙ্গীতের পৃষ্টপোষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ। (ড. আবদুল হালিম, Essays on History of Pak-Indian Music, Dhaka, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-১৭)[৩]।

মাহমুদ শাহ সার্কী : বর্তমানে এলাহাবাদ নামে খ্যাত সংগীতজ্ঞ হুসাইন শাহ এর পিতা সুলতান মাহমুদ শাহ শার্কী ছিলেন সার্কী রাজ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ক্ষমতাশীল রাজাধিরাজ। তার রাজ্য ছিল দক্ষিণে মালব এবং বাঘেল খণ্ড, উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, পূর্বে আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের বাংলা এবং পশ্চিমে আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুলতান মাহমুদ সার্কী এর ছিল বৃহৎ ও সুশিক্ষিত

www.amarboi.org

সেনাবাহিনী এবং সুসজ্জিত রাজ দরবার। এ রাজ্যের জৌলুস ও খ্যাতি ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। মাহমুদ শাহ সার্কীর মৃত্যুর পর তার প্রভাবশালী বেগম বিবি রাজী সুলতান হুসাইন শাহকে জৌনপুর রাজ্যের সিংহাসনে আরোহন করান।

সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী জৌনপুরী

হুসাইন শাহ সাকীজৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী (১৪৫৮-১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ। হুসাইন শাহ সার্কী জৌনপুরী অন্যান্য রাজাদের মত শুধু সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতাই করতেন না– বরং নিজে সঙ্গীতের একজন নিবেদিতপ্রাণ চর্চাকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন তার সমকালীন যুগের এবং অতীত কালের সংগীত বিদ্যা বিশারদ, চর্চাকারী এবং বিশেষজ্ঞ, নন্দিত সংগীতজ্ঞ।

সুলতান হুসাইন শাহ ছিলেন অতি উচ্চমানের সংগীতজ্ঞ, রাগ, রাগিনী আবিষ্কারক। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন গীতিকার। তার রচিত বহু সংগীত এন.এন. বসু সম্পাদিত 'সংগীত-রাগ-কল্প দ্রুম', শীর্ষক ভারতীয় সংগীত বিশ্বকোষে স্থান পেয়েছে (তৃতীয় ভলিউম)।

জাতীয় পর্যায়ের এবং ইতিহাসে উচ্চ স্তরের সুনাম অর্জনকারীদের মধ্যে সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী ছিলেন অন্যতম। সংগীত পর্যালোচনাকারীদের মূল্যায়নে সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী ছিলেন সংগীত বিজ্ঞানে "গান্ধর্ভ" স্তরের সংগীতজ্ঞ (শাহনেওয়াজ খান, মিরাত-ই-আফতাবনামা)[৪]।

ভারতীয় সংগীত ইতিহাসে 'মিয়া মির্জা তানসেন', মালব সুলতান 'বজ বাহাদুর'ও ছিলেন 'গান্ধর্ভ' স্তরের সংগীতজ্ঞ।

হুসাইন শাহ সার্কী এর জীবন ছিল অতি দুর্যোগময়। তা সত্ত্বেও গান্ধর্ভ স্তরে উন্নীত হওয়া ছিল তার অসাধারণ সংগীত মেধার পরিচয়। তিনি যদি মিয়া তানসেনের মত পেশাগত সংগীতজ্ঞ হতেন, তাহলে আমীর খসরু এবং অন্যান্য নায়কদের এর ন্যায় গান্ধর্ভ থেকে উচ্চ স্তরে সংগীত 'নায়ক' পর্যায়ে উন্নীত হতে পারতেন।

দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় জামাতা : ঐ সময়ে দিল্লী ও আগ্রায় ছিল লোদী রাজ বংশের রাজত্ব। সিংহাসনে আরোহিত ছিলেন সুলতান বাহালুল লোদী। অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহন করার কারণে হয়ত সুলতান হুসাইন শাহ ছিলেন কল্পনাবিলাসী এবং অধকতর আত্ম সচেতন। দিল্লীর লোদী রাজ্যের অংশ বিশেষের প্রতি ছিল তার লোভ। তিনি বিবাহ করেছিলেন দিল্লীর সৈয়দ বংশের

www.amarboi.org

সর্বশেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের কন্যাকে। সেই হিসেবে তার স্ত্রী ছিলেন দিল্লী কেন্দ্রীক সৈয়দ গোষ্ঠির সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষের উত্তরাধিকারী।

সাম্রাজ্য বিস্তার : প্রকৃতিগতভাবে জৌনপুর সুলতান হুসাইন শাহ ছিলেন সাহসী, উচ্চাকাঙ্খী, আগ্রাসী এবং অনেক ক্ষেত্রে বেপরোয়া ও হঠকারী। প্রথম প্রথম সৌভাগ্য সূর্য ছিল তার অনুকূলে। ১৪৭৮ সালে উড়িষ্যা আক্রমণ করে তিনি তা স্বীয় রাজভুক্ত করেন। গোয়লিয়র দুর্গ এবং রাজ্য অধিকার করে রাজা কিরাত সিংহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। 'বায়ানা' এবং নিওয়াত রাজ্যের রাজাগণও তার বশ্যতা স্বীকার করেন।

বদাউন এর সর্বশেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের মৃত্যুর পর সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী তার উচ্চাকাঙ্খী পত্নী মালাকা জাহানের প্ররোচনায় দিল্লী কেন্দ্রীক সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ বদাউন দখল করেন।

যমুনা তীরের ইটাওয়া দুর্গটি ছিল দিল্লী ও মালব শাসকদের পারস্পরিক অধিকার দাবী করনের এবং সংঘাতের কারণ। হুসেইন শাহ সার্কী তা দখল করেন। এ পর্যন্ত সৌভাগ্য সূর্য্য তার অনুকূলে ছিল।

নতুন রাগ প্রবর্তন : সংগীত বিজ্ঞানে জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী- এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো– সঙ্গীতে নতুন রাগ আবিষ্কার ও প্রবর্তন। হুসাইন শাহ কর্তৃক আবিস্কৃত নতুন রাগগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান রাগ হলো "রাগ জুংগলাহ"। কারো কারো মতে এটা হল আরবী ও ফার্সি রাগ জাঙ্গুলা এর ভারতীয় সংস্করণ। এটি হলো একটি আরবী, ফার্সি, হিন্দি মিশ্র রাগ। এক সময় জৌনপুরে জুঙ্গলাহ্‌ রাগের গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ছিল।

সুলতান হুসাইন শাহ জুংগলাহ্‌ ছাড়া অন্যান্য রাগ-রাগিণী আবিষ্কার করেন এবং প্রচলন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ১৪টি সাম রাগিণী, ৪টি তোড়ি রাগিণী, একটি আছাওয়ারী রাগিণী। সাম রাগিণীর মধ্যে আছে গৌড় সাম রাগিণী এবং মালহার সাম রাগিণী।

হুসাইন রাগিণী : হুসাইন শাহ সার্কীর প্রবর্তিত ৪টি টোড়ি রাগিণীর মধ্যে একটি হুসাইন শাহ-এর নাম অনুসারে "হুসাইন রাগিণী" নামে খ্যাত। হুসাইন শাহ্‌ প্রবর্তিত 'আছাওয়ারী রাগিণী' এর প্রচলন ছিল জৌনপুরে সব চাইতে বেশী। তাই এই রাগিণী 'জৌনপুরী রাগিণী' নামে খ্যাত হয়ে যায়।

www.amarboi.org

কারো কারো মতে আছাওয়ারী রাগিণীটি জৌনপুরী রাগিণী নামে পরিচিত হয়নি। বরং জৌনপুরী ও আছাওয়ারী রাগিণী দু'টি হল পৃথক। জৌনপুরী রাগিণী এবং তুর্কী রাগিণী থেকে ভিন্ন একটি রাগিণী আছাওয়ারী রাগিণী।

হুসাইনী কানরা : 'হুসাইনী কানরা রাগিণী' কারো কারো মতে হুসাইন শাহ এর আমলে প্রবর্তিত হয় এবং কারো কারো মতে এর আবিষ্কারক হলেন– সুলতান হুসাইন শাহ নিজেই।

শাহ্ হুসাইন ফকির : হুসাইন শাহ্ রচিত সঙ্গীতের রচয়িতার নামও সংগীত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত আছে। এতে গীতিকারের নাম উল্লেখ আছে শাহ ফকির নামে। নম্রতা বশত সুলতান হুসাইন শাহ্ সার্কী ফকির শব্দটি নিজ নামের শুরুতে উল্লেখ করেছেন।

হুসাইন শাহ্ রাজ্য হারা হয়ে একাধিকবার ফকির ভিক্ষুকের অবস্থা থেকেও করুন অবস্থায় পড়েছিলেন। কারণ, ফকির ভিক্ষুককে প্রাণ রক্ষার তাগিদে তস্করের মত পালাতে হয় না। (ড. প্রফেসর আব্দুল হালিম, Essays on History of Pak-Indian Music, পৃষ্ঠা-১৫, ঢাকা- ১৯৬২)[৫]।

হটকারী অভিযান : এক সময় সুলতান হুসাইন শাহ্ সার্কী দিল্লী দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ইতোপূর্বেও তিনি দিল্লী দখলের চেষ্টা করেছিলেন। বিফল হয়ে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি সম্পাদন করেন।

এরপরও তিনি বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু যমুনা তীরে লোদী বাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। যমুনা নদীতে তার হাজার হাজার সৈন্য ডুবে মরে। নিজে পলায়ন করতে সমর্থ হলেও তার স্ত্রী মালাকা জাহান বন্দী হন। সাথে সাথে বন্দী হন তার ৪০ জনেরও বেশি সভাসদ ও সেনাপতি।

সুলতান বাহলুল লোদী : দিল্লীর লোদী বংশীয় সুলতান বাহালুল লোদী প্রতিবন্ধী জৌনপুর সুলতান হুসেইন শাহ্ সার্কীর স্ত্রীর কোন অবমাননা করেননি। বরং তাকে স্বসম্মানে স্বামী হুসেইন শাহ্ সার্কীর নিকট প্রেরণ করেন।

দৃঢ়চেতা স্ত্রী মালাকা জাহানের প্রেরণায় সুলতান হুসেইন শাহ সৈন্য সংগ্রহ করে বাহালুল লোদীর সাথে পুনরায় মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হন কনৌজের নিকটে। তীব্র সংগ্রামের পর সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজধানী জৌনপুর ছেড়ে রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে উপস্থিত হন।

www.amarboi.org

বিহার ও তীরহুতের অংশ বিশেষের রাজত্ব হুসাইন শাহ সুসংহত করেন। দিল্লীর সুলতান বাহালুল লোদী বিহার পর্যন্ত সুলতান হুসেইন শাহকে ধাওয়া করেননি।

সুলতান সিকান্দার লোদী : দিল্লীর সুলতান বাহালুল লোদীর মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান সিকান্দার লোদীর সঙ্গে জৌনপুর সুলতান হুসহৈন শাহ সার্কীর যুদ্ধ হয় বেনারসে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সুলতান সিকান্দার লোদীর নেকট পরাজিত হয়ে হুসাইন শাহ সার্কী বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের আশ্রয় কামনা করেন।

বাংলার সুলতানের বদান্যতা : আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ জৌনপুরের পরাজিত সুলতান হুসাইন শাহ সার্কীকে অতিথি হিসাবে বরণ করেন এবং স্বীয় রাজ্যের পশ্চিমাংশে বিহারের কিছু এলাকা হুসেইন শাহ সার্কীর জন্য ছেড়ে দেন।

জৌনপুর রাজ হুসেইন শাহ সার্কী পূর্ব বিহারের কুহ্লগাঁও নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে সেখানেই জীবন কাটিয়ে দেন।

জৌনপুর রাজ হুসাইন শাহ সার্কী এবং বঙ্গ রাজ আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের দু' পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা তাদের মৃত্যুর পরেও অব্যাহত ছিল। জৌনপুর রাজ হুসাইন শাহ সার্কীর পুত্র যুবরাজ জালালউদ্দিন বিবাহ করেন আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের উত্তরাধিকারী এবং পুত্র নসরত শাহের কন্যাকে।

হুসাইন শাহ সার্কীর মৃত্যু হয় গৌড়ে (ফিরিস্তা) এবং সেখানেই তাকে প্রথম সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে হুসাইন শাহ সার্কীর পুত্র জালালউদ্দিন পিতার মরদেহ জৌনপুরে নিয়ে যান এবং জৌনপুরের জামে মসজিদের প্রাঙ্গণে পারিবারিক গোরস্থানে দ্বিতীয়বার দাফন করেন।

সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক শাহ নেওয়াজ খান রচিত "মিরাত-ই-আদ" গ্রন্থে সুলতান হুসাইন শাহ সম্পর্কে লিখেছেন যে সংগীত কলায় সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী ছিলেন অনুপম প্রতিভা। তার জীবনকালেই সংগীতজ্ঞ হিসেবে তার সুনাম ভারতের সর্ব কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল।

খেয়ালের প্রবর্তক : ধ্রুপদের পরবর্তী সংস্করণ হিসাবে খেয়াল সঙ্গীতের আবির্ভাব। কিন্তু এই খেয়াল সংগীতকে সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় করার জন্যে সবচেয়ে অধিক অবদান ছিল সুলতান হোসেইন শাহ সার্কীর। তার এই অবদানের জন্যই বহুকাল থেকে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের পাশাপশি খেয়াল

www.amarboi.org

শীর্ষক নতুন সংগীত কলার পরিচিতি ঘটেছে এবং ধ্রুপদের একচ্ছত্রতা লোপ পেয়েছে। (ড. প্রফেসর আবদুল হালিম, Essay on History of Pak-Indian Music, পৃষ্ঠা-১৬)[৬]।

সুলতান হুসাইন শাহ সার্কী ছিলেন জৌনপুরের সার্কী রাজ বংশের সর্বশেষ প্রদীপ। তার ইতিহাস মালব রাজ বজ বাহাদুর খান, গুজরাট রাজ বাহাদুর শাহ এবং অযোদ্ধাধিপতি ওয়াজেদ আলী শাহের ন্যায় করুন এবং হৃদয় স্পর্শী।

সুলতান সিকান্দার লোদী

দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন অত্যন্ত ধার্মীক এবং গোড়া মুসলিম। তিনি জাগতিক কোন বিষয়ে মুসলিম শরীয়াহ হতে বিচ্যুত হতেন না।

সে যুগে থানেস্বর তীর্থস্থানে হিন্দুদের স্নানযোগ পূজা অনুষ্ঠিত হতো। বিশেষ বিশেষ দিনে হাজার হাজার লোক নদী তীরে উপস্থিত হতেন। অনেকেই নদীর কুলে পায়খানা প্রস্রাব করে নদীর জল অপরিষ্কার করে ফেলতেন। এ বিষয়ে সুলতানের নিকট অভিযোগ এলে তিনি থানেশ্বর নদীস্নান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

সম্রাটের এই নির্দেশের বিরোধীতা করেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও ফেকাহবিদ এবং অযোদ্ধার হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ। কারণ, তার মতে ভিন্ন ধর্মীয়দের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জবরদস্তি করার কোন অধিকার মুসলিমদের নেই।

মাওলানা আবদুল্লাহ এর ফতোয়ায় সুলতান সিকান্দার লোদী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হন। তিনি হিন্দুদের বহু অনুষ্ঠান– বিশেষ করে সতীদাহ এবং নরমেদযজ্ঞ ধর্ম বিরোধী ঘোষণা করেন। মূর্তিপূজা তিনি কুসংস্কার মনে করতেন।

সুলতান সিকান্দার লোদী ছিলেন নিজে একজন উচ্চমানের কবি। ফার্শি ভাষায় কবিতা ও সংগীত রচনা করতেন। তার একটি কবি নামও ছিল– গুলরুখ। অর্থ-গোলাপ গন্ড। গোলাপ কপল।

সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা ঃ সিকান্দার লোদীর ধর্মীয় গোড়ামীর শিথিলতা ছিল একটি ক্ষেত্রে। তা হলো সংগীত চর্চা। সিকান্দর লোদী ছিলেন সংগীত উপভোগকারী এবং সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক। সমালোচকদের দৃষ্টিতে তার এই উদারতা যুগ-ধর্মের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। তার দরবারেও সংগীতচর্চা প্রকাশ্যভাবে হতো না।

www.amarboi.org

সুলতান সিকান্দার লোদীর জন্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা হতো রজনীর তৃতীয়াংশে। সুলতান সিকান্দার লোদী যে সমস্ত রাগ ও সংগীত অধিক পছন্দ করতেন– তার মধ্যে ছিল মালিগাঁও, দাহ, কল্যানা, কানরা (দরবারী) হুসাইন কানরা, ইত্যাদি।

সুলতান সিকান্দর লোদীর নহবত খানায় ছিলেন ১০ জন সানাই বাদক। তিনি নিদ্রার পূর্বে তাদের বাজনা উপভোগ করতেন।

সুলতান সিকান্দর লোদী দাস বালকদেরকে সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ দিতে উৎসাহিত করতেন। ৪ জন দাস বালক উন্নত মানের সংগীতজ্ঞে উন্নীত হন।

ঐ যুগের প্রচলিত যন্ত্র সংগীত ছিল 'কানুন' নামীয় একতারা, চাং নামীয় বিনা, তামবুরা, বিভিন্ন ধরনের বিনা।

উজির মিয়া ভুঁইয়া ঃ উজির মিয়া ভুঁইয়া ছিলেন সুলতান সিকান্দার শাহ্ এর উজির। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞ, পন্ডিত, সংগীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের সমজদার। সেকালে "মিয়া ভুঁইয়া" এর অনুসারীগণও ভুঁইয়া নামে পরিচিত হতেন। সে ধারা বহুকাল প্রচলিত ছিল।

মিয়া ভুঁইয়া এর নির্দেশে "সুধা নিধ সংগীত সমস্যা," "সংগীত কল্পতরু" এবং "সংগীত মাতঙ্গ" ইত্যাদি পুস্তকও ফার্সিভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

সুলতান সিকান্দর লোদীর আরো দু'জন খ্যাতনামা সংগীতামোদী অমাত্য ছিলেন সাইয়েদ রুহুল্লা এবং সাইয়েদ ইবনে রাসূল। তাদের ভবনে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হতো। এতে কণ্ঠ সংগীতজ্ঞ এবং যন্ত্র সংগীতজ্ঞগণও তাদের দক্ষতার পরিচয় দিতেন।

লাহজাত সিকান্দর শাহী ঃ সুলতান সিকান্দর লোদীর পৃষ্ঠোপোষকতায় ও নির্দেশে "লাহজাত-ই-সিকান্দর শাহী" শীর্ষক একটি সংগীত সংকলন করা হয়। লাহজাত-ই-সিকান্দর শাহী শীর্ষক গ্রন্থটি ছিল ফার্সি ভাষায় রচিত সর্ব প্রথম সংগীত গ্রন্থ। (ড. প্রফেসর আবদুল হালিম, *Essay on History of Pak-Indian Music,* পৃষ্ঠা-১৯)[৭]।

লাহজাত সিকান্দর শাহীর প্রধান সংকলক ও রচয়িতা ছিলেন হামমাদ ইয়াহইয়া কাবুলী। এই গ্রন্থটির রচয়িতাদেরকে পার্শি ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছিল, তদুপরি জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল ভারতীয় সংগীত বিজ্ঞান এবং সংগীত কলার।

"লাহজাত সিকান্দার শাহী" গ্রন্থটিতে সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য সংক্রান্ত বিষয়।

www.amarboi.org

সম্পাদক ও রচয়িতার সাথে যে, দু'জন বিজ্ঞ ব্যক্তি সহযোগিতা করেছিলেন তারা হলেন– বাহাদুর খান এবং দেলাওয়ার খান।

মুসলিম ভারতে সংগীত চর্চার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন হয়েছিল মুঘল আমলে। তবে এর প্রারম্ভ ছিল ভারতে মুসলিম বিজয় শুরু হতে। তা সত্ত্বেও এটা বেশী বলা হবে না যে, উপ-মহাদেশে মুসলিম সঙ্গীতের সর্বত্তম চর্চা, বিকাশ এবং প্রচার হয়েছিল পঞ্চদশ এবং ষোড়শ খ্রীঃ শতাব্দিতে।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও নায়ক বাইজু

মুঘল সম্রাট জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবুরের পুত্র এবং মহামতি সম্রাট আকবরের পিতা নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ুন ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ, বিদূষী ও শিল্পী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। সুলতান বাহাদুর শাহ হতে তিনি গুজরাট দখল করেন। রাজধানী দখল করার পর বিজয়ী সৈন্যগণ প্রথামত লুটপাট ও হত্যা কাণ্ডে লিপ্ত হয়। তা অবলোকন করে সংগীতজ্ঞ "নায়ক বাইজু" অত্যন্ত ব্যথিত হন।

তিনি সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে ফার্সি ভাষায় রচিত একটি সংগীত শ্রবণ করান। এই সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ চিত্ত সম্রাট হুমায়ুন জিজ্ঞাসা করেন– নায়ক বাইজু সম্রাটের নিকট কি পুরষ্কার প্রত্যাশা করেন। নায়ক বাইজু সম্রাট হুমায়ুনকে জানান যে, মুঘল সম্রাটের নিকট তার একমাত্র প্রত্যাশা হল রাজধানীতে বিজয়ী সৈন্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ড চলছে তা বন্ধ করতে হবে।

সম্রাট হুমায়ুন সংগীতজ্ঞের এই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সেনাবাহিনীর লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দান করেন (শাহনেওয়াজ খান, মিরাত-ই-আফতাব-নামা, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি)[৮]।

সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর

মুঘল সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর এর মাতৃভাষা ছিল ফার্সি। কিন্তু ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইত্যাদির প্রতি ছিল তার হৃদয়ে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং অনুভূতি। তিনি ভারতের অতীত ঐতিহ্য পুনরুজীবনে ছিলেন আগ্রহী।

প্রাচীন ভারত সম্রাট বিক্রমাদিত্তের দরবার ছিল নবরত্ন সভা। সম্রাট আকবর– ঐ স্মৃতি ধারণে নবরত্ন সভার পুনরুজ্জীবন করেন, যদিও তার

www.amarboi.org

দরবারে রত্ন সংখ্যা ছিল শতকের থেকেও বেশি। কিন্তু এই রত্নমন্ডলীর নাম শতরত্ন সভা না দিয়ে বিক্রমাদিত্বের ঐতিহ্যকে সম্মান দেখিয়ে তার শতরত্নের সভাকে নাম দিয়েছিলেন নবরত্ন সভা।

ধ্রুপদ সংগীত : আকবরের যুগে ভক্তি আন্দোলন গতিশীলতা লাভ করে। ভক্তি আন্দোলন ছিল প্রাচীন ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন। এর একটি বাহন ছিল ধ্রুপদ সংগীত। এটা ছিলো ক্লাসিক্যাল বা উচ্চ শ্রেণীর বনেদী উপমহাদেশীয় সংগীত। ধ্রুপদী সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতাদের স্তুতিগান হয়। রাজাদের প্রশংসাগীত হয়।

ধ্রুব শব্দটির উৎস আকাশের সবচেয়ে উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক ধ্রুবতারা। ধ্রুপদ শব্দটি মূল ছিল ধ্রুবপদ। তা সংক্ষিপ্ত করে করা হয়েছে ধ্রুপদ। ধ্রুব সংগীত হলো হিন্দু ধর্মীয় জ্যোতিষ্ক পূজা সংক্রান্ত সঙ্গীতের মত।

সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা ও চর্চায় ধ্রুপদ সংগীত নতুন গুরুত্ব লাভ করে এবং সমৃদ্ধতর হয়।

আকবরের তানসেন মূল্যায়ন : মুঘল সম্রাট আকবর মিয়া তানসেনকে দরবারে আনয়নের জন্য নির্দেশ দান করেন এবং তার আগমন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। মিয়া তানসেন তখন ছিলেন ক্ষুদ্র রাজ্য ভাটেরার রাজা রাম চাঁদ ভাটের সভার রাজ সংগীতজ্ঞ।

তাকে মুঘল রাজদরবারে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়– তাতে উপহার হিসাবে প্রদত্ত হয়েছিল তৎকালীন মুদ্রায় দুই লক্ষ রজত মুদ্রা যা বর্তমানের মানে হতে পারে কয়েক কোটি টাকা। এতে তৎকালে মুঘলদের ঐশ্বর্য ও শান শওকতের কিছুটা অনুমান করা যায়।

আবুল ফজলের মতে হাজার বছরের মধ্যে তানসেনের মত সংগীতজ্ঞের জন্ম উপমহাদেশে হয়নি। (Blockmann), আইনী আকবরী,পৃষ্ঠা-৬৮০)[৯] মুঘল সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর এবং মির্জা মিয়া তানসেন ছিলেন গোয়ালিয়র এর সুফী দরবেশ গোলাম গাউস গোয়ালিয়রীর মুরিদ। এ হিসেবে তারা ছিলেন পীরভাই। প্রথম জীবনে মিয়া তানসেন সুফী গোলাম গাউসের দরবারে সংগীত শিক্ষা করেন।

কুট কর্ণ দরবারী রাগ : মুঘল দরবারে মিয়া তানসেনের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুঘল শিল্পীবৃন্দ যে রাগ সংগীত উপস্থাপন করেছিলেন– তার নাম ছিল কুট কর্ণ। এই রাগটি ছিল সম্রাট আকবরের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি এই রাগটির নামকরণ করেন দরবারী রাগ। এই নাম এখনও প্রচলিত আছে।

www.amarboi.org

মিয়া তানসেনের মুঘল দরবারে আগমন উপলক্ষ্যে দরবারের একটি পেইন্টিং করা হয়েছিল। তাতে তানসেনকে ৩০-৩৫ বছরের যুবক হিসাবে অংকিত করা হয়েছে। যার অনুলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ছবিতে মিয়া তানসেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল মির্জা তানসেন হিসেবে। (Percy Brown, History of Indian Painting)[১০]।

মিয়া তানসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত রাগগুলোর মধ্যে মিয়াকি মলহার, মিয়াকি টোড়ি, মিয়াকি সারঙ অত্যন্ত সমাদৃত হয়। মিয়া তানসেন ভারতের অন্যতম প্রধান সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

বাদশাহ্ আকবরের সংগীতজ্ঞ পৃষ্টপোষকতা

আকবরের আমলে ভারত এবং পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগীতজ্ঞগণ মুঘল রাজদরবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবুল ফজল প্রায় ৪০ জন সংগীতজ্ঞ এবং বাদ্যবাদকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিয়া তানসেন।

মুঘল সম্রাটগণ সংগীত চর্চায় পূর্বসুরিদের চেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন। আকবরের সময় সংগীত চর্চা সম্পর্কে 'পপলি' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাঁর সময় বিভিন্ন রাগ সংশোধিত এবং মার্জিত হয়। যদিও সে সংশোধনে এবং মার্জিতকরণে প্রচলিত সংগীত ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়নি– তবুও এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়– এর ফলে সংগীত অধিকতর সুখ শ্রাব্য এবং প্রীতিকর হয়ে ওঠে। দরবারী রাগ আকবরের সময় হয়।

হিন্দী ভাষায় তানসেনের অবদান একটি সুন্দর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্লোকটি হলো "আকাবর বাদশা নরেনপতি", "তানসেন তানপতি"। এর অর্থ হলো আকবর বাদশা হলেন নর জাতির পতি। তানসেন হলেন গানের তানের পতি। অর্থাৎ আকবর বাদশা ছিলেন মুঘল সম্রাট আর তানসেন ছিলেন সংগীত সম্রাট।

শায়খ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালীয়রীর ভক্ত ছিলেন মুঘল বাদশা হুমায়ুন এবং আকবর (মাদাদ-ই-মাস)। শায়খ গাউস এর খানকা ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব জনের জন্যে উন্মুক্ত। তার মাজার গোয়ালিয়রে অবিস্থত। মাজারের বর্তমান ইমারতটি আকবরের ভক্তি ও বদান্যতায় নির্মিত।

যদিও সম্রাট আকবর ছিলেন দীন-ই-ইলাহী ধর্মের প্রণেতা, তিনি ছিলেন সূফী দরবেশদের পরম ভক্ত। তিনি প্রতি বছরই আজমীর শরীফ জিয়ারতে যেতেন।

www.amarboi.org

ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থানকারী সেলিম চিশতির দরবারে আকবর পুত্র লাভের জন্য দো'আ কামনায় দিল্লী থেকে ফতেপুর সিক্রি পর্যন্ত শুধু পদব্রজে নয়, নগ্ন পদেও ভিক্ষুকের ন্যায় গমন করতেন।

সম্রাট আকবর বিশ্বাস করতেন যে, সেলিম চিশতির দো'আর ফলেই সম্রাটি জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের পুত্র পরবর্তা সম্রাট নূর উদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়েছিল।

কৃতজ্ঞতায় তিনি নবজাত পুত্রের নাম রেখেছিলেন সেলিম এবং রাজধানী ও স্থানান্তর করেছিলেন দিল্লী থেকে ফতেপুর সিক্রিতে। ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাটের রাজ ভবন এবং রাজ দরবার নির্মিত হয়েছিল– লাল ইটে এবং সেলিম চিশতির দরগাহ স্বকৃতজ্ঞ আকবর তৈরী করিয়েছিলেন শ্বেত পাথরে।

মিয়া মিরজা তানসেন

মিয়া মিরজা তানসেনের নাম অবগত নয় এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বা ভারতবাসী বিরল। মিয়া মিরজা তানসেন ছিলেন এক অনুপম সংগীত শিল্পী যা উপমহাদেশের সংগীত ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি সংগীতজ্ঞ হিসাবে এমন খ্যাতির অধিকারী ছিলেন যে তার সম্পর্কে বহু উপকথা সৃষ্টি হয়েছে।

মিয়া মিরজা তানসেন জন্ম গ্রহণ করেন মধ্য ভারতের গোওয়ালিয়ার নগরের নিকটে বাহের নামক স্থানের এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার পিতার নাম মাকরান্দ মিশ্র (বন্ধু বিনোদ মিশ্র, হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৬)[১১]।

জন্ম : তানসেনের জন্মগত নাম ছিল ত্রীলোচন মিশ্র। তবে বাল্যকালে তিনি তান্না মিশ্র উপনামেই পরিচিত ছিলেন। তার জন্ম সম্পর্কেও একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন মুঘল ঐতিহাসিক শাহনেওয়াজ খান (মিরাতাই আফতাব নামা, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়, পাণ্ডুলিপি, ফলিও নাম্বার-৫২২)[১২]।

শহনেওয়াজ খান লিখেছেন– গোয়ালিয়র এর বিখ্যাত সূফী দরবেশ হযরত মুহাম্মাদ পাউস গোয়ালিয়রীর দুয়ার বরকতেই ত্রীলোচন মিশ্রের জন্ম হয়। জন্মের পর ত্রীলোচন মিশ্রকে সূফী দরবেশ গাউস গোয়ালিয়রীর নিকটে নিয়ে আসা হয়। সূফী দরবেশ তার জন্য দু'আ করেন।

জাতিচ্যুতি : ত্রীলোচন মিশ্রের ৫ বছর বয়সে পিতা মাকরান্দ মিশ্র পুনরায় তাকে সূফী গাউস গোয়ালিয়রীর নিকট নিয়ে আসেন। এবার দরবেশ তার

www.amarboi.org

মুখের চর্বিত পনর ত্রীলোচন মিশ্রকে খাওয়ান। ফলে ত্রীলোচন মিশ্রের জাত চলে যায় এবং মাকরান্দ মিশ্র একঘরে হয়ে পড়েন।

মাকরান্দ মিশ্র তখন জাতিচ্যুত শিশুটিকে দরবেশ গাউস গোয়ালিয়রীর খানকায় রেখে আসেন। খানকার খাদেম এবং জিয়ারতকারীদের আদর যত্নে শিশু ত্রীলোচন তান্না মিশ্র প্রতিপালিত হন।

শায়খ মুহাম্মাদ গাউস গোয়ালিয়রী ছিলেন দরবেশ শায়খ জাহুর এবং হাজী হামিদ এর মুরীদ। তারা ছিলেন একজন সূফী দরবেশ, যাদের ধর্ম পরায়নতা ও সরলতা ছিল সর্বত্র প্রশংসিত। শায়খ জাহুর এর ভ্রাতা শায়খ বাহলুলও ছিলেন একজন সূফী দরবেশ এবং সংগীতজ্ঞ।

বৃন্দাবন : সূফী দরবেশ শায়খ হযরত মুহাম্মাদ গাউস গোয়ালিয়রীর ইন্তেকালের পর ত্রীলোচন তান্না মিশ্র জীবিকার সন্ধানে সংগীত শিক্ষার জন্য গমন করেন বৃন্দাবনে সঙ্গীতের উস্তাদ স্বামী হরিদাস এর নিকট। গানের প্রতি শিশু তান্না মিশ্রের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় সূফী দরবেশ গাউস গোয়ালিয়রীর এর মাজারে গীত, গজল ও ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রভাবে।

স্বামী হরিদাসের নিকট সঙ্গীতের দীক্ষা লাভের পর তান্না মিশ্র যুগশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ বাইজু বাওয়ার নিকটও প্রশিক্ষণের জন্যে গিয়েছিলেন। বাইজু বাওরাও ছিলেন ভারত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ (মিরাত-ই-আফতাব)[১৩]।

দাক্ষিণাত্যে : সংগীত শিক্ষার জন্য ত্রীলোচন মিশ্র তানসেন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। ঐতিহাসিক আব্দুল কাদির বাদাওনীর মতে সংগীত শিক্ষার জন্য ত্রীলোচন মিশ্র চূনার নামক স্থানে সঙ্গীতের উস্তাদ মুহাম্মদ আদিল শাহ সুরীর নিকটও গমন করেছিলেন।

আদিল শাহ সুর ছিলেন চূনারের শেরশাহ সুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র। শের শাহ সুরী পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন।

বান্দর ঘরে : বিভিন্ন স্থানেও উস্তাদের নিকট সংগীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পর মিয়া মিরজা তানসেন রাজা রামচন্দ্র বাঘেলার দরবারে সংগীতজ্ঞের চাকুরী গ্রহণ করেন। রাজা রামচন্দ্র বাঘেলা ছিলেন বাণ্ডা রাজ্যের অধিপতি। তার রাজধানী ছিল বান্দর ঘর।

অতঃপর ত্রীলোচন মিশ্র তানসেন ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে আগমন করেন। মুঘল দরবারে তার আগমন উপলক্ষে যে চিত্রকর্ম

www.amarboi.org

পেইনটিং তৈরী করা হয়েছিল– তাতে তানসেনকে যেভাবে দেখানো হয়েছে–তা হতে তার বয়স ঐ সময় ত্রিশ-পয়ত্রিশ। ঐ পেইনটিং-এ তাকে যুবক বলে অনুমিত হয় (Percy Brown, History of Mugual Painting)[১৪]। এ হিসাবে তার জন্ম খুব সম্ভব সম্রাট বাবুরের সময়ে হতে পারে।

মিয়া মিরজা তানসেন : মাকরান্দ মিশ্রের পুত্র ত্রীলোচন মিশ্র তানসেন কখন ইসলাম গ্রহণ করে মিয়া মিরজা তানসেন নাম গ্রহণ করেন– এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ ইতিহাসে নেই। তবে ধারণা করা হয় যে তিনি সূফী দরবেশ হযরত মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়রীর মুখে-চর্বিত পান খেয়েছিলেন, তখন পূন থেকেই তিনি মুসলিম হিসাবে গণ্য হন (বন্ধু বিনোদ মিশ্রঃ History of Hindi Literature, Volume, p-246)[১৫]।

শিশু বয়সে জাতিচ্যুত হয়ে মুসলিম হিসাবে গণ্য হলেও ত্রীলোচন যখন স্বামী হরিদাস বৃন্দাবনীর নিকট এবং গোয়ালিয়রের বাইজু বাওয়ার নিকট সংগীত শিক্ষা করতেন, তখন তিনি পরিচয় দিতেন নিজেকে ত্রীলোচন মিশ্র নামে।

এরপর যখন তিনি চূনারে মুহাম্মদ আদিল শাহ্ সূরীর নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ করেন তখন তিনি মিয়া তান্না মিশ্র নামে পরিচিত ছিলেন। এরপর যখন তিনি আকবরের দরবারে আসেন তখন তিনি পরিচিত হয়ে যান মিয়া মিরজা তানসেন নামে।

শুধু তানসেনের জন্ম তারিখ নয়, তার মৃত্যুকাল সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত আইনী আকবরী গ্রন্থে তানসেনের জন্ম/মৃত্যু সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। হয়ত তখন তিনি জীবিত ছিলেন।

মৃত্যু : তানসেনের মৃত্যু হয় গোয়ালিয়রে। মিয়া মিরজা তানসেন এর মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করা হয়নি। কবর দেওয়া হয় তার উস্তাদ হযরত মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়রীর মাজারের পাশে। মিয়া তানসেনের কবরের পাশেই বেড়ে উঠেছে বিরাট এক কড়ই বৃক্ষ। এই কড়ই বৃক্ষ তল হয় মিয়া তানসেনের ভক্ত সংগীতজ্ঞ এবং নৃত্য বালিকাদের তীর্থ স্থান।

এখনো এইখানে তারা গান গায়। নাঁচানাচি করে। কড়ুই গাছের পাতা চর্বণ করে। ভক্তরা মনে করে যে এই কড়ই বৃক্ষের পত্র চর্বণ করলে তাদের কণ্ঠস্বর উন্মুক্ত হয় এবং বলিষ্ঠ হয়। ধারণা করা হয় যে, মিয়া মিরজা তানসেন ৫৭ বছর বয়সে ১৫৮৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

www.amarboi.org

মূল্যায়ন : মিয়া মিরজা তানসেন যে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত বিশারদ ছিলেন– এতে কোন দ্বিমত নেই। তবে সংগীত তারকাদের মধ্যে তার স্থান কোথায় সে বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। সংগীত তত্ত্ববিদ ও সংগীত বৈজ্ঞানিকগণ সঙ্গীতের মূল্যায়ন তাদের নিজস্ব শাস্ত্রীক পদ্ধতিতে করে থাকেন। তবে মিয়া মিরজা তানসেন যে উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রিয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন– এতে বোধ হয় কারও সন্দেহ নেই।

সংগীত বিদ্যা বিশারদগণ তানসেনের মূল্যায়ন করেন তাকে গান্ধর্ভ হিসেবে। কিন্তু আমীর খসরু সম্বন্ধে সর্বসম্মত মূল্যায়ন হলো নায়ক হিসাবে। নায়কদের মর্যাদা গান্ধর্ভ থেকে উচ্চ স্তরের। নায়ক এবং গান্ধর্ভ শ্রেণীর সংগীতজ্ঞরা শুধু তাদের কালের প্রচলিত সংগীত চর্চাই করেন না বরং অতীতের বিভিন্ন ধরণের সংগীত কৌশলের চর্চা করেন। নায়কগণ উভয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠমানের সংগীতজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত হন।

মিয়া মিরজা তানসেন ছিলেন ভারত ইতিহাসে সঙ্গীতের সর্বোত্তম বিকাশ যুগ বা রেনেঁসা যুগের সংগীতজ্ঞ। উপমহাদেশে সঙ্গীতের রেঁনেসা বা বসন্ত শুরু হয়েছিল গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তানওয়ার (১৪৮৬-১৫১৬) এবং জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ সার্কীর (১৪৫৮-১৫০০) উদ্যোগে এবং তা চলেছিল মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

সংগীতজ্ঞ সুলতান বজ বাহাদুর

সুলতান বজ বাহাদুর খান ছিলেন মধ্য ভারতের মালব রাজ্যের রাজা। পিতা সুজাত খানের মৃত্যুর পর ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ রাজ্যে তিন শাহাজাদার মধ্যে বিভক্ত হয়। তারা ছিলেন দৌলত খান, বায়েজীদ খান এবং মোস্তফা খান।

দ্বিতীয় ভ্রাতা বায়েজীদ খান হঠাৎ করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দৌলত খানের রাজ্য আক্রমণ করে ভ্রাতৃযুদ্ধে দৌলত খানকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং ভ্রাতৃ রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পাশ্ববর্তী উজ্জয়িনী ও মান্ডুরাজ্য জয় করে বায়েজীদ খান সুলতান "বজ বাহাদুর খান" উপাধি ধারণ করেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোস্তফা খানের রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি গোন্ডাওনা রাজ্যে আক্রমণ করেন।

www.amarboi.org

কিন্তু গোন্ডাওয়ানার রাজা বিরেন্দ্র নারায়ন এবং তার মাতা রানী দুর্গাপতির নিকট পরাজিত এবং আহত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নিজ রাজ্যে চলে আসেন। এ পরাজয়ের ফলে পর রাজ্য গ্রাসের স্বাদ তার মিটে যায়।

সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ : সুলতান বজ বাহাদুর প্রকৃতিগতভাবে ছিলেন একজন শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ। সংগীত ছাড়াও সুলতান বজ বাহাদুর খান এর শিল্প চর্চার অন্য একটি দিগন্ত ছিল নৃত্যকলা। সুলতান বজ বাহাদুর ছিলেন শুধুমাত্র জ্ঞাণগ্রাহী রাজন নন, তিনি ছিলেন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞও। রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে তিনি অকল্পনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বজ খানী সংগীত : রাজা বজ বাহাদুর সহজ বোধ্য খেয়াল সংগীত চর্চায় নিজস্ব মান এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। তিনি একটি বিশেষ ধরনের সঙ্গীতের আবিষ্কারক এবং গায়ক। তার প্রবর্তিত সংগীত ধারা বিশেষজ্ঞ এবং মূল্যায়কের দৃষ্টিতে "বজ খানি সংগীত" ধারা বা ষ্টাইল হিসেবে খ্যাত।

মালবের সুলতান বজ বাহাদুর প্রবর্তিত বজখানী সংগীত ছিল ধ্রুপদ ও খেয়াল এর সংমিশ্রন জাত সংগীত। বজখানী সঙ্গীতের সম্পর্ক ধ্রুপদ অপেক্ষা খেয়াল সঙ্গীতের সঙ্গেই বেশী ছিল।

খেয়াল সংগীতজ্ঞ : সুলতান বজ বাহাদুর নিজস্ব বজ খানি সঙ্গীতের প্রবর্তক এবং খেয়াল সঙ্গীতে সুদক্ষ হলেও ধ্রুপদ সঙ্গীতে অদক্ষ ছিলেন না। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহকে ধ্রুপদ সঙ্গীতের জনক মনে করা হয়। ধ্রুপদ সংগীত খেয়াল অপেক্ষা কঠিনতর এবং খেয়াল সঙ্গীতের পূর্ববর্তী ষ্টাইল হিসেবে স্বীকৃত।

সংগীত জগতের অন্য নক্ষত্র হোসেন শাহ সার্কীও খেয়াল সঙ্গীতের অধিকতর চর্চাকারী ছিলেন। উত্তর ভারত ধ্রুপদ অপেক্ষা খেয়াল সংগীতই ছিল অধিকতর জনপ্রিয়।

বজ বাহাদুর রচিত দোহা সংগীত ছিল ছন্দ বন্ধ শ্লোক, অনেকটা খেয়াল শ্রেণীর "স্থাঈ" এবং "আন্তারা" সংগীত জাতীয়। ধীমা তিন তালে ও মাপে এই খেয়াল জাতীয় সংগীত গীত হতো।

নৃত্য শিল্পী বজ বাহাদুর : ভারত উপমহাদেশের সুলতান বাদশাহদের মধ্যে নৃত্য শিল্পী হিসেবে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এরূপ ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যক্তিত্ব মালব রাজ বজ বাহাদুর ছাড়া আর কেও ছিলেন– এমন সাক্ষ্য মিলে না। বজ বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মানের নৃত্য শিল্পী।

www.amarboi.org

সংগীত রাজ বজ বাহাদুর খান-এর নৃত্য চর্চার আসর বসতো রাজকীয় দরবারেই। অন্যান্য নৃত্য শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশনের সময় পায়ের গোড়ালীতে তামা বা পিতলের তৈরী ঘুংগুর ব্যবহার করতেন।

বজ বাহাদুরও নৃত্যকালে অন্যান্য শিল্পীদের মত ঘুংগুর ব্যবহার করতেন। তবে সেই ঘুংগুরে থাকতো মণি মুক্তা।

রাধাকৃষ্ণ নৃত্য : দরাবারে বজ বাহাদুরের নৃত্যের থীম বা বিষয়বস্তু থাকতো হিন্দু ধর্মীয় অতি উঁচু মার্গের। প্রধান বিষয়টি ছিল মহাপ্রভু কৃষ্ণ এবং তার প্রেয়সী রাঁধা সংক্রান্ত।

হিন্দু ধর্ম মতে ঈশ্বর প্রেমময়। ঈশ্বরের প্রেম প্রতিফলিত হতো দেবী রাঁধা এবং মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রেমের রূপকে। এই প্রেমে কৃষ্ণ ছিলেন স্রষ্টা এবং রাধা ছিলেন সৃষ্টি। তাদের এই নৃত্য ছিল ঐশ্বরীক নৃত্য।

রাঁধা কৃষ্ণের নৃত্যের মধ্যে সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার ভালবাসা প্রতিফলিত হতো। রাঁধা ছিল মানব জাতীয় প্রতীক। বৃন্দাবনে রাঁধা শুধু একাই ছিলেন না। তার গোপী সখীগণও ছিল। তারা ছিল অন্যান্য সৃষ্টির প্রতীক।

বৃন্দা বনে গোপীদের সমভিব্যাহারে ঈশ্বর কৃষ্ণ এবং মানবতার প্রতীক রাঁধার প্রেম লীলা-রাঁধা কৃষ্ণ নৃত্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হতো।

বৃন্দাবনে রাঁধা কৃষ্ণ নৃত্যে রং বেরং এর পানি বা জল নিয়ে হলি নৃত্য হতো। বৃন্দবনে রাঁধা কৃষ্ণের প্রতিকী নৃত্যের মাধ্যমে একটি সঙ্গীতে হঠাৎ করে দেখা যায় রাঁধার দৈব সিংহাসন থেকে পতন এবং নৃত্য সঙ্গীতের মাধ্যমে স্রষ্টা কৃষ্ণের করুণা কামনা।

যদিও রাঁধা কৃষ্ণ নৃত্যের মাধ্যমে দেখা যায় রাঁধার চরম অধপতন। কিন্তু, কৃষ্ণ-প্রেমের অন্তসলীল রাঁধা হৃদয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে রাঁধারূপ সৃষ্টি রক্ষা পেয়ে যায়।

রাঁধা কৃষ্ণ প্রেম লীলা সংক্রান্ত নৃত্য নাটকের রচয়িতা এবং প্রধান নৃত্য নায়িকা ছিলেন দরবারের প্রধান নৃত্য শিল্পী রূপমতি। রাঁধা কৃষ্ণ নৃত্য নাটকের মর্মবাণী ছিল অতি সরল। গানের কলি ছিল দিল্লী ও মিরাটের স্থানীয় কথ্যভাষা খারিতে।

বজ বাহাদুরের ন্যায় তার প্রেমিকা রূপমতিও ছিলেন কবি ও সংগীত রচয়ীতা। রূপমতির রচনা ছিল বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ব্রাজ ভাষায়। রূপমতির নৃত্য সংগীতগুলোর একটি সংকলন "দি লেডি অফ দি লোটাস" বা 'পদ্ম রাণী' নামে প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

www.amarboi.org

রূপমতি কর্তৃক রচিত ও গীত সংগীত সমূহের মর্মবাণী হলো– আমি রাঁধা হীন, দীন, পাপী, বিশ্বাস ভঙ্গকারী, নির্দেশ লংঘনকারী, সর্বাঙ্গ পাপে নিমর্জ্জিতা। কিন্তু আমার একমাত্র অনুভূতি হলো– আমি তোমার।

তুমি আছো আমার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে। আমি পরিপূর্ণভাবে তোমার উদ্দেশ্য নিবেদিত। আমি তোমাকে কোন পত্র লিখিনা। কারণ তুমি আছো আমার অতি নিকটে। তোমার আসন আমার হৃদয়ে।

কৃষ্ণ প্রেমিক রাঁধার মধ্যে প্রতিফলিত হয় প্রাচীন সমাজে নারীদের মধ্যে যা কিছু ছিল উত্তম এবং স্বর্গীয়। রূপমতি ছিলেন অনুপম সৌন্দর্য, মাধুর্যের অধিকারীনী। নৃত্য, গীত পটিয়সী রূপমতি ছিলেন সর্বজনের মনোমুগ্ধকারীনী।

রাঁধাকৃষ্ণ নৃত্য নাট্যে তিনি অংশগ্রহণ করতেন রূপমতির আয়ত্ত্বাধীন সংগীতজ্ঞ এবং নৃত্য পটীয়সী ছিলেন নারীবৃন্দ। যাদের মধ্যেমণি ছিলেন রূপমতি।

নৃত্য শিল্পী রূপমতি ছিলেন একজন বিদুষী কবি, গায়িকা, আবৃতিকারক, হাস্য বিশারদ, আনন্দদায়ীকা, মহিয়সী। সমকালীন ইতিহাসে এ ধরণের অনুপম মহিলাদেরকে পদ্মিনী খ্যাতি দেয়া হত। পদ্মিনী রূপমতির শারিরীক সৌন্দর্য, উচ্চতা, বাচন ও চলন ভঙ্গী স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও ব্যক্তিত্ব তাকে অসাধারনত্বে উন্নীত করেছিল।

সুলতান বজ বাহাদুর ও তার প্রিয়তমা পদ্মিনী রূপমতি ছিলেন পরস্পরের রূপ ও গুণে মুগ্ধ। প্রেম ভালোবাসা ও আনুগত্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

রাঁধা কৃষ্ণ নৃত্য নাটকের নৃত্য গীত পটিয়সী রূপমতি স্বীয় গুণাবলীতে রাজরানী হওয়ার জন্যে ছিলেন সর্বাঙ্গীন ভাগে উপযুক্ত। অভিনয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবতার রূপ লাভ করে এবং স্বাভাবিক ও সঙ্গত ভাবেই রাজধানী ও রাজ্যে গৃহীত হয়। এ নিয়ে রাজা বজ বাহাদুর খানকে কলঙ্কিত হতে হয়নি। কিন্তু, রাজ্য হারা হতে হয়। এর ফলশ্রুতিতে রাজ্যের প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সর্বস্তরে অবক্ষয় ঘটে।

মুঘল আক্রমণ : রাণী রূপমতি ও বজ বাহাদুরের প্রেম রাজ্যের কল্প কাহিনী তরুন সম্রাট আকবরের গোচুরীভূত হলে দুরদর্শী আকবর এই রাজ্য জয়ের সুবর্ণ সুযোগ হারাতে চাইলেন না।

মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৬০ সালে সেনাপতি আদম খান, আতকা খান এবং পীর মুহাম্মাদ শিরওয়ানির নেতৃত্বে মালব বিজয়ের জন্যে একটি মজবুত বাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লী বাহিনীর মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই মুঘলগণ মালব

www.amarboi.org

রাজধানীর প্রতিরক্ষা প্রাচীরের দুই মাইলের মধ্যে এসে উপস্থিত হন। নাম মাত্র যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হয়ে চরম অবমাননার বোঝা মাথায় নিয়ে সব কিছু ছেড়ে রাজা বজ বাহাদুর খান কোন প্রকারে শুধুমাত্র জীবন নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

বন্দী রূপমতি

মুঘল বাহিনী সরতপুর পদানত করে রাজ প্রাসাদেই ঢুকে পড়লো। প্রাসাদ রক্ষীগণ অনেকেই নিহত হল। অন্তপুরের মহিলারাও পালাতে গিয়ে আহত ও নিহত হলেন। যারা পালাতে পারলো না তারা রাজ-অন্তপুরের গোপন কক্ষগুলিতে আশ্রয় নিলেন।

সেনাপতি আদম গান রাজ মহিষী রূপমতির খবর নিয়ে জানলেন তিনি আহত এবং মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন। আদম খান নির্দেশ দিলেন আহতদের চিকিৎসার সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা করতে।

রাণী রূপমতিকে জানালেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেই তার পলাতক স্বামী বজ বাহাদুর খান এর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। স্বকৃতজ্ঞ রূপমতি একটি ফার্সি শ্লোকে বিজয়ী বীর আদম খান কৃতজ্ঞতা জানালেন।

ঐতিহাসিক ফিরিস্তার গ্রন্থের মধ্যে উধৃত এই শ্লোকটির সামর্থ হলো– এই শুভ সংবাদ আমার জন্য এতো আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তির যে, এই আনন্দে আমি মরণেও সম্মত।

আদম খান কিন্তু রানী রূপমতি সুস্থ হওয়ার পরেও তাকে পলাতক সুলতান বজ বাহাদুরের নিকট পাঠাতে উদ্যোগ নিলেন না। ঘোষণা করলেন যে, বজ বাহাদুর সম্রাট আকবরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলেই রাণীকে স্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্য মুক্ত করে দওেয়া হবে।

আদম খানের বদ উদ্দেশ্য : এর মধ্যে আদম খান রাণীর রূপমতির রূপের বর্ণনা শুনে মাথা ঠিক রাখতে পরলেন না। এক রজনীতে তিনি রূপমতিকে স্বীয় প্রাসাদে আনার জন্য প্রতিহারী বাহিনী প্রেরণ করেন।

রূপমতি আদম খানের প্রাসাদে গমনের সম্মতি দিলেন। তবে, এক শর্তাধীনে। তা হলো– পদ্মিনী মহিষী রূপমতিকে আদম খানের প্রাসাদে গমনের জন্যে সুসজ্জিত হওয়ার সময় দিতে হবে। অতঃপর তাকে নেওয়ার জন্যে আদম খানকে নিজে আসতে হবে।

www.amarboi.org

এই খবর শুনে আদম খানের হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠল। তিনি নিজেও সুসজ্জিত হয়ে মহানন্দে রূপমতির প্রাসাদে আসলেন। আদম খান যথা সময়ে যথাযথভাবে রূপমতির শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন।

রূপমতি তখন স্বীয় শয্যায় চির নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নব বিবাহের কনের ন্যায় সুন্দরতম পোষাকে সুসজ্জিত হয়েছিলেন। তার অঙ্গ প্রতঙ্গে ছিল মূল্যবান মণিমুক্তার অলংকার ও কণ্ঠহার। মনে হয়েছিল বিবাহ সাজে সজ্জিত হয়েছেন। তদুপরি শয্যায় তার দেহের চারিদিকে ছিল পুষ্পের মালা। কক্ষটি ছিল সর্বত্তম সুগন্ধিতে মোহিত।

রাণী রূপমতির করুণ মৃত্যু : রাণী রূপমতির আত্মহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে আদম খান রূপমতির মন মানসিকতা ও প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি অবহিত হতে চাইলেন। আদম খানের প্রতিহারী বাহিনীদের ফেরত দেওয়ার পরেই স্বামী বজ বাহাদুরের স্মৃতি চারন করে রানী রূপমতি অত্যন্ত করুন এবং মর্মান্তিক ক্রন্দন করেন। তারপর রাজকীয় অলংকার ও মণিমুক্তা দেহে ধারণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় ভূষণে ভুষিত হন।

বিবাহের কনের সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্পুর জহর বিষ হাতে নিয়ে শয্যায় শায়িত হন। পরম তৃপ্তির সাথে হাস্য মুখে এবং তিনি স্বামী বজ বাহাদুরের স্মৃতি চারণ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বিষ পান করেন।

অমানুষ ও দুবৃত্ত্ব হয়েও আদম খান ইসলামী পদ্ধতিতে রাণী রূপমতির দাফনের ব্যবস্থা করেন। এ সংক্রান্ত খবর পেয়ে সম্রাট আকবর পীর মুহাম্মাদ খান শেরওয়ানকে সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং আদম খানকে পদচ্যুত করেন।

রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা : রাণী রূপমতির আত্মহত্যার খবর পেয়ে পলাতক সুলতান বজ বাহাদুর খান্দেশের অধিপতি মিরন মোবারক শাহের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে তার সাহায্য চান। খান্দেসাধিপতি মিরন মোবারক শাহ প্রদত্ত ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বিরাট মুঘল বাহিনীকে আক্রমণ করেন রাণী রূপমতির করুন মৃত্যুর শোকে ক্ষিপ্ত সুলতান বজ বাহাদুর।

তীব্র যুদ্ধের পর মুঘল সেনাপতি পীর মুহাম্মাদ খান শিরওয়ানী পরাজিত হয়ে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু নর্মদা নদীতে ডুবে নিহত হন। সুলতান বজ বাহাদুর রূপমতির স্মৃতি ধন্য মালব পুনর্বিজয় করেন। কিন্তু পরম পরাক্রমশালী মুঘলদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারেননি।

পরবর্তী মুঘল সুবাদার আব্দুল্লাহ্ খান উজবেগ সুলতান বজ বাহাদুর থেকে মালব পুনরুদ্ধার করেন (৯৭০ হিজরী/১৫৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ)।

www.amarboi.org

বজ বাহাদুর আব্দুল্লাহ্ খান উজবেগের নিকট পরাজিত হয়ে নতুন ভাবে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তিনি আহামাদ নগরের সুলতান বুরহানুল মুলক, মেবারের রাজা রানা উদায় সিং এবং গুজরাটের বিভিন্ন রাজন্যে বর্গের নিকট সাহায্যের প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল ঘুরাঘুরি করেন।

মুঘলগণও তার পিছু নিয়েছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য সুলতান বজ বাহাদুর বহু দুর্গম শ্বাপদ সংকুল অরণ্য ও পর্বত গুহায় আত্মগোপন করেন।

বজ বাহাদুর যুবক মুঘল সম্রাট আলাউদ্দিন আকবরের মানবিক গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের বিষয় অবহিত হয়েছিলেন। রাজ্য উদ্ধারের কোন আশা না থাকায় তিনি মহান হৃদয় আকবরের নিকট নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

আকবর তাকে নিরাশ করেননি। মুঘল রাজ বাহিনীতে তিনি দুই হাজার সাওয়ার, দুই হাজার জাট বাহিনী এবং এক হাজার পদাতিক বাহিনী মানসবদার পদ মর্যাদায় সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন। ব্যক্তি হিসেবে বজ বাহাদুর ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ, সুনিপুন পলো খেলোয়াড় এবং সুদক্ষ অশ্বারোহী। আর বহু রাজকীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি।

মালব রাজ্য সুলতান বজ বাহাদুর খানের প্রধান পেশা সংগীত চর্চা ছিল না। কিন্তু তিনিও সংগীত বিজ্ঞানীদের মূল্যায়নে গান্ধর্ব স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। মিয়া তানসেনের সঙ্গে একই স্তরে আরোহন করলেও সার্বিক বিচারে মিয়া তানসেনের স্থান সংগীতজ্ঞ হিসেবে বজ বাহাদুরের ওপরেই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন মিয়া তানসেন। সংগীত বিজ্ঞানীদের মূল্যায়নে তার অবস্থা নায়ক পদমর্যাদার নীচে এবং গান্ধর্ব স্তরের।

বজখানী সংগীত : ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে সংগীতজ্ঞ হিসাবে বজ বাহাদুরের স্থান মুঘল দরবারে মিয়া তানসেন, বাবা রামদাস এবং নায়ক চার্জুর পরেই। তবে সংগীত বিশারদদের বাইরে সাধারণ সংগীতামোদীদের বিচারে মিয়া তানসেনের পরেই রাজা বজ বাহাদুরের স্থান।

সাধারণ শ্রোতাদের নিকট উপরোক্ত চারজন সংগীতজ্ঞদের মধ্যে সুলতান বজ বাহাদুরই সর্বাধিক জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এর কারণ মিয়া তানসেন, বাবা রামদাস এবং নায়ক চার্জুর পদচারণা ছিল ক্লাসিক ধ্রুপদ সংগীত চর্চা। সুলতান বজ বাহাদুরের দক্ষতা ছিল খেয়াল সঙ্গীতে। ধ্রুপদ সংগীত অপেক্ষা খেয়াল সংগীত অধিকতর সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয়।

www.amarboi.org

যখন রূপমতি ছিলেন মুঘলদের হাতে বন্দী সে সময় তার গীত সংগীতগুলি ছিল অত্যন্ত করুন, মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক। লাইলী-মজ্ঞু, ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফরহাদের কাহিনীর অনেকটাই কবি ও গায়কদের কল্পনা প্রসূত এবং অবাস্তব। কিন্তু বজ বাহাদুর-রূপমতি প্রেম কাহিনী বাস্তব ইতিহাস এবং কল্পনা বিলাস থেকেও বিস্ময়কর।

মানব সুলতান বজ বাহাদুর এর প্রেমিকা রাণী রূপমতি কর্তৃক প্রণীত সংগীত এখনও মালবের প্রত্যন্ত এলাকায় নারীদের কণ্ঠে শোনা যায়।

সম্রাট নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর

মুঘল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দদীন মুহাম্মাদ বাবুর, নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ হুমায়ুন এবং নূর উদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর (১৬০৩-১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) সকলেই ছিলেন উত্তম পাঠক, লেখক, 'পণ্ডিত', রাজন। কিন্তু হুমায়ুনের পুত্র ও জাহাঙ্গীরের পিতা জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর ছিলেন নিরক্ষর। তিনি ছিলেন মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পাঠক। মুঘল রাজ বংশের সৌরভ এবং গৌরব গাঁথা সম্রাট আকবরের অবদান এবং উল্লেখ ভিন্ন অসম্পূর্ণ।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ছিলেন মহান হৃদয় প্রেমিক। মেহেরুন্নেসা নূরজাহান এর সঙ্গে তার প্রথম প্রেম দূরদর্শী পিতার কারণে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় কিস্তিতে তা তিনি সফল করে নেন। মুঘল রাজ বংশের স্মৃতি কথা লিখে গেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জহির উদ্দীন মুহাম্মাদ বাবুর। সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন কবি, শিল্পী এবং দেশপ্রেমিক।

মিয়া মিরজা তানসেন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালেই মৃত্যু বরণ করেন (Roger, Memoris of Jahangir, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৩)[১৬]। জাহাঙ্গীর তার স্মৃতি কথায় সংগীতজ্ঞ "মিয়া লাল" এর উল্লেখ করেছেন, যিনি তার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষেই মৃত্যু বরণ করেন।

বিলাস খান : ময়া তানসেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিলাস খান উত্তরাধিকার সূত্রে সংগীতজ্ঞ হিসেবে মুঘল দরবারে পিতার স্থান অধিকার করেন। বিলাস খান ছিলেন উঁচু মানের সংগীতজ্ঞ। তার আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত বিলাস তুড়ি ধ্রুপদ তাকে উত্তর পুরুষদের নিকট স্মরণীয় করে রেখেছে।

হাফিজ নাদ আলী : সংগীতজ্ঞ হাফিজ নাদ আলী ছিলেন জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। যে দিন নাদ আলী সংগীত পেশ করতেন– তার পরবর্তী

www.amarboi.org

দিন সম্রাট নাজরানা হিসাবে যা নগদ পেতেন, সবটুকুই নাদ আলীকে বকশিস দিতেন। তাই তার নাম হয় নগদ আলী।

সম্রাট জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা আকবরের দরবারে শত শত সংগীতজ্ঞ, বাদক এবং প্রাসঙ্গিক শিল্পীবৃন্দকে পেয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি ছাটাই করেননি। বরং তাদেকে নজর বকশিস দানে ছিলেন উদার।

সংগীতজ্ঞ মির্জা জুল কারনাইন

মির্জা জুল কারনাইন-এর পিতা ইয়াকুব আর্মেনিয়া হতে আলপ্পো হয়ে ভারতে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা সংক্রান্ত। তার পিতা ইয়াকুব আকবরের দরবারে 'সিকান্দর' নামে অভিহিত ছিলেন। আকবর তাকে মুঘল দরবারে চাকুরী দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল বিভিন্ন ভাষার ওপরে ইয়াকুবের জ্ঞান। তিনি পর্তুগীজ ভাষাও জানতেন।

মির্জা ইয়াকুব আকবরের দরবারের মির্জা আব্দুল হাই ́এর কন্যাকে বিয়ে করেন। ১৫৫৮ সালে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বাদশাহ আকবর তখন মির্জা জুল কারনাইনকে বললেন তার শালিকাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু আকবরের দরবারে জেসুইত পাদ্রীগণের মতে স্ত্রীর ভগ্নিকে বিবাহ করা ছিল খৃষ্ট ধর্ম বিরোধী। ফলে তাদের সম্মতি ছাড়াই মির্জা ইয়াকুবের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। মিরজা ইয়াকুব ছিলেন খৃষ্টান।

ইয়াকুব পুত্রদ্বয় : মির্জা ইয়াকুবের প্রথম বিয়ের সন্তান ছিলেন মির্জা জুল কারনাইস এবং মির্জা ইসকান্দর। তাদেরকে আকবর নিজ প্রাসাদে নিয়ে আসেন। তারা জাহাঙ্গীরের পুত্রদের সমবয়সী ছিল। মির্জা জুল কারনাইনের বয়স যখন বার বছর হয়, তখন পিতা মির্জা ইয়াকুব তাদের দুই ভাইকে 'সমভারে' নিয়ে যান। যেখানে তিনি ছিলেন সরকারী লবণ তৈরী কারখানার দায়িত্বে।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহনের পর মিরজা জুল কারনাইন এবং মির্জা ইস্কান্দার আগ্রায় আসেন। নতুন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

বাদশাহী নির্দেশে ইসলাম কবুল : সম্রাট জাহাঙ্গীর অবগত হলেন যে, মির্জা ইয়াকুবের দুই পুত্র মির্জা জুল কারনাইন এবং মির্জা সিকান্দার মুসলিম নন। বাদশার নির্দেশে দুইজনই কালিমা তাইয়েবা পাঠ করেন এবং পরদিন তাদের খাৎনা বা ত্বকচ্ছেদ হয়ে যায়।

www.amarboi.org

ইসলাম কবুল করার পর ইসলামকে ধর্ম হিসেবে অস্বীকার করার অপরাধে তাদেকে ভীষণভাবে মারধর করা হয়। কিন্তু কিছুতেই তারা মুসলিম বলে পরিচয় দিতে সম্মত হয়নি। নিজ ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখে সম্রাট জাহাঙ্গীর সন্তুষ্ট হন এবং তাদের সকল সুযোগ সুবিধা বহাল রাখেন।

লবণ কারখানার অধিনায়ক : ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা জুল কারনাইন এর পিতা ইয়াকুব ইন্তেকালে করেন। তখন মির্জা জুল কারনাইনের বয়স ছিল ২০ (বিশ)। মির্জা জুল কারনাইনকে তার পিতার পদে (সরকারী লবণ কারখানার সুপারিনটেনডেন্ট) নিয়োগ করা হয়। তারা দুই ভাই-ই খৃষ্ট ধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাদের ব্যবসার আয় খৃষ্টানদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতেন।

১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মির্জা জুল কারনাইনকে ফৌজদার এবং সুবেদার পদে নিয়োগ করেন। মির্জা জুল কারনাইন দুইশত খৃষ্টানদের সকল ব্যয়ভার বহন করতেন। এক পর্যায়ে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ মুঘলদের একটি বাণিজ্য জাহাজ লুট করে। তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর জেসুইট খৃষ্টানদের জন্যে আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেন। সেই সময় মির্জা জুল কারনাইনই জেসুইটদের ব্যয়ভার বহন করতেন।

সেকালে খৃষ্টানদের জন্য ৪৭,০০০ টাকা অনুদানের কারণে রোম থেকে জুল কারনাইন সম্মান সূচক পদবী লাভ করেন। সম্রাট শাহজানের রাজত্বকালে জুল কারনাইন বাংলায় মুঘল সুবেদার ছিলেন (১৫২৭-৩২)।

সংগীত চর্চা : হিন্দী কবিতা এবং সঙ্গীতের প্রতি জুল কারনাইনের গভীর আকর্ষণ ও দক্ষতা ছিল। মুঘল বাদশার জন্য রচিত সঙ্গীতে জুল কারনাইন সুর দিতেন। তিনি রাজ দরবারে সংগীতজ্ঞদের সংগীত শিক্ষা দিতেন, বিশেষ করে তার নিজের রচিত সংগীত।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তার স্মৃতি কথা "তুজোক-নামায়" জুল কারনাইনের সংগীত প্রতিভার প্রশংসা করেন। ভারতীয় সঙ্গীতে তার দক্ষতার প্রশংসা করেন। তাকে একজন খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মির্জা জুল কারনাইন সংগীতজ্ঞ হিসেবে ছিলেন 'গান্ধর্ভ' পর্যায়ের। তিনি ধ্রুপদী সংগীতজ্ঞ হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবার আলোকিত করেন।

মির্জা জুল কারনাইন ছিলেন মিয়া তানসেনের শিষ্য মিয়া আকিলের শিষ্য। মিয়া আকিল ছিলেন একজন ফৌজদার এবং রাজ্যের আমীন (শাহনেওয়াজ খান, মিরাত-ই-আফতাবনামা)[১৭]।

www.amarboi.org

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছাড়াও আব্দুল হামিদ লাহোরী এবং মুহাম্মদ সোয়ালীদ এর মত ব্যক্তিত্বগণও জুলকারনাইন এর সংগীত প্রতিভার প্রশংসা করেছেন (বাদশা নামা, খণ্ড-১)[১৮] (আমলে সালিহ, খণ্ড-১)[১৯]।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর এর সময় পর্যন্ত ছিল ধ্রুপদ সঙ্গীতের রাজত্ব। খেয়াল তখনও জনপ্রিয় ততটুকু হয়নি। ফকির উল্লাহ্ তার রচিত 'রাগ দর্পণ' গ্রন্থে দু'জন বিখ্যাত খেয়াল গায়কের উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহ এবং ঈদসিং বৌর (প্রফেসর আব্দুল হালিম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬)[২০]।

একটি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মির্জা জুলকারনাইনের একটি সংগীতও সংরক্ষিত হয়নি, যেমন হয়েছে নায়ক বায়জু, মিয়া তানসেন, মুহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা, সাধারাং, হাররং, প্রমুখের অন্যান্যদের সংগীত। তার সঙ্গীতের সুর সম্পর্কেও কোন লিখিত তথ্য নাই। তার সংগীত চর্চা সম্পর্কে শুধু এটুকু বলা যায় যে, তিনি ছিলেন মূলতঃ ধ্রুপদ গায়ক সংগীতজ্ঞ।

Father Hosten তার সমৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন যে, জুল কারনাইন যে সুরে গান গাইতেন, তা যদি কেও চিহ্নিত করতে পারে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করতেন। এক ব্যক্তিকে তিনি এই দক্ষতার জন্য একটি বাড়ী দান করেন আর একজনকে দিয়েছিলেন একটি হাতী (Father Hosten, Memoris : Asiatic Society of Bengal, Calcutta)[২১].

মির্জা ফকির উল্লাহ্ রচিত "রাগ দর্পণে" (পাণ্ডুলিপি) মুঘল সম্রাট শাহজাহান এর দরবারের সংগীতজ্ঞদের অনেকের বিবরণ উল্লেখ আছে। এতে মির্জা জুল কারনাইন এর কোন উল্লেখ নেই।

সম্রাট শাহজাহানের লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শাহজাদা এর নির্দেশে মির্জা জুল কারনাইন স্বরচিত একটি ধ্রুপদ সংগীত পেশ করেন।

সংগীতজ্ঞ হিসাবে জুল কারনাইন-এর দক্ষতা শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন শাহনেওয়াজ খান তার 'মিরাত-ই-আফতাব'[২২] নামাতে এবং মির্জা ফকির উল্লাহ তার রচিত 'রাগমালায়'[২৩] উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। তাদের প্রশংসায় একটি কারণ হলো ভারতীয় ভাষায় মির্জা জুলকারনাইনের দক্ষতা ও তার বিনয়, নম্র স্বভাব। 'মিরাত-ই-আফতাব নামা' গ্রন্থে তাকে সঙ্গীতের 'গান্ধর্ভ' পদ মর্যাদায় উল্লেখ করা হয়। যা ছিল মিয়া তানসেনের মর্যাদা।

উপমহাদেশের ইতিহাসে বড় বড় বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন ভারত বহির্ভূত। কিন্তু রাজ দরবারের সংগীতজ্ঞরা প্রায় সকলেই ছিলেন

www.amarboi.org

ভারতীয়। ভারতের বাহির থেকে আগত প্রথম শ্রেণীর সংগীতজ্ঞদের মতে দুইজনের নামই ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

মির্জা জুলকারনাইন সম্পর্কে একটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলিম বা হিন্দু ছিলেন না বলে তার সংগীত প্রতিভা ও অবদানের কোন অবমূল্যায়ন করা হয়নি।

সম্রাট খুররম শাহজাহান

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র খুররম শাহজাহান (১৬২৮-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন শিল্প সাহিত্য ও স্থাপত্যের অবিস্মরণীয় পৃষ্ঠপোষক। মুঘল রাজবংশের পূর্ববর্তী সকল রাজার সময়ই সিংহাসন নিয়ে পরিবার ও বহিঃশত্রুর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল।

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ২৮ বৎসরে কোনরূপ দুর্যোগ ছিল না। বরং, বিরাজ করেছিল শান্তি শৃঙ্খলা। তার ফলে সংগীত, কাব্য, শিল্পকলার সন্তোষজনক বিকাশ ঘটেছিল। মুঘল বংশের শৌর্য বিত্তের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আজও তাজমহলের সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা তুলনাহীন।

"রাগ দর্পণ" : মির্জা ফকির উল্লাহ্ সাইফ খান পরবর্তীকালে মুঘল আমলের সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তিনি তার রচিত[২৪] "রাগ দর্পণে" সম্রাটের সংগীত পৃষ্ঠপোষকতার বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সম্রাট শাহজাহানের দরবারের ত্রিশজন সংগীত যন্ত্র বাদক এবং সঙ্গীতের সাথে সংশ্লিষ্টদের উচ্চতর মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

"মান কৌতুহল", গ্রন্থে উল্লেখিত যে সংগীত পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে সে মাপকাঠিতে শাহজাহানের দরবারে সংগীতজ্ঞগণ সকলে উন্নতমানের বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত।

মিরজা ফকির উল্লাহর মতে শাহজাহানের দরবারে সংগীতজ্ঞদের তুলনায় আকবরের দরবারের সংগীতজ্ঞগণ ছিলেন হাতুড়ে সংগীতজ্ঞ স্বরূপ। এই হাতুড়েদের দলে তিনি তানসেনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলেননি।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, শাহজাহানের সময় শিল্পকলার মান উন্নয়নের প্রবণতা জোরদার হয়। রাজ্যে ছিল শান্তি শৃঙ্খলা। দেশ ছিল ঐশ্বর্যে ভরা। শাসন ছিল দৃঢ়চেতা। তার ফলে সর্ব দিকে মান উন্নয়নের প্রবণতা এবং প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

www.amarboi.org

লাল খান গুন সমুদ্র : লাল খান গুণ সমুদ্র ছিলেন কোন এক পর্যায়ে শাহজাহান এর দরবারে সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগীতজ্ঞ। লাল খান ছিলেন তানসেন পুত্র বিলাস খানের কন্যা জামাতা এবং শিষ্য। লাল খানের বৈশিষ্ট্য ছিল ধ্রুপদ সঙ্গী পরিবেশনায়। ধ্রুপদে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্তিতেও লাল খান ছিলেন তুলনাহীন।

লাল খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র খুসহাল খান ভূষিত হন "গুণ সমুদ্র" খ্যাতিতে।

গুণ খান : সংগীতজ্ঞ 'গুণ খান' এবং মিশ্রি খানকে সম্রাট শাহজাহান তার পুত্র সুজার সঙ্গে বাংলায় গমনের অনুমতি দিয়েছিলেন। সুজা নিযুক্ত হয়েছিলেন বাংলার সুবেদার।

মরমী সংগীতজ্ঞ বাহাউদ্দীন : মরমী সংগীতজ্ঞদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের দরবারে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন শায়খ বাহাউদ্দীন। তিনি ছিলেন বার্নাওয়ার অধিবাসী। কিন্তু ফকির হিসাবে ছিলেন বহু দেশ বিদেশ ভ্রমণকারী। তার প্রিয় সংগীতযন্ত্র ছিল অমৃত বীণা। তিনি খেয়াল নামক সংগীত যন্ত্র আবিষ্কার করেন। অমৃত বীণা বাদ্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

মিয়া লালু ও শের মুহাম্মাদ : শায়খ বাহাউদ্দীন ছাড়াও আরও দুইজন প্রখ্যাত মরমী সংগীতজ্ঞ ছিলেন "মিয়া লালু" এবং শেখ বাহাউদ্দীনের শিষ্য "শের মুহাম্মাদ"। শের মুহাম্মাদ এবং মিয়া লালু অতি উন্নত মানের মরমী সংগীতজ্ঞ এবং যন্ত্র সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

কাওয়ালী সংগীত : কাওয়ালী সঙ্গীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সংগীতজ্ঞ কবির এবং রাওজা। কবির কাওয়ালী সঙ্গীতের নতুন এবং উন্নততর ধারা প্রবর্তন করেন।

মহা কবি রায় : কার্ণাটিক সঙ্গীতে সর্বশ্রেষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন জগন্নাথ মহা কবি রায়। তিনি সাধারণত দাক্ষিণত্যের ভাষায় সংগীত পরিবেশন করতেন।

গুণ সেন : সম্রাট শাহজাহান যে সংগীতজ্ঞের সঙ্গীতে এবং সুর লহরীতে ছিলেন গুণমুগ্ধ, তিনি হলেন সংগীতজ্ঞ গুণসেন। সম্রাট তাকে নায়ক-ই-আফজাল (সর্বশ্রেষ্ট নায়ক) খ্যাতি দান করেন।

বিদেশী পর্যটক ও সংগীতজ্ঞ : শাহজাহানের সময় মুঘল রাজদরবারের খ্যাতি চতুর্দিকে এত ছড়িয়ে গিয়েছিল যে বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে যায়। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা শুধু সম্রাটই করতেন না, রাজ অমাত্যরাও করতেন।

www.amarboi.org

বিদেশী সংগীতজ্ঞ ও যন্ত্র সংগীতজ্ঞ স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার আশায় মুঘল রাজদরবারে অতিথি হিসাবে এসে নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে মুঘল রাজদরবারে অথবা রাজ্যে থেকে যেতেন। এর ফলে বিদেশী সঙ্গীতের সঙ্গে দেশীয় সঙ্গীতের সমন্বয় হয়। ভারতীয় এবং ইরানী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হ্রাস পায়।

সঙ্গীতে শাহজাহানের উৎসাহ আকবরের ন্যায়ই ছিল। ডক্টর আবদুল হালিম শাহজাহানের আমলে সংগীত চর্চা সম্পর্কে লিখেছেন যে তাঁর আমলে সংগীতকলার সংস্কৃতকরণ এবং অলংকৃতকরণের প্রবণতা দেখা দেয়।

আমির খসরুর আমল থেকে ভারতীয় এবং পারস্য সংগীতকলার যে সমন্বয় প্রচেষ্টা শুরু হয়, শাহজাহানের আমলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভারতীয় এবং পারসিক সংগীত নিজস্ব পৃথক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন জাতীয় সঙ্গীতের রূপ লাভ করে।

আকবরের সময়ে বহু সংগীতজ্ঞ এবং বাদক পারস্য এবং ট্রান্স সক্সিয়ানা হতে আসেন। কিন্তু, শাহজাহানের দরবারে মাত্র দুজন বিদেশী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুস্থানী সংগীত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বিদেশী সংগীতজ্ঞ আমদানীর প্রয়োজন ছিল না। দেশী সংগীতজ্ঞরাই শাহজাহানের উন্নত শিল্পসুলভ সংগীত স্পৃহা সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন।

মুহাম্মাদ বাক ও মীর ঈমাদ : বিদেশী সংগীতজ্ঞ এবং রচয়িতা হিসাবে শাহজাহানের দরবারে খ্যাতিমান ছিলেন হেরাতের মুহাম্মদ বাক মুঘল এবং মীর ঈমাদ। তারা শুধু সংগীতজ্ঞই ছিলেন না, তারা ছিলেন উন্নতমানের সংগীত রচয়িতা।

যদিও সাধারণভাবে সংগীতজ্ঞগণ মুঘল রাজ দরবারে আসতেন, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ে বিদেশী প্রদিদ্বন্ধীতার আগমন হত কম। কারণ মুঘল সংগীতজ্ঞদের সঙ্গীতের মান বিদেশীদের তুলনায় উন্নততর হয়েছিল। সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে জগত বিখ্যাত "নায়ক গোপাল" এর সঙ্গে আমীর খসরুর সংগীত মুকাবিলার বিষয়টির স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়নি।

যুবরাজ সুজা : যুবরাজ সুজা বাংলায় আসার সময় কয়েকজন সংগীতজ্ঞ সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিলাস খানের শিষ্য মিশরি খান এবং অপর সংগীতজ্ঞ গুলখান দিল্লী দরবারের নামজাদা সংগীতজ্ঞ ছিলেন। শাহজাহানকে অনুরোধ করে সুবাদার সুজা তাঁদের বাংলায় নিয়ে আসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলার রাজদরবারে সুজার আমলে সঙ্গীতের আসর ভালভাবে জমে।

www.amarboi.org

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর
(১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ)

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর এর পিতা শাহজাহানের দরবারে সংগীতজ্ঞদের অত্যন্ত মর্যাদার আসন ছিল। আওরঙ্গজেব নিজেও ছিলেন সঙ্গীতের একজন সমজদার। মুঘল রাজবংশের প্রায় সকলেরই সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহনের যে রাজকীয় আনুষ্ঠানিকতা ছিল তাতে সঙ্গীতের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তার সিংহাসনে আরোহনের আনুষ্ঠানিক প্রচেসান শুরু হয়েছিল খিজরাবাদ থেকে। এই প্রচেসনে সংগীতজ্ঞরা যেমন ছিলেন, সংগীত যন্ত্রবাদক দলও ছিল।

সিংহাসনে আরোহনের অনুষ্ঠান হলে বাদ্যবাদক দল তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিল। সে অনুষ্ঠানে শুধু সংগীত নয়, নৃত্য বালিকারাও তাদের কলাকৌশল প্রদর্শন করেছিল। ঐতিহাসিক খাফী খানের মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব সঙ্গীতের নিয়ম কানুন ও বিধিমালা উত্তম রূপে অবহিত ছিলেন এবং সংগীত উপভোগ করতেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আমলগীর তাঁর প্রথম দিকে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সংগীতজ্ঞগণ সম্রাট থেকে প্রচুর উপঢৌকন পেতেন। সঙ্গীতের শিল্পমান বিচারে তিনি অতি সুদক্ষ ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তিনি অতি নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠেন এবং রাজত্বের দশম বছরে রাজদরবারে সংগীত চর্চা বন্ধ করে দেন। আওরঙ্গজেব সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত হন।

সম্রাটের উপেক্ষার ফলে সংগীত চর্চা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও ওমরাহগণ সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। দীর্ঘকাল থেকে সংগীত চর্চা ওমরাহদের চিত্তবিনোদনের এক প্রধান উপায় ছিল। যদিও নিষ্ঠাবান সম্রাট সংগীত চর্চা ত্যাগ করেন। কিন্তু, তাঁর রাজ কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে সংগীত চর্চার উৎসাহ দিতে থাকেন।

ধর্মীয় চেতনা : সম্রাট আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহনের ত্রিশ বছর পর ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইমাম শাফেই এর মতবাদে প্রভাবিত হন। তিনি তখন থেকে সকল প্রকার বিলাসীতা ত্যাগ করেন। সাধকের জীবন অবলম্বন করেন এবং সকল আমোদ প্রমোদ নিজের জন্য হারাম করে নেন।

www.amarboi.org

যদি কোন সংগীতজ্ঞ ও সংগীত যন্ত্রবাদক তাদের পেশা ত্যাগ করতে রাজী হতেন এবং এজন্য অনুতপ্ত হতেন, তিনি তাদের জন্য অনুদান দিতেন এবং জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করে দিতেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনের শেষ বিশ বছরে সংগীতজ্ঞরা তার নিকট থেকে কোন প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। এ সময় একটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য।

সংগীতজ্ঞ ও বাদকগণ তাদের পেশায় বঞ্চনা, হতাশা ও দুঃখ কষ্টের বিষয়টি সম্রাটের দৃষ্টিতে আনয়নের জন্য প্রাসাদের নিকটবর্তী রাস্তায় একটি কৃত্রিম শব যাত্রার ব্যবস্থা করেছিল। এর জন্য মৃত দেহের খাটিয়াও বহন করা হয়। শব যাত্রীদের উক্ত প্রচেসনে সমবেত কণ্ঠের শোক সংগীত এবং শোক বিলাপের ব্যবস্থাও ছিল।

সম্রাট তার প্রসাদের দর্শন বেলকনি থেকে সমবেত কণ্ঠের শোক সংগীত এবং করুন কান্নার স্বর শুনে কার ইন্তেকাল হয়েছে– তা অভহিত হতে চান। শোক যাত্রার আয়োজকদের পক্ষ থেকে সম্রাটকে খবর দেওয়া হয় যে বাদশা আওরঙ্গজেবের উপেক্ষা, উদাসীনতা এবং অবহেলায় মুঘল সাম্রাজ্যে সঙ্গীতের মৃত্যু ঘটেছে।

তাই সঙ্গীতের মৃত দেহ খাটিয়ায় স্থাপন করে কবরস্থানের দিকে শোক যাত্রা যাচ্ছে এবং মৃত সংগীতকে দাফন করা হবে। বুদ্ধি দীপ্ত ও রসজ্ঞ সম্রাট এই খবর শুনে হাসলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিব্রতবোধ করলেন না। তিনি মৃদু হেসে এই শোক যাত্রার আয়োজকদের জন্য বাদশার বাণী পাঠালেন।

তাতে উল্লেখ ছিল সঙ্গীতের মৃত দেহ খাটিয়াসহ যেন দাফন করা হয় এবং কবর যেন গভীর করা হয়। কবরের ওপর মাটি যেন অত বেশী দেওয়া হয় যাতে মৃত সঙ্গীতের কোন ছন্দ, স্বর, সুর যেন কবর ভেদ করে ওপরে আসতে না পারে।

আওরঙ্গজেবের দরবারের সংগীতজ্ঞগণ তাদের কর্মহীনতা এবং অলসতার দুঃখ, বেদনা কাগজ কলমে লিখে রাখার পেশাও অবলম্বন করেছিলেন।

সম্রাট বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২ খ্রী)

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর এর পুত্র বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন সংগীত প্রেমিক, সংগীত পৃষ্ঠপোষক এবং সংগীত অনুষ্ঠানের নিয়মিত প্রধান অতিথি। তিনি সারা রাত জেগে থাকতেন। এর অংশ বিশেষ কাটত

www.amarboi.org

সংগীত শ্রবণে। তিনি ঘুমাতেন দুপুর পর্যন্ত। আহার বিশ্রামের পর রাজ দরবারে আসতেন কখনও আছরের আগে। কখনও আরো পরে। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন বে-খবর। সে জন্য জনগণের নিকট তিনি পরিচিত হয়ে ছিলেন 'শাহ-ই-বে-খবর' হিসাবে।

তার পিতা আওরঙ্গজেব আলমগীর হতে সম্রাট বাবর পর্যন্ত ছয়জন মুঘল সম্রাট যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন– এর ফল নিশ্চিন্তে ভোগ করেছিলেন শুধু "শাহ-ই-বে-খবর বাহাদুর শাহ" নন, ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত।

নিয়ামত খান : সম্রাট বাহাদুর শাহ বে-খবর এর দরবারে প্রধান সংগীতজ্ঞ ছিলেন সংগীতজ্ঞ নারামুল খানের পুত্র "নিয়ামত খান"। তিনি ছিলেন মূলতঃ সংগীত রচয়িতা। তার রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল, তারানা, হাল, সাদরা এবং অন্যান্য সংগীত তিনি দক্ষতা, প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য্য ও সুর বাহার সমেত উপস্থাপন করতে পারতেন।

নিয়ামত খান সম্রাট জাহন্দার শাহ এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৫ খ্রিঃ) এর দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে দরবার আলোকিত করেন। নিয়ামত খাঁর ছদ্ম নাম ছিল সাধরাং (চিরানন্দ)। এই নামে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ এর উদ্দেশ্যে নিয়ামত খাঁ বহু খেয়াল রচনা করেন।

মুহাম্মদ শাহ 'রঙিলা'

আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠাপরায়ণতার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার পৌত্র জাহান্দর শাহ এবং প্রপৌত্র মোহম্মদ শাহ-এর আমলে। তাঁর সংগীত প্রিয়তার জন্য মুহম্মদ শাহ 'রঙিলা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তার আমলে সংগীত অধিকতর শিল্পসম্মত ও অলংকারসম্মত হয়। সংগীত বিজ্ঞান এবং সংগীতকলার মান পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত হতে থাকে।

লালা বাঙ্গালী : আওরঙ্গজেবের পরই অপদার্থ মোগল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শৌর্য-বীর্যে ভাটা পড়ে যায়। যুদ্ধবিদ্যা এবং রাজ্য শাসনের উৎসাহ নিস্প্রভ হয়ে আসে। সম্রাট মোহম্মদ শাহের রাজদরবারের প্রধান সংগীতজ্ঞ ছিলেন নিয়ামত খান। খেয়াল রচনায় নিয়ামত খানের খুবই পারদর্শিতা ছিল। নিয়ামত খানের শিষ্যগণের মধ্যে লালা বাঙ্গালী এবং নিয়াজ কাওয়ান সুপ্রসিদ্ধ।

সংগীতজ্ঞ বাদশাহ : বাদশাহ মুহাম্মদ শাহ নিজেও ছিলেন একজন উন্নত মানের সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত রচয়িতা। তিনি 'খেয়াল' এবং 'তারানা' সংগীত

www.amarboi.org

রচনা করতেন। বর্তমানে প্রচলিত অতীতের কালজয়ী খেয়ালের প্রায় ৭০% রচয়িতা ছিলেন– সাধারণ্ড নিয়ামত খাঁ অথবা মুহাম্মদ শাহ্ রঙিলা।

রঙিলা শব্দটির উৎস ফার্সি শব্দ "পিয়া সাদা রঙিলে"। এটি ছিল মুহাম্মদ শাহ্ এর ছদ্ম নাম। অতীতে সঙ্গীতে রচয়িতার নাম অথবা ছদ্ম নাম সঙ্গীতের প্রথমে বা পরে অথবা সঙ্গীতের মধ্যেই লিখিত এবং সংগীত পেশকালে উচ্চারিত হত।

শায়খ মইনুদ্দীন : সংগীতজ্ঞ মইনুদ্দীন ছিলেন শাহ্জাহানের দরবারের সংগীতজ্ঞ শের মুহাম্মদ এর পৌত্র। মুইনুদ্দীন ছিলেন উন্নত মানের খেয়াল রচয়িতা (মিরাত-ই-আফতাব নামা, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, পাণ্ডুলিপি ৫২৫)[২৫]।

ফিরোজ খাঁন : ফিরোজ খাঁন ছিলেন নিয়ামত খাঁর কন্যা জামাতা। তিনি কোন কোন দিক দিয়ে নিয়ামত খাঁন থেকেও উচ্চমানের সংগীত রচয়িতা এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। সংগীত রচনায় তার বিশেষ দিগন্ত ছিল ধ্রুপদ সংগীত, খেয়াল সংগীত এবং তারানা সংগীত (পূর্বোক্ত ৫২৫)।

সূফী দরবেশের সংগীত-চর্চা

আমীর খসরু : আমীর খসরু সভা কবি ছিলেন– খিলজী এবং তুগলক বংশের কয়েকজন সুলতানের। আমীর খসরু নিজে সূফী ছিলেন। আমীর খসরু প্রবর্তিত এবং সংস্কৃত কাওয়ালী ধর্মীয় সমাবেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ন্যায়নিষ্ঠ তুগলক রাজন্যবর্গ সংগীত-চর্চা বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। সূফীগণ সংগীত-চর্চা করতেন। বিশেষত চিশতীয়া তরীকার সূফী এবং দরবেশদের খানকায় সঙ্গীতের আসর বসতো। সূফীদের কেও কেও মনে করেন ধর্মীয় উন্মাদনা এবং আল্লাহ্ প্রেমের মোহাবিষ্ট অবস্থা সৃষ্টির প্রকৃষ্ট উপায় সংগীত।

পীর শেখ বোধান : বারনাওয়ার পীর শেখ বোধান খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে একজন প্রখ্যাত সংগীত সমঝদার সূফী ছিলেন। তাঁর খানকাকে একটি সংগীত মহা-বিদ্যালয় বললেও অত্যুক্তি হত না। এই খানকায়ে দক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন সংগীত শিল্পীর আনাগোনা ছিল। খানকায় কাওয়ালী এবং খেয়াল গাওয়ার জন্য সংগীতজ্ঞের সংখ্যা কয়েক শত ছিল।

www.amarboi.org

জৌনপুরের সুলতান হোসেন সর্কি পীর শেখ বোধানের সঙ্গে তাঁর রচিত সংগীত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সংগীত সম্পর্কে তালিম নেওয়ার জন্যে দরবারের সংগীতজ্ঞদের পাঠাতেন।

শেখ মুহাম্মাদ গাউস : ঐতিহাসিক বাদাউনী লিখেছেন, গোয়ালিয়রের কামিল আওলিয়া শেখ মুহাম্মাদ গাউসের খানকায় যে সংগীত হতো, তা তিনি নিজেই রচনা করতেন। সুরও দিতেন উত্তর ভারতের সংগীতজ্ঞদের সর্বপ্রিয় ফকীর শেখ মুহাম্মাদ গাউস।

ধর্মীয় আলিমগণ সংগীতকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সূফীদের সমর্থন না পেলে মুসলিম ভারতে সংগীত-চর্চা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় সূফী সাধকদের দ্বারা। তরবারী দ্বারা ইসলাম ভারতে প্রচারিত হয়নি।

যে দিল্লী, আগ্রা, উত্তর প্রদেশ ৭০০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসনের কেন্দ্রভূমি ছিল, সেখানে জনসংখ্যার মাত্র ১৪ জন মুসলিম। তাও সম্ভব হয় দরবেশ-আউলিয়াদের তাবলীগের ফলে। তাঁরা সঙ্গীতের প্রতি আলিমদের ন্যায় বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না।

বাংলার মারফতী সংগীত, মুর্শিদী, কাওয়ালী, বাউল সংগীত ও পাকিস্তানের কাফিস সংগীত এবং কাশ্মীরের সূফিয়ানা, কলিম, সূফী দরবেশ-আউলিয়াদের সমর্থন পেয়ে গণমনে শিকড় গেড়ে আছে।

মুসলিম প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ

দিল্লীর সংগীতজ্ঞ নায়ক আমীর খসরুকে সঙ্গত কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশে ইন্দ-মুসলিম সঙ্গীতের জনক মনে করা হয়। পাক ভারত মুসলিম ধারার সঙ্গীতের উন্নয়নে দিল্লীর সুলতান বাদশাগণ এবং প্রাদেশিক সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অবদান ছিল গভীর ও সীমাহীন।

কেন্দ্রে এবং প্রদেশে মুসলিম শাসকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অতুলনীয় অবদান ছিল—প্রাদেশিক ভাষা উন্নয়নে, সংগীত উন্নয়নে এবং নতুন নতুন সংগীত যন্ত্রের আবিষ্কার, উন্নয়ন এবং প্রবর্তনে।

www.amarboi.org

কাশ্মীর সুলতান জয়নুল আবেদীন কাশ্মীরী (১৪১৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

উপমহাদেশে কাশ্মীর ছিল সংগীত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। সুলতান জয়নুল আবেদীন (১৪১৬-১৪৬৭ খ্রীঃ) ছিলেন কাশ্মীরের সফল এবং সুযোগ্য শাসক। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক এবং ভক্ত। তিনি সংগীত যন্ত্রের এমন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে তার ব্যবহৃত রুবাব এবং বীণা স্বর্ণালংকীত ছিল। সে সময় গোয়ালীয়রের রাজা ছিলেন দুলগার সেন। তিনিও ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত এবং পৃষ্ঠপোষক।

কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন (১৪১৬-৬৭ খ্রীঃ) গোয়লিয়র রাজ্যের সংগীত পৃষ্ঠপোষক রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের সংগীতজ্ঞদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাশ্মীর এবং গোয়ালিয়রের মধ্যে রাজকীয় পর্যায়ে দূত বিনিময় এর ন্যায় রাজকীয় সংগীতজ্ঞ বিনিময় হতো।

সুলতান জয়নুল আবেদীন এর সমসাময়িক : কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন এর সঙ্গীতের উৎসাহের কারণে দুলগার সেন তার রাজ্যে প্রাপ্ত সঙ্গীতের ওপর কয়েকটি পুস্তক উপহার হিসাবে কাশ্মীর রাজকে প্রেরণ করেছিলেন। তার পুত্র কিরাত সিংহও পিতার সম্মানার্থে কাশ্মীর রাজ সুলতান জয়নুল আবেদীন এর নিকট তার রাজ্যে প্রাপ্ত সংগীত গ্রন্থ উপহার হিসাবে প্রেরণ করতেন (নিজামুদ্দীন আহমাদ বকশী, তাবাকাত-ই-আকবরীনামা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২৪০)[২৮]।

কাশ্মীর সুলতান জয়নুল আবেদীন এর সভা কবি ও সংগীতজ্ঞ লোদী ভাট প্রণয়ন করেছিলেন সংগীত শাস্ত্রের ওপর একটি প্রামান্য সংগীত কোষ গ্রন্থ। “মানাক” শীর্ষক এই গ্রন্থটি সুলতান জয়নুল আবেদীন এর নির্দেশেই প্রণীত হয়েছিল। (Nizamuddin Ahmed Bakhshi: Tabaqat-i Akbari, Bibliotheca Indica Series, Vol. III, P-439)[২৯].

গোয়ালিয়র রাজ মানসিংহ তানোয়ার (১৪৮৬-১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)

গোয়ালিয়র রাজ্যটি ছিল পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে সংগীত চর্চার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। গোয়লিয়রের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য রাজা মানসিংহ তানোয়ার (১৪৮৬-১৫১৬ খ্রীঃ) ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছেন। তার রাজসভা ছিল ঐ যুগে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম সংগীতজ্ঞদের সংগীত চর্চা ও সংগীত গবেষণা কেন্দ্র।

www.amarboi.org

রাজা মানসিংহ তানোয়ারের সময় সংগীত চর্চা প্রায় রাজধানীর প্রত্যেকটি গৃহেই প্রসারিত হয়েছিল। মনে হত রাজধানীর সকলেই সংগীতজ্ঞ। সার্বজনীন সংগীত চর্চার ফলে সঙ্গীতের রাগ-রাগীণির একটি থেকে আর একটির সুক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করা ছিল কঠিন।

যদিও কোন্ সংগীত সাধারণভাবে কোন্ রাগ রাগীণির তা বুঝা যেত, কিন্তু তার পরেই কোনো বাক্যের রাগ-রাগীণির– সূক্ষ্ম পার্থক্য বিলীন হয়ে যেত।

সংগীত বিজ্ঞানে এই বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্যেই রাজা মানসিংহ তানোয়ার একটি সংগীত কমিশন গঠন করেন। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তানোয়ার-এর দরবারে সংগীতজ্ঞ ছিলেন নায়ক মাহমুদ, নায়ক লৌহঙ্গ, নায়ক পানডে, এবং নায়ক কারান এবং আরো অনেকে। তারা ছিলেন রাজা মানসিংহের দরবারের সেরা সংগীত সৌরভ এবং গৌরব। এতো জন শীর্ষ সংগীতজ্ঞের সমাবেশ সে কালে অন্য কোন রাজ দরবারে ছিল না।

ডক্টর ইকরাম লিখেছেন যে সংগীত-চর্চার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়র রাজ রাজা মানসিংহ (১৪৮৬-১৫২৭) সঙ্গীতের পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য এক কমিশন বসান। নায়ক মাহমুদ এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। হিন্দু মুসলিম সঙ্গীতের সমন্বয়ের ফলে কতগুলো অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছিল।

এগুলো দূর করে সংগীত বিশুদ্ধকরণ, শ্রেনীবিভাগ করাও কমিশনের দায়িত্ব ছিলো। এ কমিশনের রিপোর্ট বের হয় 'মান কৌতুহল' নাম নিয়ে। এতে বিভিন্ন রাগ-রাগীণির শ্রেণীবিভাগ এবং মান নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজা মানসিংহের আর এক অবদান এই যে, পূর্বে সংস্কৃতিতে ধ্রুপদ গীত হতো। মানসিংহ হিন্দীতে ধ্রুপদ গাওয়ার নির্দেশ দেন। তাতে জনমনে সঙ্গীতের আবেদন বৃদ্ধি পায়।

তেলাং (তেলিংগানা) রাজ্যে সংগীত চর্চা

তেলাং (তেলিংগানা) রাজ্যের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন নায়ক গোপাল, নায়ক বাখসু এবং নায়ক বান্নু। তারা তেলিঙ্গনা হতে গোয়লিয়রের থানেস্বরে এসেছিলেন পবিত্র স্নান উপলক্ষে। সংগীত পৃষ্ঠপোষক রাজা মানসিংহ ভাবলেন– তার রাজ্যে তার পরে এত সংগীত সম্রাটের আবির্ভাব এক সঙ্গে হয়ত হবে না। ফলে, নিম্ন স্তরের সংগীতজ্ঞের সংগীত চর্চার পরিণতিতে যে সমস্ত রাগ-রাগীণি সে যুগে প্রচলিত ছিল, তার অনেকগুলি হারিয়ে যাবে এবং বিকৃত হবে।

www.amarboi.org

তাই, তিনি তেলাং রাজ্যের সংগীতজ্ঞদের নিকট আবেদন জানালেন যে, তারা গোয়ালিয়রের রাজ দরবারে সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতা ও আলোচনাক্রমে ভারতীয় রাগ-রাগীণির একটি সংগ্রহ গ্রন্থ তেরী করতে পারেন। এটা হবে উত্তর সূরীদের প্রতি পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠতম অবদান।

সংগীতজ্ঞগণ তেলাংরাজ্যের রাজা মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাদের শ্রম ও মেধার ফসল হলো সে যুগের শেরা সংগীতজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ সংগীত গবেষণা গ্রন্থ "মান কৌতুহল"।

ফকির উল্লাহ্ রচিত[৩০] 'রাগ দর্পণ' এবং অনুদিত 'মান কৌতুহল' ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

সঙ্গীতে গুজরাটের অবদান

গুজরাটের 'নায়ক বাকসুর' এর বষ্ঠস্বর এমন ছিল তিনি অন্য সংগীতের সঙ্গে গান গাইলে মনে হতো না যে দুইজন সংগীতজ্ঞ একসঙ্গে গান করছেন। নায়ক বাকসু কর্তৃক প্রবর্তিত 'কানরা' প্রচলিত আছে 'নায়কীয় কানরা' নামে। নায়ক বাকসু কর্তৃক আবিষ্কৃত কল্যাণ রাগ 'নায়কা কল্যাণ' নামে অভিহিত।

পরবর্তীতে সংগীতজ্ঞ ফকির উল্লাহ 'মান-কৌতুহল' অনুবাদের সময় ফার্সি সংগীত এবং চাইনিজ সংগীত থেকে কিছু কিছু তথ্য এই 'মান-কৌতুহলে' অন্তর্ভুক্ত করেন।

ছয়টি প্রধান রাগ ঃ মান-কৌতুহলে ভারতীয় রাগগুলোকে ছয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলোকে বহু সংখ্যক পুত্র, কন্যা, ভারীয়াতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম ছয়টি রাগ ছিল– (১) ভৈরান (সুসধন, চুরস টাক), (২) মালকাউস (শ্যাম, খ্যাম), (৩) হিন্দেল (বসন্ত, ললীত, পানচাম, জৈত, ধৈর্য্য, মানজ্য, শকর্মন, নরদ, ভাইরন), (৪) দ্বিপক, গোধনী (গো-স্বর সংক্রান্ত), মঙ্গল, অষ্টক, পর্দী (পর্দীপকী, চম্পক), (৫) শ্রী-রাগ (টংক, মালব, মার, কণটি, বাহারী), (৬) মে (সুরাটী, মালারী, শোয়াস্ত, কামডা, খ্যাত বাহার, বায়বিনদী, জয় বশন্ত, ইত্যাদি ২০০ রাগ)। (প্রফেসর ঃ ডঃ আবদুল হালিম ঃ Essays on History of Indo-Pak Music, পৃষ্ঠা- ২২-২৩)[৩১]।

৮০,০০০ রাগ রাগিণী কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়ে যে, উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে ৮০,০০০ রাগ-রাগিণি আছে। এই সমস্ত রাগ-রাগিণির নাম সঙ্কলিত কোন গ্রন্থে হয়নি। তবে শত শত এবং হাজার হাজার রাগ-রাগিণির যে ছিল- তা ধারণা করা যেতে পারে।

www.amarboi.org

এর দ্বারা বুঝা যায় প্রাচীন ও মধ্য ভারতে সংগীত চর্চা কত উন্নত ও ব্যাপক ছিল। রাজা নওয়াব আলী রচিত[৩২] Muariful Nghmat-2-তে বহুসংখ্যক প্রাচীন সঙ্গীতের উল্লেখ আছে।

সুলতান মাহমুদ শাহ-৩ : গুজরাটের রাজধানী ছিল আহমাদাবাদ। সুলতান মাহমুদ তৃতীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংগীত প্রিয়। ঐ সময় সংগীত চর্চা অধিকাংশ জনগণের স্বাভাবিক পেশা হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঐ সময়কার গুজরাটে সংগীত চর্চা সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রতিটি রাস্তায় ও বাজারে এমন কি প্রত্যেকটি বাড়িতে সঙ্গীতের সুর শোনা যেত। (Mirat-I Sikandari, History of Guzrat, P-411, অনুবাদক ইধু)[৩৩]

মুঘল পরবর্তী ভারতে সংগীত চর্চা

আওরঙ্গজেব আলমগীর পরবর্তী মুঘল শাসকগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরও ১৫০ বছর পর্যন্ত মুঘলদের রাজত্ব নামকা ওয়াস্তে হলেও চলেছিল। ঐ সময় মুঘলদের কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী দেশীয় রাজন্য বর্গের ওপর কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে আরোপ করেনি।

আফগানিস্তান, ইরাক, বালখ, বাদকসান, ইত্যাদি মুঘল সাম্রাজ্যের বহির্গত হওয়ার ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের সংগীতজ্ঞদের ভারতে আসা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে, ভারতে সংগীত চর্চা হ্রাস পায়নি।

সংগীত চর্চা বিকেন্দ্রীকরণ : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সম্রাটদের অর্থ বিত্তের অভাব ঘটে। সাম্রাজ্যে কর আরোপের ক্ষমতা মুঘল সম্রাটদের ছিল না। উপমহাদেশে বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। প্রাদেশিক শাসন কর্তাগণ উত্তরাধিকার বা যুদ্ধের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতার দখলদার হয়ে তাদের শাসনকে আইনগত বৈধতা দানের লক্ষ্যে দিল্লীর সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতেন। তারা দিল্লীর সম্রাট হতে ফরমান বা নিয়োগপত্রও গ্রহণ করতেন। এ জন্য সম্রাটকে মোটা অংকের টাকা নজরানা বা সেলামী দিতে হত।

কেন্দ্রীয় সরকারের এ দূরবস্থার যুগে সংগীতজ্ঞগণ দিল্লী ত্যাগ করে প্রাদেশিক সুলতান বা নওয়াবদের আশ্রয়ে চলে যান এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগীত চর্চার আকর্ষণীয় কেন্দ্র গড়ে তোলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ হ্রাস হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়। প্রদেশগুলোর রাজধানীর সংগীতজ্ঞদের ভীড় জমে।

www.amarboi.org

মারাঠা অঞ্চলে সংগীত চর্চা: ভারতে মুঘল পরবর্তী আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের যুগে মারাঠাগণই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দিল্লীর কর্তৃত্বের প্রতি উদাসীন। কোনো কোনো যুগে মারাঠা শাসকগণ ছিলেন দিল্লীর সম্রাটদের অভিভাবক। মারাঠাগণ সঙ্গীতের সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মারাঠা রাজ্যে সংগীতকে দেব বন্দনার অঙ্গ হিসাবে ধরা হত। সঙ্গীতে ব্যকরণ বা বিধি বিধানগত বাধা নিষেধও কঠিনতর ছিল। ফলে মারাঠা রাজধানীগুলোতে উন্নতমানের সংগীতচর্চা শুরু হয়।

মুসলিম রাজা বাদশাদের পোষাক পরিচ্ছদে যে জাঁকজমক বিলাসীতা ছিল, হিন্দুদের মধ্যে ততটুকু ছিল না। মুসলিম আগমনের পূর্বে হিন্দু রাজন্যবর্গ অপেক্ষাকৃত সরল জীবন-যাপন করতেন। হিন্দু ঋষিগণ গৃহ অপেক্ষা অশ্বত্থ তলই (বট জাতীয় বৃক্ষ) পছন্দ করতেন।

কিন্তু, মারাঠা শাসকগণ মুঘল রাজধানীতে প্রচলিত রাজদরবারের শান শওকত এবং জৌলুস তাদের রাজধানীতে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। মুঘলদের রাজকীয় আচার আচরণ, পোষাক পরিচ্ছদ, উপহার উপঢৌকন গ্রহণ ও প্রদান ইত্যাদি মারাঠা রাজ সভায় প্রবর্তিত হয়। তাই উত্তর ভারতের সংগীতজ্ঞদের অনেকে দাক্ষিণাত্যে ভীড় জমান।

অযোদ্ধা ও লাখনৌ : উত্তর এবং মধ্য ভারতে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা অক্ষুন্ন ছিল অযোদ্ধার– লাখনৌ নওয়াব দরবারে এবং রামপুরে। এ দুইটি ছিল উত্তর ভারতে সঙ্গীতের তীর্থ স্থান।

অযোদ্ধার নওয়াব আসাফুদ্দৌলার রাজত্বকালে পাঠনার মুহাম্মদ রেজা খাঁন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন কালজয়ী "নাগামাত-ই-আসাফি"। আসাফি শব্দটি সংযুক্ত করা হয় আসাফুদ্দৌলার নাম থেকে।

রাগ রাগিণীর শ্রেণী বিন্যাস : 'নাগামাত-ই-আসাফি' গ্রন্থে রাগ রাগিণীর শ্রেনী বিভাগের ভিত্তি গ্রহণ করা হয় শুদ্ধ নোট। বিলাওয়াল মাফ এবং আট মাফ স্পষ্টতর করা হয়। রাগ-রাগিণীর শ্রেনী বিভাগ হয় অতীতের থেকে শুদ্ধতর।

পিতৃ রাগ, পুত্র রাগ, ভ্রাতৃ রাগ, কন্যা রাগ, ইত্যাদি রাগের শ্রেনীবিভাগ মাত্রা ও সীমারেখা শুদ্ধতর হয়। ফলে রাগ-রাগিণী নিয়ে সংগীতজ্ঞদের মধ্যে যে মত পার্থক্য ও তর্ক বিতর্ক ছিল তা হ্রাস পায়।

হালকা সংগীত : ভারতীয় রাজা বাদশা, সুলতান, আমীর উমরাহদের যুগে উচ্চ রাগের জটিল সংগীত অপেক্ষা হালকা সংগীত ও রসিকতাই প্রচলিত হতে থাকে। ধ্রুপদ ও খেয়ালের পরিবর্তে লাখনৌ রাজ দরবারে অতি হালকা ও মামুলী সংগীত-ঠুমরী ও টপ্পা জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

www.amarboi.org

ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত শ্রবণ করে তন্ময় হয়ে থাকা অপেক্ষা মদ্য পান করে কোল বালিশ ও গালিচায় হেলান দিয়ে থাকা অধিকতর শান্তিময় অনুভূত হয়। মদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মোরগ যুদ্ধের ন্যায় তুচ্ছ বিষয়গুলো অভিজাতদের প্রিয় প্রশান্তি হয়ে উঠে।

এ যুগে ধ্রুপদের ন্যায় কণ্ঠ স্বরের গাণিতিক উচ্চ মার্গের উত্থান পতন অপেক্ষা যৌন সংগীতই অধিকতর আবেদন সৃষ্টিকারী মনে হতো। উচ্চ স্তরের ধ্রুপদ দূরের কথা, মধ্য স্তরের খেয়াল শ্রবণেও বিত্তশালী ও অভিজাতদের উৎসাহ হ্রাস পায়।

ঠুমরী ও টপ্পা : ঠুমরী ছিল খোলাখুলি প্রেম ও যৌন বিনোদন সংগীত। একই স্বর বা তান বিভিন্ন সুরে ও মাপে গেয়ে শ্রোতার কর্ণকুহরে ও হৃদয়ের গভীরে কোমল অনুভূতি সৃষ্টি করা অপেক্ষা প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম ও কাম রসাত্মক সংগীতই শ্রোতাদের নিকট অধিকতর সমাদৃত হয়ে উঠে।

খেয়ালের মধ্যেও প্রেম ও ভালবাসার অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। খেয়ালের প্রেম ভালোবাসা ছিল ইঙ্গিত ধর্মী ও রূপক বর্ণনা সংক্রান্ত। কিন্তু ঠুমরীতে প্রেম ছিল বাস্তব এবং দৈহিক অনুভূতির বর্ণনা।

সংগীতজ্ঞ মিয়া সুরী : টপ্পার আবিষ্কারক ছিলেন লাখনৌ দরবারের সংগীতজ্ঞ মিয়া সুরী। এর মূল সূত্র ছিল পাঞ্জাবের উট চালকদের সংগীত। এই সঙ্গীতের উৎস ছিল পাঞ্জাব থেকে আরও দূরে– মধ্য এশিয়ার তাঁতার মুঘলদের আনন্দ বিনোদনে।

তাঁতার মুঘলদের প্রাচীন রুক্ষ সংগীতকে মিয়া সুরী ভদ্র, নম্র জনপদের সঙ্গীতে উন্নত করেন। ধ্রুপদ এবং খেয়াল অভিযাত্রী ছিল সুনির্দিষ্ট। মাপ, পরিমাপ ও সুরের ক্রমশঃ উত্থান ও পতনের গাণিতিক ধারা হতো স্পষ্ট। কিন্তু ঠুমরী এবং টপ্পার মধ্যে সঙ্গীতের ব্যাকরণের কোন শাসন ছিল না। বরং, রাজত্ব ছিল স্বরের উশৃঙ্খল উত্থান ও নৃত্যের মাদকতার মধ্যে।

ঠুমরী এবং টপ্পার জনপ্রিয়তার পরিণতিতে ধ্রুপদ উপেক্ষিত ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু ঘটেনি। ঠুমরী এবং টপ্পার পেছনে ধ্রুপদ সংগীত পড়ে তাকলেও দূর থেকে আওয়াজ করত– আমরা এখনও মরিনি।

রামপুর : রামপুরই ছিল বৃটিশ ভারতে সংগীত চর্চার উজ্জ্বলতম কেন্দ্র। রামপুরের নওয়াবগণ শুধু সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতাই করতেন না, তারা নিজেরাও ছিলেন উন্নত পর্যায়ের সংগীতজ্ঞ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– (১) নওয়াব কলবে আলী খাঁন, (২) শাহজাদা সা'দত আলী খাঁন, (৩) নওয়াব হামিদ আলী খাঁন এবং (৪) নওয়াব রাজা আলী খাঁন।

www.amarboi.org

বৃটিশ রাজত্বে অবক্ষয় : বৃটিশ রাজত্বের শুরুতে ভারতীয় সংগীত চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ইংরেজরা ভারতীয় উস্তাদী সঙ্গীতের মাধুর্য কখনো অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই এ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে দুর্ভিক্ষে খাদ্য বিবর্জিত অন্নহীনের ন্যায় ভারতীয় ক্ল্যাসিক বনেদী সংগীত ধুকে ধুকে মরতে থাকে।

ইংরেজ রাজত্বে সমগ্র ভারতে সংগীত সূর্য্যের মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভূত হলেও রামপুর রাজ্যের সঙ্গীতের বহু প্রদীপ তাদের ঐতিহ্যের শিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল।

www.amarboi.org

আধুনিক যুগ

ধ্রুপদ সংগীত

মধ্য যুগ পর্যন্ত উপ-মহাদেশের সঙ্গীতের দুইটি ধারা ছিল- ধ্রুপদ এবং খেয়াল। ধ্রুপদ শব্দের মূল উৎস হল ধ্রুব। উত্তর আকাশের স্থির পোল স্টার এর সংস্কৃত নাম হলো ধ্রুব তারা।

আকাশে সকল নক্ষত্রেরই অবস্থান পরিবর্তন হয়। যেমন হচ্ছে আমাদের নিকটস্থ নক্ষত্র সূর্য্যের। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র ইত্যাদি নক্ষত্র নয় বরং গ্রহ উপগ্রহ।

ধ্রুপদ সংগীত চর্চা : ধ্রুপদ সংগীত হলো অতি প্রাচীন ক্লাসিক সংগীত। মধ্যযুগীয় বা আধুনিক সঙ্গীতের ন্যায় এর ধারা ও পদ্ধতি নীতিমালা সুযোগ অনুসারে পরিবর্তিত বা উন্নততর হয় না। ধ্রুপদ হল ভারতীয় আদি সংগীত। এর বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু ধর্মীয় দেব বন্দনা।

সংগীত তারকা মন্ডলী : মধ্যযুগে ধ্রুপদ এবং অন্যান্য সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবনে তানসেন ছাড়াও অনেকের অবদান ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- (১) নায়ক চারজু, (২) মলাবরাজ বজ বাহাদুর, (৩) বাবা রামদাস বৈরাগী, (৪) সুবান খাঁন, (৫) মিয়া লাল খাঁন (তানসেন পুত্র বিলাস খানের জামাতা), (৬) বিচিতর খান, (৭) বীর মন্ডল খান, (৮) বীণা বাদক পূর্বীণ খান, (৯) বীণা বাদক শিহাব খান, (১০) শরৎ খান, (১১) শ্রী জ্ঞান খান, আরও ছিলেন আগ্রার অন্ধসংগীতজ্ঞ, (১২) সুরদাস, (১৩) বাবা রাম দাস এর পুত্র, আরও অনেকে।

সম্রাট আকবরের সময় হিন্দু ধর্মীয় সংগীত বা ধ্রুপদ সংগীত রাজদরবারে অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

সংগীত যন্ত্র বাদক : তদুপরি রাজদরবারে ছিল বিভিন্ন দেশ-বিদেশী সংগীত যন্ত্র বাদক। সংগীত যন্ত্রের মধ্যে ছিল তানুল, গীচক, তাম্বুর, কার্বুস ইত্যাদি। এইগুলো ছিল তার যুক্ত সংগীত যন্ত্র। এছাড়া ছিল বিভিন্ন ধরণের বাঁশী। মুঘল দরবারের সংগীতজ্ঞদের অনেকেই ছিলেন গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিবাসী।

বায়েজীদ খান ঃ ধ্রুপদ সংগীতজ্ঞ হিসাবে শাহজাহানের দরবারে আরও তিনজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন (১) বায়েজীদ খান, (২) তুজহা ওয়ারী, (৩) হামির সেন এবং হামীর সেনের পুত্র (৪) শুভল সেন প্রমুখ।

www.amarboi.org

ধ্রুপদ সংগীতজ্ঞ হিসাবে লাল খান, মুহিব খান, গুজরাটি এবং তার শিষ্য বসন্তী কালা ওয়ান্ত এর পরেই ছিল ধ্রুপদী হিসাবে রাং খান কালাওয়ান্তের স্থান। তিনি দারাং খান নামেও পরিচিত ছিলেন।

বৈশিষ্ট্য : শাহজাহানের সময় হোসেন শাহ্ সার্কী আবিষ্কৃত এবং প্রবর্তিত খেয়াল সঙ্গীতের প্রসার ঘটে। কারণ, খেয়াল সঙ্গীতের আবেদন ছিল ব্যাপকতর এবং পদ্ধতি ছিল সহজতর। ধ্রুপদ সংগীত ছিল ধর্ম দেবদেবী ও ধর্মীয় উপাখ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত।

খেয়ালের মধ্যেও ধ্রুপদের রঙ্গ, কৌতুক, কৌশল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বৃন্দাবনের ভগবান শ্রী কৃষ্ণের লীলা কাহিনীও খেয়ালে প্রবেশ করে। তবে 'খেয়াল' ছিল ধ্রুপদের তুলনায় ধর্ম নিরপেক্ষ। খেয়ালের মধ্যে ভক্তি বাদ অপেক্ষা দুনিয়াবী আমোদ প্রমোদ ও সাজ সজ্জার মান ছিল উন্নততর।

ধ্রুপদ সঙ্গীতের পরিবর্তে মুঘল রাজত্বের শেষ ভাগে খেয়াল সঙ্গীতের চর্চা বেশী হতে থাকে এবং অন্যান্য সংগীত কলা ও স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিকাশ লাভ করতে থাকে।

ধর্ম ও সংগীত : মুসলিমদের নিকট সংগীত নামাজ, রোজা এবং ইবাদতের অংশ তো নয়, বরং অধিকাংশ আলেমের মতে তা পাপ। তার ফলে সঙ্গীতের প্রতি গুরুত্ব, আনুগত্য বা পবিত্রতার অনুভূতি মুসলিমদের বিন্দুমাত্র ছিল না।

ভারতে মুসলিম এবং হিন্দুদের সংগীত চর্চার মধ্যে বিরাট এক পার্থক্য ছিল। হিন্দু ধর্মে সংগীত হলো পূজা অর্চনার ভাষা। ভারতীয় দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হন স্তব, স্তুতি গীত ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। যে স্তব, স্তুতির মাধ্যমে দেবতার পূজা করা হয়, তা সাধারণত একই সুরে ও তারে করা হয়।

মুসলিমদের ধর্ম গ্রন্থ আল্-কুরআনের কোন বাক্য বা শব্দ দূরের কথা, একটি অক্ষর পরিবর্তনের অধিকার কোন মুসলিমের নেই। হিন্দু ধর্মের কড়াকড়ি এত বেশী না হলেও যতটুকু ছিল তাতে ধর্মীয় সঙ্গীতের রাগ, তাল, ইত্যাদির খুব বেশী পরিবর্তন করা যেত না।

এর পরিণতিতে সঙ্গীতের ন্যায় ধর্ম-নিরপেক্ষ কলা ছিল—আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের একটি উপায় মাত্র। তাই সঙ্গীতের রাগ, মেলোডি, সুর যে ভাবে মধুরতর করা যায়, সে ধরনের পরিবর্তনে তেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এর ফলে মুসলিম সমাজে সংগীত বিজ্ঞান যুগে যুগে সমৃদ্ধতর হওয়ার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় ছিল।

www.amarboi.org

খেয়াল সংগীত

খেয়াল শব্দের অর্থ হলো ধারণা, কল্পনা, চিন্তা, অস্পষ্টতা, ইত্যাদি। খেয়াল বসে মানুষ অনেক কিছুই করে। খেয়াল সঙ্গীতের মধ্যে সংগীত বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু সঙ্গীতের তাল, দীর্ঘ ও স্বল্প করণে অধিকতর স্বাধীনতা থাকে। তাই, এই সঙ্গীতের আবেদন শ্রোতার মান অনুসারে বিভিন্ন রূপ করার স্বাধীনতা সংগীতজ্ঞের থাকে।

খেয়াল ও ধ্রুপদ : খেয়াল হল ধ্রুপদ-এর পরবর্তী স্তরের সংগীত। ধ্রুপদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রত্যেকটি নোটে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতম সময় ধরে সুরের ওপর টান দেয়া হয়। এর ফলে সুরের টান সঠিক হলো বা দুর্বল হলো বা ত্রুটিপূর্ণ হলো তা মূল্যায়ন করা সহজতর হয়। ধ্রুপদ সংগীত কঠিনতর এবং অত্যন্ত ভারিক্কী তালের সংগীত।

ধ্রুপদের তুলনায় খেয়াল হলো পরবর্তী স্তরের বা আধুনিক সংগীত। খেয়ালকে ইসলামী সংগীতও বলা হয়। খেয়াল ধ্রুপদের মত ভারিক্কী না হলে গজলের মত হালকা নয়। সংগীত বিশ্লেষকের কেও কেও হুসাইন শাহ সার্কীকে খেয়াল টাইপের সঙ্গীতের জন্মদাতা বলেছেন। জন্মদাতা না হলেও এর প্রবর্তনকারী এবং জনপ্রিয়তাকারী হুসাইন শাহ সার্কী অবশ্যই বটে।

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ সার্কীর আমলে ভারতে আরব এবং ফার্সি সঙ্গীতের সমন্বয় ধারা তীব্রতর হয়।

রাজা রাম শাহ : খার্ঘ পুরের সংগীতজ্ঞ রাজা রাম শাহ ছিলেন সংগীত সম্রাট আমীর খসরু এবং সুলতান হোসেন সার্কী রচিত খেয়াল এর গায়ক।

শাহজাহানের রাজত্বকালে বিখ্যাত খেয়াল সংগীতজ্ঞ ছিলেন রাজা বৌর (ফকির উল্লাহ ঃ রাগ দর্পণ, ফলিউ-২০)[২৬]।

মরমীবাদীদের নিকট খেয়াল সঙ্গীতের আবেদন ছিল। তাদের অনেকেই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর খেয়াল সংগীতজ্ঞ (Profesor Abdul Halim, p-46)[২৭]।

মুঘলদের খেয়াল চর্চা : মুঘলদের স্বর্ণ যুগে খেয়াল এর জনপ্রিয়তা ততটুকু ছিল না। যদিও খেয়াল সঙ্গীতের আবির্ভাব অনেক পূর্বেকার। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ রঙিলার পূর্ব পর্যন্ত খেয়াল সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক ছিল না।

মালব রাজ এবং সংগীতজ্ঞ বজ বাহাদুর ধ্রুপদের মাধ্যমে রাধা কৃষ্ণ সংগীত চর্চাকারী হয়ে কিছুটা হিন্দু ঘেষা হয়েছিলেন। অন্যদিকে সুলতান হুসেইন শাহ সার্কী খেয়াল চর্চা করে মুসলিম ঘেষা সংগীতজ্ঞ বলেই বিবেচিত হন।

www.amarboi.org

উপভোগ্যতা : খেয়াল সঙ্গীতে ধ্রুপদ সঙ্গীতের একটি নোট আর একটির নোটের সঙ্গে ধ্রুপদের ন্যায় আস্তে আস্তে মিশনা। বরং, একটি নোট থেকে আর একটি নোটে বা সুরে দ্রুত মিশে যায়।

এর ফলে নোটগুলো সুস্পষ্ট না হলেও শ্রুতিতে উপভোগ্য হয়। সুরটি না বুঝলেও সুরেলা এবং সুশ্রাব্য হয়। কারণ সুর তরঙ্গের মত বাতাসে ভাসতে থাকে।

ধ্রুপদ সঙ্গীতের মধ্যে বহু গুরুগম্ভীর রসের প্রাধান্য থাকে। এই রস অনেকের পক্ষেই উপভোগ করার দক্ষতা থাকেনা। ধ্রুপদ সংগীত অপেক্ষা খেয়াল সংগীত অধিকতর জনপ্রিয়।

ধ্রুপদ বনাম খেয়াল : খেয়াল সংগীত ধ্রুপদের তুলনায় হালকা এবং প্রস্তুতিহীন। খেয়াল উপস্থিত বক্তৃতার মতো সংগীত। তবে এর মধ্যে সংগীত গ্রামার বা বিধিমালার মারপেচ কম থাকার ফলে সাজ সজ্জা বা মাধুর্য্য অধিকতর হয়।

ধ্রুপদ সঙ্গীতের আনন্দকে যদি রেলগাড়ীতে চলার আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে খেয়াল হবে দামী মটর গাড়ীতে চলার আনন্দের মত।

খেয়াল সঙ্গীতের মধ্যে বিধি বিধান কম থাকায় গায়কের জন্য যেমন এটা সহজ, শ্রোতার জন্যও তেমন আনন্দঘন। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই উপভোগ করা যায়। ধ্রুপদ সঙ্গীতে তৃপ্তি পেতে হলে মিনিটের হিসাবে গান শুনলে চলবে না। ঘন্টার মাপে আনন্দ পেতে হবে। ধ্রুপদ উপভোগ করতে হলে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত গান শোনার ধৈর্য্য থাকতে হবে এবং গানের বিধিমালা জানতে হবে।

নদীতে পাল তোলা নৌকায় ভ্রমনের মত তৃপ্তি পাওয়া যায় ধ্রুপদে। স্প্রীড বোটে চলার আনন্দের মত আনন্দ পাওয়া যায় মধুর তানের খেয়ালের মাধ্যমে। অসংখ্য কম্বিনেশান বা সিটিং এর সুর সৃষ্টি হয় খেয়ালের মাধ্যমে। খেয়াল যদি হয় আধুনিক ও ধর্ম নিরপক্ষ, ধ্রুপদ হবে প্রাচীন এবং ধর্ম ভিত্তিক।

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা

বাংলাদেশে লোকগীতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। রাজন্যবর্গ বা ওমরাহদের অনুপস্থিতির জন্য এ অঞ্চলে বনেদী রাগ প্রধান উচ্ছাঙ্গঁ সঙ্গীতের চর্চা তেমন হয়নি। সংগীতকলা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে উচ্চাঙ্গের সংগীত অনুধাবন, অনুভব ও উপভোগ করা কষ্টকর। সাধারণ লোকের পক্ষে সংগীত সংক্রান্ত তেমন জ্ঞান অর্জন করা হয়ে ওঠে না। সেজন্য এ অঞ্চলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চেয়ে সহজবোধ্য লোকসংগীত এবং ধর্মীয় সংগীত অপেক্ষাকৃত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

www.amarboi.org

নওয়াব ওয়াজেদ আলী খাঁন : অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলী খাঁ ১৮৫৫ সালে ইংরেজের নির্দেশে সিংহাসন পরিত্যাগ করে কলকাতার মাটিয়া বুরুজে নির্বাসিত হতে বাধ্য হন। কিন্তু, তিনি নির্বাসিত হলেও তার সংগীত সাধনা প্রাণবন্ত ও জীবন্ত ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ।

বিদায়ী সংগীত : লাখনৌ ছেড়ে কলিকাতা মাটিয়া বুরুজে যাত্রার প্রাককালে নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ্ স্বরচিত ভৈরবী সংগীত অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে গেয়েছিলেন। ৭০ বছর পর লাখনৌতে ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত All India Music Conference- এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উস্তাদ ফাইয়াজ হোসেন খাঁন অত্যন্ত আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে নওয়াব ওয়াজেদ আলী খাঁ রচিত এবং গীত বিদায় সংগীত গেয়ে শ্রোত্রী মন্ডলীকে অশ্রু ভারাক্রান্ত করেছিলেন।

নাজ সংগীত গ্রন্থ : বলা হয় যে নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ সংগীত সাধনার মাধ্যমে লাখনৌ শহরকে উন্নীত করেছিলেন ভারতের ভিয়েনা নগরীর স্তরে। নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ রচিত "নাজ" শীর্ষক সঙ্গীতের গ্রন্থটি লাখনৌ শহরের সুলতানী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তকে তিনি তার দরবারে শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের গীত শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলী খান রাজ্য পরিচালনা অপেক্ষা সংগীত-চর্চাই বেশী করতেন। রাজদরবারে প্রধান উযিরদের চেয়ে প্রধান সংগীতজ্ঞের আসন ছিল উচ্চে। তিনি যখন বাংলায় নির্বাসিত হন, একশত দশ জন সেরা সংগীতজ্ঞ তাঁর সঙ্গে আসেন। তাজ খান, তাসাদ্দক হোসেন খান প্রমুখ গায়কের কণ্ঠে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সংগীত অত্যধিক সমাদৃত হতো।

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত-চর্চার কথা আলোচনা কালে বলা যায় যে, নওয়াব ওয়াজেদ আলী খানের কলকাতায় নির্বাসন একটি শুভ ঘটনা। লাখনৌ থেকে আগত সংগীতজ্ঞরা বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন।

মুসলিম শাসনামলে শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো ছিল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে উন্নততর শিল্পকলা সৃষ্টি সম্ভব নয়। অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা নিয়ে থাকলে মহত্তর, শিল্প সৃষ্টির চিন্তা অনেকটা বিলাসীতা। বর্তমানে আমাদের শিল্পীদের দারিদ্র্য প্রবাদ বাক্যের ন্যায়।

দারিদ্র্যই শিল্পী জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মেনে না নিয়ে শিল্পচর্চা করা সম্ভব নয়। উপ-মহাদেশের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু, শিল্প-চর্চার দিক দিয়ে আমরা বাদশাহীর আমল থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছি।

www.amarboi.org

বাংলাদেশের সংগীত-গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য। কিন্তু, সংগীত বিজ্ঞানের (রচনাশৈলী, স্বর, যন্ত্র, সংগীত প্রকরণ সম্পর্কীয় সু-বিখ্যাত গ্রন্থ মনে হয় রচিত হয়নি। মুসলিমদের স্বর্ণযুগে সংগীত বিজ্ঞানের ওপর এ স্তরের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

উস্তাদ আলাউদ্দীন খান

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরোদ বাদক উস্তাদ আলাউদ্দীন খান এর জীবন কাহিনী বহু কাল্পনিক নাটক, উপন্যাসের কাহিনী হতে বিস্ময়কর। গলার সুর অপেক্ষা প্রাণহীন যন্ত্র সঙ্গীতের সুর উৎপাদনই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু যন্ত্র বাদকই ছিলেন না, তিনি বহু সংখ্যক যন্ত্র আবিষ্কারও করেছিলেন।

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে উস্তাদ আলাউদ্দীন ছিলেন মধ্য ভারতের মাইহার দরবারের প্রধান যন্ত্র সংগীতজ্ঞ এবং প্রধান সরোদ বাদক। সরোদ হলো আরব দেশে ব্যবহৃত তারযুক্ত এক প্রকার বিশেষ সংগীত যন্ত্র। সরোদ ছাড়াও আলাউদ্দীন খানের প্রিয় সংগীত যন্ত্র ছিল ভায়লিন।

মাইহার দরাবার : মাইহার দরবারে শুধু সংগীতজ্ঞ নয়, সংগীত রচয়িতা এবং সংগীত যন্ত্রবাদকদেরও একটি বিরাট দলও উস্তাদ আলাউদ্দীন খান গড়ে তুলেছিলেন। তারা মাইহার দরবার ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে যন্ত্র সঙ্গীতের আসর জমাতেন। আলাউদ্দীন খানের সরোদ বাজনা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শ্রোতাগণ শ্রবণ করতেন।

ব্যক্তিত্ব : উস্তাদ আলাউদ্দীন খান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন সহজ, সরল ব্যক্তিত্ব। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ও জীবন যাত্রার মান ছিল অত্যন্ত সরল। উস্তাদ আলাউদ্দীন খান এর জীবনের আদর্শ ছিল মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন। জীবন সাধনায় সফল হতে হলে কি অপরিসীম দুঃখ, কষ্ট ভোগ করতে হয়– এর অনুপম দৃষ্টান্ত হলেন আধুনিক কালের উস্তাদ আলাউদ্দীন খান।

বংশ পরিচয় : আলাউদ্দীন খানের জন্ম বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার শিবপুর গ্রামে। তার পিতার নাম সফদার হোসেন খান। আলাউদ্দীন খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফতাব উদ্দীন খান ছিলেন একজন উন্নতমানের তবলা বাদক এবং বংশীবাদক।

উস্তাদ আফতাব উদ্দীন দুই হাঁটুর মাঝখানে তবলা রেখে কনুই দিয়ে তবলা বাজাতে পারতেন। পনের বছর বয়সেই আফতাব উদ্দীন খান গৃহত্যাগী ফকিরের জীবন অবলম্বন করেন। পরবর্তীতে যন্ত্র সঙ্গীতের পেশায় জীবন যাপন করেন।

www.amarboi.org

চার বছর বয়স থেকেই সংগীত যন্ত্রের প্রতি শিশু আলাউদ্দীনের আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতা আফতাব উদ্দীন বাইরে থাকলে শিশু আলাউদ্দীন তবলা এবং ভায়লিন শিশুসুলভ ভাবে নাড়াচাড়া করতেন এবং বাজাতেন। লেখাপড়ায় তার মনোযোগ ছিল না।

শিশুকালে গৃহ ত্যাগ : আট বছর বয়সে মাত্র ১২ টাকা মায়ের অজ্ঞাতে নিয়ে আলাউদ্দীন গৃহত্যাগী হন। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ীর নিকটে নায়ড়া গ্রামে এসে একটি যাত্রা পার্টিতে যোগ দেন।

যাত্রা পার্টিতে : যাত্রা পার্টির প্রধান তাকে দিয়ে পার্টির খাদেমের কাজ করাতেন এবং যাত্রায় অংশ নিতে বা আলাউদ্দীনকে কোন কিছু শিখাতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ, আলাউদ্দীন ছিলেন মুসলিম সন্তান। যাত্রা পার্টিতে থাকা কালেই সংগীত ও সংগীত যন্ত্রের প্রতি আলাউদ্দীনের আকর্ষণ দৃঢ় হয়।

সংগীত বাদক দলে : নায়ড়া গ্রামের পার্টি ছেড়ে আলাউদ্দীন "গফুর এবং গণী" নামের এক সংগীত বাদক দলের অন্তর্ভুক্ত হন। অল্প সময়েই তিনি যন্ত্র সঙ্গীতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নিজেই ঢাকা শহরে রাস্তার পাশে এককভাবে যন্ত্র সংগীত বাজাতেন। এতে যা পয়সা পাওয়া যেত– তা হতে টাকা প্রতি এক আনা (তার পয়সা) তাকে দেওয়া হত। তিনি তুর্য ধবনী উদ্দীপক বাঁশী *Clarionet* বাজানোও শিখে নেন।

কলকাতা গমন : ঢাকা শহরের বৈচিত্র্য আলাউদ্দীনকে ধরে রাখতে পারেনি। "গফুর এবং গণীর" বাদ্য দল ত্যাগ করে আলাউদ্দীন কলকাতায় চলে যান। কলকাতা যে এত বড় শহর– তা তিনি ভাবতে পারেননি। বিরাট বিরাট ইমারত এবং একই রূপ রাস্তা চিহ্নিত করাও তার পক্ষে কষ্টকর ছিল। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর।

প্রথম রাত : কলকাতা শহরের প্রথম রাত আলাউদ্দীন হুগলী এলাকায় গঙ্গা তীরে একটি ঘাটের সিঁড়িতে কাটান। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার কাপড় চোপড় এবং টাকা পয়সা যা সব উধাও হয়ে গেছে।

ভিক্ষা প্রশিক্ষণ : হাঁটতে হাঁটতে আলাউদ্দীন নিমতলায় এসে এক সাধুর কাছে ভিক্ষা চান। সাধু তখন তাকে কিভাবে সাধুর মত আচরণ করতে হবে এবং ভিক্ষুক হিসাবে রাস্তার পাশে বসতে হবে– এ শিক্ষা দেন।

ফলে, অতি সহজে তার খাওয়া পড়া এবং রাস্তার পাশে নিদ্রার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এতে ঐ স্থানের সাধুদের ঈর্ষার সৃষ্টি হল। হয়ত তাদের আয় কিছুটা কমে গিয়েছিল।

www.amarboi.org

বিতাড়ন : সাধুগণ তাকে মারধর করে গঙ্গা তীরের স্নান স্থানের সিঁড়ির আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আলাউদ্দীন তখন ড. কেদারনাথের চেম্বারের বারান্দার নিকটে এসে সংগীতজ্ঞ ভিক্ষুকদের সঙ্গে থাকতে চাইলেন। কিন্তু আলাউদ্দীন খান নাম শুনে সংগীতজ্ঞ ভিক্ষুকেরা তাকে ভদ্র লোকের সন্তান মনে করে তড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি পঙ্গু এবং অন্ধ ভিক্ষুকদের সহকারী হিসাবে তাদের আশ্রয় নিলেন।

ব্রাহ্মণ সংগীতজ্ঞ ননী গোপাল : আলাউদ্দীনের সংগীত ও বাদক হওয়ার নেশা এবং ঢাকার অভিজ্ঞতা এবং কলকাতার বিড়ম্বনা অবহিত হয়ে এক ভদ্রলোক দয়া পরবশ হয়ে তাকে বাবু ননী গোপালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বাবু ননী গোপাল ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ব্রাহ্মণ সংগীতজ্ঞ।

নাম পরিবর্তন : তখন থেকে আলাউদ্দীন বাবু ননী গোপালের পরামর্শে "মন মোহন দে" নাম ধারণ করেন। কারণ, সঙ্গীতের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। বিভিন্ন কারণে তারা মুসলিমদেরকে সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ দিতে অসুবিধা অনুভব করতেন।

তবলা ও তানপুরা প্রশিক্ষণ : আলাউদ্দীন খাঁন তখন হতে বিকালে তিন ঘন্টা তবলা এবং তানপুরা চর্চার সুযোগ পেলেন। শিক্ষার্থী হিসাবে আরও অনেকেই ছিল। তিনি তার গুরুর নিকট সাত বছরে স্বরগাম শিক্ষা পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সময় তাকে অনেকের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়।

বিবাহের রাতে পলায়ন : কলকাতায় কেও তাকে চিনতে পেরে তার পরিবার বর্গকে তার সম্পর্কে জানায়। তার বাবা মা তাকে আনার জন্য তার ভ্রাতা আফতাব উদ্দীনকে কলকাতায় পাঠান। কিছু দিন পর তাকে বাড়িতে ধরে রাখার জন্য বাবা-মা তার সঙ্গে এগার বছর বয়সী এক কন্যার বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের রাতেই আলাউদ্দীন এক বস্ত্রে পালিয়ে যান। তবে উপহার হিসাবে যে ৪৫টি টাকা তিনি সেদিন পেয়েছিলেন তা সাথে নিতে ভুল করেননি।

পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু : কুমিল্লা জেলায় তার বাড়ি নবীনগর থানার শিবপুর গ্রাম থেকে বহু স্থান ঘুরেন। অবশেষে প্রায় চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে নব বিবাহিত আলাউদ্দীন নারায়নগঞ্জ আসেন। নারায়নগঞ্জ থেকে কলকাতায় চলে যান। কিন্তু তার ব্রাহ্মণ গুরু বাবু ননী গোপাল এ মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

বেহালা ও বাঁশি ক্রয় : এবার আলাউদ্দীন হোমিও ডক্টর মহেশ ভট্টাচার্যের ভ্রাতুস্পুত্রের সহায়তায় ডাক্তারের কম্পাউন্ডারের মেসে থাকার সুযোগ পান।

www.amarboi.org

সাথে সাথে তিনি একটি ভাল কাজ করেছিলেন। তা হল বিয়ের মধ্যে প্রাপ্ত উপহারের টাকা হতে তিনি দশ টাকায় একটি বেহালা (ভায়লিন) এবং বিশ টাকা দিয়ে একটি ক্ল্যারিওনেট বাঁশি কিনেন।

কনসার্ট পার্টিতে ঃ এবার তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা হাবু বাবুর আশ্রয়ে আসেন। হাবু বাবু তাকে একটি কনসার্ট পার্টিতে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি মহারাজ যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন শিল্পী কর্মচারী হাজারী খান থেকে শাহনাই (সানাই) বাঁশি বাজানো শিখেন। ঐ সময় তিনি হাবু বাবুর নিকট থেকে বিদেশী যন্ত্র সংগীত চর্চা শিক্ষা শুরু করেন।

তবলা বাদক মিনার্ভা থিয়েটার : টাকার অভাবে আলাউদ্দীন মিনার্ভা থিয়েটারে দশ টাকা মাসিক বেতনে তবলা বাদক হিসাবে চাকুরী নেন। এ সময় তার নাম মদনমোহনকে পরিত্যাগ করা হলে "প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস"। মুরারী গুপ্তের শিষ্য নন্দী ভট্ট থেকে তিনি "পাখওয়াজ" শিক্ষা লাভ করেন। মাঝে মাঝে মিনার্ভা থিয়েটার কোম্পানীতে গানও তিনি গাইতেন।

ত্রিপুরার মহারাজার বাদক দলে : মিনার্ভা থিয়েটার কোম্পানীর চরম অনৈতিক পরিবেশ অসহনীয় হয়ে পড়ার পর আলাউদ্দীন অগত্যা জীবন স্বপ্ন এবং জীবনের একমাত্র শখ গান বাজনা ছেড়ে শান্তির সন্ধানে নিজ বাড়ীতে চলে আসেন। এ সময় তিনি ত্রিপুরার মহারাজার দরবারে বিভিন্ন যন্ত্রের মহড়া দেন। ফলশ্রুতিতে মহারাজার বাদক দলে অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হন।

মুক্তাগাছায় মহারাজ বাড়িতে : ত্রিপুরা থেকে আলাউদ্দীন মুক্তা গাছার (ময়মনসিংহ) জমিদার বাবু "জগৎ কিশোর আচার্যের" চাকুরীতে যোগদান করেন। জমিদার বাবু সঙ্গীতের একজন উদার পৃষ্টপোষক ও সমজদার ছিলেন।

উস্তাদ আহমাদ আলীর খাদেম : মুক্তাগাছার মহারাজার বাড়ীতে রামপুরের উস্তাদ আহমাদ আলী খানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উস্তাদকে সরোদের টৌডিরাগ (আলাপ) শোনান। এক পর্যায়ে আলাউদ্দীন রামপুরের উস্তাদ আহমাদ আলী খানের পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান।

খাদেম ও বাবুর্চি : উস্তাদ আলাউদ্দীন কলকাতায় আসেন এবং চার বছর উস্তাদ আহম্মদ আলী খানের খাদেম ও বাবুর্চি হিসাবে সেবা করেন। এ সময় তিনি সারোদে বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করেন। অতঃপর উস্তাদ আহমাদ আলী খানের সঙ্গে তিনি রামপুরে গমন করেন এবং আহমাদ আলী খান এর পিতা ওয়াজীর আলী খানের সঙ্গে পরিচিত হন।

www.amarboi.org

রামপুরে : ওয়াজীর আলী খান ছিলেন রামপুরের নওয়াবের একজন রুবাবী সংগীত যন্ত্র বাদক। ওয়াজীর আলী খানের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আলাউদ্দীন বহু চেষ্টা করেন।

এক টাকার আফিম : এক টাকার আফিম কিনে ওয়াজীর আলী খানকে উপহার দেন। এতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াজীর আলী খান সাহেব আলাউদ্দীনকে তার পুত্র আহমাদ আলীর বাবুর্চি হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন।

মাইহার নবাবের গাড়ী চাপা পড়ার চেষ্টা : এ সময় একদিন নতুন বুদ্ধি আলাউদ্দীনের মাথায় এলো। মাইহারের নওয়াবের গাড়ী যখন প্রাসাদ থেকে বের হচ্ছিল, তখন আলাউদ্দীন গাড়ির সম্মুখে সেজদা দিয়ে পড়ে যান। গাড়ি অবশ্য ড্রাইভার থামিয়ে ফেলেছিল এবং পুলিশ আলাউদ্দীনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

দুর্ঘটনা হতে রক্ষা : রামপুরের নওয়াব বাহাদুর এই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়ে বললেন "রুবাবী বাদক ওয়াজীর আলী খান বঙ্গদেশ থেকে একটি সন্ত্রাসী নিয়ে এসেছে।" আল্লাহ্‌র শুকরিয়া কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

তদন্তে আলাউদ্দীনকে সন্ত্রাসী মনে হয়নি। তার বাবুর্চি চাকুরীটাও থেকে গিয়েছিল। ওয়াজীর আলী খান আলাউদ্দীনকে অনুমতি দিলেন রামপুর দরবারের সংগীতজ্ঞের সঙ্গে এক মাস পর্যন্ত যন্ত্র সংগীত বাজনা চর্চা করতে।

সরোদ বাদক ওয়াজীর আলীর শিষ্যত্ব : রামপুরের নওয়াব আলাউদ্দীনের সংগীত শিক্ষার আগ্রহের খবর পেয়ে ওয়াজীর আলী খানকে বললেন– আলাউদ্দীনকে তার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে। সেকালে উস্তাদের শিষ্য হতে হলে নাজরানা দিতে হত। নওয়াব সাহেব নাজরানা বাবদ কয়েকটি সোনার মোহর তার পক্ষ থেকে আদায় করে দিলেন।

মাসিক এক টাকা বেতন : আলাউদ্দীনের ভরণ পোষণের জন্য মাসিক এক টাকা ভাতা মঞ্জুর হল। রামপুর দরবারে আলাউদ্দীন পূর্ণ সাত বছর কাটিয়েছিলেন। তিনি ওয়াজীর আলী খানের সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। কিন্তু সংগীত শিক্ষার তেমন সুযোগই পেতেন না।

স্ত্রীর আত্মহত্যা : এর মধ্যে খবর পেলেন যে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। ওয়াজীর আলী খান এ খবর পেয়ে ভক্ত আলাউদ্দীনের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হলেন এবং তাকে নিয়মিত সংগীত শিক্ষা দিতে রাজী হলেন। ওয়াজীর আলী খানের মৃত্যু পর্যন্ত আলাউদ্দীনের রামপুরে ছিলেন। অতপর

www.amarboi.org

রামপুর ত্যাগ করে আলাউদ্দীন বাড়িতে ফিরে এলেন এবং নতুন করে বিয়ে করলেন।

মাইহার মহারাজার দরবারে চাকুরী : অতঃপর আলাউদ্দীন মধ্য ভারতে মাইহার মহারাজার দরবারে চাকুরী নিলেন এবং প্রায় সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন।

ইউরোপ ভ্রমণ : নৃত্য শিল্পী উদয় শংকরের দলের সঙ্গে আলাউদ্দীন খান ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং সরোদ বাদ্য বাজনা উপস্থাপন করেন। অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরী এবং জার্মানী এর বিভিন্ন শহরে আলাউদ্দীনের সরোদ বাদ্য সাড়া জাগিয়ে ছিল।

মাইহার বাদক দল গঠন : ইউরোপ থেকে আলাউদ্দীন ইউরোপীয় সংগীত যন্ত্র নিয়ে আসেন। মাইহারের মহারাজার দরবারে একটি উত্তম মানের সংগীত যন্ত্র ক্রয় করিয়ে নিয়ে আনান। মাইহারের দরবারের একটি উন্নত মানের বাদক দলও ক্রমশঃ গড়ে তোলেন। মাইহারের বাদক দল উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুনাম অর্জন করে।

উপমহাদেশের সর্বোত্তম সরোদ বাদক : আলাউদ্দীন খান ছিলেন উপমহাদেশের সর্বোত্তম সরোদ বাদক। ওয়াজীর আলী খানের আরেক শিষ্য হাফিজ আলী খানও সরোদে দক্ষতা অর্জন করেন। তবে আলাউদ্দীন খান ছিলেন সার্বিক বিচারে সরোদ বাজনায় উপমহাদেশে অদ্বিতীয় এবং তুলনাহীন।

জীবন ব্যাপী সাধনা : আলাউদ্দীনের পুত্র আহমাদ আলীও সরোদ বাজনায় পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। উস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হলো– তার জীবনব্যাপী সাধনা। এরূপ শ্রম সাধনার অধিকারী হলে যে কোন বিভাগেই অপ্রত্যাশিত এবং অকল্পনীয় সাফল্য সহজসাধ্য।

www.amarboi.org

শেষ কথা

সুরের সাগরে অবগাহন

গোলাফ গাছের গোলাফ হতে সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। নিষ্পাপ শিশুর দেহ হতে মলমূত্রও নির্গত হয়। মানব দেহ নির্গত বীর্য, ডিম্বানু হতে নবী রাসূলের ন্যায় মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছে। সূফী, ওয়ালি দরবেশের জন্ম হয়েছে। ফেরাউন, সাদ্দাত, নামরুদ, আবূ লাহাব, আবূ যাহেলও মানব দেহ নিস্মৃত অপবিত্র বস্তু হতে সৃষ্ট। গান বাজনাও অনেকটা তদ্রূপ। এক ভাই ইচ্ছা করলে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন। অপর ভাই যৌন সংগীত গাইতে পারে। ছোরা দিয়ে কুরবানীর গরু জবেহ করা হয়। ঐ ছুরি দিয়ে নিষ্পাপ শিশু হত্যা করা যায়। নিয়ত অনুসারে কর্ম ফল।

গানের সুর: গানের সুর এমন যে সকল মানুষই তা পছন্দ করে। গান আনন্দ বৃদ্ধি করে। অনুভূতির নিকটতম সঙ্গী হয় গানের সুর। দূর থেকে ভেসে আসা সংগীতের মৃদূ সুর হৃদয়কে নাড়া দেয়। সংগীতের সুর যত দূর হতে আসে, ততই গভীর হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া সুরের অভাব অতি তীব্র। সংগীতের হারানো সুর, হারানো অর্থ হতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সুরের প্রভাবের গভীরতা : মানুষের অনুভূতির ওপর অতি গভীর প্রভাব হলো সংগীতের সুরের। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সংগীত শ্রবণ করলে সংগীতের ডানায় ভর করে মন যতদূর সম্ভব উড়ে যায়। সংগীতের ডানায় যে অনুভূতি ভর করে, ক্রমশ তা নেমে এসে জীবনের ওপর আছর করে। দৈনন্দিন জীবনের কালিমা সংগীতের জলে মুছে যায়।

সংগীত পুরুষের হৃদয়ে ও নয়নে অগ্নি প্রজ্বলিত করে। নারীর নয়নে প্রবাহিত করতে পারে অশ্রুধারা।

সংগীতের তান : জড় এবং জীবনের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রাণ। রক্ত, বীর্য ও বস্তুতে যখন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। নড়া চড়া করে। জড় বস্তুতে জীবন সৃষ্টির পর খাদ্য দিতে হয়। এ প্রাণের নড়া চড়ায় সংগীতের তাল আছে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্কের প্রতীক হলো মা এবং নবজাতকের মাতৃদেহের মূর্চনা।

সুরেলা ধ্বনী : শব্দের উত্থান পতনের মধ্যে সংগীতের সুরেলা ধ্বনি, আলাপ, তান আছে। পশুর প্রাণের প্রকাশও ধ্বনি এবং তানে। শ্রবণের মত কণ্ঠ থাকলে সর্বত্রই সংগীতের সুর শোনা যায়।

www.amarboi.org

শিশুর কান্নার মধ্যে ধ্বনি তরঙ্গ আছে। কান্নার স্বরগ্রামের মাধ্যমে শিশু কথা বলে। শিশু ক্রোধ, অভাব এবং প্রয়োজনের বিষয় তার মাকে জানায়। মা এর কর্ণের পর্দায় শিশুর সুরেলা ধ্বনিতে ঐক্য তান প্রতিষ্ঠিত হয়। মা জানে কান্নার মাধ্যমে শিশু কি চায়।

সংগীতের উপকারীতা : ধর্মীয় সংগীত মলিনতা মুক্ত। হামদ, নাত, গজলের পবিত্রতা গভীর। সংগীত শিল্পীকে পিতামাতা এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং আবেগ অনুভূতির দিকে টেনে তোলে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সান্নিধ্য স্থাপন করে। সংগীতের আবেদন প্রভাব বিস্তার করে মনে এবং অনুভূতিতে।

গানের সম্পর্ক জ্ঞানের সঙ্গে নয়। বরং আবেগের সঙ্গে। কবিতা হতে গান অনেক উপরের শিল্পকলা। কবিতা মনকে তত মাতাতে পারে না, যতটুকু পারে সংগীতের মূর্চনা, সুরের কম্পন। সরগ্রামের ওঠানামা।

সর্বজনীনতা : সংগীত শুধু মাত্র কাণের কাছে বনবনানী, কেনকেনানী নয়। সংগীতের প্রভাব অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ অপেক্ষা হৃদয়ের ওপর সবচেয়ে বেশী। সুকণ্ঠ হলো মানবতার প্রতি স্রষ্টার একটি মহা অনুদান। সংগীত মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা দূর করে। তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

যন্ত্র সংগীত : শিশুর কর্ণের পর্দায়ও যন্ত্র সংগীত আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিশুর নিদ্রা ভাঙ্গে মায়ের গানে। গানের ভাষায় শিশুর চোখ নিদ্রালু হয়।

যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার চেতনায় তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। কোনো কোনো সংগীত হৃদয়ে ঝড় এবং উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। জীবিত থেকেও অধ মৃতের অস্তি পাঞ্জরে প্রাণ সৃষ্টির একটি মহৌষধ হতে পার সংগীত। হতাশায় বিপন্ন হৃদয়ে প্রাণ সৃষ্টি করে সংগীত। ভাঙ্গা হৃদয়ের চিকিৎসার একটি ওষুধ হলো সংগীত। যারা গান বাজনা ভালোবাসে, তাদের মেজাজ সাধারণত সুসম হয়ে থাকে।

সংগীত হলো সর্বজনীন আনন্দের উৎস। মানবতার এক সর্বজনীন ভাষা হলো যন্ত্র সংগীত। যন্ত্র সংগীতের ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনুভব করে। নৃত্য কলার নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নৃত হলো নীরব সংগীত। সংগীত হলো অদৃশ্য নৃত্য।

ইঙ্গিতবহ সংগীত : সংগীত সব কিছু সুস্পষ্ট করে বলে না। সংগীত শুধু স্থাপত্য এবং পেইন্টিং এর ন্যায় সত্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়। কল্পনা ঐ ইঙ্গিতে ভাষা প্রয়োগ করে।

www.amarboi.org

দেবদূতগণের সঙ্গে কথা হয় যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে। চিত্রকলা ইঙ্গিতবহ এবং সিম্বলিক। এর মধ্যে পাওয়া যায় বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত বা আউটলাইন। ভেতরটা পূরণ করতে হয় নিজস্ব কল্পনা দিয়ে। সংগীতও তাই।

সংগীত গল্প বা ঘটনার মত নয়। কবিতার মতও নয়। বরং অধিকতর অস্বচ্ছ এবং অস্পষ্ট। যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে ভক্ত হৃদয়ে উর্ধলোকের নির্দেশ ধ্বনিত হয়।

দ্বীনী সংগীত : হযরত দাউদ আ: এর কণ্ঠস্বর ছিল যে কোনো সংগীতজ্ঞের কণ্ঠস্বর থেকে মধুর। প্রচারকগণ, 'হামদ, নাত, গজল ও তিলাওয়াতে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন। ধর্মের সঙ্গে ওয়াজের সুর এবং মনের কোলাকুলি হয়।

জান্নাতের মানুষ হযরত আদম আ: এবং আদি মাতা হাওয়া দুনিয়াতে এসেছেন। দুনিয়ার মানুষের আর দু' একটি বিষয় স্বর্গে ফিরে যাবে, তা হলো নেক আমল, কুরআন তিলাওয়াতের স্বর এবং মানুষের ঈমান।

মধুর কণ্ঠস্বর মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার এক বিরাট অনুদান। এ অনুদান বীজসম। তা চর্চা করা হলে এ বীজ বিরাট মহীরুহের আকার ধারন করতে পারে। জান্নাতে মানুষের সুর হবে মধুরতম। এ সুর দুনিয়াতে মানুষের কণ্ঠে লুক্কায়িত আছে।

নবী রাসূলদের কারো কারো কণ্ঠস্বরে সংগীতের আমেজ থাকতো। তাঁদের কোমল স্বরে দু:খ ও বেদনায় হৃদয়ের আগুন নিভে যেত। সংগীত আনন্দের সময়ের বন্ধু। সংগীত পান্ডিত্যের সহায়ক ও সহকারী। সংগীতের সুরে এবং স্বরে ভাষা হারিয়ে যায়। সংগীত হতে পারে ধর্মের সঙ্গী এবং প্রার্থনার শিষ্য। হিন্দু ধর্মে মধুর সংগীত হলো পবিত্র ঈশ্বরের বাণী। তাদের সংগীতের দেবতাদের বাণী শ্রুত হয়।

সংগীতজ্ঞদের জীবন যাত্রার মান : মুসলিম সোনালী যুগের সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতজ্ঞাগণের জীবন যাত্রার মান ছিল আশাতীত ভাবে অতি উচ্চ। বর্তমান কালের মধ্যবিত্তদের স্তরে নয়, বরং তুলনামূলকভাবে তারা থাকতেন যে কোনো শহরের সমৃদ্ধতম অঞ্চলে।

মুসলিমদের সোনালী যুগে সংগীত সেবীদের অধ:পতন নয় বরং সামাজিক স্তরের উর্ধে আরোহন ছিল অভিজাত, বনেদী এবং উচ্চবিত্তদেরও ঈর্ষার বিষয়।

www.amarboi.org

সংগীত ও হৃদয় : হৃদয়ের বেদনার সুরে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়। ব্যথা বেদনায় যখন কণ্ঠস্বর স্তব্দ হয়ে যায়, সংগীতের স্বর হৃদয়ে তখনো বাজতে থাকে।

এমন হৃদয়ে কি আছে যা সংগীতের মূর্চনায় গলে না ! দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের একটি ওষুধ হলো ভাষাহীন সংগীত।

সংগীতের সুর সর্বত্র শ্রুত হয় যদি মানুষের কর্ণ উৎকর্ণ থাকে। সংগীত হৃদয়কে অতি কোমল এবং নিরস্ত্র করে নেয়। হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত একটি ধর্মীয় তীরও ফিরে যেতে বাধ্য হয় না।

দৈনন্দিন জীবনের ধুলিকনা মুছে যায় শ্বাশত সংগীতের স্রোতে ও টানে। সংগীত শিক্ষার মাধ্যমে প্রেমের শিক্ষাও হয়ে যায়। সংগীত মনকে এমন কোমল করে তোলে যে ধর্মীয় সংগীতের মোহনীয়তায় ভাষা হারিয়ে যায়।

www.amarboi.org

উপমহাদেশীয় সংগীত চর্চার তথ্যসূত্র

১. করম ঈমাম খান, মাদান-ই-মিউসিকি
২. প্রফেসর রেনাডে 'হিন্দুস্থানী সংগীত'
৩. ড. প্রফেসর আবদুল হালিম Essays on History of Pak-Indian Music, Dhaka, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-১৭
৪. শাহনেওয়াজ খান, মিরাত-ই-আফতাবনামা
৫. ড. প্রফেসর আব্দুল হালিম, Essays on History of Pak-Indian Music, পৃষ্ঠা-১৫, ঢাকা- ১৯৬২
৬. ড. প্রফেসর আবদুল হালিম, Essay on History of Pak-Indian Music, পৃষ্ঠা-১৬
৭. ড. প্রফেসর আবদুল হালিম, Essay on History of Pak-Indian Music, পৃষ্ঠা-১৯
৮. শাহনেওয়াজ খান, মিরাত-ই-আফতাব-নামা, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি
৯. Blockmann; আইনী আকবরী, পৃষ্ঠা- ৬৮০
১০. Percy Brown History of Indian Painting
১১. বন্ধু বিনোদ মিশ্র, হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২৪৬
১২. মিরাতাই আফতাব নামা, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়, পাণ্ডুলিপি, ফলিও নাম্বার-৫২২
১৩. মিরাত-ই-আফতাব
১৪. Percy Brown, History of Mugual Painting
১৫. বন্ধু বিনোদ মিশ্র ঃ History of Hindi Literature, Volome, p-246
১৬. Roger, Memoris of Jahangir, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৩
১৭. শাহনেওয়াজ খান, মিরাত-ই-আফতাবনামা
১৮. বাদশা নামা, খণ্ড-১
১৯. আমলে সালিহ, খণ্ড-১
২০. প্রফেসর আব্দুল হালিম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬
২১. Father Hosten, Memoris : Asiatic Society of Bengal, Calcutta
২২. শাহনেওয়াজ খান মিরাত-ই-আফতাব নামা
২৩. মির্জা ফকির উল্লাহ, রাগনামা
২৪. মির্জা ফকির উল্লাহ, "রাগ দর্পণ"
২৫. মিরাত-ই-আফতাব নামা, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, পান্ডুলিপি ৫২৫
২৬. ফকির উল্লাহ ঃ রাগ দর্পন, ফলিউ-২০
২৭. Profesor Abdul Halim, p-46
২৮. নিজামুদ্দীন আহমাদ বকশী, তাবাকাত-ই-আকবরীনামা, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২৪০
২৯. Nizamuddin Ahmed Bakhshi: Tabaqat-i Akbari, Bibliotheca Indica Series, Vol. III, P-439
৩০. ফকির উল্লাহ, 'রাগ দর্পন', 'মান কৌতুহল'
৩১. প্রফেসর ঃ ডঃ আবদুল হালিম ঃ Essays on History of Indo-Pak Music, পৃষ্ঠা-২২-২৩
৩২. রাজা নওয়াব আলী, Muariful Nghmat-2
৩৩. Bay (Translete) Mirat-I Sikandari, History of Guzrat, P-411

www.amarboi.org

মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস
বুনিয়াদী গ্রন্থ সূত্র তথ্য (Bibliography)

১। **আল কুরআনুল কারীম**

সূরাহ্ লুকমান ৩১ : আয়াত ৬

সূরাহ্ লুকমান ৩১ : আয়াত ৬

সূরাহ্ হজ্জ ৪৯ : আয়াত ২

সূরাহ্ নাজম ৫৩ : আয়াত ৬০, ৬১

সূরাহ্ আকসা ৮০ : আয়াত ১

সূরাহ্ আকসা ৮০ : আয়াত ২

২। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহিম ইবন আল মুগিরা ইবন বারাহ্দিজা আবূ আব্দুলস্নাহ্ আল দারন্নয়া ফিল বুখারী : **সাহীহ্ আল বুখারী**।

৩। **মুসলিম** ইবন হাজ্জাজঃ **আস সাহীহ্ লি মুসলিম**।

৪। আবূ ঈছা মুহাম্মাদ ইবন ঈছা **আত্ তিরমিজি : জামিউত তিরমিজি**

৫। সুলাইমান ইবন আশআছ **আবূ দাউদ** আস সাজিস্থানীঃ **সুনানু আবূ দাউদ**

৬। ইমাম নোমান ইবন সাবেত **আবু হানিফা** রাঃ হতে উদ্ধৃতি

৭। **ইমাম মালিক** ইবনু আনাস রাঃ হতে উদ্ধৃতি

৮। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু **ইদরিস শফেঈ** রঃ হতে উদ্ধৃতি

৯। ইমাম **আহমাদ ইবনু হাম্বাল** রঃ হতে উদ্ধৃতি।

10. Abu Abdullah Ibn al Abbar, **Kitab al Takmila**, Fiad Tarikh. Edited by D.F. Corera, Madrid, 1889.

11. W. Ahlward edited **The Divans of six Ancient Arab Poets,** London, 1870.

12-25). <u>**14 Vols**</u>, Ibn al Akhir, **Al-Kamil**, edited by C.J. Tornberg. <u>**14 Vols**</u>, Leyden. 1851-76.

26. H.F. Amedroz (Edited) **Kitab al Wazara al Sabi**, Hilal, Leyden, 1904.

27-33). <u>**7 Vols**</u> H.F. Amedroz and D.S. Margoliouth (Translation & edition) **The Eclipse of the Abbasid Caliphate,** <u>**7 Vols**</u>, Oxford, 1920-21.

34. E.G. Browne, **A Literary History of Persia from the Earliest times till Firdousi,** Cambridge, 1928, London, 1902.

35. **Bibliotheca India,** London, 1849.

www.amarboi.org

36. Mechaelis Casiri, **Bibliotheca Arabico Hispana,** Madrid, 1760-70.
37. Saluador Daniel. Edited by Henry Gorge Farmer, **The Music and the Musical, Instruments of the Arabs,** London, 1915.
38. Zirab al Dawla, **Kitab, Tarbih al Arwah, Millah ah al Surar al Afrah (Ghost Remover and the key to joy and Happiness).**
39-42). 4 Vols, R.P.A. Dozy, **History of Musalmans of Spain,** 4 Vols, Leyden, 1861.
43. I. Hastings, **Encyclopedia of Religions & Ethics,** Edinburgh, 1908 to 1926.
44. Henry George Farmer, **Arabian Influence on Musical Theory,** London, 1925.
45. Henry George Farmer: **A History of Arabic Music up to 13th Century,** Luzac and Company, London, 1929.
46. Henry George Farmer, **The Influence of Music From Arabic Sources, London, 1926.**
47-51). 5 Vols, Abul Fida, **Akhbarul Bashar (History of Mankind), Anales Muslem,** 5 Vols, Hafriae, 1789-94.
52. C. Huart: **A History of Arabic Literature,** London, 1903.
53. Reynold A. Nicholson, **A Literary History of the Arabs,** London,1907.
54-58). 5 Vols, Al-Nuwairi, Nihayat al Arab, 5 Vols, Cairo, 1925.
59. Abul Faraj Ibn Ismail Ibn Muhammad al Quraisi Al-Ispahani, **Hebrews, Historia Orientatis,** Oxford, 1672
60-80). 21 Vols, **Abul Faraj Ali Ibn Al-Ismail Ibn Muhammad al Quraisi Al-Ispahani, Kitab al Aghani,** 21 Vols, Printed in Cairo, 1905-6. Biliotheka India, Calcutta.
81-83). 3 Vols, Alauddin Ata Mahiki **Juwayni, Tarikhi Zahan Gusha,** Edited by Mohammed Qazwini, 3 Vols, London and Leyden, 1912-37.
84-85). 2 Vols, L. Leclerc, **History of Arab Medicine,** 2 Vols, Paris, 1876.
86. H.C. Kay, **Yaman, Its early Mediaeval History,** original by Nazim Ud-Deen, Omarah al Hakami, London, 1892.
87. Ibn **Khaldun, Muqaddimah,** Paris, 1858, **Kitabul Ibr, Universal History of Arabia.**

www.amarboi.org

88. Hajji **Khalifa, Kashf al Zunun**, Leipsic, London, 1835-58, Habib as Siyar.
89. Ibn Khaldun, **Prolegomenes, Historiques,** Paris, 1862-68.

90-93). 4 Vols, Ibn Khallikan: **Biographical Dictionary**, Translated From Arabic by Baron Mac Guekin de Slene, 4 Vols, London, Paris, 1843-71.
94. Ibn Khallikan, **Kitabul Wafiatul Ayyan,** (Translation of Ibn Khillikan's Biographical Dictionary).
95. Nasir Khusrau, **Safar Namah** AH 437-444 (1035-1042 A.D). Edited & Translated by C. Schefer, Paris, 1874, 1881-1892
96-97). 2 Vols, Mohammed Ibn Shakir Al-Kutubi, **Fuwat al Wafat**, Edited by Nasr al Haruni, 2 Vols, Bulaq, 1866.
98-100). 3 Vols, W.H. Macnathen, Editor, The Alif Laila of Book of the Thousand Nights and One Night, 3 Vols, London, 1841.
101-102). 2 Vols, Al-Maqqari, **Analectes Sur Histoire et la literature des Arabs** d' Espange, 2 Vols, Leyden – 1855-61.
103-104). 2 Vols, Al-Maqqari, Al-Mawaiz wal-Itibor, Edited by Muhammad Quttal Adawi, 2 Vols, Bulaq, 1853, (Nafhut–Tib (History of Spain).
105-106). 2 Vols, Al-Maqqari, **The History of Mohammedan Dynasties in Spain,** 2 Vols, London, 1840-43, Translated by Pascual de Gayzngos, 2 Vols, Leyden, 1855-61.
107-108). **2 Vols,** Al-Maqrizi, Al Mawadiz, Wal i Tiber, Edited by Mohammad Qutta al-Adawi, **2 Vols,** Bulaq, 1853.
109. Abdul Wahid Al-Marakushi, **The History of the Almohades**, Edited by R, Dozy, Leyden, 1881.
110-118). 9 Vols, Al-Masudi : Abul Hasan Ali Ibn Husain, Ibn Ali Al-Masudi, **Akhbar al Zaman, Kitab-al, Awsat**. Les Prairies d'or, 9 Vols, Paris, 1861-77.
119. Al-Masudi, Abul Hasan Ali Ibn Husain Ibn Ali Al-Masudi, **Kitab al Tanbih Wa'l Ischraf**, Edited by M.G. de Geoje. Leyden, 1894.
120. Al-Mubarrad, **Kamil of El Mubarrad**, Edited by W. Wright, Leipsic, 1874-92.

www.amarboi.org

121. W. Muir, **The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall**, Edited by T.H. Weir, Edinburg, 1915.

122-125. 4 Vols, A.C. Muredja D' O' Ohsson, **History of the Mongols from Chengis Khan to Timorlane**, 4 Vols, The Hague, Amsterdam, Netherlands, 1834-35.

126-127). 2 Vols, Minhaj-ud-Din Saraj, **Tabaqati Nasiri**, Translated by H.G. Reverty, Bibliotheca, Indica, 2 Vols, London, 1881.

128. Reynold A. Nicholson, **A Literary History of the Arabs**, London, 1907.

129. J, Owen, The Skeptics in the Italian Renaissance, London, 1893.

130. Stanley Lane Poole, **The Mohammadan Dynasties,** 1894.

131. Stanley Lane Poole, **A History of Egypt in the Middle Ages**, London, 1901.

132. Stanley Lane Poole, **The Moors in Spain**, 4th Edition, London, 1890.

133. Zakariyyah Al Qaswini: **Athar al Bilad**, Gottingen, 1857.

134. Abu Hasan Ali Ibn Yousuf Al-Qifti, **Kitab al Ikhbar al Ulama**, (History of Scholars)

135. Abul Hasan Ali Ibn Yousuf Al-Qifti, **Tarikh al Hakama**, Edited by Lippert, Leipsic, 1903.

136-138). 3 Vols, **Abdullah Ibn Al-Aqqas Ibn Al-Fazal, Ahmed Ibn Mohammed Ibn Abd Rabbihi** (860-780 AD.) **Iqd al Farid**, (Unique Necklac) 3 Vols, Cairo,1887-88.

139. J. Rebera, La Musica de Las Cantigas, Madrid, 1922.

140. Shafi al Deen, **Kitab al Aduar** (Book on Musical Note) Text Book on Music, 1252 A.D.

141. Sharf Al Deen Harun, **Tawarikh Islam Ghusa** 18 : Risalat Al-Sharfiyah.

142. M. Steins-cheneider, **Jewish Literature from the Eighth to Eighteenth Century**, London, 1857.

143. Ibn at- Tiqtaka, **Al Fakhri, History of Muslim Dynasties, Paris**, 1910. W. Ahlwardt, Gotha Edition, 1860.

144-146). 3 Vols, G. B. Todenrini, Literature Turchesca, 3 Vols, Venice- 1787.

147. Abu Zafar Nasiruddin, Tusi, **Ilm al Musici** (Science of Music)

www.amarboi.org

148-149). 2 Vols, Muaffaz al Dear Abul Anbar Ibn Abi Usaiba (1202-1270 AD.): **Uyun al Anbafi Tabaqat al Attibba**, (History Physicians). 2 Vols, Konigsberg, 1882.

150. C. Van Volten, (Edited by Liber) **Maatih-al Ulum**, Leyden, 1895.

151. Jaliz, (C, Van Volten edited) **Kitab al-Mahasin wal Addad**, Leyden, 1898.

152-158). 7 Vols, Von Hammer- Purgstall, **Literature of the Arabs,** 7 Vols, Vienna, 1850-56.

159. Wolf, **Bibliography Hibrew.**

160-166). 7 Vols, Yakut, **Irshad al Arib** (Mujam al Udaba) edited by D.S. Margoliuth (Gibb, Series), 7 Vols, London, 1908-27.

167. Abul Faraz Mohammad Ibn Ishaq Ibn **Abi Yakub al Nadim Al-Warraq** Baghdadi, **Al-Kitab Al Fihrist** min Anmer Qungent, Hirous, Leipsic -1871-72.

আসতাগফিরুল্লাহ্ মিন কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।
আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তায়ালার।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ -এর সম্মানীত পরিচালকবৃন্দের অনেকেই **'মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস'** পুস্তকটির রচনা সম্পন্ন করতে এবং প্রকাশনা ত্বরান্বিত করতে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ এবং তাদের অনুগ্রহভাজন।

এ পুস্তকটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনামূলক প্রচেষ্টা না হলে পুস্তকটি প্রকাশনা অনেক বিলম্বিত হতো। আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী।

তাদের জীবন যাত্রা উন্নততর ও সাফল্য মন্ডিত হোক এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জীবন সুন্দর হোক— রাব্বুল আলামীনের নিকট এই প্রার্থনা এবং মুনাজাত করছি। আমীন

এ জেড এম শামসুল আলম
বিনীত লেখক

www.amarboi.org

এজেডএম শামসুল আলম-রচিত
কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা

১. আল্লাহু তা'য়ালা ও তার সত্ত্বা, পৃঃ ৯৬, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী।
২. আল-কুরআনের বাণী, পৃঃ ১০৮, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী।
৩. ঈমান ও তাঁর মৌলিক উপাদান, অনুবাদকঃ শহীদ আকন্দ, পৃঃ ১৪৪, বাড পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রী।
৪. হায়াত, মউত, দৌলত, অনুবাদক ঃ শহীদ আকন্দ, পৃঃ ১০৪, মুহাম্মাদ পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রী।

তাবলীগ ও দাওয়াহ

৫. তাবলীগ ও ফজিলত, অনুবাদক শহীদ আকন্দ, পৃঃ ১৫২, বাড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮ খ্রী।
৬. তাবলীগ ও দাওয়াহ, অনুবাদক শহীদ আকন্দ, পৃঃ ৪৪০, ই. ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

সালাত-সিয়াম

৭. সালাত ও সিয়ামের তাৎপর্য, পৃঃ ১২৮, নব তরঙ্গ, ২০০০ খ্রী।
৮. রোজার তাৎপর্য, পৃঃ ৬২, ই. ফা. বা. প্রকাশনা, ২০০৩ খ্রী।
৯. হজ্জের তাৎপর্য, পৃঃ ৯৬, মল্লিক এন্ড কোং, ১৯৯৩।

মহানবীঃ

১০. মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.), পৃঃ ১৬৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৮ খ্রী।
১১. মহানবী পরিবার, পৃঃ ১৭৬, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৫ খ্রী।
১২. শিশুদের মহানবী (সাঃ), পৃঃ ৭০, ই. ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৬ খ্রী।
১৩. মহানবী (সাঃ) ও শিশু, পৃঃ ৪০, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫ খ্রী।

সাহাবীঃ

১৪. আশারা মুবাশ্‌শারা (দশজন বিশিষ্ট সাহাবী), পৃঃ ১২৬, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রী।
১৫. মহিলা সাহাবী, পৃষ্ঠা-১৫২, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৭ খ্রী।
১৬. হযরত আলী (রা.), এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পত্র, পৃঃ ৩৫, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৩ খ্রী।
১৭. কৃতদাস থেকে সাহাবী, পৃঃ ১২৮, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী।
১৮. ইতিহাসে উপেক্ষিত আবূ জর (রা.), পৃঃ ৭২, মুক্তি প্রকাশনী, ১৩৭৫ বাংলা
১৯. বিপ্লবী সাহাবী আবূ জর গিফারী (রা.), পৃঃ ৬৬, মুক্তি প্রকাশনী ১৯৬৭ খ্রী।

সোনালী জীবনঃ

২০. সাহাবীদের সোনালী জীবন-১, পৃঃ ১৬০, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খ্রী।
২১. সাহাবীদের সোনালী জীবন-২, পৃঃ ১৬৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খ্রী।
২২. সাহাবীদের সোনালী জীবন-৩, পৃঃ ১৬৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৫ খ্রী।

সংস্কৃতিঃ

২৩. ইসলাম ও সঙ্গীত চর্চা পৃঃ ৬২, মুর্শেদী প্রেস, সুনামগঞ্জ, ১৯৬৭ খ্রী
২৪. বাঙ্গালী সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪৪, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রী।
২৫. মুসলিম সংস্কৃতি, পৃঃ ২০৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রী।
২৬. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পৃঃ ১৫৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৫ খ্রী।
২৭. মসজিদ পাঠাগার, পৃঃ ৬০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

www.amarboi.org

পারিবারিক মূল্যবোধঃ

২৮. পরিবার পরিজন, পৃঃ ৮৪, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

২৯. বিবাহ ও প্রেম, পৃঃ ১৬০, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

৩০. বিবাহ ও যৌনতা, পৃঃ ১৬০, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

৩১. নারীর শ্রেষ্ঠত্ব, পৃঃ ১৭৬, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

জীবনী

৩২. হযরত শায়খ শাহজালাল (রাঃ), পৃঃ ২৭৪, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬ খ্রী।

৩৩. নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, পৃঃ ৪০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৭ খ্রী।

৩৪. মেজর আবদুল গণী, পৃঃ ৩২, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৭ খ্রী।

৩৫. শাহজালালের শিষ্যগণ, পৃ ৪১, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮২ খ্রী।

ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্সঃ

৩৬. ইসলামী ব্যাংকিং, পৃঃ ১৬০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৯৯ খ্রী।

৩৭. ইসলামী ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল), পৃঃ ১৭৬, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১ খ্রী।

ইসলামী রাষ্ট্র

৩৮. ইসলামী রাষ্ট্র, পৃঃ ২৮৫, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৯৫ খ্রী।

৩৯. আফগান তালিবান, পৃঃ ৪০, বাড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রী।

৪০. আফগানিস্তান ও তালিবান, পৃঃ ১৪৪, বাড পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রী।

ইসলামী অর্থনীতিঃ

৪১. ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, পৃঃ ২২৬, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৩ খ্রী।

৪২. ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ ব্যবস্থার স্বরূপ, পৃঃ ৪৪, গিফারী সোসাইটি প্রকাশনা, ১৯৬৭ খ্রী।

৪৩. জমি ক্রয়-বিক্রয় বন্ধক, পৃঃ ১৬০, ঝিঙ্গে ফুল, ২০০৭ খ্রী।

পরিবার পরিকল্পনাঃ

৪৪. ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা (অনুবাদ); মূলঃ আবদেল রহীম উমরান, Family Planning in the Legacy of Islam পৃঃ ৩৫১, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, ১৯৯৫ খ্রী।

শিক্ষাঃ

৪৫. মাদ্রাসা শিক্ষা, পৃঃ ১৯২, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০০ খ্রী।

৪৬. মহিলা মাদ্রাসা, পৃঃ ৩৪, আল ফালাহ প্রকাশনা, ১৯৯৩ খ্রী।

৪৭. মাসজিদ পাঠাগার, পৃঃ ৬০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

৪৮. শিক্ষামূলক গল্প ও কাহিনী, পৃঃ ১৬০ সাজিদ প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রী।

৪৯. ছোটদের ইসলাম, পৃঃ ৪৮, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী।

৫০. শিশু পালন, পৃঃ ১৪৩, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০১ খ্রী।

বর্ণ পরিচয়

৫১. বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ পৃঃ ৪৮, আলীফ পাবলিশার্স, ১৯৭৯ খ্রী।

৫২. বর্ণ পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৮, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮০ খ্রী।

৫৩. বর্ণ পরিচয়, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৫৬, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮২ খ্রী।

৫৪. ছবিতে বর্ণ পরিচয়, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮১।

ইসলামী প্রবন্ধমালা

৫৫. ইসলামী চিন্তাধারা, পৃঃ ৮৯২, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮১।

৫৬. ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৬১০ ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৮।

৫৭. ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৫৮৪, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

www.amarboi.org

৫৮. ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৩০৪, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮১।
৫৯. নির্বাচিত ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৩১৬, মজিদ পাবলিকেশন, ২০০৫।

বিবিধ

৬০. ব্যবহারিক ইসলাম, পৃঃ ৩৮৬, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬।
৬১. ক্যানসার রোগীর খাদ্য ও পথ্য পৃঃ ৪০, মুজিব পাবলিকেশন ২০০৫ খ্রী।
৬২. ব্যক্তিত্বের বিকাশ পৃঃ ২৬৪, কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী।
৬৩. চাকুরী, পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য পৃঃ ৩০৯ কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০২ খ্রী।
৬৪. অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব, পৃঃ ২৫৭, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১০ খ্রী।
৬৫. ইসলাম ও হিন্দুধর্ম পৃঃ ২৮০, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১১ খ্রী।
৬৬. মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস পৃ- ৩৫৬, দেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১২ খ্রী।

ইংরেজীঃ

67. Message of Tableeg & Dawah Pp. 1390, I.F.B. Publication, 1993.
68. Islamic Thoughts, Pp. 1058, I.F.B. Publication, 1986.
69. Multiplex Thoughts Pp. 946, B.C.B.S. Ltd. 1990.
70. Family Values Pp. 304, B.C.B.S. Ltd. 1995.
71. The Mosque, Mosque Society, Pp. 44, 1979.
72. Mosque and the Youth, Pp 122, B.C.B.S. Ltd., 1999
73. Mosque and Youth Activities in Indonesia, Hilful Fudhul Publication, 1999.
74. Abdul Quader Jilani R. Pp. 32, I.F.B. Publication, 1980
75. Al Hizra Centenary Celebrations Pp. 32, I.F.B. Publication, 1980
76. Islamic Public School Pp. 90, Hilful Fudhul Publication, 1991.
77. English Haraf Pp. 32, I.F.B. Publication, 1984
78. Islam & Family Planning Pp. 126, I.E.M., Family Planning Directorate, 1985
79. Consumption Pattern in Islamic Economy, Pp. 47, Hilful Fudhul Publication, 1999.
80. Entrepreneunal Savings Pp. 60, Hilful Fudhul Publication, 2000.
81. Adminstrative Policy Letter of Hazrat Ali (R.) Pp 40, Department of Forms & Publication, 1976.
&
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 2011
82. Bureaucracy in Bangladesh Perspective Pp. 239, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 2011., BPATC, Savar, 1999.
83. Democracy and Election Pp. 239, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 1996.
84. Administration and Ethics, Pp. 180, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 1997.

www.amarboi.org

মুসলিম সঙ্গীত চর্চার সোনালী ইতিহাস

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা -চট্টগ্রাম